অনুষ্টুপ

প্রাক শারদীয় সংখ্যা

অ নু ষ্টু প

সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক ত্রৈমাসিক

৩৯ তম বর্শ : চতুর্থ সংখ্যা

১৪১২

সূচি

প ত্রি কা র ক থা

স ম্পা দ কী য়

কবিতা ও টীকা : উৎপলকুমার বসু/২

স ং স্কৃ তি স মা চা র

পাপ ও প্রায়শ্চিত্ত : সৌরীন ভট্টাচার্য/৭, নৃতত্ত্বের নতুন পরিসর : অঞ্জন ঘোষ/১২, বই-রাগ সাধনা : হাতে খড়ির অন্তর্জলী : অনিরুদ্ধ লাহিড়ী/১৫, জয় বাবা হলদিরাম ও কালো টাকার দাদাগিরি : দেবনাথ মুখোপাধ্যায়/১৮, কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র পাঠের দিন সমাগত, মাননীয় অর্থমন্ত্রী : সুকুমার সিকদার/২১, ছাত্র আন্দোলন, পশ্চিমবঙ্গ সরকার ও শাসক দল : অরুণকুমার দাস/২৯, একটি নদীর মৃত্যুকথা : সমীর চৌধুরী/৩১, সত্যানন্দ, সরকার, বাজার ইত্যাদি : আনন্দ বর্ধন/৩৪, দ্বিখণ্ডিত : উদয়ভানু চিত্রকর/৩৭, পাঁচিলের এপার-ওপার : সঞ্জয় মুখোপাধ্যায়/৪০, আঁখো-দেখা হাল : সঞ্জয় ঘোষ দস্তিদার/৪২, আরেক তোতা কাহিনী : পতিতপাবন সরকার/৪৫, মাই ব্রাদার নিখিল : এক আধুনিক সংলাপ : দেবাশিস সেনশর্মা/৪৮, দেখেছি সুমন-কে : অভিজিৎ ঘোষ/৫০

আ লে খ্য

অক্ষরের অভিমান, হরফের আড়াল, মুদ্রণ শিল্পী প্রভাতকুমার ঘোষ : স্বপন চক্রবর্তী/৫৯

প্র ব ন্ধ

রাষ্ট্র-ভাষাতত্ত্বর দিকে : রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য/৭৩, পৌরুষের সুযোগ, বিভ্রম ও বিপর্যয় : লিঙ্গচর্চার অন্য আধখানা : জয়ন্তী বসু/৮৩, মেজাজের হেরফের আর বাংলা ক্রিয়াপদ : প্রবাল দাশগুপ্ত/১০৫, বিবাহিতের ব্রহ্মচর্য প্রসঙ্গ : চিরন্তন সরকার/১১৬, কথা, কাহিনি, আখ্যান : সন্দীপ বন্দ্যোপাধ্যায়/১২৭, হারানো বইয়ের আশ্চর্য জগৎ : দেবাশিষ গুপ্ত/১৩৯, শক্তির প্রকাশে সভ্যতার বিকাশ : মহাম্মদ আমীর হোসেন/১৫৯

দু টি ক বি তা : অভীক মজুমদার/১৯৩

গ ল্প

একটি গ্রামের গল্প : দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়/১৯৭, ভূতের ভবিষ্যৎ : হাসান আজিজুল হক/২০৫, ওঙ্গি-জারোয়াদের জীবন : অমর মিত্র/২১৫

ক বি তা

প্রসূন মজুমদার/২২৯, বিপ্লব চৌধুরি/২৩১, নিখিলেশ রায়/২৩২, কৌশিক চক্রবর্তী/২৩৩, অনামিকা বন্দ্যোপাধ্যরায়/২৩৪, সঞ্জয়কুমার দত্ত/২৩৭, অসিত দাস/২৩৯, সেলিম মল্লিক/২৪০, মানসকুমার চিনি/২৪১, তুষার ভট্টাচার্য/২৪২, আনন্দ ঘোষ হাজরা/২৪৩, যশোধরা রায়চৌধুরী/২৪৪, সুবীর ঘোষ/২৪৫, অরিন্দম মণ্ডল/২৪৬, শিবাংশু মুখোপাধ্যায়/২৪৬, প্রফুল্ল পাল/২৪৭, হরিসাধন চন্দ্র/২৪৮

রা জ নৈ তি ক উ পা খ্যা ন

তপন বন্দ্যোপাধ্যায়/২৫১ এবং মোহিত রায়/২৭০

এবারের বাছাই : জগৎমঙ্গলকাব্য : চন্দন ভট্টাচার্য/২৮০

শে ষ পা তা র ছ ড়া : শিবাজী বন্দ্যোপাধ্যায়/২৮২

ক্রো ড় প ত্র

পাঁচ ঘর এক উঠোন : পাঁচ নবীনের গল্প

ভূমিকা : অনিরুদ্ধ লাহিড়ী/২৮৫

রানা সরকার/২৮৭, ধীরেন্দ্রনাথ কর/২৯৯, শেখর বন্দ্যোপাধ্যায়/৩০৮, সাগরিকা রায়/৩১৯, অরুণ কাঞ্জিলাল/৩২৭

অ নু ষ্টু প/১৯৬৬—২০০৫

সম্পাদক অনিল আচার্য

সম্পাদকীয় সহযোগী গৌতম সেনগুপ্ত : অভীক মজুমদার : সুশীল সাহা

কার্যালয় সচিব আশিস ঘোষ

কর্মসচিব অতীশ ঘোষ

প্রচ্ছদ দেবব্রত ঘোষ

বর্ণবিন্যাস কমল পাঁজা

মুদ্রণ ডি. ডি. এ্যান্ড কোং
৬৫ সীতারাম ঘোষ স্ট্রিট

দাম ৬০্ টাকা

সডাক ৮০্ টাকা

প ত্রি কা র ক থা

৩৯ তম বছরের শেষ সংখ্যাটি প্রকাশিত হলো। আগামী শারদীয় সংখ্যা হবে ৪০ তম বছরের প্রথম সংখ্যা। ভাবতেও অবাক লাগে। নিছক ছাত্রাবস্থায় ১৯৬৬ সালে যে পত্রিকা কয়েকজন তরুণের হাতে একটি চারাগাছের মত বা একটি ক্ষুদ্র বীজের মত রোপিত হয়েছিল আজ সে মহীরুহ না হলেও একটি বৃক্ষে পরিণত হয়েছে বলা যায়। কষ্ট করে হলেও সে বেঁচে আছে। গরীবগুর্বোর মত আধপেটা খেয়ে বেঁচে আছে। তাই বা কম কি?

অনুষ্টুপের শৈশবে সময়টা ছিল একদম অন্যরকম। বাতাসে বারুদের গন্ধ ছিল, ছাত্র আন্দোলন ছিল, নতুন চিন্তাভাবনার সঙ্গে ছিল জ্ঞানান্বেষণের আগ্রহ। একদিকে এক্ষণ, পরিচয় অন্যদিকে কৃত্তিবাস। একদিকে মননশীল ও বিখ্যাত মানুষ অন্যদিকে সৃজনের নামে উচ্ছৃঙ্খলতাসহ প্রতিষ্ঠাগামীদের হোয়াইট হাউসের মিছিল। একদিকে সত্যজিৎ, সৌমিত্র, বিনয় ঘোষ, কমলকুমার রাধারমন, দান্তে ও মার্কস সংখ্যা, অন্যদিকে মধ্যরাত্রি শাসন করে কয়েকটি যুবক।

এ-সবের মধ্যে সৃষ্টি হয়েছিল নতুন একটি প্রতিষ্ঠানবিরোধী প্রতিবাদী ধারা, যার অন্যতম বাহক ছিল 'অনুষ্টুপ'। সবচাইতে বড় কথা হলো, অনুষ্টুপ সর্বদাই সময়কে বুঝেছে। নিষ্ঠার সঙ্গে সে প্রতিবাদী কণ্ঠকে বজায় রেখেছে। দেখেছে, 'আজকে যে প্রতিবাদী কণ্ঠ, সর্বংসহা কবে কাল সে'। আর সেখানেই আসে বিচ্যুতি। অনুষ্টুপের তা হয়নি। অনুষ্টুপ সে-জন্যই বেঁচে আছে।

অনেক পুরনো অভ্যাস বজায় রেখেও অনুষ্টুপ কী করে টিকে গেল এতদিন? আত্মসমর্পণ না করে, মাথা উঁচু করে বেঁচে থাকাটা কি আজকের দিনে অপরাধ নয়? এই প্রসঙ্গে মনে পড়ল সদ্যপ্রয়াত ভিন্ন ধরণের গল্পকার অরূপরতন বসুর 'ধ্বংসস্তূপ' নামক সংকলনের *'অপদার্থ'* শীর্ষক গল্পের কয়েকটি লাইন—

সতীশ বলেছিল, একটা কনসেনট্রেশন ক্যাম্পের কমান্ডার কি স্বাধীন? অন্য সকলের হাতে যদি শেকল থাকে, তাহলে কেবল তোর হাতে শেকল না থাকলেই কি তুই স্বাধীন? ....

'আমরা কেড়ে নিচ্ছি না তো?' বলল সতীশ, 'তুই নিজেই সেটা আমাদের হাতে দিবি, না-দিলে এমন কেউ সেটা নেবে, যার লক্ষ্য সে নিজে ছাড়া বাকি আর সকলকে তার মেশিনের চাকা বানিয়ে ফেলা।'

এই সরল যুক্তিতে আমরা শয়তানকে ঈশ্বর বা ঈশ্বরকে শয়তান ভেবে বস্তে পারি। দু'দলেরই লক্ষ্য আমার আত্মা, আমার বিবেক। যদি কাউকে না দিই, যদি বলি আমি সচেতন মানুষ তোমাদের আমি বিশ্বাস করিনা? তোমরা সকলেই ক্ষমতালোভী, তোমরা যারা আজ ক্ষমতায় নেই, কাল ক্ষমতায় গেলে 'অ্যানিম্যাল ফার্ম'-এর নেপোলিয়ন নামক শূকর হবে না, তার কোনও গ্যারান্টি নেই? আমার আত্মা আমারই থাক। অন্যায় হবে কি তা?

আসলে ন্যায় ও অন্যায়ের মধ্যেকার ব্যবধান ক্রমশ হয়ে গেছে দুর্বল। নিজস্ব স্বার্থ ও নিজের ভালো থাকার বাইরে অপরের জন্য বাঁচা, অন্যের দুঃখ দুর্দশার শরিক হওয়ার ভাবনা উবে যাচ্ছে ক্রমশ মধ্যবিত্ত বাঙালির জীবন থেকে। অপরে প্রতি ঈর্ষা, প্রতিহিংসা, অকারণ লোভ খন্ড খন্ড করে দিচ্ছে জীবন আমাদের। কেউ ভালো কাজ করলে, কেউ ভালো লিখলে, কেউ যথাযোগ্য সম্মান পেলে আমরা তা মেনে নিতে পারি না। আমরা দল করি নিজের স্বার্থরক্ষার জন্য, ক্ষমতার মই বেয়ে ওপরে ওঠার জন্য, সবার ভালো করার জন্য নয়। কোনও অন্যায় করে আজ আমাদের অনুশোচনা হয় না। অন্যকে দুঃখ দিয়ে, অন্যের বেদনা সঞ্চার করে আমাদের আনন্দ হয়। একধরনের স্যাডিজম্ পেয়ে বসেছে আমাদের। কিন্তু এই অন্ধকারের মধ্যে আদর্শ মানুষ নেই এমন নয়। ভালো মানুষ আছেন বলেই এখনও চলছে এই সমাজ। খারাপ মানুষের সংখ্যা চিরকালই বেশি বলে, ভালো মানুষ নেই, এমনটি হতে পারে না। এই চল্লিশ বছরে আমরা দেখেছি এমন নিঃস্বার্থ মানুষই সাহিত্য-সংস্কৃতিকে বাঁচিয়ে রেখেছেন। অনুষ্টুপের পাশে দাঁড়িয়েছেন।

এমন কিছু মানুষের সাহচর্য, সাহায্য ও বন্ধুত্ব না পেলে কবে এক ফুঃ-এ নিভে যেত এই ক্ষুদ্র দীপশিখা। সত্তরের ভয়াবহ শ্বেতসন্ত্রাসেও আমরা বেঁচে ছিলাম, পরবর্তীকালে কোনও রাজনৈতিক দলের খাতায় নাম না লিখিয়ে, প্রতিষ্ঠানিকতার সপক্ষে চাটুকারিতা না করে, বরঞ্চ তাকে তীব্রভাবে আক্রমণ করে অনুষ্টুপ বেঁচে আছে আজও।

আমরা নিজেদেরও একটু বদলাতে চাই। বদলানোর জন্য বদলানো নয়, নতুন করে ভাবনা-চিন্তা করে বদলানো। অন্ধভাবে একই অভ্যাস, একই ভাবনা, একই পদ্ধতি অবলম্বন করে চলা নয়। নতুনদের স্থান দেওয়া, নতুন ভাবনাকে তুলে ধরা, নতুন সাহিত্যকে আহবান করাটাও সে কাজের অন্যতম। আমরা পুরাতনের মধ্যেও নতুনকে আবিষ্কার করতে চাই। যোগ্যতা ও বিচারের মাপকাঠিটা আর একবার দেখে নিতে চাই। যদি ভুল করি, শুধরে নিতে আপত্তি নেই। কোনও লেখক যদি নতুনভাবে বার বার ভাবতে ও লিখতে পারেন ভালো, কিন্তু একই লেখা একই কথা একই ভাষ্য বার বার ছাপার কোনও অর্থ নেই। লেখকরা বাঁচেন বলেই পত্রিকা বাঁচে। পত্রিকারও মানুষের মত বাঁচার জন্য বিবেক থাকা দরকার।

আমরা বিবেক বিসর্জন না দিয়ে বেঁচে চাখতে চাই। বেঁচে থাকার অধিকার আছে আমাদের। এই মুহূর্তে বেঁচে থাকার জন্য ক্যানসার নামক কালান্তক ব্যাধির সঙ্গে সংগ্রাম করছেন কবি ভাস্কর চক্রবর্তী। তার বেঁচে থাকার সংগ্রামে আমরা পাশে আছি।

স ম্পা দ কী য়

শেষমেশ ইচ্ছেগুলো উধাও হয়েছে
স্বপ্নগুলো হুমড়ি খেয়ে পড়ে আছে এদিক-সেদিক
কী তুমি করতে পারো
হে উন্মাদ
দিন আর রাত শুধু লেখা আর লিখে যাওয়া ছাড়া

ভাস্কর চক্রবর্তী : জিরাফের ভাষা/১

কী লিখি? কেন লিখি? প্রশ্নটি বার বার বিব্রত করে তোলে। 'অধিকার' ও 'অধিকারী' এসব শব্দ মনের মধ্যে বিভ্রম সৃষ্টি করে বার বার। তবে সাহসী হয়ে উঠি, মূর্খ যেমন সাহস দেখায়, এ-কথা ভেবে যে আজ এ-সব চিন্তা অর্থহীন। কেন প্রকাশিত হয় এত লিট্‌ল ম্যাগাজিন, এত কবিতা, এত গল্প, এত ভাষ্য, এত প্রবন্ধ? চিন্তা ও চেতনার ক্ষেত্রে কোনও সামাজিক অভিঘাত কি তৈরি হয় তার ফলে?

পথ নির্জন, পথে কত ভয়, তবুও রানার ছোটে। ছোটে কি? কোথায় রানার? কী হবে এ-বোঝা বয়ে? কেন লিখেছিলেন সুকান্ত? অল্প বয়সের দুঃখবোধ? মৃত্যুর আগে কি তাই একটু একটু করে পাল্টাচ্ছিল তাঁর কবিতা? তিনি কি ভেবেছিলেন যে ফুলবাগানের মোড়ে, গালে হাত রাখা মূর্তি হয়েই থাকবেন তিনি? হয়ে যাবেন অতিব্যবহৃত মাইক্রোফোনের রেকর্ড, যা বাজানো হয় নিয়মিত এবং যার কোনও অভিঘাত নেই এই সমাজে? যদি বেঁচে থাকতেন, ফুরিয়ে যাওয়া কবি হিসেবে, তিনি কি ডাক পেতেন কবিতা উৎসবে? মনে পড়ে যায়, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথা। বড় কষ্টে, বড় দারিদ্রে মারা গিয়েছিলেন তিনি। আজ কি তিনি কথাসাহিত্য উৎসবে সভাপতিত্ব করতেন? অথবা সভাপতি হতেন বাংলা আকাদেমির? কী বলতেন সভাপতির ভাষণে? নাকি সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের মত অবস্থা হতো তাঁর? অথবা তাঁকে কি কোনও মন্ত্রীত্ব দেওয়া হতো? তাহলে বর্তমান মন্ত্রীরা যা করছেন, তিনিও কি তাই করতেন?

এ-সব এলোমেলো প্রশ্ন ভিড় করে আসে মনে। বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের বন্ধু কবি ও সুবাগ্মী শ্রী নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী আজ বাংলা আকাদেমির সভাপতি। কী ভাবতেন কবি বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় আজ? কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকোত্তর শ্রেণীতে 'মার্কসবাদ ও মার্কসীয় অর্থনীতি', পড়ার জন্য একজন আগ্রহী ছাত্রও নেই। এ-সব দেখে কী ভাবতেন দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়?

হয়তো ভাবতেন, হয়তো ভাবতেন না। হয়তো বলতেন, ঠিক-ই আছে, তা বলে ভেবো না মার্কসবাদ শেষ হয়ে গেছে। মার্কস নিজে কি কিছু ভাবতেন

আজকের সরকারী মার্কসবাদীদের দেখে? নিজেদের দেশে কম্যুনিস্ট শাসন শেষ হয়ে গেছে বলে আফশোস্ করে বেঁচে থাকলে কি লেনিন ও স্তালিন চলে আসতেন কোলকাতায়? বর্তমান চীনের রাষ্ট্রীয় কাঠামো, শেয়ার মার্কেট, মালটিন্যাশানাল দেখে মাওসে তুঙ্-এর কি আর একবার 'পার্কিনসন্স ডিজিজ' হতো না?

আজ দেখে কী যে আনন্দ হয়, একটিও দুষ্টু ছাত্র নেই। কী বাধ্য, কী ভালো হয়ে গেছে সব! সবাই ভবিষ্যতের কথা ভাবছে। কেউ ভাবছে কবে মন্ত্রী হবে, কেউ ভাবছে কবে আমেরিকা যাবে বা যাবে বিদেশে। পড়তে যাবে, পুনে, মুম্বই, ব্যাঙ্গালোর-এ বা দিল্লিতে অথবা এস. আই. টি বা হারভার্ড বা প্রিন্সটন্-এ। যারা এত সব পারবে না, তারা নেতা হবে, পঞ্চায়েত-প্রধান হবে, নিদেন এল্ সি এস। বদলে গেছে সব স্বপ্ন। 'বিপ্লবোত্তর' পরিস্থিতিতে বেড়েছে উচ্চাকাঙ্ক্ষা। গ্রামের ছেলেরা আজ পরীক্ষায় হারিয়ে দিচ্ছে শহরকে। তাদের চোখে উচ্চাকাঙ্ক্ষা। ডাক্তার হবে, ইঞ্জিনিয়ার হবে, বড় চাকরি করবে। কিন্তু কেউ-ই ভাববে না, এই সমাজব্যবস্থার পরিবর্তন চাই। প্রতিবাদ করলে তারা হবে সমাজের চোখে ব্রাত্য। বদলে গেল, অতীতের সব মূর্খামি। ভালো লাগে সেই সব মানুষকে দেখে যারা আজ প্রায়ই দূরদর্শনে কথা বলেন, জেল খেটেছেন একদা, এখন সে সব সুদূর অতীত। শিক্ষকরা আজ আর আন্দোলনের কথা ভাবতেও পারেন না, কেননা তাদের সব দাবি মিটে গেছে। যেসব ছাত্র সংগঠন, শিক্ষক সংগঠন বা অন্যান্য সংগঠন ছিল, তারা নিয়মিত বনভোজন, কনফারেন্স ও সেমিনার করেন। আজ আর কোনও আন্দোলনের দরকার নেই। আমরা আগে শাসিত ছিলাম, এখন আমরা সবাই রাজা, আমাদের এই রাজার রাজত্বে।

সমাজতন্ত্র আমাদের যে আন্তর্জাতিকতার শিক্ষা দিয়েছে, সেই শিক্ষা আমরা মনে প্রাণে গ্রহণ করেছি। আমেরিকা আমাদের শত্রু, কিন্তু মালটিন্যাশানাল আমাদের বন্ধু। উন্নয়নের জন্য আজ আমাদের বিস্তর ক্যাপিটাল চাই। দেং জিয়াও পিং-এর কথা আমরা মানি, 'বিড়াল কালো কি সাদা, জানার দরকার নেই, দেখতে হবে সে ইঁদুর মারতে পারে কি না।' ক্যাপিটালের চরিত্র জানার দরকার নেই দেখতে হবে সে উন্নয়নের কাজে লাগে কি না।

নেতিবাচক কথার দিন শেষ। শেষ, ভাবনা-চিন্তা করার দিন। বডি ল্যাঙ্গুয়েজকে হতে হবে পজিটিভ্। ভাবতে হবে, প্রতিবাদের চরিত্র হবে আন্তর্জাতিক এবং সেকুলার। সে-জন্য ধর্মান্ধদের সঙ্গে দরকার হলে এক হয়ে যেতে হবে। কুসংস্কার যদি ভোট এনে দেয় তাকে নির্মূল করা যাবে না। দারিদ্র্য থাকবেই। শ্রেণীহীন সমাজব্যবস্থা আসলে স্বপ্ন, এবং অবশ্যই 'ইউটোপিয়া'। বি পজিটিভ্ থিংক পজিটিভ্।

কবিতা ও টীকা

উৎপলকুমার বসু

২

ডায়েরী থেকে

১.

অল্পই লিখেছে তারা, অবিনাশী, বাণিজ্যব্যাপক এই উপকূলে,
সৈকতে, ছাউনি ফেলে, বালুকণা বাতাসে উড়িয়ে, দিক—
নির্দেশ পেয়েছিল তারা, লিখে গেছে, সামান্য দু-একটি শব্দে,
সংকেতে বা জলের ফলকে, কোনো জ্ঞান নয়, কোনো
অধিবিদ্যা নয়, শুধুই ব্যবসাবার্তা, যাও দেশ-দেশান্তর,
এমনই বলেছে, মেপে রাখো জ্যামিতিপ্রবাহে, টানো
বীজগণিতের সুতো, মাথার সমান্তরাল, ক্ষণকাল-মহাকাল
এ-সব স্বার্থের গ্রন্থি, চাও যাত্রাপথ, সমুদ্রে কি নদী-মোহনার
বুকে, পাতো জাল, আঁকো ভূমি-বিভাজক, নাব্যতা
কঠিন, কিন্তু তারো চেয়ে দুরূহ নয় কি প্রকৃতির
কুটিল লিখন—বৈপরীত্যে, যুদ্ধের পূর্বাভাষে, জোয়ারে,
টানের মুখে?
    জাগে নিদ্রাহীন শত শত প্রাণবৃক্ষ সৈন্য-প্রসবিনী।

২.

ছিল বটে সেইসব দিন।
বুদ্ধি ছিল প্রতিবন্ধ,
ফুলহীন পুষ্পগন্ধ—
ঐতিহ্যে নবীন।

আষাঢ় মেঘের আজ ঘটা—
প্রাকৃতিক, স্বভাবকাজল।
বার্তা যেন বৃষ্টির জল,
সূর্যাস্তের ছটা।

এসে তো পড়েছ এই গ্রামে,
মানচিত্রে ধৃত।
ক্ষুধাশান্তি তন্ডুল, ঘৃত
পেয়েছ বেনামে।

আরো পাবে। বহু কিছু চাই—
ঢেউ আর বায়ুর বিহার,
ত্বক পরিচর্যাকারী ক্ষার,
রাত্রির রাশিচক্র, ছাই।

এই কয় পঙ্‌ক্তি পারে না
ধরে দিতে প্রাপ্যের তালিকা।
নিভে গেল শিখা।
অস্তচাঁদ বনের ঠিকানা।

যদি এলে সফেন অক্ষরে
দাবি করো জলপথ,
আলোকিত নৌ-রথ
সৈকতে, সমুদ্রের স্বরে।

টীকা

অল্প কয়েকদিনের ব্যবধানে লেখা এই কবিতা দুটির মধ্যে এক ধরনের আত্মীয়তা আছে। প্রথমটিতে আছে জাগতিক, দেশকালহীন, বিস্তৃত সেই সব বাণিজ্যের কথা, অবলুপ্ত বণিকদের স্মৃতি যারা একদা সমুদ্রপথে ভেসে পড়েছিল। সেই সার্থবাহদের সঙ্গে ছিল কিছু প্রাথমিক বিজ্ঞান, সামান্য গণিত আর সাংকেতিক হিসাবশাস্ত্র ও ব্যবহারিক বিদ্যা। হয়তো যুদ্ধের উপকরণ ছিল। ছিল আদি মানচিত্র ও সরল বিজয়পতাকা।

দ্বিতীয় লেখাটি সে তুলনায় অনেকটাই অস্তিত্বনির্ভর, ব্যক্তিগত এবং আমি-তুমির পরম্পরায় বহুমাত্রিক। কবিতায়, প্রায় সকলেরই কবিতায়, একালে, আমি এবং তুমি শব্দ দুটি স্থান পরিবর্তন করলেও যা বলার থাকে তাতে তেমন কিছু তারতম্য ঠাহর হয় না। হয়ত প্রকরণ পাল্টায় বা মধ্যমিল-অন্তমিলে বিঘ্ন ঘটতে পারে। কিন্তু সে-সমস্যা অলঙ্ঘনীয় নয়। গদ্যভঙ্গি অবলম্বন করলে এই দ্বন্দ্বের লঘু সমাধান হয়ে থাকে। ছান্দসিকের কাছে তা সহজপাচ্য। কিন্তু, স্বল্প কয়েকজনের মতো, আমিও জেদবশত তেমন রফা করতে রাজি নই।

ফলে, লেখা, বিশেষত কবিতা লেখা, আজ, পার্থিব ভাষায় অনেক নক্সাবর্জিত অলঙ্কার, অভাবিত অভিনিবেশ ও অগম্য চলাচল দাবি করে।

সংস্কৃতি সমাচার

পাপ ও প্রায়শ্চিত্ত

আপাতত একটি খবরের কিছুটা অংশ মোটামুটি বঙ্গানুবাদ করা যাক। সংবাদপত্রে প্রকাশিত খবর। অনেকেরই হয়তো চোখে পড়ে থাকবে।

গোনাগুনতি ২,৭১১টি আনকোরা নতুন কংক্রিটের স্তম্ভ
ধাঁ করে মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে
ওই কালো মাটিতে, রক্তের দাগ-লাগা ওই মাটিতে—
ব্রান্ডেনবুর্গ ফটক আর হিটলারের বাঙ্কারের ঠিক মাঝখানে।

হ্যাঁ, লাইন এরকম ভাঙাই ছিল প্রকাশিত খবরে, কেন তা জানি না।
তা সে যাই হোক গে—

বিরাট পরিসর আর বার্লিন শহরের ঠিক
মধ্যিখানে এই অবস্থান।

কারো সাধ্যি নেই চোখ ফিরিয়ে চলে যাবার।
আর এতেই বোঝা যায় নেতারা কতটাই মনেপ্রাণে
চাইছিলেন এই স্মৃতিসৌধ। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জার্মানদের
হাতে নিহত ষাট লক্ষ ইহুদি। তাঁদের স্মৃতিতে নির্মিত
এই সৌধ।

'আজ আমরা এমন এক স্মৃতিফলকের উদ্বোধন করছি যার সঙ্গে জড়িয়ে আছে নাৎসি জার্মানির জঘন্য এক ঘৃণ্য যুদ্ধাপরাধ। গোটা একটি জনগোষ্ঠীকে আগাগোড়া লোপাট করে দেবার চেষ্টা।' জার্মান সংসদের অধ্যক্ষ ভোল্‌ফগাং থিয়েরসে-র উদ্বোধনী উক্তি এসব। ভালো কথা। শেষমেশ জার্মানি তবু নিজের অতীতের মুখোমুখি হতে শিখছে। বর্তমান সময়ের দেশনেতাদের মাথায় অন্তত আছে কথাটা। কথাটা মাথায় আছে না অনেক চেষ্টা করে কাঠখড় পুড়িয়ে ঢোকাতে হয়েছে তাঁদের মাথায়, তাও বলা মুশকিল। সে গল্পও আছে। এসবের পিছনে নাকি আছেন বার্লিন টেলিভিশনের

এক সাংবাদিক। লিয়া রোশ নামের এই মহিলা নাকি ১৯৮৮ থেকে লেগে আছেন এই ব্যাপারে। ভদ্রমহিলার জন্ম এক প্রটেস্টান্ট পরিবারে। ইউরোপ মহাদেশের নিহত ইহুদিদের স্মৃতিতে কোনো এক কেন্দ্রীয় স্মারকের জন্য দাবি তুলেছিলেন ভদ্রমহিলা। নিহত জার্মান ইহুদিদের স্মরণে তবু কিছু আয়োজন আছে। কিন্তু ওই ষাট লক্ষের মধ্যে তাঁদের অনুপাত মাত্র ২.৫ শতাংশ। বাকি ৯৭.৫ শতাংশ আরো ১৭টি দেশের অধিবাসী। নিশ্চিহ্ন এঁদের স্মৃতিও কি লুপ্ত হয়ে যাবে। বিগত সতেরো বছর ধরে ভদ্রমহিলা বিভিন্ন দরজায় কড়া নেড়েছেন, কখনো হয়তো ধাক্কাধাক্কিও করতে হয়েছে। রাজনীতিকদের দরজায়, সম্ভাব্য দাতাদের দরজায়।

যা হয়। ভদ্রমহিলার নাকি গুণগ্রাহীও যেমন আছেন, তেমনি সমালোচকেরও অভাব নেই। অনেকে মনে করেন তিনি বর্তমান প্রজন্মের জার্মানদের বিবেক। তাঁর অস্বস্তিকর প্রশ্নে নেতৃত্ব বিব্রত ও জর্জরিত। আবার অনেকে মনে করেন তিনি নাৎসি নৃশংসতার স্মৃতি উসকে দিয়ে নিজের আখের গোছাচ্ছেন। হতে পারে। সবই সম্ভব। আমরা এখানে বসে এ বিষয়ে বিচার করার কেউ নই। আর ওই সাংবাদিকের চরিত্র বিশ্লেষণও আমাদের কাজ নয়। আমরা লক্ষ করতে চাই স্মৃতিফলকের ধারণাটাকেই।

উদ্বোধন অনুষ্ঠানের দিনে উপস্থিত ছিলেন জার্মান নেতাদের অনেকে এবং ওই ইহুদি নিধন যজ্ঞের ভুক্তভোগী কেউ কেউ, সেইসব পরিবারের বর্তমান প্রজন্মের অনেকে। একজন উপস্থিত ছিলেন সাবিনা ভান্ ড্যের লিন্‌ডেন্। তিনি এসেছিলেন পোল্যান্ড থেকে। তখন তাঁর বয়স ছিল এগারো। নিজের গল্পটা তিনি সেদিন বলেছিলেন বর্তমান কালের ক্রিয়াপদ ব্যবহার করে। 'আমি প্রাণপণ জোরে মায়ের হাত আঁকড়ে রয়েছি, কিন্তু তাও গায়ের জোরে কেউ হ্যাঁচকা টানে সে-হাত ছাড়িয়ে দিচ্ছে। আর কোনোদিন সেই মাকে আমি দেখিনি।' এঁদের বর্ণনার সামনে জার্মান নেতারা নীরবে দাঁড়িয়েছিলেন মাথা নীচু করে।

কিন্তু এ কথাও মনে রাখা চাই যে সেদিনের ওই কুৎসিত কাণ্ডের জন্য আজকের প্রজন্মের জার্মানদের দায়ী বা দোষী করার কোনো মানে হয় না। হ্যাঁ, এ কথা যেমন মনে রাখতে হবে, তেমনি এ কথাও ভুললে চলবে না যে ওই কাণ্ডের স্মৃতির দায়ভার থেকে এঁদের মুক্তি নেই। আজকের জার্মান প্রজন্ম এই দুঃসহ স্মৃতির উত্তরাধিকারী। এই উত্তরাধিকারের মোকাবিলা তাঁদের এক রকমভাবে করতে হবে। যাঁরা জন্মসূত্রে জার্মান এই উত্তরাধিকার কি কেবল তাঁদেরই? তাহলে অত্যাচার, অত্যাচারী, অত্যাচারিত, এসব কথা কি শুধু তাঁদেরই জন্য যাঁরা জন্মসূত্রে বা ঘটনাচক্রে ওই বৃত্তের অন্তর্ভুক্ত? বাইরে যাঁরা তাঁদের সুখনিদ্রায় কোনোক্রমে ব্যাঘাত হবে না? তাহলে নাৎসি বীভৎসার ধিক্কারেই বা আমি গলা মেলাব কী করে। এখানেই সত্তা সন্ধানের প্রশ্ন, এখানেই চৈতন্যের প্রসারের প্রশ্ন। কে তুমি? এই প্রশ্নের উত্তর সহজে মেলবার নয় এই কারণেই যে আমার পূর্ণ গঠিত নিখাদ সত্তা নিরুপদ্রব স্থির কোথাও দাঁড়িয়ে নেই। যতদিন সে চারদিক থেকে আলোবাতাস শুষে নিতে পারে ততদিন সে জীবন্ত নিত্য প্রসরণশীল।

আমার চৈতন্যময় সত্তা সেই কারণেই আমার বস্তুসত্তাকে অনেকদূর ছাড়িয়ে যেতে পারে। আমি জন্মসূত্রে কিংবা আচরণগত সূত্রে কিংবা বিশ্বাসের সূত্রে ইহুদি না হয়েও ইহুদি অত্যাচারে ধিক্কার জানাতে পারি। এ পর্যন্ত বোধহয় খুব অসুবিধা নেই। অন্যদিকে আমি জন্মসূত্রে বা ব্যবহারিক সূত্রে নাৎসি জার্মানির হয়তো কেউ নই, তা সত্ত্বেও কিন্তু ওই একই ন্যায়সংগতিতে আমাকে কখনো নাৎসি অপরাধেরও শরিক হতে হবে হয়তো। নাৎসি দর্শন, নাৎসি রাজনীতি ও নাৎসি মনোভঙ্গি বিষয়ে আমার যে-অবস্থান তার প্রসারের জোরেই আমি কিন্তু আমার নিতান্ত ব্যক্তিসত্তাকে অতিক্রম করে যেতে পারছি। আসলে আমাদের নিতান্ত ব্যক্তিসত্তা বলে যে-বস্তুকে আমরা অনেক সময়ে চিহ্নিত করতে অভ্যস্ত তা সম্ভবত অলীক। মানুষ তার ভাবনার জোরেই ওই তথাকথিত ব্যক্তিসত্তাকে এদিক-ওদিক ছড়িয়ে দিয়ে নিয়ত নিজের সত্তা নির্মাণ করে চলেছে। তাই আমি জন্মসূত্রে জার্মান না হওয়া সত্ত্বেও নাৎসি জার্মানির উত্তরাধিকারের প্রশ্নে কোনো পাপবোধ আমাতেও বর্তাবে কিনা তা কিন্তু খানিকটা অবশ্যই নির্ভর করবে নাৎসি দর্শন, নাৎসি রাজনীতি, নাৎসি অত্যাচার ইত্যাদি সম্পর্কে আমার তত্ত্বগত ও বিচারগত অবস্থানের উপর। এই অবস্থানের প্রশ্নটা জরুরি করে তুলতে না পারলে আমরা দৈনন্দিনের অনেক অবস্থাও ঠিক মোকাবিলা করতে পারব না। রাস্তায় যেতে যেতে হঠাৎ দেখলাম মারামারি জটলা। এই কলকাতা শহরে এরকম দৃশ্যের জন্য বেশি হাতড়াতে হয় না। চলার পথে এরকম কিছু দেখলেই যে আমরা সবাই গিয়ে সেই মারামারিতে মিশে যাই তা নয়। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রে একটা অবস্থান কিন্তু আমার থাকে। যেমন পথ দুর্ঘটনার ক্ষেত্রে বাস বা লরি বা গাড়ি পুড়িয়ে দেওয়া কিংবা চালককে হাতে পেলে মারধর করা, রাস্তা অবরোধ করে বসে পড়া ইত্যাদি আমাদের সবার বেশ পরিচিত কর্মকাণ্ড। আমরা সবাই হয়তো এই ধরনের কর্মকাণ্ডের শরিক হই না সব সময়ে। কিন্তু ওই অবস্থানের জোরে আমাদের দায়ভাগ থেকেই যায়। 'ঘুষখোর পুলিশ, অতএব পাবলিকে দু-ঘা দেবেই, বেশ করেছে', এরকম একটা অবস্থান আমাদের খুব চেনা। কাজেই আমি হাতে করে দু-ঘা না দিলেও আমার দায় থেকে যেতে পারে। পক্ষান্তরে, 'ওরকম করবেন না, মারধোর না করে পুলিশের হাতে তুলে দিন,' একথা বলার সাহস হয়তো তখন আমাদের অনেকের থাকে না, বাস্তব পরিস্থিতিও অধিকাংশ সময়ে এরকম কথা বলার অনুকূল হয় না। কিন্তু কিছু না বলতে পারলেও যে অবস্থানটা একেবারে বৃথা গেল, তা বোধহয় বলা ঠিক না। আর কিছু না হোক এ ঘটনা নিয়ে দু-চারজনের সঙ্গে কথাবার্তা তো হবেই। তাতে করে কিছু বিনিময় কি আর হবে না।

ইতিহাসের অবিচার ও অত্যাচার ও তার প্রায়শ্চিত্ত। ব্যক্তিভাবনার প্রসারের যে-সম্ভাবনার কথা বললাম সেই সূত্রেই কিন্তু বলা সম্ভব এ তোমার, এ আমার পাপ। কাজেই কে আমরা কোন কাজে কতটা প্রত্যক্ষ জড়িত সেটাই শুধু একমাত্র বিচার্য নয়। আমরা অবস্থানগতভাবে কে কোথায় দাঁড়িয়ে তাও জানা চাই। এইসব অবস্থান

যাচাই করতে শিখলে দেখব যে অতীত ইতিহাসের রেশ রীতিমতো আমাদের বর্তমানেও বহমান থাকে। ওই যে স্মৃতিসৌধের প্রশ্ন, প্রায়শ্চিত্তের হয়তো সে এক ধরন। তার আনুষঙ্গিক দ্বিধা শংশয় দ্বন্দ্ব অনেক থাকে, কিন্তু তার জন্য প্রায়শ্চিত্তের প্রশ্নটাও যেমন অবান্তর হয় না, তেমনি প্রায়শ্চিত্তের ধরনটাও খুব জরুরি হয়ে দেখা দেয়। এ প্রশ্ন উঠেছে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জাপানের অত্যাচার নিয়ে। চীন ও কোরিয়া দীর্ঘদিন ধরে জাপানের ক্ষমাপ্রার্থনা দাবি করে আসছে। ওই নাৎসি অত্যাচারের ভুক্তভোগীদের মতো চীন-কোরিয়ার 'তৃপ্তিদায়িনী'দের মধ্যে মধ্যে কেউ কেউ এখনো বেঁচে আছেন। সেদিনের অবমাননার প্রতিকার চেয়ে তাঁদের আর্তি এখনো শোনা যায়। সেই অর্থে অনতি-অতীত ইতিহাসের এই পাপ এখনো প্রত্যক্ষত বর্তমান। তা যদি নাও হত, তাহলেও ওই প্রসারের সূত্র ধরে আমরা বর্তমানেই সে সমস্যার ভাগীদার। অনুরূপ প্রশ্ন জালিয়ানওয়ালাবাগের বেলায় উঠেছে। বর্তমান প্রজন্মের ইংরেজ রাজপুরুষের বেলায় কয়েক বছর আগে তাঁর ক্ষমাপ্রার্থনা দাবিও করা হয়েছে। ওখানেও জন্মসূত্রে ইংরেজ বলেই সবাই যে ওই পাপের উত্তরাধিকারী তা বলা হয়তো খুব সংগত নয়। আবার জন্মসূত্রে ইংরেজ না হয়েও অনেকে ওই অত্যাচারের প্রত্যক্ষ বা অপ্রত্যক্ষ শরিক হতেই পারেন। এমনকি অনেক ভারতীয়ও তা হতে পারেন। আমাদের বাবরি মসজিদও তো এরকম এক 'অন্যায় ও তার প্রতিকার'-এর সংকট। কেউ ভাবছেন ওই মসজিদ এক মূর্তিমান অন্যায়, অতএব তা গুঁড়িয়ে দেওয়াই কতর্ব্য। এবং বস্তুত অন্যায় কিংবা অন্যায় নয় তা মীমাংসা হবার আগেই গুঁড়িয়ে দেওয়া হয়ে গেল। আধুনিক মনের একটা ধন্দ এখানে। গুঁড়িয়ে দেওয়া, মাথা ফাটিয়ে দেওয়া, অত্যাচারের পাপের একমাত্র প্রায়শ্চিত্ত পালটা অত্যাচার, এসব কথা আধুনিক মন সহজে মানতে চায় না। তাই স্মৃতিসৌধ, তাই ক্ষমাপ্রার্থনা, তাই দুঃখপ্রকাশ, তাই মাথা নীচু করে নীরবে দাঁড়ানো, তাই এইসব, আরো সব প্রতীকী মুদ্রা।

কিন্তু পাপ ও প্রায়শ্চিত্তের জটিলতা কি আর মাত্র এইটুকু। ওই বার্লিন স্মৃতিফলকগুলির রূপকার মার্কিন স্থপতি পিটার আইজেনম্যান। ১৯৯৯-এ তিনি ফলকগুলির রূপ পরিকল্পনা করেন। দুটো ফুটবল মাঠের সমান এক প্রান্তরে এই ফলকগুলি স্থাপিত। কৌণিক আকৃতির এই স্তম্ভগুলি চওড়ায় ২.৫ মিটার আর উচ্চতায় ৫ মিটার পর্যন্ত। মধ্য বার্লিনের এই স্মৃতিচত্বরে নগরশব্দ স্তব্ধ, হাওয়ার ঝাপট নেই, বিমূর্ত রেখার মতো আলো ছড়িয়ে পড়ে ফলকের ফাঁকে ফাঁকে। স্থপতির ইচ্ছানুসারে দর্শকরা এখানে স্বাধীনভাবে ঘুরে বেড়াতে পারবেন, চাইলে পিকনিক করতেও পারেন, কবরখানার চেহারা মোটেই তাঁর অভিপ্রেত নয়। তিনি প্রাণের চেহারা চান। ইচ্ছে করলে কেউ কোনো পাথরের গায়ে এমনকি স্বস্তিকাচিহ্নও এঁকে দিতে পারেন। 'এমনকি চাইলে কেউ সেমীয় বিদ্বেষী কথাবার্তাও লিখতে পারেন। শুধুই অনুমোদিত কার্যকলাপই চলবে এরকম স্মৃতিসৌধ বড়ো ক্লান্তিকর।' কিন্তু চত্বরের কর্তাদের এতটা মোটেই মনঃপূত নয়। তাঁরা ফলকগুলির গায়ে এমন এক ধরনের পদার্থ লেপে দিয়েছেন যাতে

লেখা না ধরে। এখানে আবার আর এক গোল বেধেছে। লেখন প্রতিরোধী ওই পদার্থের প্রস্তুতকারক সংস্থা একটি জার্মান কোম্পানি, নাম ডেগুসা। জানা গেছে যে আউশভিৎস-এর গ্যাস চেম্বারগুলির জন্য বিষাক্ত গ্যাস জোগান দিয়েছিল যে কোম্পানি এই ডেগুসা নাকি তাদের উত্তরসূরি। এসব জানাজানি হবার পরে নির্মাণকার্য নাকি স্থগিতও রাখতে হয়েছিল। আরো অনেকবারই নানা কারণে স্থগিত হয়েছিল কাজ। বর্তমানে জার্মানির ইহুদি নেতাদের অন্যতম প্রধান পল স্পিগেল অবশ্য মনে করেন এই ফলকের তেমন কোনো তাৎপর্য নেই। কেননা, এই চত্বরে কোনোভাবে দর্শককে ওই ঘৃণ্য যুদ্ধাপরাধের কেলেঙ্কারির মুখোমুখি করা হচ্ছে না। ওই অপরাধের প্রকৃত অপরাধীদের সম্বন্ধে সরাসরি কোনো উল্লেখও নেই। ইউরোপ মহাদেশের বিভিন্ন জায়গায় যেসব কন্সেন্ট্রেশন ক্যাম্প রয়েছে, সেগুলিই ওঁর মতে প্রকৃত স্মৃতিসৌধ। তবে এই স্মৃতিচত্বর উপলক্ষে জার্মানিতে আবার নাকি নতুন করে যুদ্ধাপরাধ বিতর্ক দানা বাঁধছে। অনেকের কাছে এর মূল্যও স্মৃতিফলকের তুলনায় কম নয়।

ইতিহাসের পাপ ও প্রায়শ্চিত্তের সমস্যা দেখা যাচ্ছে সরল নয়, বেশ জটিল। তাই তো হবার কথা।

সৌরীন ভট্টাচার্য

তথ্যসূত্র : দ্য স্টেট্স্ম্যান, দ্য স্ট্রেইট্স্ টাইমস/এ এন এন।

নৃতত্ত্বের নতুন পরিসর

সমাজবিজ্ঞান গবেষণায় সামাজিক ও সাংস্কৃতিক নৃতত্ত্বের নির্দিষ্ট ভূমিকা আছে। সমাজে সংস্কৃতির ধারা অনুধাবনে নৃতাত্ত্বিক গবেষণা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এখন তো আবার সামাজিক ইতিহাস অনুসন্ধানেও নৃতত্ত্বের ভূমিকা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। এ-সব কারণেই নৃবিজ্ঞান গবেষণার বিভিন্ন নতুন ধারার সঙ্গে পরিচয় থাকা জরুরি। সম্প্রতি কলকাতায় তার সুযোগ মিলেছিল।

দীর্ঘ ২৬ বছর পরে আবার ভারতে, এবার কলকাতায়, অনুষ্ঠিত হয় নৃবিজ্ঞানের আন্তর্জাতিক মহাসম্মেলন। এর আগে ১৯৭৮-এ নয়া দিল্লিতে অনুষ্ঠিত হয়েছিল International Union of Anthropological and Ethonological Sciences (IUAES)-এর দশম বিশ্ব সম্মেলন বা World Congress। গত ১২-১৫ই ডিসেম্বর ২০০৪-এ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বসে IUAES-এর আন্তর-কংগ্রেস বা অন্তর্বর্তীকালীন সম্মেলন। প্রাচ্যের প্রবীনতম নৃতত্ত্ব বিভাগ হওয়ার দৌলতে এই সম্মেলন কলকাতায় মঞ্চস্থ হওয়া কিছুই বিচিত্র না। নৃতত্ত্ব চর্চার ঐতিহ্যের নিরিখে এই সম্মেলন আয়োজন করার দায়িত্ব কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নিশ্চয়ই পাওনা।

তবে সম্মেলনের অধিবেশন পর্যালোচনা করলে ধরা পড়ে নানাবিধ অসংগতি। আন্তর্জাতিক নৃতাত্ত্বিকদের সঙ্গে স্থানীয় নৃবিজ্ঞানীদের কথোপকথনে ছিল ভাষাগত তথা তাত্ত্বিক ব্যবধান। আন্তর্জাতিক স্তরে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক নৃতত্ত্বের যে বিভিন্ন ধারা উপস্থিত তার সঙ্গে স্থানীয় নৃবিজ্ঞানীদের সম্যক পরিচয় নেহাত ক্ষীণ। তাই সম্মেলনে তাত্ত্বিক মত বিনিময়ের সুযোগ থাকলেও তার সদ্ব্যবহার করা যায়নি। অধিবেশনগুলিতে তথ্য নিয়ে মতান্তর ব্যতিরেকে অবস্থানের দ্বন্দ্ব বিশেষ চোখে পড়েনি, বরঞ্চ শোনা গেছে সমান্তরাল কথাবার্তা। যেমন, সংখ্যালঘু সম্প্রদায় সম্পর্কিত আলোচনায় বিভিন্ন দেশে সংখ্যালঘু নির্যাতনের বহু উদাহরণ তুলে ধরা হয় কিন্তু সংখ্যালঘুদের কীভাবে নির্ধারণ করা হয়, কোন মাপকাঠিতে কারা নির্ধারণ করে তাদের, তা নিয়ে তেমন আলোচনা হয়নি। স্থূল কথা : সম্মেলনে বিবরণই ছিল মূল উপজীব্য, বিশ্লেষণাত্মক বা তাত্ত্বিক আলোচনা খুব কিছু জায়গা পায়নি।

প্রায় ৪০০ জন্য সদস্য বিশিষ্ট নৃতত্ত্ব সম্মেলনে এক তৃতীয়াংশ ছিল ভিনদেশের মানুষজন। নৃতত্ত্ব বিষয়ে এতো বৈচিত্রপূর্ণ সম্মেলন কলকাতায় সচরাচর অনুষ্ঠিত হয়

না। তা-ও, আশ্চর্যভাবে, কলকাতার গণমাধ্যমে এই সম্মেলনের প্রায় কোনো খবরই ছাপা হয়নি। স্থানীয় জনসাধারণকে এই বিশাল কর্মকাণ্ড সম্বন্ধে অবগত করার বিশেষ কোনো দায়িত্ব আয়োজকরাও গ্রহণ করেন নি। দুই ঔদাসীন্য মিলিয়ে স্থানীয় বিদ্যোৎসাহীদের অংশগ্রহণে খামতি ছিল। মন্দের ভালো, ভারতের অন্যান্য অঞ্চল থেকে বেশ কিছু গবেষক এসেছিলেন—তাঁদের উপস্থিতিতেই যা খানিক মুখরক্ষা হয়েছে।

তিনদিন ধরে ৫০টি অধিবেশনে বিভক্ত হয়ে সম্মেলনের মূল আলোচনা উপস্থাপিত হয়। বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা একই সঙ্গে পাশাপাশি চলে প্রতিদিন। সব আলোচনায় উপস্থিত হওয়া বা শোনা কারো পক্ষেই সম্ভবপর নয়। অতএব শুধু যে কটি অধিবেশনে উপস্থিত ছিলাম তার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকছে এ আলোচনা।

নগর-নৃতত্ত্বকে (urban-anthropology) কেন্দ্র করে বেশ কটি অধিবেশনের ব্যবস্থা ছিল। ফলত, শহরের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা হয়। সামাজিক সম্পর্কের প্রকারান্তর ও প্রকাশ নিয়ে আলোচনা রীতিমতো জমে ওঠে। এভেলিন ডুয়ারের নিবন্ধ এর একটি ভালো উদাহরণ। ডুয়ারের আলোচ্য বিষয় ছিল বার্লিন ও মেক্সিকো সিটির রাস্তার Love Parade বা ভালবাসার মিছিল। এই মিছিলের সূত্রপাত যদিও বার্লিনে কিন্তু এখন তা মেক্সিকো শহরের প্রধান এক আকর্ষণ হয়ে উঠেছে, এবং এই মিছিলে অংশগ্রহণের মধ্যে দিয়ে শহরের যুব সম্প্রদায় তাদের যুদ্ধ বিরোধী মনোভাব ও প্রতিবাদী সত্তার প্রকাশ ঘটায়। ডগল্যাস হিল-এর বিষয়বস্তু ছিল দক্ষিণ এশিয়ার কয়েকটি বন্দর, শহরের বন্দর সংস্কার। তাঁর নিবন্ধটিতে ডগল্যাস মূলত কলকাতা ও চট্টগ্রাম নিয়ে আলোচনা করেন। তিনি দেখাবার চেষ্টা করেন যে বন্দর সংস্কারের ফলে অন্তর্বর্তী এলাকায় (hinterland) কী ধরণের প্রভাব পড়েছে এবং বন্দর শ্রমিকদের জীবনযাত্রা কীভাবে পাল্টে যাচ্ছে। মেকানাইজেশনের পরিণামে গতরের কাজ ক্রমশ কেমন হ্রাস পাচ্ছে। ডি. পার্থসারথির বিষয় ছিল : মুম্বাই শহরের যে urban commons বা সাধারণ এজমালি এলাকা জমি জবরদখল করে গরিব ও খেটে খাওয়া মানুষরা এককালে তাদের বস্তি বানিয়েছিল যেখানে আজ সেখানে উন্নয়ন ও পুনর্গঠনের নামে অনাহূত বস্তিবাসীদের উচ্ছেদ করে নতুন বহুতল বাড়ি নির্মাণের প্রচেষ্টা চলছে। এই নিবন্ধে দেখানো হয়েছে, শহরের বর্ধিষ্ণু শ্রেণীর মানুষরা কোন পন্থায় মুম্বাইকে ঢেলে সাজাবার চেষ্টা করছে। এবং এ প্রায় প্রত্যাশিতই যে সেই আমিরি পরিকল্পনায় গরিব বস্তিবাসীদের কোনো স্থান নেই। অন্য দিকে কলকতার দু ধরণের হাউসিং কমপ্লেক্স-এর বাসিন্দাদের জীবনযাত্রা নিয়ে আলোচনা করেন শঙ্খপ্রিয় গুহ ও গোপাল চক্রবর্তী।

অন্য একটি আলোচনা সভার বিষয়বস্তু ছিল প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের শহরাঞ্চলে আত্মীয়তার ধরনধারণ। এই অধিবেনে আলোচিত হল কেরলে প্রেমভিত্তিক বিবাহের ফলাফল, ইতালিতে সন্তানহীন মহিলাদের সন্তান প্রসবের নতুন টেকনলজি প্রয়োগের দরুন আত্মীয়-সম্পর্কের পরিবর্তন, এবং হায়দ্রাবাদে শহুরে মধ্যবিত্তদের মধ্যে বন্ধুত্ব ও

আত্মীয়তার প্রতি আনুগত্য। এই আলোচনা সভায় লক্ষ করলাম ভারতীয় সমাজের গতিপ্রকৃতি বিদেশী নৃতাত্ত্বিকদের গোচরে আসছে এবং তাঁদের গবেষণায় লিপিবদ্ধ হচ্ছে। এবং এতে স্বদেশীভাবাপন্ন কিছু শ্রোতা-দর্শক উদ্বিগ্ন! এঁদের মতে ভারতের শহরাঞ্চলে জাতপাতের বিশেষ প্রভাব নেই তাই এ সব জিনিস পাঁচ কান করা মানেই (সুমহান) ভারতকে পশ্চাৎপদ প্রমাণ করার কুমতলব। অথচ এঁদের ধারণাকে পরীক্ষিত তথ্যের সঙ্গে মেলালে ভিন্ন চিন্তাই জাগে।

অন্য একটি আলোচনা সভায় তুলে ধরা হল বৈষম্যমূলক আচরণের বিভিন্ন অভিব্যক্তি। একদিকে কীভাবে আদিমতার আখ্যা দিয়ে পিছিয়ে-পড়া অঞ্চলের অধিবাসীদের মূলস্রোত থেকে বিচ্ছিন্ন করে রাখা হয়, অন্যদিকে সরকারি পরিকল্পনার কল্যাণে প্রত্যন্ত সুন্দরবন অঞ্চলে মানুষের চেয়ে অধিক মূল্যবান হয় বাঘ। আন্দামানের জনজাতিদের উপর এক বিশেষ অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে সরকার অনুমোদিত উন্নয়ন প্রকল্পের রূপায়নে আদিবাসী সংস্কৃতিকে কোন উপায়ে বিপন্ন করা হচ্ছে তার বিস্তারিত আলোচনা হয়। ঐ অধিবেশনের ১০ দিন পর আন্দামান-নিকোবার দ্বীপপুঞ্জ বিধ্বংসী সুনামীর আওতায় আসে। সেখানে কিন্তু 'আদিম' আদিবাসীদের অভিজ্ঞতালব্ধ সাধারণ জ্ঞানই ছিল তাদের জীবনরক্ষার পাথেয়।

কয়েকটি অধিবেশনেই মহিলাদের সমস্যা নিয়ে আলোচনা হয়। তার একটিতে গিয়ে দেখি, এত সংখ্যক পেপার জমা পড়েছে যে বক্তারা পাঁচ মিনিটের বেশি সময় পাচ্ছেন না। ফলে খুব সংক্ষেপে বক্তব্য যদিও বা রাখা হচ্ছে, আলোচনার কোনো সুযোগ নেই। তবে গে ও লেসবিয়ান স্টাডিজের আসরে গিয়ে এশীয় দেশে তাদের পরিস্থিতির বিশদ আলোচনা শোনা গেল।

পঞ্চাশটি অধিবেশনে বিভক্ত সম্মেলনটির মাধ্যমে আধুনিক নৃবিজ্ঞান চর্চার গতিপ্রকৃতির রূপরেখা অনুধাবন করা যায়। আদিম মানব সংস্কৃতি যে আর নৃতত্ত্বের প্রধান আলোচ্য বস্তু নয় তা এখন খুব স্পষ্ট। আধুনিক সমাজের গতি-প্রকৃতি নিয়ে নৃতাত্ত্বিকরা বহু রকমের গবেষণায় রত। বর্তমানে নিউক্লিয়ার গবেষণা সংস্থা থেকে সাইবার চ্যাটরুম সবই নৃতাত্ত্বিক গবেষণার ক্ষেত্র হতে পারে। এই সব ক্ষেত্র থেকেই গড়ে উঠছে নৃতত্ত্বের সাংস্কৃতিক সমালোচনার আধার। এবং সেখানেই নৃতত্ত্বের সার্থকতা।

অঞ্জন ঘোষ

বই-রাগ্য সাধনা : হাতেখড়ি-র অন্তর্জলী

ধরা যাক শুভ ঘটনাটা শেষমেশ ঘটল : বর্ণমালার স্মৃতি বিলুপ্ত হল, বাজার থেকে উধাও হল সব বই। একাকার করে সব বই না হয়ে যদি শুধু পাঠ্যপুস্তক তা হত, যাকে বলে আপদ বিদায়, বিষাদবায়ুতে আক্রান্ত হয়ে বালক-বালিকারা একেবারে যে ভেঙে পড়ত তা হয়তো নয়। কিন্তু অবিমিশ্র ভালো কি ঘটার কথা? তা ঘটে? তাই ধরা যাক ধরাধাম থেকে বিদায় নিল পাঠ্য-অপাঠ্য ভালো-খারাপ মিহি-মোটা সব কিসিমের বই, আর আমরা এক লাফে ফিরে গেলাম অধীত বিদ্যার নাগালের একান্ত বাইরে অজ্ঞতার কল্পভূস্বর্গে—চমৎকার!

এরকমটা ঘটলে উৎফুল্ল যারা হত তাদের কারো কারো কথা বলা যাক, এবং বোঝবার চেষ্টা করা যাক বইয়ের বিরুদ্ধে কী তাদের আপত্তি, তাকে ঘিরে কেন তাদের এত না উদ্বেগ।

রিফর্মেশন পরবর্তী উগ্র সংস্কারবাদী ধর্মগোষ্ঠীগুলির একটি হল অ্যানাব্যাপ্টিস্ট সম্প্রদায়। জার্মান অ্যানাব্যাপ্টিস্টদের মধ্যে এবিসিডেরিয়্যান (Abecederian) বলে একটি উপ-সম্প্রদায়ের উদ্ভব ঘটেছিল। ইংরেজির অনুকরণে এদের হয়তো অআকখবাদী বলা চলতে পারে, যদিও এদের যত যা রাগঝাল, মজার কথা, তার লক্ষ্যস্থল ছিল নিরীহ abcd বা অআকখ—সংক্ষেপে বর্ণমালা। যাই হোক, তাদের ঐতিহাসিক গুরুত্ব যেই কারণেই কিছু কম ছিল না। মোটামুটি শ'পাঁচেক বছর আগেই নিজেদের মতো করে মূল সত্যটি তারা হৃদয়ঙ্গম করতে পেরেছিল : জ্ঞানই হল সর্ববিধ পাপের মূল। আর বই ছাড়া যেহেতু প্রজন্ম থেকে প্রজন্মান্তরে বিচরণের ক্ষমতায় অপারগ জ্ঞান অনেকাংশে ঠুঁটো, এবং abcd বা অআকখ দিয়ে যেহেতু লিখিত ও পরে মুদ্রিত হয় পুঁথিপত্তর, মানবনিয়তির পক্ষে আধ্যাত্মিক তাৎপর্যে যা কিছু পাপজনক, তাই বিষবৎ পরিত্যাজ্য, তার উত্থানভূমি হল শেষ বিচারে বর্ণমালা। একেই বোধহয় বলে বিসমিল্লায় গলদ।

নিরয়গামী অতল পামরটিকে যে পরিণতিতে ডুবতে হয় পাপের পঙ্কে, সুদূর শৈশবে অনুষ্ঠিত 'হাতেখড়ি' দিয়েই তাহলে ঐ সুনিশ্চিত ভবিতব্যতার অশুভ সূচনাটি ঘটছে। এই যুক্তিতে অধোগামী সোপানশ্রেণীর সর্বনাশা প্রথম ধাপটি হল হতচ্ছাড়া বর্ণমালা। জ্ঞানের অশ্লীল খপ্পর থেকে মুক্তি পেতে হলে তাই বইপত্রের হাতছানিতে সাড়া দিয়ে তাতে মশগুল থাকলে কোনমতেই চলবে না। প্রয়োজনে ভেঙে তছনছ

করা যাক ছাপাখানা; লেলিহান আগুনের পাবক শিখায় অকাতরে আহুতি দেওয়া যাক তাদের, যাদের মধ্যে অসার মস্তিষ্কচর্চার এত না নচ্ছার ঘটাপটা; বিদায় নিক পুস্তক-রাশির পাপজঞ্জাল; জ্ঞানের কলুষ মুছে মানব-আত্মা ফিরে পাক তার নিরঞ্জন শুদ্ধতা। শয়তানের প্ররোচনায় জ্ঞানবৃক্ষের ফল খেয়েছিল বলেই তো তার আত্মার আজ এই বেহাল দশা; এখন উদ্গার করে ব্যক্তিচৈতন্য থেকে নিঃশেষে ফেলে দেওয়া যাক নিম্বফলের তিক্তকষায় চর্ব্যচোষ্য।

পাপপুণ্য আর ধর্মাধর্মের ধূম্রজাল সরিয়ে নজর করে তাকালে দৃশ্যপটটি চেনা চেনা লাগছে যেন। মনে পড়ে যাচ্ছে নাকি তিন-সাড়ে তিন দশক আগে বহুশ্রুত সেই আপ্তবাক্যটি—'যে যত পড়ে সে তত মূর্খ হয়'? স্বর্গরাজ্যটি আকাশেই স্থাপিত হোক বা পৃথিবীর জলে-কাদায়, উগ্র বিশ্বাসের প্রেরণাটি ধর্মগুরু বা রাজনৈতিক নেতা যিনিই জোগান, তাতে প্রবেশের অধিকার তাহলে সীমাবদ্ধ থাকছে কেবল তাদের মধ্যে এবং তার চাবিকাঠিটি গচ্ছিত থাকছে কেবল তাদের হাতে, পুঁথিপত্তর খুলে পণ্ডশ্রম হবে, তাই অধ্যয়নের উদ্যোগটি আদৌ নেয়নি যারা : Blessed are the ignorrant! প্রথম প্রকল্পটির পিছনে কার্যকর ছিল একটি উপধর্মের হিংস্র বেলাগাম গোঁ; আর দ্বিতীয়টির পিছনে সক্রিয় ছিল রাজনৈতিক অতিবামাচারের অবুঝ উদ্ভট বালখিল্যতা। তাগিদটা ছিল অনেকটা এরকম : নিঃশর্ত আনুগত্যের পরিপন্থী যখন প্রশ্নশীলতা—এই মনস্কতা তো বিদ্যারই আন্তরিক দান—চিত্তভূমি থেকে তাকে উন্মূল করা যাক এবার।

বইমাত্রকেই যে ভয় বা সন্দেহের চোখে দেখতে হবে, হবেই হবে—ধর্মীয় বা রাজনৈতিক বিশ্বাসের সাধারণ অবস্থানটি কিন্তু আদপে এরকম নয়। বিশ্বধর্মগুলির ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ উল্টোটাই বরং সত্যি। রাজনৈতিক চিন্তাভাবনার ক্ষেত্রেও কি তা নয়? বেদ বাইবেল ত্রিপিটক কোরান থেকে ডাস ক্যাপিটাল—ধূপধুনো দিয়ে কম তো পুজো-আচ্চা করা হয় না এদের! ইংরেজিতে 'বিবলিওল্যাট্রি' শব্দটি এবং আরবিতে 'কোরান শরিফ'-এর 'শরিফ' ও 'গ্রন্থসাহেব'-এর 'সাহেব' শব্দগুলি তো যথাক্রমে পূজ্যতা মান্যতা এবং অপ্রতিহত প্রতিপত্তির দ্যোতক। পরাবিদ্যার সারীভূত আশ্রয় ও মূর্ত রূপ বলেই না হিন্দুদের বেদ হল 'বেদ' অর্থাৎ বিদ্যা, যদিও অন্যান্য ধর্মগ্রন্থের তুলনায় তা ন্যূনতম পঠিত। বিশ্বাসী খ্রিস্টান অথচ বাইবেল পড়েনি অতি বিরল—ঠিক ততটাই যতটা, উল্টোদিকে, বিশ্বাসী হিন্দু অথচ বেদ যে পড়েছে। 'হরফ'-এর কল্যাণে অবশ্য সংস্কৃতিম্মন্য শহুরে বাঙালির বসবার ঘরে 'প্রথম আলো' 'তুর্কি হারেমে বন্দিনী' 'ঋভু' ও 'কাবুলিয়ালার বাঙালি বউ' ইত্যাদি মহাগ্রন্থের পাশে শোনা এবং দেখা যায় ঠাঁই বেচারার ইদানীং জুটেছে। 'গেল' 'গেল' রব তুলে সাংস্কৃতিক অবনমনের শোরগোল যাঁরা তুলছেন, ছিমছাম বসবার ঘরে টিভি/ডিভিডি-র পাশে ঘর আলো করে মূর্তিমতী পরাবিদ্যা যে আবির্ভূতা, লক্ষ্য করছেন কি তাঁরা?

বিদ্যা বা বই সম্পর্কে সুগভীর ঘৃণা এবং অবিশ্বাস-সঞ্জাত এই যে আপসহীন প্রত্যাখ্যানের প্রসঙ্গটি গোড়ায় উঠল, তার পিছনে কার্যকর থাকছে, পরিষ্কার করে কবুল

করা যাক কথাটা, নৃশংস তাত্ত্বিক জেদবশত সামাজিকভাবে নিঃসঙ্গ গোষ্ঠীচৈতন্যের ঘনীভূত উদ্বেগ। শুধুই কি তা-ই? না, একই সঙ্গে নিশ্চিত এই আত্মগৌরব যে নিখিল সত্যের নির্যাসটি ন্যস্ত হয়েছে কেবল তারই পূত করকমলে। গোষ্ঠীমনের বৈকল্যের পিচ্ছিল প্রায়ান্ধকারে সন্তর্পণে প্রবেশ করে তবেই হয়তো কিছুটা এর চরিত্র নিরূপণ করা সম্ভব—তবে তা যাকে বলে ভয়ে ভয়ে, প্রায় প্রাণ হাতে করে।

এই হিংস্র 'বই-রাগ্য' কিন্তু ছাপোষা গৃহী মানুষকে একেবারেই মানায় না—কেননা বই-য়ের কাছে তারা যে নানাভাবে ঋণী, কাণ্ডজ্ঞানবশত এই সহজ সত্যটা তাদের ভালোই জানা। তা নইলে এটা কিন্তু মনে হয় ঠিক, অন্তত কিছুদূর পর্যন্ত, যে নিছক পুঁথিগত বিদ্যার ব্যবহারিক সারবত্তা সম্পর্কে সন্দেহ মোটের ওপর একটি স্বাস্থ্যকর সামাজিক সংস্কার। বিদ্বানটি একজন নিষ্কর্মা ভালোমানুষ বুড়ো হলে অবজ্ঞায় এবং আদর করে তাকে কুমড়ো-কাটা বট্‌ঠাকুর বলা চলে। কিন্তু ব্যক্তিটি সামাজিক ক্রোধের আস্পদ হয়ে ওঠে, যখন ঐ বিদ্যার উন্নাসিক অহংবশত পুঁথির আড়ালে সে অনায়াসেই হারিয়ে যেতে দেয় জীবিত বিশ্ব এবং প্রাণবন্ত অভিজ্ঞতাকে। এরকম একজন ব্যক্তি মারফতি—তা এই সরল অর্থেই যে, ঘুরপথে, বই মারফত না এলে, সরাসরি, কোনো অভিজ্ঞতাই কল্কে পায় না এই উদ্ধত পণ্ডিতম্মন্যটির কাছে।

সামাজিক অসুখটি ছেলেবুড়ো আমাদের সবার চেনাজানা অসুস্থ গ্রন্থকীটটির চোখে, জায়গা পাল্টে মহাভারত হয়ে ওঠে ভারত, আর মহাগ্রন্থটির দ্বারা গ্রস্ত দেশকালের রক্তমাংসের সজীব ভারত নিঃশব্দে সরে যায়, এর চোখ তাই মনোযোগের আড়ালে। ব্যক্তিটি যা বোঝে না তা হল, পাগলা ষাঁড়ে তাড়া করলে তদ্দণ্ডে নোটবইটি ফেলে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে পালাতে হয়; আর নৌকাডুবির সময়টিতে সাঁতার যার রপ্ত হয়নি, হায়, সেই বিদ্যা-বোঝাই তবে ভাগ্যাহত বাবুমশায়ের জীবনের ষোল আনাই তো ফাঁকি। হাবুডুবু খেয়ে ডুবছে যখন, বিদ্যা বলুন, বর্ণমালা বলুন, বই বলুন, খুব কাজে কি লাগবে তখন?

অনিরুদ্ধ লাহিড়ী

জয় বাবা হলদিরাম ও কালো টাকার দাদাগিরি

স্বনামধন্য নমকীন্‌ওয়ালা 'হলদিরাম'-মালিক প্রভুশঙ্কর আগরওয়াল পুলিসি হেপাজতে। রাজস্থানী ভুজিয়াকে যিনি বাঙালির অন্দরমহলে পৌঁছে দিয়েছেন সেই প্রভুশঙ্করজি পুলিসের কব্জায়। সারা পশ্চিমবাংলা জুড়ে ভুজিয়া-জাল বিস্তার করার পথে তিনি যে পরিমাণ রাজনৈতিক আমলাতান্ত্রিক পুলিসি যোগাযোগ তৈরি করেছেন বলে অনুমান করা যায়, তাতে এমন মহাপুরুষটির যে-কোনও অপরাধেই গ্রেপ্তার হওয়াটা আমাদের কিছুটা অবাকই করে। সে যাই হোক, এ ক্ষেত্রে প্রভুশঙ্করের অপরাধটা একটু গুরুতরই। বড়বাজারের বাড়ি থেকে এক অবাধ্য চা-ওয়ালাকে উচ্ছেদ করার (দরকার হলে খুন করেও) জন্যে এক পেশাদার খুনিকে বরাত দেওয়া থাকে, অপরাধ জগতের ভাষায় বলে 'সুপারি' দেওয়া।

এহেন গুণধর প্রভুশঙ্কর মোটামুটি স্বল্প সময়ের মধ্যেই কলকাতার বুকে বিশাল পরিমাণ জমি-বাড়ির মালিক হয়েছেন এবং অন্যান্য ব্যবসার সঙ্গে আকাশ দখলের প্রতিযোগিতাতেও নেমে পড়েছেন।

যে-কোনও কালো বস্তুর নেশার মতোই কালো টাকা রোজগারের নেশাও বড় বিপজ্জনক। এ নেশার রসদ জোগাতে অন্ধকার জগতের মানুষজনের মদত বড় জরুরি। যেমন, চা-ওয়ালাকে উৎখাত করতে গোপাল তেওয়ারির দরকার ছিল। এই কালো টাকার সঙ্গে অন্ধকার জগতের যে অশুভ আঁতাত, এটাই দেশের সমাজ আর অর্থনীতিকে ভেতর থেকে ফোঁপরা করে দিচ্ছে। এই ধরনের আঁতাত সম্বন্ধে একটা সাধারণ ধারনা হল এই যে, এটা খুব সাম্প্রতিক অতীতে গড়ে উঠেছে। ব্যাপারটা বোধহয় ঠিক তা নয়। পৃথিবীর অন্যান্য দেশের মতোই এ দেশেও বিত্তবান এবং দুর্বৃত্ত—এই দুই গোষ্ঠী পরস্পরকে পুষ্ট করে চলেছে দীর্ঘদিন ধরে। বুর্জোয়াদের লুম্পেন-তোষণ এবং তাদের মাধ্যমে শ্রমিকদলন আজ কোনও নতুন ঘটনা নয়। অর্থাৎ সামাজিক দুর্বৃত্তায়ন এবং টাকার কৃষ্ণায়ন প্রায় যুগ যুগ ধরেই হাত ধরাধরি করে চলে আসছে।

কোনও বিশেষ মুহূর্তে ভারতবর্ষে অর্থনীতিতে কালো টাকার পরিমাণ এবং বিস্তার কতটা ব্যাপক তার সঠিক পরিমাপ করা যায় না। তবে পরিমাণটা যে ভীতিজনক এ বিষয়ে কোনও দ্বিমত নেই। কালো টাকা বলতে আমরা সাধারণ অর্থে কী বুঝি? কালো টাকা হল হিসেববহির্ভূত টাকা। হিসেব অর্থাৎ যার ভিত্তিতে আয়কর

রিটার্ন দাখিল করা হচ্ছে। সাধারণ ধারণায় এটা আমরা অনেকেই বুঝি যে, বিভিন্ন ধরনের বাণিজ্যিক লেনদেন এবং তার থেকে উদ্ভূত আয়ের একটা বেশ বড় অংশ এই হিসেবের বাইরে থেকে যায়। স্বভাবতই এই আয়ের ওপর আয়কর দেওয়ার প্রশ্নই ওঠে না। কালো টাকার এই চারিত্রিক কারণে এর কলেবর ক্রমশ স্ফীত হতে থাকে।

গোকুলে বাড়তে বাড়তে যে লক্ষ লক্ষ কোটি টাকা অর্থনীতিতে খেলে বেড়াচ্ছে তা কাদের হাতে কী চেহারায় আছে? প্রচলিত ধারণা অনুযায়ী কালো টাকার একটা বড় অংশ নিয়োজিত হচ্ছে জমি এবং ইমারত নির্মাণ শিল্পে। বিশাল জনসংখ্যার একটা বড় অংশের নগরমুখীনতার কারণে আবাসন সমস্যার সমাধানে শহরাঞ্চলে বহুতল ইমারত নির্মাণ একটি প্রধান শিল্পে পরিণত হয়। কালো টাকার অপেক্ষাকৃত লঘু অংশ নিয়োজিত হচ্ছে হোটেল-রেস্তোঁরা শিল্পে, চলচ্চিত্র শিল্পে আর সোনা ও রত্নখচিত অলঙ্কারে।

মোট কালো টাকার সিংহভাগটাই আছে ব্যবসায়ীদের কাছে। কারণ কালো টাকার বড় অংশটা তাদেরই তৈরি। আর একটা বড় অংশ আছে বিভিন্ন পেশায় নিযুক্ত মানুষদের, আর রাজনীতিবিদ ও আমলাদের কাছে।

সোনা অথবা রত্নখচিত অলঙ্কারে নিয়োজিত কালো টাকা নিয়ে তেমন সমস্যা কিছু নেই। অবশ্য সোনার চোরাচালানের সঙ্গে যুক্ত দুষ্কর্মের ক্ষেত্রটি তো আছেই। কোটি কোটি টাকা বাজেটের বলিউডি ফিল্ম আর মুম্বই, দিল্লি, বাঙ্গালোর, হায়দরাবাদ, আমেদাবাদ, কলকাতা, চেন্নাইয়ের মেগা আবাসন এবং বাণিজ্যিক প্রকল্পগুলোই হল মূল গোলমালের জায়গা।

মুম্বই চলচ্চিত্র শিল্পে প্রতি বছর যে বিপুল পরিমাণ কালো টাকা লগ্নি হয়ে আসছে তার খবর মুম্বইয়ের অন্ধকার জগতের দাদাদের কাছে পৌঁছোতে খুব বেশি সময় লাগেনি। বিদেশি পণ্য (অস্ত্র থেকে আরম্ভ করে সোনা এবং অন্যান্য বিলাস সামগ্রী) চোরাচালানের মতো ঝুঁকিবহুল কাজের চেয়ে চলচ্চিত্রে লগ্নিকারী কালো টাকার মালিকদের ভয় দেখিয়ে তোলা আদায় করা তাদের কাছে অনেক সহজ বলে মনে হয়। প্রায় একই সঙ্গে অর্থনৈতিক উদারীকরণ এবং বিশ্বায়নের প্রক্রিয়ার সঙ্গে তাল মিলিয়ে বিলাসবহুল বহুতল আবাসন আর বাণিজ্যিক বিপণন কেন্দ্র নির্মাণে একটা জোয়ার এসে গেল। বিশাল অঙ্কের কালো টাকা এগিয়ে থাকা মেট্রো শহরগুলোতে এবং শহরতলিতে (খামারবাড়ি) জমি এবং ইমারত নির্মাণশিল্পে বিনিয়োগ হতে লাগল। বড় বড় শিল্পোদ্যোগীরাও তাঁদের কালো টাকার ভাণ্ডার নিয়ে নির্মাণশিল্পে ঢুকে পড়লেন। শুরু হয়ে গেল আক্ষরিক অর্থেই গলা-কাটা প্রতিযোগিতা। সীমিত পরিমাণ জমি দখলের লড়াই করতে দুর্বৃত্ত বাহিনী তৈরি করতে হল। প্রতিদ্বন্দ্বীকে রাস্তা থেকে সরিয়ে দেওয়া, অবুঝ জমির মালিককে খতম করে জমির দখল নেওয়া ইত্যাদি কাজে দুর্বৃত্তদের ব্যাপকভাবে ব্যবহার করা শুরু হল। এমন মধুর লোভে রাজনৈতিক মৌমাছিরাও এই চক্রে ভিড়ে গেলেন। একদিকে নির্মাণশিল্পের সঙ্গে যুক্ত কালো টাকার মালিকদের

যাবতীয় সুযোগ-সুবিধে প্রদান আর অন্যদিকে তাদের আশ্রিত দুর্বৃত্তদের প্রশাসন ও আইনের হাত থেকে বাঁচানোর দায়িত্ব (মহান!) নিলেন ধান্ধাবাজ রাজনীতিকরা। পুলিস এবং প্রশাসনিক আমলারাও স্বাভাবিকভাবেই এই প্রক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়লেন। পাপচক্রটি সম্পূর্ণ হল।

মুম্বই-দিল্লি-বাঙ্গালোর পরিক্রমা সেরে এই চক্র এখন কলকাতাতেও সক্রিয়। কারণ বুদ্ধাঙ্গনেও এখন বিশ্বায়নের প্রলম্বিত ছায়া। শুধু কলকাতাই নয়, গোটা পশ্চিমবাংলাতেই তো এখন কালো টাকার তাথৈ নাচন। তার সঙ্গে গোদের ওপর বিষফোড়ার মতো পশ্চিমবাংলায় এই মুহূর্তে একমাত্র শিল্পই হল নির্মাণশিল্প। প্রমোটাররাই হল পশ্চিমবাংলার সবেধন নীলমণি কামধেনু। সুতরাং এদেরকে কেন্দ্র করেই সার্বিক দুর্বৃত্তায়নের করাল ছায়া। লক্ষ লক্ষ বেকার ছেলে তোলা-শিল্পের নাট-বল্টু। শহরের রাস্তা জুড়ে ইমারতি দ্রব্য সরবরাহের ব্যবসা। সারা সমাজটাই কালোয় আলো। এদের উপযোগী অর্ডারি সংস্কৃতিও তৈরি হয়ে যায়। পাড়ায় পাড়ায় রাতভর সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের বিপুল আয়োজনে মিস্ অমুকরা পশ্চিমবাংলায় ফিরে আসে। সংস্কৃতির মদিরা যখন মাথায় চড়ে তখন দু'চারটে লাশও পড়ে। ষষ্ঠী দুলেরা দিলীপ-সঙ্গী হয়ে যায়। দিলীপরা দাদা ধরে। দাদারা বলে ভাইদের করে খাবার কথা।

এইভাবেই চক্রটা আবর্তিত হতে থাকে। মানুষ অসহায় বোধ করে, ভয়ে-ঘেন্নায় বোবা হয়ে যায়। সমস্ত জায়গা দখল করে নেয় মাফিয়া আর লুম্পেনরা। সাম্যবাদী এই বৃন্দাবনটিকেই কি মরূদ্যান বলেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী?

দেবনাথ মুখোপাধ্যায়

কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র পাঠের দিন সমাগত, মাননীয় অর্থমন্ত্রী

সরকারের আয়ু যত দীর্ঘ হচ্ছে, বর্গের বিপরীত অনুপাতে তার আর্থিক দুর্দশাও তেমন প্রকট হচ্ছে, পুরানো শাড়ির ছিদ্র যেমন চতুর্দিকে বাড়তে থাকে। ক্ষমতায় এসে রাজ্যের আর্থিক সমস্যা দৃঢ় করে আয় বৃদ্ধি করার কোনও চেষ্টা না করে শুধু সস্তা জনপ্রিয়তা অর্জনের জন্য একে একে মুক্তকচ্ছ হয়ে অবশেষে হর্ষবর্ধনের প্রয়াগপর্ব। পরনের নেংটিটুকু ছাড়া রাজ্যের ভাঁড়ে মা ভবানী। তখন বেকার ভাতা, ফ্রি-স্কুল, পুস্তক বিতরণ, মধ্যাহ্ন ভোজন, খাজনা মকুব, কেন্দ্রের হারে কর্মচারীদের ভাতা ও বোনাস, সিক ইন্ডাস্ট্রির সরকারীকরণ—কত হৈ চৈ। তখন বেকার চাকুরিপ্রার্থীদের কথা ভেবে চাকুরির পরীক্ষায় ফি মকুব করে দেওয়া হল। রাজ্য জুড়ে নানা কিসিমের ছাড়-ছুড়ের মোচ্ছব চলল ক'বছর ধরে।

একদিকে যেমন মোচ্ছব-মেলা চলল কিছুদিন, অন্যদিকে তখন দলের উস্কানিতে ট্রেড ইউনিয়নের দুর্দশা, বেহাল বিদ্যুৎ ব্যবস্থা, পরিবহণ ব্যবস্থার দৈন্যদশায় রাজ্যে নতুন করে শিল্পায়ন তো দূরস্থান, যা ছিল, তাও একে একে বন্ধ করে মালিকেরা দিল্লি, ব্যাঙ্গালোর, হায়দ্রাবাদের রাস্তায় ভাগতে শুরু করে দিল। একে একে চটকল বন্ধ, ডানলপ, ভিখারি পাসোয়ান—সে নানা কেচ্ছা। এদিকে আবার শিল্প প্রসারের স্বপ্ন দেখিয়ে নতুন স্যুটকোট বানিয়ে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী, শিল্পমন্ত্রী, অর্থমন্ত্রীরা 'কমিউনিস্ট' হয়ে যাওয়া পুঁজিপতিদের হাত ধরে বছর বছর বিদেশে ছুটতে শুরু করলেন। যারা আসে, তারা রাস্তার খানাখন্দ দেখে, নেতাদের বচনামৃত শুনে ভাগলবা। মৌ নামের কী একটা ভৌতিক বস্তুর নাম শোনা যেত যখন তখন—মৌ হচ্ছে, মৌ হচ্ছে রবে খবরের কাগজের পাতা গুলজার। এখন আর কিছুতেই মৌ নাই। পাড়ায় পাড়ায় শুধু মৌরসী পাট্টা। দুলালচন্দ্র—জিন্দাবাদ।

শিল্প নেই, ব্যবসা নেই, চাকুরি নেই। রাজস্ব আদায় নেই। পড়তি জমিদারবাড়ির মতো তাই এক-একটি করে ঘরের গহনা বিক্রি চলছে। বন্ধ হল বেকার ভাতা, বিনি পয়সার চাকুরির পরীক্ষা। ভোল পাল্টে বড় ব্যবসায়ীদের সাথে গলাগলি হরি-সংকীর্তন। ছোটখাট ব্যবসায়ীদের সস্তায় জমি পাইয়ে দিয়ে গৃহনির্মাণের ব্যবসায় নামল সরকার। তাতে লাভ কত হল, বছরের বাজেটে তার কোনও ইতিবাচক ছবি ফুটে উঠছে না, বরং ভেতরের দৈন্য ঢাকতে বাইরে মন্ত্রীরা বেশি করে সংস্কৃতির উপর জোর দিচ্ছেন।

সংস্কৃতি ক্রমবর্ধমান করতে নেতাজি ইনডোর ও যুবভারতী স্টেডিয়ামে এখন খেল-কূদের চেয়ে নাচাগানাই চলে বেশি। কিছুটা বা সরকারি উদ্যোগে, পৃষ্ঠপোষক থাকেন মন্ত্রীমশাইরা। দলপতিরা হর-ওয়াক্ত সেখানে সম্মেলন-টন করে সবাইকে গরম রাখেন, ভোটযুদ্ধে নেতিয়ে না পড়ে তাদের বাহিনী।

গৃহস্থের বৌ বিয়ের বেনারসী পরে রাস্তার কলে জল আনতে গেলে যেমন বোঝা যায় যে তার পিন্ধনের কাপড় শেষ, এম্-আই-টি পাশ অর্থমন্ত্রী পর পর ক'বার ঘাটতি-শূন্য বাজেট পরিবেশেন করে সে কথাই আবার প্রমাণ করে দিলেন। মন্ত্রীমশাই স্বয়ং হাত পেতে দিলেন খোদ বিলাতের দিকে, প্রার্থনা, বাজেটের অর্থসংস্থান কর। ক্রমে ক্রমে বেকার ভাতা মাথায় উঠল। বিনামূল্যের ব্যাপারস্যাপার ক্রমশ কমতে লাগল। সরকারি হাসপাতালে গিয়ে কড়ি ফেলে মরতে হবে, রক্তের দাম ১৭৫ টাকা থেকে একলাফে বাড়ানো হল ৫০০ টাকা, স্কুল-কলেজের মাইনে বেড়ে গেল, উন্নয়ন খাতের খরচ প্রায় বন্ধ। সি এ জি এই সময় আবার জঘন্য তথ্য দিয়ে বসল। রাজ্যের অভ্যন্তরীণ উৎপাদন, রাজস্ব আদায় ও অন্যান্য সূত্র থেকে আয়ের চেয়ে ব্যয় অনেক বেশি বলে ঋণের বোঝা চেপে বসেছে রাজ্যবাসীর ঘাড়ে। রাজস্ব ঘাটতি বাড়ছে তীব্রভাবে। ২০০১-০২ সালে রাজস্ব খাতে আয় হয়েছিল ১৪,৫৩৮ কোটি টাকা, ব্যয় দাঁড়াল ২৩,৩৯৫ কোটি। তাতে গোদের উপর বিষফোড়ার মতো ১৯৯৭-৯৮ সালে যেখানে ওই রাজস্ব আয়ের মধ্যে রাজ্যের নিজস্ব কর আদায়ের পরিমাণ ছিল মাত্র শতকরা ৫০.৩০ ভাগ, ২০০১-০২ সালে তা নেমে গেল মাত্র শতকরা ৪৪.৯৫ ভাগে। এই নিন্দুক রিপোর্ট আরও বলে দিল ৯৭-৯৮ সালে যেখানে সুদ মেটানো ও প্রশাসনিক খাতে খরচ ছিল মোট ব্যয়ের শতকরা ৩৬ ভাগ, বর্তমানে তা বেড়ে দাঁড়িয়েছে শতকরা ৪৩ ভাগ।

সরকারি ব্যবসার নমুনা যদি একবার দেখা যায়, তাতেও কলার মান্দাসে শোয়া লখিন্দরেরও চক্ষু খুলে যাবে। ২০০১-০২ সাল পর্যন্ত ৪১৪৩ কোটি টাকা নানাভাবে বিনিয়োগ করে সরকার মুনাফা বাবদ পেয়েছে মাত্র ৩.৭৭ কোটি টাকা। ট্রাম চালাতে ১৯৯৭ থেকে ২০০২ সাল পর্যন্ত সরকার ২২০ কোটি টাকা ভর্তুকি দেবার পরেও লোকসান ১৩৩ কোটি টাকা। আর সেই ট্রামপ্রসাদের নৈবেদ্যের উপর বসে আছেন এক 'বাম-নেতা।'

নতুন স্কুল-কলেজ তৈরির কথায় সরকার মাথার উপর দু'হাত তুলে গৌরাঙ্গ হয়ে বসল। পরন্তু কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে ফি বাড়িয়ে দেওয়া হল। সুযোগ বুঝে এগিয়ে এল ব্যবসায়ীরা। তাদের স্কুল-কলেজ গড়ার অনুমতি দেওয়া হল। মেডিকেলে ভর্তির জন্য ক্যাপিটেশন ফি নেওয়া হবে। নতুন প্রায় তিনশত ইংরেজিমাধ্যম স্কুল গড়ে উঠল। একে একে অসংখ্য ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ তৈরি হতে লাগল। বাংলা মাধ্যম স্কুল বন্ধ হতে লাগল একে একে খোদ কলকাতায়।

তাতেও সামলানো যাচ্ছে না। এবার সরকার বসে গেল রবীন্দ্রনাথের হিং টিং

ছট-এর জট খোলার মতো টাকা আয়ের ভাবনায়। খরচ কমাতে হবে। কর বাড়াতে হবে। রাজস্ব চাই, আরও রাজস্ব। স্ট্যাম্পডিউটি বাড়ানো হল। জমির খাজনা, পৌরসভার খাজনা, গাড়ির খাজনা, বাড়ির খাজনা বাড়ানো হল। তাতেও হচ্ছে না। আরও চাই। এবার তাই মানুষ ছেড়ে গরু ছাগল ভেড়া কুকুরের উপর দৃষ্টি পড়ল। বাদ গেল না ঠেলা সাইকেল রিক্সা কেউই। দু-ঠেঙে মানুষ আপাতত বাদ গেলেও যে কারণে সাইকেলে ট্যাক্সো লাগবে, রাজামশাই দুদিন বাদেই বলতে পারেন, সাইকেলের বদলে যাঁরা দু'পায়ে চলছেন, তাঁদের মাসে ছ'টাকা, রাজ্যের মতো যাঁরা ক্রাচে ভর দিয়ে চলবেন তাদের মাসিক তিন টাকা হারে কর দিতে হবে। রাজ্যকে যে নিজের পায়ে দাঁড়াতে হবে!

খাঁড়ার ঘা পড়ল গিয়ে পাবলিকের ঘাড়ে। ১৯৯৭-২০০০ সালের শিক্ষাবর্ষের মধ্যে বিনামূল্যে বিতরণের জন্য ছাপানো পাঠ্যপুস্তকে ২৩১ কোটি কপি কম ছাপানো হয়েছে। অর্থাৎ যাদের বিনামূল্যে বই দেবার কথা, তারা তা পেলই না। প্রত্যন্ত গ্রামের ছাত্রছাত্রীরাই যে এই বঞ্চনার শিকার হল, তা ব্যাখ্যার প্রয়োজন নেই। ১৯৯৯-২০০০ সালে দারিদ্র্যসীমার নীচে থাকা ৮.৮৫ লক্ষ পরিবারকে স্বর্ণজয়ন্তী গ্রাম স্ব-রোজগার যোজনার আওতায় আনার কথা বলা হলেও মাত্র ১.২৬ লক্ষ পরিবার সেই সুযোগ পেয়েছে। দফায় দফায় হাসপাতালের ফি বাড়িয়ে দেবার সাথে গ্রামীণ প্রাথমিক চিকিৎসা কেন্দ্র বন্ধ করে দেবার সিদ্ধান্ত নেওয়া হল। খাজনা বেড়েছে ভূমির, জমির, বাড়ির। ভূমি রাজস্বের লক্ষ্যমাত্রা একধাপে ২৫২ কোটি টাকা ধার্য হয়েছে। জলকর, জঞ্জালকরের সাথে এবার নবতম সংযোজন হবে আগুন কর। দরিদ্রের রাজ্যে যাঁরা গাড়ি চড়ে মৌজ করবেন, তাঁদের উপর কোপ পড়ল বেশ ক'ঘা। গাড়ির উপর ট্যাক্স কয়েকগুণ বাড়িয়েই শেষ নয়, একসাথে আগামী কয়েক বছরের জন্য আগাম নিয়ে নেওয়া হবে সেই কর। ভবিষ্যতে কিভাবে চলবে, তা ভাবার সময় নেই, আজ তো উনুনে হাড়ি চড়ুক। নইলে মাইনে বন্ধ হয়ে যাবে সরকারি কর্মীদের।

তাই অতীতের নোংরার উপর পুরানো কার্পেট পেতে দিয়ে শুরু হল উল্টো মুখে হাঁটা। স্কুলে এবার আর পূর্ণসময়ের শিক্ষক নন, তাঁরা হবেন খণ্ডকালীন এক বা দু'হাজার টাকার বিনিময়ে চুক্তির কারবারে তারা মাঝে মাঝে পড়াবেন—বাকি সময়ে প্রসন্ন গুরুমশাইয়ের মতো মুদিদোকান, মুরগি ও শূকর পালন, দুগ্ধ দোহন বা তোলাবাজের কাজ করতে পারবেন। যাদের যোগ্যতা আছে টিউশনিতেও কোনও বাধা নেই তাঁদের।

একদিকে পুলিশকে বলা হল, যত পারো, গাড়ি-চড়িয়েদের কাছ থেকে জরিমানা আদায় করো। সে যুগের মনসবদারি আর কি—নিজেরা আয় করে সৈন্যদল পোষণ করো। শুধু পুলিশকে উৎসাহ দেওয়া নয়, রাজস্ব আদায়ে বিশেষ গতি আনতে সরকারি বিভিন্ন দপ্তরকে আর্থিক পুরস্কার দেবার কথাও প্রস্তাব করেছেন অর্থমন্ত্রী। *(সংবাদ: আনন্দ বাজার পত্রিকা-১৫/১০/০৩)*। নিজের পায়ে দাঁড়াতে হবে তাদেরই

যাদের রাজস্ব আদায়ের সুযোগ আছে। নগরোন্নয়ন, পুর, সেচ, ক্ষুদ্রশিল্পবাণিজ্য, কৃষি— সব দপ্তরই এখন থেকে বাড়তি রাজস্ব আদায়ে মন দেবে। একদিকে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার বুলি, আর একদিকে পুঁজিপতিদের আমন্ত্রণ—এই দুইয়ের ফোঁকর ভরাতে চলছে অসুস্থ রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থা বিক্রির প্রস্তুতি (ইতিমধ্যে দশটি সংস্থা কেনার জন্য পঞ্চাশজন ব্যবসায়ী লাইন লাগিয়েছেন (*খবর : দি টেলিগ্রাফ-২৪/৯/০৩*)।

তবে এত সব নেই নেই-এর মধ্যেও একটি সুখের খবর আছে। সহজে মদ্য পাইয়ে দেবার জন্য আরও তিন হাজার মদের দোকানের লাইসেন্স দেওয়া হল। বর্তমানে সরকার মদের দোকান থেকে ৫৭০ কোটি টাকা আদায় করলেও এটা কয়েকগুণ বৃদ্ধির সম্ভাবনা আছে বলে কর্তাদের ধারণা। এই রসে গ্রামবাসীরাও যাতে বঞ্চিত না হন, তার জন্য প্রতি পঞ্চায়েত এলাকায়ও একটি করে মদ্যভাণ্ডার সুনিশ্চিত করা হল। শহরে প্রতি ১২,০০০ জন প্রতি ও গ্রামে ১৮,০০০ জন প্রতি একটি করে দোকানের লাইসেন্স দেওয়ার সিদ্ধান্ত হল (খবর : আনন্দবাজার পত্রিকা, ২২/১১/০৩)। সেই সাথে 'ছিপি খুলুন এবং গলায় ঢালুন' (রেডি টু ড্রিঙ্ক) জাতীয় হালকা ফুরফুরে মদের ব্যবস্থা করা হবে সাধারণ সব মনিহারি দোকানেও। এবার তাই মনিহারি নামটি সার্থক হবে। খোকার জন্য আইসক্রিম, খুকির জন্য চকোলেট আর বাবা-মার হাতে ফুরফুরে হালকা মদের দুটি বোতল—এই হবে বাঙালির পূজার বাজারের ছবি। আহা কী আনন্দ আকাশে বাতাসে!

অচিরেই হয়তো এমন সুখের দিন আসবে, যখন সরকার বলবে, চাকুরির দরখাস্তের সাথে সদ্যখালি ১০টি মদের বোতল জমা দিতে হবে, ভোটে প্রার্থীর জন্য ৫০টা, শ্মশানে দাহ্য হতে আসা মৃতের ব্যবহৃত ১০০টি মদের খালি বোতল জমা দেওয়া আবশ্যক। সরকারি স্কুল-কলেজে ভর্তি বা চাকুরিপ্রার্থীকে পঞ্চায়েত প্রধানের কাছ থেকে এই মর্মে প্রত্যায়নপত্র নিতে হবে যে শ্রীমান/শ্রীমতি অমুক বিগত দশ বছর যাবত নিয়মিত মদ্যপানে অভ্যস্ত এবং এজন্য প্রয়োজনীয় অর্থসংগ্রহে তিনি নিজ পিতামাতা বাদেও এই এলাকায় পকেটমার, চুরি, ছিনতাই ও তোলাবাজ হিসাবে দক্ষতা অর্জন 'করিয়াছে'। তার ফলে কর ছাড়াও মদ্যপানে বেকারি, হতাশা, ব্যর্থতার জ্বালা যেমন ভুলে থাকা যাবে, তেমনি পঞ্চত্ব প্রাপ্তির সম্ভবনাও বেড়ে গেলে অন্যান্য সেক্টরের আয়ও বেড়ে যাবে।

এসব প্রস্তাবই অতি উত্তম ও সামাজিক বিপ্লবের বিকল্প বলে গণ্য হতে পারে। তবে তাতেও কাজ না হলে অর্থমন্ত্রী এ বিষয়ে তাঁদের এক পূর্বাচার্যের কথা স্মরণ করতে পারেন। তিনি অক্সফোর্ড কেমব্রিজে না পড়লেও স্বশিক্ষিত হয়েছিলেন অভিজ্ঞতা আর পূর্বসূরিদের কাছ থেকে শিখে। রাজ্যের যা হা-হতোস্মি অবস্থা, তাতে অর্থমন্ত্রী অনায়াসে অর্থশাস্ত্র প্রণেতা কৌটিল্যের পরামর্শ নিতে পারেন, যিনি ২৩০০ বছর আগে রাজা আমাদের অর্থমন্ত্রীর মতো গ্যাঁড়াকলে পড়লে কিভাবে উদ্ধার পাবেন, তা লিখেছিলেন, বোধ হয় এই সব পণ্ডিতজনের কথা ভেবেই। এখনই মন্ত্রীমশাই কৌটিল্যের

অর্থশাস্ত্র কিনে পড়া শুরু করুন। হিন্দি, ইংরেজিতে আপত্তি থাকলে মাতৃদুগ্ধ পানের মতো বাংলা ভাষাতেই পড়ে ফেলুন তাঁর অমরসৃষ্টি অর্থশাস্ত্রের যোগবৃত্ত নামক পঞ্চম অধিকরণের দ্বিতীয় অধ্যায় বা ৯০-ম প্রকরণ, যার পোশাকি নাম 'কোশভিসংহার'। সাদা বাংলায় বললে দাঁড়ায় রাজার ভাঁড়ে মা ভবানী দশা হলে নির্দিষ্ট রাজস্ব অপেক্ষা অধিক টাকা কিভাবে গোছাবেন, তার দাওয়াই বা সুপরামর্শ। রাষ্ট্রে সংবিধানের ৩৬০-তম অনুচ্ছেদ প্রয়োগ করার মতো দুর্দশা দেখা দিলেও রাজামশাই এই মুষ্টিযোগ কাজে লাগাতে পারেন। অবশ্যি অর্থশাস্ত্র না পড়ে আমাদের অর্থমন্ত্রী তার অনেকগুলিই প্রয়োগ করে যাচ্ছেন। যেগুলি এখনও বাকি আছে এখানে তা কানে কানে বলে দেওয়া যেতে পারে। তবে জনগণ সাবধান থাকবেন, যে-কোনও দিন এর যে-কোনও দিক থেকেই এর দু'-এক ঘা আপনাদের উপরও আসতে পারে।

কৌটিল্য বলেছেন, অভাবের প্রথম পর্বে যে অঞ্চলে বৃষ্টি বা নদীর জলের উপর নির্ভর করে ভাল শস্য উৎপাদিত হয়, সেই শস্যের ১/৩ বা ১/৪ ভাগ রাজা দাবি করে নিতেই পারেন। কিন্তু কৃষক যদি রাজস্ব ফাঁকি দেবার জন্য শস্য লুকিয়ে রাখে তবে ফাঁকি দেবার হিসাবের আটগুণ জরিমানা আদায় করা হবে। বর্ধমান, হুগলি, নদিয়া, মুর্শিদাবাদ এই হিসেবের লক্ষ্যস্থান হতে পারে। ধান বাদে অন্যান্য বনজ সম্পদের উপর ১/৬ ভাগ ও হস্তির-দন্ত ও পশুচর্মের অর্ধেক রাজা আদায় করে নেবেন। লক্ষ্যস্থান সুন্দরবন, পুরুলিয়া, দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি।

আর স্বর্ণ রৌপ্য মাণিক্য ও হস্তি অশ্বের ব্যাপারীরা বিক্রয়মূল্যের ১/৫০ ভাগ, আর বস্ত্র, গন্ধ, ভেষজ, মদ্য ও তৈজসের ব্যবাসয়ী ১/২৪ ভাগ কর দেবেন। ধান্য, তৈল, ঘৃত, শকট ও লৌহজাত পণ্যের ব্যবসায়ী দেবেন ১/৩০ ভাগ। তেজারতি ও বন্ধকি কারবারি ও কুলটা নারীর দ্বারা কামাই করেন, এমন লোকের আয়ের ১/১০ ভাগ আদায় করা যাবে। এই শেষপর্বের আয়ের সম্ভাবনা এদেশে প্রচুর। সল্টলেক, বালিগঞ্জের বাবু কালচরের দিকে ধ্যান দিলে কিছু কম আসবে বলে মনে হয় না। মদ্যপানকে উৎসাহ দেবার মতো এই হৃদয়জ্বালা জুড়ানোর ব্যাপারে সরকার একটু হম্বিতম্বি বন্ধ করে উৎসাহ দিলেই বেশ ভালই আয় হতে পারবে। কলকাতার দু'-একটি এলাকা বাদ দিলে ইদানীং সল্টলেক সহ অন্যান্য এলাকায়ও এই ব্যবসা ক্রমবর্ধমান। পুলিশ তো নানা পশ এলাকা থেকে মধুচক্রের মক্ষীরানীর সন্ধান করে মাঝে মাঝে। তবে এবংবিধ কর আদায়কারীদের উপর একটু লক্ষ্য রাখা দরকার হবে প্রাকৃতিক কারণেই। কৌটিল্য কিন্তু এই গুরুত্বপূর্ণ দপ্তরটির দায়িত্ব পুলিশের হাতে দিয়ে নিশ্চিত হতে পারেননি বলে একজন গণিকাধ্যক্ষ নিয়োগের পরামর্শ দিয়েছিলেন।

এভাবে কাঠুরে, বাঁশুরে, কুমোর, হোটেলঅলার ভোজশালার কাছ থেকে ১৫ ভাগ আদায় করা যাবে। নট-নর্তকী ও বেশ্যারা দেবেন ১/৩ ভাগ। এতে আবার বুদ্ধিজীবীদের একাংশ ক্ষেপে যেতে পারেন। এখন তো নট-নর্তকীরাই বুদ্ধিজীবী। চাষী ব্যাপারীর পর এবার পালা গরু, মোষ, ছাগল, মুরগির পোল্ট্রিঅলাদের। শূকর ও

মুরগি এমনি এমনি বাড়ে বলে মালিকেরা দেবেন ১/২ অংশ, ছাগল, ভেড়ার মালিকেরা দেবেন ১/৬, গরু, মোষ, খচ্চর, গর্দভ, উষ্ট্রপালকেরা দেবেন ১/১০। আর যে-সব ব্যবসায়ী ব্যবসাপত্তর গুটিয়ে হাত-পা তুলে বসে আছেন, মাফ নেই তাঁদেরও। এক টাকা করে অবশ্যই তাঁদেরও দিতে হবে। এছাড়াও যুগোপযোগী হাজার পেশা জমে উঠেছে ইদানীং। জ্যোতিষী, বিউটিশিয়ান, ডায়েটিশিয়ান, পকেটমার, তোলাবাজ, ইভেন্ট ম্যানেজার, আরও কত কি। তারাও বাদ যাবে না।

তবে হ্যাঁ। এভাবে একবারই বাড়তি টাকা আদায় করা যাবে। দুবার নয়। আর তাতেও দূর-দূরান্তের প্রত্যন্ত প্রদেশে যাঁরা নানাকর্মে রত থেকে দেশের উপকার করছেন, তাঁদের বাড়তি রাজস্বের থেকে বাদ দিতে হবে। আর বাড়তি আদায়ের সময়ে লক্ষ্য রাখতে হবে, কৃষকের যেন নিজের সংবৎসরের খোরাকি ও বীজশস্যের অভাব না হয়।

তবে এসবেও না কুলোলে কৌটিল্য মোক্ষম দাওয়াই বাতলেছেন এর পরে। হাত-পেতে না পেলে ছলনার আশ্রয় নিতেও পিছপা হবেন না রাজা। কালেক্টর মশাই হঠাৎ কোনও জরুরি কাজে লাগবে বলে চাঁদা তুলতে পারবেন নাগরিকদের কাছ থেকে। পার্টির চাঁদা ও অন্যান্য চাঁদার এ কম্মোটি ঘটেই চলেছে হাটে-বাজারে, স্কুলে। কিছু লোককে আগেভাগে পটিয়ে বেশি টাকা দান করছে বলে প্রচার করে অন্যদেরও বেশি টাকা দিতে প্ররোচিত করা যেতে পারে। যারা কম দেবে তাদের নামে কুৎসা প্রচার করেও চাপ দিয়ে বাড়তি টাকা আদায় করা যাবে। যারা বেশি দেবে, তাদের ছত্র, উষ্ণীষ, ভূষণ দিয়ে অনুগত করতে হবে। এখন দেওয়া যাবে সাম্মানিক পঞ্চায়েত প্রধান, মদের লাইসেন্স, পার্টিরত্ন, পার্টিভূষণ জাতীয় খেলাত ও খেতাব। অন্যের টাকা তোমরা জমিয়ে রেখেছ বলে ভিন্নধর্মী বা অন্য পক্ষের লোকদের গৃহ, আশ্রয়, উপাসনালয় থেকে টাকা জোর করে নিয়েও রাজকোষ বৃদ্ধি করা যেতে পারে। শত্রুরাজা আক্রমণ করতে পারে এ কথা প্রচার করে দেবমন্দিরের টাকাপয়সা নিরাপত্তার কারণে হাতিয়ে আনা চলবে।

তাতেও সুবিধা না হলে শ্মশানে, মেলায়, তীর্থস্থানে গুপ্তচরেরা সাধু সেজে নানা ইন্দ্রজাল দেখিয়ে দেবতার কোপ প্রশমনার্থে দক্ষিণা আদায় করে রাজাকে এনে দেবেন। গাছে অকালে ফল ধরা, পাতালনাগের আবির্ভাব, নরখাদক রাক্ষসের হাত থেকে রক্ষা পেতে শান্তি স্বস্ত্যয়নের কথা বলেও টাকা হাতানো চলবে। দেবতাদের কোপ প্রমাণের জন্য দু-একজন মৃত্যুদণ্ডাদেশপ্রাপ্ত ধনঞ্জয়কে রাতে বিষ দিয়ে হত্যা করে ফেলে রাখা যেতে পারে। আজকাল তো পার্টি কর্মীদের বডি ফেলা আকছার হচ্ছেই।

বণিক সেজে অন্যের টাকা আমানত রেখে বা মুদ্রাপরীক্ষার ছলে অন্যের টাকা মেরে দেবার যে ব্যবস্থা কৌটিল্য বলেছেন, তা এ যুগেও অচল নয়। সাধুবাবারা তো এখনও টাকায় টাকা বাড়ানো বা লোহাকে সোনা তৈরি করার কথা বলে নকল সাপ্লাই করে চম্পট দিচ্ছেই। গুপ্তচর মারফত আধুনিক যুগের উপযুক্ত চিট-ফান্ড তৈরি করে

বা শেয়ার বাজারে নকল শেয়ার কেনা-বেচা, দেশে-বিদেশে চাকুরি পাইয়ে দেবার প্রলোভন দেখিয়েও প্রজার টাকা রাজকোষে নেওয়া যেতে পারে।

কৌটিল্যের পরবর্তী পরামর্শ আরও বেশি রঙিন। এবার আর লোভী নয়, এবার রাজকোপে পড়বেন শত্রুপক্ষের (এখন বলুন বিরোধী পার্টির লোক) লোক, আর কলকাঠি নাড়াবেন সুন্দরী নারীরা। সুন্দরী নারী গুপ্তচর শত্রুপক্ষের লালটু-লম্পট গোছের লোকের সাথে আসনাই করার কৌশলে তাঁর শয়নমন্দিরে পৌঁছে তাঁকে ধর্ষণ করা হচ্ছে বলে চেঁচামেচি করে লোক জড়ো করবেন। আর আগেভাগে সাজিয়ে রাখা দাদারা ও পুলিশরা সেই এলাকায় ঘাপটি মেরে অপেক্ষা করে ধর্ষণের অজুহাতে গ্রেপ্তার করে শত্রুপক্ষের সর্বস্ব কেড়ে নেবেন। অথবা তাঁদের সম্পত্তির উত্তরাধিকার নিয়ে গোলযোগ দেখা দিলে গোপনে গুপ্তচর দিয়ে একপক্ষকে হত্যা করে হত্যার দায়ে অন্যপক্ষকে গ্রেপ্তার করে তাঁদের দুজনের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করবেন। কিংবা মৃত্যুদণ্ডাদেশপ্রাপ্ত কোনও লোককে ঐ শত্রুপক্ষের সাথে অর্থ বা নারীঘটিত ব্যাপার নিয়ে যাতায়াতের সুযোগ দিয়ে রাতে গুপ্তঘাতক দ্বারা ঐ দণ্ডিতকে হত্যা করে পূর্বোক্ত শত্রুকে হত্যার দায়ে গ্রেপ্তার করে তাঁর সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা যাবে।

আবার মহাপুরুষের বেশ ধরে কোনও গুপ্তচর শত্রুপক্ষের লোকদের মায়াবিদ্যায় প্রভাবিত করে গুপ্তধন প্রাপ্তির আশায় গোপনে যাগযজ্ঞ করাবেন। আর সেখানে আগে চিহ্ন দিয়ে রাখা কোনও মুদ্রা বা গহনা মাটিতে পুঁতে রেখে তা ঐ শত্রুকে যজ্ঞের ফল হিসাবে পাইয়ে দেবেন। সেই টাকা খরচ করা কালে তাঁকে চোর বলে বামাল গ্রেপ্তার করে তাঁর সর্বস্ব কেড়ে নিতে পারবেন। চাকরের বেশধারী গুপ্তচর জাল টাকাকে তার মনিবের দেওয়া বলে তাকে পুলিশের হাতে ধরিয়ে দেবে। শত্রুপক্ষের কোনও লোকের ঘরে ঐরকম চাকর সাজিয়ে তাকে দিয়ে গোপন জায়গায় জাল টাকা বা নিষিদ্ধ দ্রব্য রেখেও ঐ লোককে গ্রেপ্তার করে তাঁর সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করতে পারবে।

এ ছাড়াও কৌটিল্য শারীরিক সাজার বিকল্প হিসাবে আর্থিক শাস্তির কথা বলেছেন বার বার। এখন চোর, ছ্যাঁচোড়, ধর্ষক, খুনি, অপহরণকারী, তোলাবাজ, প্রতারকদের ধরে আরামে জেলে বসে খাওয়ানো, তাদের পাহারা দেওয়ার খরচ ও জেল ভেঙে পালিয়ে যাওয়া আটকাতে ঝক্কি অনেক। অনেকের আবার অনিচ্ছা হলে জেলে থাকতেও চায় না। যখন-তখন পাঁচিল টপকে চম্পট দেয়। এদের মধ্যে যাদের সাধ্য আছে, তাদের কাছ থেকে বিরাট অংকের টাকা আদায় করে নিলে সরকারের তিন তরফা লাভ। হাতকাটা দিলীপরা তাতে দেশের কাজেও লেগে পড়তে পারে মওকা বুঝে। তাদের পোশাক খরচ বাঁচে, নগদ অর্থ লাভ ও ভবিষ্যতে নতুন আয়ের সম্ভাবনা।

সুতরাং শাস্ত্রবিৎ কৌটিল্য যে-সব পরামর্শ দিয়েছেন, তা প্রয়োগ করার মতো সময় সম্ভবত পশ্চিমবঙ্গে এসে গেছে। কিন্তু কৌটিল্য সাবধানবাণী উচ্চারণ করেছেন, সাধারণ প্রজাদের ক্ষেত্রে (এখানে পড়ুন দলের কর্মী) এসব চালাতে গেলে প্রজার

কোপে স্বয়ং নাশের সম্ভাবনা প্রকট। শত্রু ও অধার্মিকের ক্ষেত্রেই যেন ধনসংগ্রহের এই সব পদ্ধতি প্রয়োগ করা হয়, কৌটিল্যের এই কথা মেনে মন্ত্রীমশাই লেগে পড়তে পারেন।

ভাগ্য ভাল, শত্রুর কোনও অভাব নেই। মার্কসবাদীদের শত্রুস্থান খুব প্রবল। শ্রেণীশত্রু, অন্যদলশত্রু, দলের মধ্যে স্বাধীনচেতা স্পষ্ট বক্তারা শত্রু, দল ছেড়ে দেওয়া বর্তমান শত্রু—শত্রু নানা রকম। সুতরাং 'মার্কসবাদ' ঠিকমতো প্রয়োগ করা না গেলেও কৌটিল্যবাদ প্রয়োগের উপযুক্ত ক্ষেত্র হয়ে উঠেছে পশ্চিমবঙ্গ।

আশা করি, আগের সব বাদ, যা কিনা এতদিনে রাজ্যের অর্থব্যবস্থা বরবাদ করে দিয়েছে, তাদের সর্ববাদ দিয়ে নিজেদের অনর্থকারী অর্থশাস্ত্র, যা কিনা বিলাতি কেইনস স্মিথেরা লিখেছেন, তা ফেলে একেবারে খাঁটি দেশি দাওয়াই, কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র প্রয়োগ করে দেখতে পারেন। শাস্ত্রবচন সর্বত্র মান্য যদি ক্ষমতায় থাকতে হয়। যা খুশি করে এই ভয়াবহ আর্থিক অবস্থায় বলুন, আতুরে নিয়মোনাস্তি।

সুকুমার সিকদার

ছাত্র আন্দোলন, পশ্চিমবঙ্গ সরকার ও শাসক দল

১৯৭৭ সালে বামফ্রন্ট সরকার যে ক্ষমতায় আসতে পেরেছিল তার একটি বড় কারণ ছাত্র আন্দোলনের পরম্পরা যার ফলে নকশালবাড়ি সহ পূর্ববর্তী সব আন্দোলন ভারতের মানচিত্রের এই অংশে অন্য এক আবহ নির্মাণ করেছিল। পশ্চিমবঙ্গের গরিষ্ঠাংশ শিক্ষিত মানুষ যে আজও বামপন্থার পরিপোষক তার কারণ ছাত্রাবস্থায় প্রায় সকলেই মার্কসবাদকে এক অনন্য দর্শন হিসেবে দেখেছিলেন। বিগত ২৮ বছর যাবৎ 'মার্কসবাদী কম্যুনিস্ট পার্টি' বঙ্গেশ্বর হবার পর বর্তমান প্রজন্ম—যাঁরা পূর্বেকার কংগ্রেসী শাসন দেখেন নি, তাঁরা ভাবতেই পারেন এই সব মন্ত্রীরা ও শান্ত্রীরা এবং তাদের প্রমোটার ব্যবসায়ীরা যদি 'মার্কসবাদী' অভিধায়ে বিশেষিত হতে পারেন, তবে পুঁজিবাদ ও 'মার্কসবাদ' একই কথা।

যাঁরা ব্রিটিশ পরবর্তী ভারতে জন্মেছেন, তাঁরাও অবাক হয়ে ভাবতে পারেন, স্বয়ং কেরেনস্কিও এই সব 'মার্কসবাদী' দেখলে অবাক হতেন এবং হয়তো লজ্জাও পেতেন। কেননা সোস্যাল ডেমোক্র্যাটরাও এমন নির্লজ্জভাবে উৎপাদনের সঙ্গে জড়িত নয় বা জড়িত কেবল ট্রেডিং ক্যাপিটালের সঙ্গে এমন অসৎ মালিকদের সঙ্গে এমন নির্লজ্জ মেলামেশা করতেন না। শপিং মল আর আধুনিক ৮৯ হল, হোটেল, মদের অঢেল লাইসেন্স, ফ্লাইওভার কে 'উন্নতির' একমাত্র সূচক, তার পরিণতি একদিন ভয়াবহ হতে বাধ্য। সে কোনও প্রকারেই হোক শাসন ক্ষমতা দখল করে থাকতেই হবে এই মানসিকতা পার্টিকে একদিকে দুলালের মত মাস্তানদের ওপর নির্ভরশীল করছে, আজ ক্ষমতালোভী এইসব বামপন্থীদের কাছে মানুষের একমাত্র পরিচয় হলো তাঁরা তাদের ভোটার কি না। তুমি যদি আমার সমর্থক না হও, তবে তুমি আমার শত্রু। তোমায় নিজস্ব কোনও মতামত থাকতে পারে না। আমার মতামতই তোমার মতামত। স্বয়ং হিটলারও এমনভাবে ভাবতে পারতেন কিনা সন্দেহ। তিনিও তো সোস্যালিস্ট কথাবার্তাই বলতেন। প্রথমে তলে তলে গুপ্ত হত্যা, বিরোধীদের নিকেশ করা এবং তারপর তার আর ঘোমটার দরকার হয় নি।

বামপন্থীরা এক সময় বিশ্ববিদ্যালয়ে পুলিশের অনুপ্রবেশের বিরুদ্ধে আন্দোলন করেছিলেন। তখনকার কংগ্রেসী উপাচার্য ও অধ্যক্ষরাও শিক্ষাস্থলে পুলিশের উপস্থিতি দরকারি মনে করতেন না। আজ যাঁরা বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চতম পদ দখল করে আছেন, তাঁরাও এক সময় ছাত্র আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। এই সরকার যাঁরা চালাচ্ছেন তাঁদের কেউ কেউ ছাত্র আন্দোলন করেন নি এমনই নয়। মধ্যরাত্রে পুলিশ পাঠানোর আগে একবারও কেন মনে হলো না দিনের আলো ফুটুক আর একবার ভেবে দেখি। আজ যে নেতারা গর্জন করছেন ছাত্ররা ছাত্র

আন্দোলনের কি জানে, তারা একবার আয়নার সামনে দাড়িয়ে দেখুন, তাদের মুখগুলি অত্যাচারী শাসকের মুখে পরিণত হয়েছে। হুঁদা একবার অনেক অনুরোধে একজন মন্ত্রীর একটি অবক্ষ মূর্তি তৈরি করেছিলেন। আবরণ উন্মোচনের পর শিউরে উঠেছিলেন সেই মন্ত্রী। একি! একি নিষ্ঠুর মুখ! একি পিশাচের মত দেখতে একটা মানুষ! এ-লোকটা আমি নই। হুঁদা মৃদু হেসে বলেছিলেন, আপনি আগে কী ছিলেন জানি না, এখন আপনি এরকমই একজন।

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় কোনও একক দৃষ্টান্ত নয়। সমস্ত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান আজ এঁরা 'গণতান্ত্রিকভাবে' দখল করেছেন। এদের এলসি সে সব নিয়ন্ত্রণ করে। এদের পার্টির অধ্যাপকরা সমস্ত গভর্নিং বডি ভাগাভাগি করে দখল করে আছেন। রাজনৈতিক দলের নেতারা ছাত্রদের নিয়ন্ত্রণকর্তা। এককালের ছাত্রপরিষদের নেতারা আজ কেন্দ্রের মন্ত্রী, গতকাল যেমন ছিলেন কলকাতার মেয়র। সেটা ছিল কংগ্রেসি সংস্কৃতি। আজ বামপন্থীরা সেই সংস্কৃতির বাহন। বামছাত্র আন্দোলনের নেতারা আজ মন্ত্রী এখানে, কাল কেন্দ্রেও মন্ত্রী হবেন।

পশ্চিমবঙ্গে কি বিপ্লব হয়ে গেছে? এসে গেছে শ্রেণিহীন সমাজ ব্যবস্থা, যে কোনও প্রতিবাদ করা যাবে না? প্রতিবাদহীন স্থবির জনগোষ্ঠী কি নিজের ভাল বুঝতে পারে? বর্তমানে যাঁরা মন্ত্রী এবং শাসকদলের নেতা একসময় তাঁরাও জঙ্গী ছাত্র আন্দোলনের অংশীদার ছিলেন। তাঁরা কি তাদের বিবেককে একবারও প্রশ্ন করেন না, ভাবেন না যে তাঁরা cosmetic development-এর যে কর্মসূচি নিচ্ছেন, তার ফল একদিন মারাত্মক হতে পারে?

চারপাশে বৃদ্ধদের আফ্‌শোস্ শুনি, বর্তমান প্রজন্ম ভোগবাদী হয়ে গেছে। ছাত্ররা হয়ে গেছে কেবল কেরিয়ারিস্ট। 'মার্কসবাদী'রা আয়নায় নিজেদের মুখ একবার দেখুন। প্রতিবাদের ক্ষেত্রটি ধ্বংস করে দেবেন না। কেননা সেই প্রতিবাদহীনতার পথ ধরেই আসবে মৌলবাদ।

তরুণকুমার দাস

একটি নদীর মৃত্যুকথা

'ইছামতীকে পুরনো স্রোতে ফেরাতে যৌথ নদী কমিশনের বৈঠক আজ' শিরোনামে প্রকাশিত সংবাদে লেখা হয়েছে—

'ইছামতীর হারিয়ে যাওয়া গতিপথ ফিরিয়ে তাকে আবার পুরনো ধারায় বহমান করতে আজ, সোমবার কলকাতায় ভারত-বাংলাদেশ যৌথ নদী কমিশনের বৈঠক বসছে।

'বাংলাদেশ থেকে বেরিয়ে নদিয়ার মাজদিয়া হয়ে উত্তর চব্বিশ পরগনার দত্তফুলিয়া-বনগাঁ-বসিরহাটে দু'দেশের সীমান্ত ছুঁয়ে আন্তর্জাতিক মাত্রা পেয়েছে ইছামতী। কিন্তু সংস্কারের অভাবে এই নদী হারিয়ে গিয়েছে নদিয়ার কাছে এসে। কোথাও রেললাইন বসেছে নদীর বুকে, কোথাও বা গড়ে উঠেছে ইটের ভাটা, জনবসতি। হারিয়ে যাওয়া নদী তাই বর্ষার মরসুমে জলমগ্ন করে দেয় বিস্তীর্ণ এলাকা, জলবন্দি হয়ে পড়ে বনগাঁ-বসিরহাটের বিস্তীর্ণ এলাকার মানুষজন। বন্যার জল বেরনোর পথ রুদ্ধ থাকায় সেই জল ভাসিয়ে দেয় বাংলাদেশের এলাকাও।

'এই সঙ্কটের মোকাবিলায় দু'দেশের সরকারি প্রতিনিধি ও নদীবিশেষজ্ঞরা প্রতি বছরই বৈঠক করেন।...

'বনগাঁ বসিরহাটে বন্যার মরসুমে ইছামতীর ভয়াবহতা কমাতে পলিকাটার কাজ শুরু করেছে রাজ্য সরকার। সেই কাজের শ্লথ গতিতে মনিটারিং কমিটির বৈঠকে ক্ষোভ গোপন করেননি অর্থমন্ত্রী অসীম দাশগুপ্ত। ইছামতীর পুরো গতিপথের বাধা দূর করতে যৌথ নদী কমিশনের সাক্ষ্য ছাড়াই যে-ভাবে এখানে-ওখানে খাপছাড়াভাবে নদী সংস্কারের কাজ চলছে, তাতে আপত্তি জানিয়েছে ইছামতী বাঁচাও কমিটিও। সেচমন্ত্রীর কাছে স্মারকলিপি দিয়ে সরকারি কাজে পরিকল্পনার অভাব নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন সেচ দফতরের সরকারি কর্মচারী ফেডারেশনের নেতা মনোজ চক্রবর্তী। তাঁর দাবি, গোটা নদীর পুনরুজ্জীবনে উদ্যোগী না-হলে এই অর্থব্যয় অর্থহীন হয়ে পড়বে।'

বাস্তবিক সরকারি পরিকল্পকদের গাছাড়া ভাব এবং সন্দেহজনক আচরণের সঙ্গে একই অপরাধে অপরাধী রাজনৈতিক নেতাদের দূরদর্শিতার অভাব যুক্ত হয়ে আরো অনেক অনভিপ্রেত অশুভ সমস্যার মতো একটা জলজ্যান্ত নদীর বিলুপ্ত হয়ে যাওয়ার মতো সাংঘাতিক সমস্যার দিকে দেশকে ঠেলে দিচ্ছেন। অথচ প্রায় প্রতি বছরই বর্ষার

আগে খবরের কাগজে এসব নিয়ে লেখালিখি হয়, আমলাদের ছুটোছুটি বাড়ে, মন্ত্রীকে বিবৃতি দিতে হয়, শুরু হয় মাটি কাটা—কিন্তু নদীর অবস্থার তাতে কোনো পরিবর্তন হয় না।

দীর্ঘদিন ধরে নানা অবহেলার জেরে মরতে বসা নদীটির তীরবর্তী বাসিন্দাদের আন্দোলনকে রাজ্য সরকার কখনই তেমন গুরুত্ব দেয়নি। অভিভাবকহীন নদীটির কোনো বেসিন ম্যাপ পর্যন্ত ছিল না। ফলে ইছামতী বলে যে একটা নদী আছে তার কোনো লিখিত প্রমাণ সরকারের কাছে ছিল না। সমস্যা এখন এমন গভীরে পৌঁছেছে যে প্রায় দেউলিয়া হয়ে যাওয়া সরকারের পক্ষে তাকে সামাল দেওয়া আর সম্ভব নয়, ঠিক তখনই টনক নড়েছে রাজ্য সরকারের। ইছামতী নদীকে নিয়ে কী ধরনের চূড়ান্ত অবহেলা এবং সমগ্র জাতির কাছে মানবিক অপরাধের গোপন কাহিনী তৈরি হয়েছে খুব সংক্ষেপে তার একটা তালিকা দেওয়া যাক।

১. ১৮৬৫ খ্রিস্টাব্দে ব্রিটিশ সরকার মাথাভাঙা থেকে চূর্ণী নামের একটা খাল কেটে ইছামতীর জলে ভাগ বসায়।

২. ১৯৪৫ খিস্টাব্দে মাঝদিয়ার পাবাখালিতে ১৮৮ নম্বর রেল সেতু তৈরির সময় নদীতে বোল্ডার ফেলে, বাঁধ দিয়ে মাথাভাঙা নদী থেকে ইছামতীর উৎসমুখ বন্ধ করে দেওয়া হয়। দীর্ঘদিন ধরে পলি জমতে জমতে উৎসমুখের কাছে এমন দশ কিলোমিটারেরও বেশি এলাকা জুড়ে চর পড়ে গেছে।

৩. নতুন যেসব সেতু তৈরি হয়েছে, যেমন, রাখালদাস সেতু, কালিয়ানি সেতু সেগুলো তৈরি করার সময় যে বোল্ডার ফেলা হয়েছিল, তাও তোলা হয়নি।

৪. টিপি, দুর্গাপুর, ডেকুটিয়ায় অবৈধভাবে ইছামতীর জল পাইপ দিয়ে টেনে যে ভেড়ি তৈরি করা হয়েছে, সরকারের উঁচু মহল থেকে শুরু করে পঞ্চায়েত পর্যন্ত জানিয়েও কোনে ফল হয়নি।

৫. নদীর পাশে অসংখ্য ইটভাটা ক্রমশই নদী বুজিয়ে তাদের এলাকা বাড়িয়ে চলেছে। নদী ঘিরে পাটা নিয়ে মাছ ধরার ব্যবসা এবং অপরিসিত সেচের কাজও চলছে রমরমিয়ে। চেষ্টা করেও বন্ধ করা যায়নি এসব। শুধু ভোটের বা গোপন টাকা লেনদেনের রাজনীতি বলে এড়িয়ে যাওয়া যাবে না একে। প্রায় সব পার্টির লোকজন ছাড়াও এমনকী মন্ত্রীদের আত্মীয়স্বজনেরা পর্যন্ত জড়িত এসব ব্যাপারে। ফলে সরকারি টাকা নয়-ছয়ের অনেক উদাহরণের মতো ইছামতী সংস্কারের কাজটাও একটা বড় উদাহরণ হয়ে উঠছে।

শুধু কি টাকা নয়ছয়? উপযুক্ত পরিকল্পনা আর সদিচ্ছার অভাব সংস্কারের কাজ কতটা হাস্যকর করে তুলেছে তার একটা নমুনা হল, ২০০০ সালের বন্যার আগে নদী সংস্কারের দাবিতে বাসিন্দারা বিক্ষোভ দেখালে মাঝদিয়ার পাবাখালিতে মাথাভাঙা চূর্ণী থেকে একটা খাল কেটে ইছামতীর উৎসমুখ খুলে দেওয়া হয়। পরিনামে বনগাঁর চার লক্ষ মানুষ ভয়ঙ্কর বন্যার মুখে পড়েন।

বন্যার পর নদী সংস্কারের কাজ শুরু করতে করতে বর্ষা চলে আসে। মোট ১ কোটি ২৫ লক্ষ টাকা খরচ হয় সেবার। মাঝদিয়া থেকে বনগাঁ পর্যন্ত পাটা তোলা হলেও ঠিক তার পেছন পেছন পাটা পালা দিয়ে দেন ব্যবসায়ীরা। টিলিতে যমুনা ও ইছামতীর সংযোগস্থলে কাটা মাটি নদীর পাড়েই পড়ে থাকে। বর্ষার জলে সেই মাটি ধুয়ে নদীতেই ফিরে যায়। একই জিনিস হয়েছে মাথাভাঙার খালে। সবচেয়ে তাজ্জব ব্যাপার হল, বহু অর্থব্যায়ে যে খাল কাটা হয়েছিল নদীর উৎসমুখ খুলে দেওয়ার জন্য পরবর্তীকালে সেই খালপাড়ে শিবনিবাস ও পাবাখালি গ্রামের মধ্যে একটা সংযোগকারী রাস্তা করতে দেওয়া হয়েছে ওই খালের মধ্যেই মাটি ফেলে। এই রাস্তা উপচে জল আর ইছামতীতে যেতে পারছে না। একই ঘটনা ঘটছে টিপিতে। নদীর তলদেশ থেকে মাটি কেটে সেই মাটি আবার নদীতেই ফেলা হচ্ছে। অন্যদিকে নদীর মোহনা হাসনাবাদ দিয়ে বঙ্গোপসাগরের জল প্রচুর পরিমাণ পলি নিয়ে ঢুকছে ইছামতীতে। পাইপ দিয়ে সেই জল টেনে নেওয়া হচ্ছে ভেড়িতে আর পলি পড়ে থাকছে নদীতে।

দেউলে হয়ে যাওয়া আর্থিক অবস্থা নয়, সর্বব্যাপী শৈথিল্য, ভোট-কুড়ানি রাজনীতি, মতাদর্শগত দেউলিয়াপনা আর চরিত্রহীনতা একটা প্রাণবন্ত, সুন্দর নদীকে তিলে তিলে শেষ করে দিচ্ছে।

সমীর চৌধুরী

সত্যানন্দ, সরকার, বাজার ইত্যাদি

এ বছর মার্চ মাসে হঠাৎ একদিন গভীর রাতে একটি বেসরকারি বাংলা চ্যানেলে চোখ পড়ে যায়। বলা ভালো, মুহূর্তের দৃষ্টিপাতে যা মোটেই গুরুত্বপূর্ণ ছিল না, কানে কয়েকটি শব্দ শুনে থমকে যাই। চ্যানেল আর পাল্টাতে পারছিলাম না। দাড়ি-গোঁফ-জোব্বা-টুপি পরা এক 'আধুনিক' ধর্মগুরু সরাসরি প্রবীর ঘোষ এবং বিজ্ঞানবাদী ব্যক্তিদের 'আতংক্‌বাদীদের মতো শুট্ করতে' (উচ্চারণে অবাঙালি টান এবং হাতে বন্দুকের নল বানিয়ে আঙুল পাকানো লক্ষণীয়!) আদেশ দিচ্ছেন। পাশে এক স্বাস্থ্যবতী মহিলা হাসি হাসি মুখে সায় দিচ্ছিলেন। এসব দেখে রাতে এত উত্তেজিত হয়ে পড়ি, ঘুমোতে পারিনি। তারপর অনেকেই জানেন, ছোটোখাটো আলোড়ন এই ঘটনাকে ঘিরে তৈরি হয়েছিল। ঐ ব্যক্তির নাম সত্যানন্দ, ওরফে প্রদীপ দাস, ঐ মহিলার নাম 'ক্যাপ্টেন' শতাব্দী চ্যাটার্জি। সত্যানন্দ ঐ ঘটনার জেরে গ্রেপ্তার হন, একটি বেসরকারি টিভি চ্যানেল ঐ ঘটনাবলিকে বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে একাধিক অনুষ্ঠান করেন, জরুরি আলোচনা করেন, সংশ্লিষ্ট নানা বিষয় সম্পর্কে অনুষ্ঠানে খোঁজখবরও দেওয়া হয়। একটি দৈনিক পত্রিকায় দীর্ঘ লেখা বেরোয়, প্রকাশিত হয় সম্পাদকীয়। বিভিন্ন মহল থেকে এ বিষয়ে 'সক্রিয়' প্রতিবাদের প্রতিশ্রুতিও দেওয়া হয়—ক্রমশ আবার বিষয়টি থিতিয়ে যায়। এখন, আবার সারাদিন জুড়ে বাংলা চ্যানেলে গেরুয়া বা লাল পট্টবস্ত্র পরিহিত নানা জটাস্টাইল বা কেশকায়দার 'বাবা' (সবাই যে 'বাবা' কেন, সেও এক রহস্য! কাকু, জেঠু, খুড়োও হোক!) বা ছদ্মনামধারী জ্যোতিষীর মিছিল! এখন সবই শান্ত, সবই ভালো!

সমস্যাটা কিন্তু ফেলে দেবার নয়। এসব 'অকিঞ্চিৎকর' ঘটনাকে আমল না দিয়ে আমরা এতকাল 'গভীরতর বিশ্লেষণ' আর 'তত্ত্বকাঠামো'-র নামে যে বিস্তর চুলোচুলিতে মগ্ন থেকেছি তার বিষফল ফলতে শুরু করেছে। নিঃশব্দে পাল্টে যাচ্ছে চারপাশ, নতুন নতুন প্যাঁচে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে ফেলা হচ্ছে সমাজের নানা তলা—বিস্ময়কর নীরবতা পালন করছেন অনেকেই। যা ঘটবার ঘটে যাচ্ছে....।

শুধু বাংলা চ্যানেল নয়, কেব্‌ল টিভির দৌলতে ঘরে ঘরে ঢুকে পড়ছে চব্বিশ ঘন্টা প্রচারমূলক ধর্মীয় চ্যানেল—'আস্থা', 'সংস্কার' কিংবা 'সাধনা'। এইসব 'হিন্দুত্ব' থেকে বাঁচবার কোনো পন্থা নেই, কেননা কেব্‌ল যাঁরা চালান, তাঁদের বারবার বলেও এসব চ্যানেল সরাতে পারিনি। আমাদের 'প্রযুক্তি' 'উন্নতি' 'আধুনিকতা'-র দায় তো

নিতে হবে। কেননা এসব ঠাটজমকের সঙ্গে তো 'বাজার' আছে। ফলে বিক্রি হবার মতো সব কিছুই এখানে ঢালাওভাবে পাওয়া যাবে, আপনার-আমার সেসব 'কিনব না' বলার অধিকার নেই। যে কেব্‌ল-চ্যানেল সন্ধের স্লট-এ 'বাবা তারকনাথ' চালায়, ঐ দিনই ('শিবরাত্রি') গভীরতর রাতে নধর মার্কিনি ব্লু-ফিল্মও চালায়। আমরা দুটিই দেখি।

মুশকিল অবশ্য এটুকুই নয়। ভারত সরকারের বি এস এন এল-এর বিজ্ঞাপন তো সবাই দেখি। একটি মোবাইল ফোন-এর সঙ্গে সেখানে চমৎকার জুড়ে দেওয়া আছে 'এক কুণ্ডলী হ্যায়'। ধর্ম, প্রযুক্তি আর আধুনিকতার এমন মেলবন্ধন (যে মেয়েটির সঙ্গে সম্বন্ধ করা হচ্ছে তার নাম আবার 'পূজা'। বামপন্থী, মার্কিনপন্থী সব নারীবাদীই দেখি এসব ব্যাপারে মুখ খোলেন না। 'ক্ষুদ্র' ব্যাপার!) আমরা বেবাক গিলে চলেছি, 'ধর্মনিরপেক্ষ' সরকারি উদ্‌যোগে। পশ্চিমবঙ্গ সরকারও পিছিয়ে থাকেনি। সাক্ষরতার প্রচারমূলক বিজ্ঞাপনে বর্ণপরিচয় আর শিক্ষাকে চমকপ্রদ মুন্‌শিয়ানায় লোকনাথবাবার সঙ্গে মিলিয়ে দেওয়া হয়েছে। প্রায়শই নানা চ্যানেলে দেখি আর কপাল চাপড়াই। এসব ক্ষেত্রে বাম-দক্ষিণ কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে প্রগতিশীলতার শবদেহ বহন করছে। জমাটি ব্যাপার আরো আছে। 'হাচ্'-এর মোবাইলে আপনি 'হরোস্কোপ' টাইপ করে হাই-টেক জ্যোতিষীদের পরামর্শ পেতে পারেন, সারা শহর জুড়ে দিকে দিকে সাইনবোর্ডে বিভিন্ন স্বঘোষিত 'খাঁটি' (কিছুদিন পর নিশ্চয়ই ISI ছাপমারাও থাকবে!) ধর্মগুরুর বিজ্ঞাপন, বিভিন্ন ধর্মগুরুর সম্মেলন-মোচ্ছবের মিছিল, তাদের তৈরি ইশকুলের রবরবা (সেগুলি সবকটিই ইংরেজি মাধ্যম!), প্রায় প্রত্যেক (দু-একটি উজ্জ্বল ব্যতিক্রমও আছে) দৈনিক পত্রিকায় 'আপনার আজকের দিন', রাশিচক্র.....। বেশ কিছু 'আধুনিক' পাঠ্যক্রমে (কয়েকটি তো সরকার স্বীকৃত, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের যৌথ উদ্‌যোগে পরিচালিত!) স্পষ্টত ধর্ম, ধর্মগুরু, ধর্মমাহাত্ম্যের বন্দনা। দৃষ্টান্ত না দিলে আবার সরকারি লোকজন বলে, 'তথ্য নেই, সব বানানো!' এই ধরুন, 'সমীক্ষণী'-র মনোবিদ্যা পাঠ্যক্রম, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে এঁরা সন্ধের পর ক্লাস করেন। 'আধুনিক' চিকিৎসার নামে পাঠ্যক্রমে ('ধর্মনিরপেক্ষ' দেশে এসব সম্ভব!) কী কী আছে সংশ্লিষ্ট বিদ্বৎসমাজকে একটু দেখতে বলব। অবশ্য ঘুমন্ত ব্যক্তিরা কি জাগেন কখনো?

সত্যানন্দের ঐ ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে গায়ক নচিকেতা একটি টেলিভিশন সাক্ষাৎকার দেন, যাতে তিনি একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় উত্থাপন করেন। তাঁর বক্তব্য ছিল এই যে, যখন তিনি প্রথম যৌবনে বামপন্থী সাংস্কৃতিক আন্দোলন করতেন, সারকারিনায় 'অশ্লীল' নাটক বন্ধ করার প্রয়াসে উদ্‌যোগী হতেন, তখন সমান্তরাল ধর্মভণ্ডামি-বিরোধী আন্দোলন ছিল—এখন সেসব কোথায়? দ্বিতীয়ত, কোনো ব্যক্তি কি টেলিভিশনে গণতন্ত্রের দোহাই দিয়ে কোনো স্লট কিনে আর-ডি-এক্স বিস্ফোরণের প্রশিক্ষণ দিতে পারে? দু'ক্ষেত্রেই উত্তর হয়তো একই রত্নপেটিকায় বন্ধ আছে। যার নাম ব্যালট-বাক্স। বামফ্রন্টের কোনো শরিকদলই এসব 'সামান্য' বিষয়ে কোনো মন্তব্য করে না। পাছে গদি হাতছাড়া

হয়ে যায়। 'আন্দোলন' তো অনেক দূরের কথা। তারওপর মেজো, সেজো বামনেতাদের হাতে ধারণের আংটি আর শরীরের নানা আবৃত অংশে মাদুলি-তাবিজের ছড়াছড়ি। (একদিন আচমকা উলঙ্গ প্যারেড করালে অনেক অজানা তথ্য ফাঁস হতে পারে। কতশত 'ভৌগোলিক-সাংস্কৃতিক' ভুল!)

অন্যদিকে বাজারপন্থী প্রগতিশীলেরাই বা কম কী! তাঁরা মুক্তবাজার অর্চনা আর মার্কিনলেজুড়বৃত্তির পাশাপাশি আজও ছবিসহ ঐ সত্যানন্দের বিজ্ঞাপন ছেপে চলেছেন। কেননা, মুনাফার আনন্দ তো ধনতন্ত্রের মূলকথা, তার 'নৈতিক' দায়িত্ব কোথায়? এঁরা ফলাও করে বিভিন্ন ধর্মগুরুর গুণকেত্তন ছাপেন, সম্মেলনের প্রতিবেদন প্রকাশ করেন, গুজরাটে ভূমিকম্প হলে তহবিল খোলেন, গুজরাটে সংখ্যালঘুদের ধর্মের নামে কোতল করা হলে আর্তমানুষকে 'সেবা' করতে ট্যাঁ-ফোঁ করেন না।

আসলে, সরকার বলুন, রাজনৈতিক দল বলুন, বাণিজ্যিক সংস্থা বলুন, সকলেই 'ধর্ম'-এর সঙ্গে একটা সমঝোতা তৈরি করতে চেয়েছে। ও ব্যাপারে নীরব থেকে কাজ হাসিল করাটাই এদের লক্ষ্য। কত শত সহস্র তরুণ-তরুণী সন্তোষী মা-র উপোস করে কম্পিউটার কোর্স-এ অংশ নিচ্ছেন—তা তারা সম্যকভাবে জানে। ভোটচক্রে ভগবান, ভূত সবই মানতে হয়, মাল বেচতে একটু-আধটু 'কুসংস্কার'-কে প্রশ্রয় তো দিতেই হবে। সত্যানন্দ সাময়িক ঝামেলা কাটিয়ে উঠে আবার তীব্রতর ভাষায় (রাষ্ট্রের ভাষায়!) মার্কস, লেনিন, বা ফিদেল কাস্ত্রোকে 'আতংক্বাদী' হিসেবে শনাক্ত করলে অবাক হব না!

পুনশ্চ : সত্যানন্দবাবাজি তাঁর সাধন সঙ্গিনী সমেত 'আমার চ্যানেল'-এ ইদানীং ফের জাঁকিয়ে বসেছেন!

আনন্দ বর্ধন

দ্বিখণ্ডিত

মুসলিমদের ধর্মীয় ভাবাবেগে আঘাত দিয়েছে, এই কারণ দেখিয়ে তসলিমা নাসরিনের *দ্বিখণ্ডিত* বইটি নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। এখন প্রশ্ন তোলা যেতে পারে : হিন্দুদের ধর্মীয় ভাবাবেগে আঘাত দিয়ে যদি কোনো বই প্রকাশিত হয়, এবং হিন্দুদের তরফ থেকে যদি সেই বইটি নিষিদ্ধ করার দাবি ওঠে, তবে সেই বইটিও কি নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হবে? খ্রিস্টানদের ক্ষেত্রেও কি একই ব্যবস্থা নেওয়া হবে? বৌদ্ধদের ক্ষেত্রে? জৈনদের ক্ষেত্রে? শিখদের ক্ষেত্রে? বছর কয়েক আগে দেবী সরস্বতীর নগ্ন ছবি এঁকে মকবুল ফিদা হুসেন হিন্দুদের ধর্মীয় ভাবাবেগে আঘাত দিয়েছিলেন। যার ফলে হিন্দুধর্মের ধ্বজাধারীরা হুসেনের স্টুডিওতে হামলা চালিয়েছিল। সেই সময় সেইসব বাঙ্গালি কবি-লেখকের কী ভূমিকা ছিল, যাঁরা নাসরিনের *দ্বিখণ্ডিত* বইটি নিষিদ্ধ করার জন্য মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যকে পরামর্শ দিয়েছিলেন? তাঁরা কি হিন্দুদের ধর্মীয় ভাবাবেগে আঘাত দেবার জন্য হুসেনের নিন্দায় মুখর হয়েছিলেন? নাকি তাঁরা হুসেনের সমর্থনে পথে নেমেছিলেন? যদি তাঁরা দ্বিতীয়টিই করে থাকেন, তবে তাঁরা কি মনে করেন যে হিন্দুদের, বা অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের, ধর্মীয় ভাবাবেগে যথেচ্ছ আঘাত করা চলতে পারে, কিন্তু মুসলিমদের ধর্মীয় ভাবাবেগে কখনোই আঘাত করা চলবে না? মহম্মদের নিন্দা হওয়ায় *দ্বিখণ্ডিত* বইটি নিষিদ্ধ হল। বুদ্ধের নিন্দা হলে, যিশুর নিন্দা হলে, কৃষ্ণের নিন্দা হলে, রামের নিন্দা হলে বা রামকৃষ্ণের নিন্দা হলেও কি একই ব্যবস্থা নেওয়া হবে—যদি তাঁদের ভক্তদের দিক থেকে অনুরূপ দাবি ওঠে? আবার, ধর্মীয় ভাবাবেগে আঘাত না দিয়ে যদি অন্য কোনো ভাবাবেগে আঘাত দেওয়া হত, তবে সেক্ষেত্রেও কি বইটি নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হত? এই যেমন, রবীন্দ্রনাথ অনেক বাঙালির কাছে ঈশ্বর না হলেও ঈশ্বরপ্রতিম। সেই রবীন্দ্রনাথকে ঘিরে বহু বাঙালির এক বিশেষ ধরনের ভাবাবেগ রয়েছে। তাঁদের সেই ভাবাবেগ রীতিমতো পীড়িত হয় যখন তাঁরা সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের এই কবিতার পঙ্‌ক্তিটি পড়েন :

তিন জোড়া লাথির ঘায়ে রবীন্দ্র-রচনাবলী লুটোয় পাপোশে।

রবীন্দ্র-রচনাবলী সম্বন্ধে অত্যন্ত কুৎসিত এই ভাষা-প্রয়োগ মেনে নিতে না পেরে রবীন্দ্র-ভক্তেরা যদি কোনোদিন দাবি তোলেন হয় সুনীলকে তাঁর কাব্যগ্রন্থ থেকে এই পঙ্‌ক্তিটি বাদ দিতে হবে, নতুবা তাঁর কাব্যগ্রন্থটি নিষিদ্ধ ঘোষণা করতে হবে, বামফ্রন্ট সরকার রবীন্দ্র-ভক্তদের সেই দাবি মেনে নেবে তো?

তাছাড়া, কমিউনিস্টদের তো আমরা চিরটাকাল নাস্তিক, ধর্মহীন, ধর্মবিরোধী বলেই জেনে এসেছি। তাঁরা আবার কবে থেকে ধর্মের রক্ষক হয়ে উঠলেন? মার্ক্সের নিন্দা হলে, স্টালিনের নিন্দা হলে, বা কমিউনিস্টদের নিন্দা হলে, তাঁদের গায়ে ফোস্কা পড়তে পারে। কিন্তু কোনো ধর্ম-প্রবর্তকের নিন্দা হলে তাঁদের গায়ে ফোস্কা পড়ে এ তো ভাবাই যায় না। আর তাঁরা তো মানুষকে ধর্মীয় মূঢ়তার কবল থেকে উদ্ধার করবার জন্য ঐতিহাসিকভাবে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ ছিলেন। তাহলে তাঁরা কিছু মানুষের ধর্মীয় মূঢ়তাকে অযথা প্রশ্রয় দিচ্ছেন কেন? সেটা কি মুসলিমদের ভোট-ব্যাঙ্ক হারাবার ভয়ে?

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় এক্ষেত্রে একটি অদ্ভুত কথা বলেছেন। 'ইসলামে পয়গম্বর সম্পর্কে, তাঁর ব্যক্তিগত চরিত্র নিয়ে কোনো কথা বলা নিষিদ্ধ। তাঁর ছবি ছাপা নিষিদ্ধ। এটা ভাল হোক, মন্দ হোক, সমাজের স্বার্থে এটা তোমাকে মেনে নিতেই হবে। অনেক মানুষের বিশ্বাস নিয়ে খেলা করা চলে না।' (আজকাল, ৯ ডিসেম্বর, ২০০৩) কেউ কেউ এমনও বলেছেন যে, মুসলিমরা আল্লার নিন্দা শুনতে রাজি আছে, কিন্তু মহম্মদের নিন্দা হলে সাচ্চা মুসলিম রক্তগঙ্গা বইয়ে দেবে। তাহলে দেখা যাচ্ছে একজন মুসলিমের কাছে আল্লার মহিমার চেয়েও পয়গম্বর মহম্মদের মহিমা অনেক বেশি। কিন্তু কেউ কি কোনো মানুষের নাম করে এরকম কোনো ফতোয়া জারি করতে পারে যে, সেই মানুষের নামে কোনো সমালোচনা করা যাবে না, এবং আমাদের সেই ফতোয়া মেনে চলতে হবে? এটা তো মানুষের ব্যক্তিস্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ। বাঙালি রবীন্দ্রভক্তরা যদি রবীন্দ্রনাথের নাম করে কোনোদিন এরকম কোনো ফতোয়া দেন যে, রবীন্দ্রনাথের নিন্দা হলে ধোলাই খাবে, পেটাই হবে, তবে সুনীল কি সেই ফতোয়া মেনে নিয়ে যাবতীয় রবীন্দ্র-সমালোচনা বন্ধ করে দেবার কথা বলবেন? কেননা, এই ধরনের ফতোয়া যাঁরা দেন, তাঁরা যথার্থ সমালোচনা আর নিন্দার মধ্যে কোনো ফারাকই করতে পারেন না, তাঁরা যে-কোনো সমালোচনাকেই নিন্দা ধরে নেন। আজ যদি গান্ধীভক্তেরা গান্ধীর নাম করে ফতোয়া দেন, রামভক্তেরা রামের নাম করে, কৃষ্ণভক্তেরা কৃষ্ণের নাম করে, যিশুভক্তেরা যিশুর নাম করে, বুদ্ধভক্তেরা বুদ্ধের নাম করে, মহারাষ্ট্রের শিবাজীভক্তেরা শিবাজীর নাম করে দেন, তবে সেইসব ক্ষেত্রেও কি আমাদের ঐ সব ফতোয়া শিরোধার্য করে চলতে হবে? কোনো মানুষ, বা কোনো ধর্ম, কোনো রাজনৈতিক দল, বা রাষ্ট্র কি এইরকম কোনো ফতোয়া জারি করে অন্য মানুষের স্বাধীন ভাবনার গতিকে রুদ্ধ করে দিতে পারে? যদি পারে, তবে সে কোন্ অধিকারে পারে? এই অধিকার কে তাকে দিল? অন্যের জীবন, অন্যের ভাবনাকে নিয়ন্ত্রণ করায় তার অধিকার রয়েছে—এটা কীভাবে সাব্যস্ত হল? এই অধিকারের উৎস কোথায়? বা, এই অধিকার কতখানি নিরংকুশ? পয়গম্বর মহম্মদ স্বয়ং কি কোরানে এরকম কোনো নির্দেশ দিয়ে গেছেন যে, যদি কেউ তাঁর নামে কোনো সমালোচনা করে, বা তাঁর ব্যক্তিগত চরিত্র নিয়ে কোনোরকম কটাক্ষ করে,

তবে তাকে সঙ্গে সঙ্গে কোতল করতে হবে? বা তাকে পেটাতে হবে? যদি মহম্মদ না দিয়ে থাকেন, তবে তাঁর নাম করে এই অদ্ভুত নির্দেশ কে দিল? এই পৃথিবীতে সবাই অবাধে সবার সমালোচনা করতে পারবে, এমনকি আল্লা বা ঈশ্বরেরও সমালোচনা করতে কোনো বাধা নেই, শুধু একমাত্র পয়গম্বর মহম্মদকে নিয়েই কোনোরকম কথা বলা যাবে না; করলেই মার খেতে হবে, বা বই নিষিদ্ধ হবে; এটা তো অদ্ভুত কথা।

একজন বিদেশি লেখক শিবাজীর নামে কিছু অপ্রিয় সত্য তাঁর গ্রন্থে প্রকাশ করায় কট্টর শিবাজীভক্তেরা পুনের ভান্ডারকর ইনস্টিটিউটে হামলা চালায়, কেননা ঐ হামলাকারীদের সন্দেহ ছিল যে ভান্ডারকর ইনস্টিটিউটে গবেষকেরাই বিদেশি লেখককে শিবাজী সম্পর্কে তথ্যের যোগান দিয়েছিলেন। সুনীল এই হামলা সম্পর্কে কী বলবেন? তিনি কি এই হামলার নিন্দা করবেন, বা করেছেন? যদি করে থাকেন, কেন করেছেন? কেননা এখানেও তো সুনীলের ভাষ্য অনুযায়ী অনেক মানুষের বিশ্বাস নিয়ে খেলা করা হয়েছে। তাহলে, কোন মানুষের কোন বিশ্বাস নিয়ে খেলা করা চলবে, আর কোন মানুষের কোন বিশ্বাস নিয়ে খেলা করা চলবে না, সেটা কীসের ভিত্তিতে নির্ধারিত হবে?

সুনীলের যুক্তি আরও একটি কারণে আদৌ সমর্থনযোগ্য নয়। ইউরোপেও এককালে বাইবেলের বিরুদ্ধে বা চার্চের বিরুদ্ধে কথা বলার অধিকার কারও ছিল না। সেই নিষেধাজ্ঞা অমান্য করলে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই শাস্তি ছিল মৃত্যু। তা, সুনীলের কথামতো ইউরোপের মানুষ যদি চার্চ-কর্তৃপক্ষের সেই নিষেধাজ্ঞা অক্ষরে অক্ষরে মেনে চলতেন তাহলে আধুনিক ইউরোপের জন্ম কি আদৌ হত? তাহলে আমরা কেন মুসলিমদের জন্য মধ্যযুগের অন্ধকারকেই চিরস্থায়ী করে রাখতে চাইছি?

উদয়ভানু চিত্রকর

পাঁচিলের এপার-ওপার

গবেষণা সূত্রে আমি বেশ কতকগুলি কেন্দ্রীয় সংশোধনাগারে বা পরিচিত ভাষায় জেল ঘুরেছি টানা চার মাসেরও বেশি সময় ধরে। নানা অপরাধের, নানা চরিত্র ও বয়েসের কয়েদি দেখেছি খুব কাছ থেকে। অজস্রবার কানে এসেছে 'কবে ছাড়া পাব', 'আমি নির্দোষ', 'ফাঁসানো হয়েছে', 'পুলিশ রিপোর্ট চার্জশিট সব চক্রান্ত' 'গরিবেরই শাস্তি হয়'—ইত্যাদি।'

একদিন দুপুরে আলিপুরে বসে কাজ করছি। সময়টা 'ইন্টারভিউ'-এর অর্থাৎ কয়েদি মানুষদের পরিজন এসেছে তাঁদের বাড়ির হতভাগ্য মানুষটাকে চোখের দেখা দেখতে—দু'টো কথা বলতে, কিছু খাবার দিতে। প্রচুর গণ্ডগোল, চিৎকার, চেঁচামেচি, হৈ-হল্লা—মাইকে নাম ঘোষণা। কিন্তু সবার গলা ছাপিয়ে উঠছে একটা বাচ্চার গলা—'বাবা-বাবা-বাবা'—আর মা তার চেয়েও জোরে ছেলেটাকে ধমকাচ্ছে, মারছে। কি অদ্ভুত পরিস্থিতি! একদিকে ছেলেটার আবেগ অন্যদিকে মাথায় আকাশ ভেঙে পড়া সহায়সম্বলহীন এক অসহায় মহিলার শিষ্টাচার বজায়ের চেষ্টা। ভাবছিলাম, শাস্তিটা কার? শাস্তি হচ্ছে কোথায়?

হালফিলে পাঁচিলের ভেতরে থাকা মানুষদের জন্য অসীম সাহস আর উৎসাহ নিয়ে এগিয়ে এসেছে 'স্বজন' নামে এক স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা। এদেরই সহযোগিতা আর সহায়তায় উৎসাহ পাওয়া বেশ কিছু বন্দী মানুষের স্ত্রী-পুত্রের সঙ্গে কথা হয়েছিল আমার। এসব উৎসাহী, উদ্দীপ্ত মহিলাদের মধ্যে একজনের কথাই বলি—ধরুন, তার নাম মিতালি মণ্ডল। শ্বশুর নেই, দেওর নেই, স্বামী-শাশুড়ি পাঁচিলের ওপারে। মিতালির এক মেয়ে, এক ছেলে। বাড়ি এক প্রত্যন্ত গ্রামে। সামান্য লেখাপড়া জানা সাতাশ বছরের এক বিবাহিতা মহিলা। স্বজনহারা এই মহিলার ঠিকানায় যখন স্বজন এসেছিল তখন মিতালি লজ্জা ঢাকতে ছেঁড়া মশারি জড়িয়ে ঘর থেকে বেরিয়েছিল। স্বজন তাঁকে দিয়েছিল একটি সেলাই মেশিন। মিতালি যুদ্ধ করেছে, জয়ী হয়েছে কি না বলতে পারব না, তবে লড়াই করে পায়ের তলায় জমিটা খুঁজে পেয়েছে।

এবার ওর পরিস্থিতি আর সিদ্ধান্তগুলো দেখা যাক। মিতালির মেয়ে বয়সে বড়, ছেলে ছোট। বিয়ে হয়েছিল দেখাশুনা করে। বাবা জানতেই পারেননি তাঁর জামাই স্ত্রীহন্তা। শুধু জানতেন প্রথম পক্ষের স্ত্রী মারা গেছে। বিয়ের কিছুদিনের মধ্যেই কোর্ট আর উকিলের চিঠিপত্র আসা-যাওয়ার ফলেই মিতালি জানতে পারে স্বামীর আগের

পক্ষের মৃত্যু স্বাভাবিক নয়। কেস চলে, বছর ঘোরে। মিতালির এক নয়, পরপর দুটো সন্তান জন্মায়। কিছু পরে বিচার শেষে শাশুড়ি আর স্বামীর কারাবাস। যাবজ্জীবন নয়, এইটুকুই ভরসা, কিন্তু চারপাশে অন্ধকার। সে ভিটে ছেড়ে যায়নি, বাবার গলগ্রহ হয়নি, আত্মহত্যা করেনি, হাতে ছিল সেলাই মেশিন। কিন্তু ছেলে-মেয়ে? বাবার কাছেই ছেলে মানুষ হবে, এই দায়ভার বাবাকেই নিতে হবে। কিন্তু মেয়ে থাকবে তার কাছে। মেয়েকে সে স্কুলে পড়াচ্ছে। পর পর সাতটা ক্লাসে ফেল করেনি। মিতালির শপথ 'মেয়েকে ভালভাবে শিক্ষিত করবই—খাওয়া জোটে ছাই নাই জোটে।' পুরুষশাসিত সমাজে মিতালি ছেলেকে দিল বাপের কাছে আর 'উইমেন এমপাওয়ারমেন্টে'র সেমিনারে না গিয়েও 'উইমেন লিভ' আন্দোলনের কথা না জেনেও কাছে টেনে নেয় মেয়েকে। শপথ নিয়েছে মেয়েকে শিক্ষা দেবে, সম্মান নিয়ে রোজগার করতে শেখাবে। আত্মনির্ভর করবে।

মিতালির সিঁথিতে উজ্জ্বল সিঁদুর, মাথায় ঘোমটা, হাতে শাঁখা। জিজ্ঞাসা করলাম, 'আপনার স্বামীকে দেখতে যান?' হাসি মুখে বলল, নিশ্চয়ই। কেন যাব না, সেই তো আমার স্বামী। আর স্বামী যতই হারামি-ঢ্যামনা হোক না কেন, তবু ঐ আমার স্বামী।

তবে সবাই মিতালি নয়, বেশিরভাগ মহিলাই আজ শুধুমাত্র বাঁচার তাগিদেই জীবনকে এলোমেলো করে ফেলেছে। মিতালির চেনা আছে অনেক মহিলাকেই যাঁরা আজ একজন পুরুষের সঙ্গে এলে অন্যদিন আসে আর একজনের সঙ্গে। কাউকে বলে দেওর, কাউকে পাড়ার দাদা। এসব মহিলার সাজপোশাকই আলাদা, ঠোটে লাল লিপস্টিক।

সে দেখেছে সাত বছরের শিশুকে নিয়ে ঠাকুমা পাঁচিলের ধারে কাঁদছে। বলছে, ওর মা বাড়ি থেকে পর মানুষের কাছে চলে গেছে, ছেলেটাকে ফেলে গেছে আমার কাছে, বাপটা তো পাঁচিলের ওপারে।' এটাই সাধারণ ছবি।

এই ছবি বদলাতে প্রথমেই প্রয়োজন বাস্তব পরিকল্পনা আর সরকারি সাহায্য (আর্থিক নয় মানবিক)। আসুন, বিভিন্ন সমাজসেবী সংস্থার কর্মীরা, সামাজিক কর্মীরা, সমাজবিজ্ঞানের ছাত্র-ছাত্রী আর গবেষককুল তথা উদারমনস্ক ব্যক্তিরা—সবাই মিলে সরকারি অনুমতি নিয়ে গড়ে তুলি এক মঞ্চ। এর কাজই হবে পশ্চিমবাংলার সমস্ত কেন্দ্রীয় সংশোধনাগারে সাজাপ্রাপ্ত বন্দিদের পারিবারিক ঠিকানা, সদস্য সংখ্যা, আর্থিক অবস্থার পরিসংখ্যান লিপিবদ্ধ করা এবং তারপর এই পরিবারগুলোর সঙ্গে প্রত্যক্ষ সম্পর্ক গড়ে তোলা। এঁদের দিকে তাকাবার প্রয়োজন আছে। সমাজের বৃহত্তর স্বার্থে প্রয়োজন এই ছিন্নমূল পরিবারগুলোকে সমাজের মূলস্রোতে ফিরিয়ে আনার।

সঞ্জয় মুখোপাধ্যায়

আঁখো-দেখা হাল

লেখা বলতে কী বুঝি? ছবি বলতেই বা কী বুঝি? আদপেই কিছু বুঝি কি? আর বুঝতে যাবই বা কেন? কীসের দায়? কার কাছে দায়? যা যা না বুঝেই যদি কিছু মানুষ, আমরা (অবশ্য সংখ্যাতত্ত্ব দিয়ে মাপলে 'কিছু' থেকে 'প্রচুর' হতে বেশি সময় লাগবে না নিশ্চিত) একটা একটা জীবন কাটিয়ে দিতে পারি, দোষ কী? তাই আমাদের দোষ নেই, রোষও নেই।

বুঝতেই যদি হয়, তবে বুঝতে হবে কীভাবে সচ্ছল থাকা যায়, কীভাবে রোজগার বাড়াতে হয়, কীভাবে ফ্ল্যাট কেনা যায়, কীভাবে টিকে থকা যায়, কীভাবে অনেক কিছু কেনা যায়, কীভাবে কীভাবে কীভাবে....!!!

এটা বুঝতেই যদি এক জীবনের অনেকটা সময় কাটিয়ে দেওয়া যায়, তখন কিন্তু সত্যি সত্যি অনেক কিছু না বুঝলেও চলবে।

বিক্রেতা অধ্যুষিত বাজারে আজ আর ভাবার সময় নেই। পুরোনো কাসুন্দির মতো সময় কোথায় সময় নষ্ট করবার? ক্রেতারা যেখানে ধুঁকছে, ফিরিওয়ালারাই দায়িত্ব নিচ্ছেন তাঁদেরই সর্বস্ব (!) দিয়ে ক্রেতাকুলকে বাঁচিয়ে রাখার। বলছেন অবশ্য, ক্রেতা আছেন বলেই আমরা ভরসা পাচ্ছি, তাই জোগান দিচ্ছি। সেই চিরাচরিত দ্বন্দ্ব, তাই না! হাঃ! তাই আমরা Loan-এ আছি, Lonely আছি। আরও আছি টিভির কাছাকাছি, কোমরে বেঁধে শক্ত কাছি, সব মিলিয়ে দারুণ আছি!

কী দায় তবে 'লেখা' বেঝার? কেন দায় তবে 'ছবি' বোঝার? আমাদের অভিধানে এখন নতুন নতুন শব্দ আছে, আছে emi, আছে ভাট, থুড়ি ভ্যাট, আছে ছ'হাজারের ওপর মাসমাইনে হলেই ঘেরা আবাসনে swimming pool (আচ্ছা, এর বাংলা কী?), আছে ring tone, আছে mothers day, আছে গলানো সোনার মতো ভরা বুক conditions apply, আছে ramp, আছে, আছে, আছে....টাইম লাগে না। (আর হ্যাঁ, কীভাবে হাঁটবেন তাও যে শিখতে হবে), ...না আছে আলাদা করে খোলা আকাশের তলায় rampart, না আছে সেলাই শেখার স্কুল (বদলে পাবেন boutique, fabric—আচ্ছা এ থেকেই কি fabricate-এর জন্ম?), না আছে শৈশব, না আছে দুঃখ, না আছে মৃত্যু...তাই তবু বিরহদহন লাগে কি না বুঝি না। তবু শান্তি, তবু আনন্দ? তবু অনন্ত....?

হুম্।

জানি না, সত্যি জানি না। জানেন সম্পাদক মহাশয়, ব্রহ্মাও জানেন হয়ত।

কথাগুলো আলোচনা হচ্ছিল, ভাবা হচ্ছিল, বোঝার চেষ্টা করা হচ্ছিল অবশ্য সম্পূর্ণ ভিন্ন এক প্রেক্ষিতে। ছবি, অর্থাৎ সিনেমা (painting নয়) দেখা, ছবি দেখানোর পদ্ধতি, পুরাকালে (যদিও একশো বছরের বেশি ওধারে টপকায়নি এখনও) দেখানোর পদ্ধতি, আধুনিকতার ছত্রচ্ছায়ায় (নাকি multiplex-এ) কী পদ্ধতি, মিনার-বিজলী-ছবিঘর—এদের ধরন, নন্দন (সর্বপ্রথম এবং অকৃত্রিম, না খেতে খেতে বিশ্রামহীন অবিরাম ছবি দেখার সুযোগ যে multiplex)-এর পদ্ধতি এবং এর থেকে উদ্ভূত উত্তর-আধুনিক সময়ে ছবি দেখার পদ্ধতি কী হবে বা হতে পারে...এই সব।

আচ্ছা, 'লেখা' পড়ার পদ্ধতি কি বদলেছে? পুঁথি থেকে encarta-এ তো হাজার হাজার বছর ধরে নাটোরের বনলতা সেনের মতো হেঁটেই চলেছে, চলবেও। তালপাতাতে লেখা হলেও পড়া হত, maplitho-তে ছাপা হলেও পড়া হয়, আবার টুক্ করে চিপ্ করে বৈঠকখানায় (উফ্, drawing room) গ্রন্থাগারে (ধুস্, বললাম না Library) desktop-এ (বাঃ, এবার ঠিক হয়েছে) টুপটাপ ঝরে পড়লেও পড়া হচ্ছে। আরে পড়ছে তো রে বাব্বা! সব্বাই লেখাপড়া না শিখলে কি দেশ গোল্লায় যাবে? গেছে কি এতদিনে? যারা পড়ার তারা ঠিকই পড়ছে, খোঁজ রাখলেই হয়। আচ্ছা, পাঠকের TRP নেই? এই তো, এখানেই যে 'লেখা'র সঙ্গে 'ছবি'র অন্যতম ফারাকটা আবার চোখের সামনে চলে এল। অক্ষরজ্ঞান না থাকলেও, বর্ণমালা না জানলেও যে ছবি দেখা যায়, শুধু পটে লিখার পটের মতো একটা canvas থাকলেই তো হয়। এই, আর যদি 'চোখ'ই না থাকে? তবে আর কি, Black-এর সামনে Blackout.

আচ্ছা বেশ, এত কচকচানির দরকার নেই, এ কূলের আছে অক্ষরজ্ঞান, ও কূলের আছে দৃষ্টি—না না, চোখ, শুধু চোখ। তবে অনেক অনেক রকমের চোখ। সাদা চোখ, কালো চোখ, রোগা চোখ, মোটা চোখ, হলুদ চোখ, লাল চোখ, রাম চোখ, শ্যাম চোখ, হাঁদা চোখ, ভোঁতা চোখ, ধূর্ত চোখ, সরব চোখ, নীরব চোখ। খোলা চোখ, বোজা চোখ। বেশ, এ সব মিলিয়েই দেখুক না হয়। তবু দেখুক। যত লোক পড়বে, তার থেকে বেশি, অনেক বেশি তো দেখবে রে বন্ধু। তবেই না এর এত সাহস, তবেই না কয়েক হাজার বছরের ছোট হওয়ার এতটুকু লজ্জা না রেখেও কী স্পর্ধিত রূপে ভরিয়ে দিয়েছে ভুবন। আমার তোমার সবার ভুবন। কী মধুর মধুর রূপ ধারণ করে—হেরো হে কখনও মিনার-এ (এরাই কিন্তু mainstream, সাবধান, শাখা-প্রশাখা নয়), কখনও নন্দনে (এদের নাকি 'এখানেই জন্ম, এখানেই মৃত্যু'—কৃতজ্ঞতা শ্রী সুমন চট্টোপাধ্যায়), কখনও সুশোভিত ছত্রচ্ছায়ায় (multi-তে টিকিটের সঙ্গে coke, chips, উম্‌ম্....ক'দিন পর টিকিটের লটারিতে 'ভরসা' free পেয়ে যাবেন)। এমা, এখানে শেষ না যে, এই তো ভোল সামান্য পাল্টে কত শত করুণাধারার মতো টিভিতে (হোক না পর্দায় ছোট), চার-পাঁচটা channel-এ শুধু ৫২টা রবিবার ধরে ২০০র ওপর সংখ্যা, তার ওপর 'ফিরসে দিখাও' তো আছেই।

অনুচ্ছেদ : ছোটবেলায় 'দীপ্তি' হলটা চালু ছিল। 'প্রদীপ' তো এখনও আছে। দীপ্তিতে দু'বন্ধু আলাদা আলাদা টিকিট কাটায় ওপর-নিচ হয়ে গিয়েছিল। কি আর করা, ওপরে বেশি পয়সা দেওয়া বন্ধু দেরিতে ঢোকায় আরও বেশি দুঃখ। ঢুকেই সে হাঁক পাড়ে নিচেঃ তু আ গয়া কেয়া? ম্যায় তো আভি ঘুঁসা। নিচ থেকে উত্তর আসে, আরে, তু তো এক বড়িয়া সিন মিস কিয়া রে! উম্‌ম...আ হা হা। (কি আক্ষেপ! আচ্ছা, তখন কি একান্ত গোপনে কিছু..., নাকি বুক ভরা কিছু...)।

নিচ: আব তেরে কো ক্যা ফায়দা রে?

ওপর: ফিরসে দিখা না। (চিৎকার) ফিরসে দিখাও।

(হল জুড়ে কোরাস : ফিরসে দিখাও)

তো, যে কথা হচ্ছিল। ফিরসে দিখালে আবার ৫২×৪-৫টা শনিবার। তার সঙ্গে আবার এত টেলিফিল্ম ছাড়াও বিভিন্ন ফিক্‌শন। (না-না, ফিক্ করে হাসার মতো নয় সবগুলো) থরে থরে সাজানো হচ্ছে। সাজানো চলছে, চলবে। হরেক রকম, হরেক ভাবে। শুধু দেখে যাও। হরেক রকম চোখের জন্য সাজা-পর্ব চলছে, চলুক 'দেখা'ও তবে। চোখ বন্ধ করলে খেলব না বলে দিলাম।

সঞ্জয় ঘোষ দস্তিদার

আর এক 'তোতাকাহিনী'

যেটা সব চাইতে দুঃখের বিষয় তা হলো বাঙালি মধ্যবিত্তের শিরদাঁড়া গত আটাশ বছরে ক্ষয়িষ্ণু হতে হতে এখন আর নেই বলা যেতে পারে। যাঁদের এখনো একটুও আছে তাঁদের কপালে অশেষ দুঃখ। আইডিয়লজি বা রাজনৈতিক মতাদর্শ আজ একটি নেহাৎই ছেঁদো কথা। আজ মনে হয় বাঙালি মধ্যবিত্ত একসময় অবস্থার চাপে পড়েই বোধহয় বামপন্থী হয়েছিল। দেশভাগ, দেশত্যাগ ও ভঙ্গুর অর্থনৈতিক অবস্থার অসহায়তায় দেওয়ালে পিঠ ঠেকে গিয়েছিল তাঁদের। তার সঙ্গে মিশেছিল কল্পনার আতিশয্য। বাঙালি রোম্যান্টিকতা নিয়ে ভারতের ও বিদেশেও হাসাহাসি হয়। বাঙালি মধ্যবিত্ত (মনে রাখবেন আমি কোথাও মধ্যশ্রেণী বলছি না) চাকুরিজীবী মনুষ্যগণ 'বিপ্লব'টা বুঝে গেছেন। ১৯২৫ সালে কম্যুনিস্ট পার্টির জন্ম সাল যদি ধরে নেওয়া হয় তাহলে ২০০৫ সালে ৮০ বছর বয়স হলো তার। কেরলে কম্যুনিস্ট পার্টি একেবারে প্রথমে ক্ষমতায় এলেও পরবর্তীকালে একবার ইউ. ডি. এফ্ (কংগ্রেস জোট) অন্যবার এল্. ডি. এফ (সি পি এম জোট) এমনটিই চলছে। পশ্চিমবঙ্গে বিরোধীদল বলে কিছু নেই। সুপ্রিমো মমতা ব্যানার্জী বলে যিনি আছেন, তাঁর রাজনৈতিক বিচারবুদ্ধি এত অসাধারণ যে আলিমুদ্দিন স্ট্রিট ও মহাকরণ-এ সি.পি.এম.-এর উচিত তাঁর মূর্তি বসানো। কংগ্রেস দলের কথা ছেড়ে দিতে হচ্ছে এই কারণে যে এটিও সুবিধাবাদী, আদর্শহীন একটি দল। যাদের সবাই নেতা এবং সবাই সবার বিরোধী। বিজেপি ক্যাডারভিত্তিক পার্টি হলেও মধ্যযুগীয় ধ্যানধারনা ও ধর্মভিত্তিক দল বলে তারও কোনও ভবিষ্যত নেই। সিপিএম যুক্তফ্রন্টের অভিজ্ঞতার পর বামফ্রন্ট তৈরি করেছে। এবং তাঁদের মত করে এদের সমমতাবলম্বী দলের স্বীকৃতি দিয়েছে। মাঝে-মধ্যে সামান্য গোলমাল হলেও নিজেদের স্বার্থে এবং দলের স্বার্থে তারা তা মিটিয়ে নিয়েছে। সুব্রত, অজিত, মমতা, সুদীপ-নয়নাদের গল্প আমরা সবাই জানি। অন্যদিকে কংগ্রেসের নেতাদের মধ্যে ভয়ঙ্কর হিংসাহিংসির কথা কারো অজানা নেই। এখন পর্যন্ত যা অবস্থা তাতে ধরে নিতে হবে পশ্চিমবঙ্গে বামফ্রন্ট বা সি.পি.এম.-ই রাজত্ব করবে এবং কেন্দ্রে ভগ্নদর্শাগ্রস্থ কংগ্রেসকে চাপে রেখে অনেক সুযোগ সুবিধা আদায় করতে পারবে। অর্থাৎ উন্নয়নই বলুন আর রাজত্ব করা বলুন সেটাই হলো আসল কথা। মনে হয়, বামফ্রন্ট দীর্ঘকাল এ-রাজ্যে ক্ষমতায় থাকবে।

কিন্তু এ-লেখার প্রতিপাদ্য বিষয় অন্য। কেরলে অবিভক্ত কম্যুনিস্ট পার্টি যখন ক্ষমতায় এলো, প্রয়াত হেমাঙ্গ বিশ্বাস সেই সময় একবার চীনে গিয়েছিলেন। (চীন বানানে হ্রস্ব'ই' ব্যবহার করতে পারলাম না)। তখন সারা ভারত জুড়ে বাম মতাবলম্বীদের সে এক অবর্ণনীয় উচ্ছ্বাস। ধারণা হয়েই গেল, যে কেরলে বিপ্লব হয়েছে, এবং সারাভারতে বিপ্লব হলো বলে! নকশালবাদী স্লোগান স্মর্তব্য, 'সত্তরের দশক, মুক্তির দশক', 'বিপ্লবের কাজ ত্বরান্বিত করুন'। হেমাঙ্গ বিশ্বাসরাও উচ্ছ্বসিত। এর মধ্যে একদিন দল বেঁধে তাঁরা চৌ-এন-লাই এবং স্ত্রীর সংগে দেখা করতে গেলেন। তিনিও চীনা কম্যুনিস্ট পার্টির নেত্রী ছিলেন। তিনি হেমাঙ্গ বিশ্বাসকে তিনি কেরলে বিপ্লব প্রসঙ্গে কয়েকটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেছিলেন। (১) কেরলে তোমরা তো বিপ্লব করে ক্ষমতা দখল করেছো শুনলাম! কীভাবে ক্ষমতা দখল করলে? হেমাঙ্গদারা সরলভাবে উত্তর দিলেন, কেন? নির্বাচনের মাধ্যমে।' মাদাম্ মিষ্টি হেসে জিজ্ঞাসা করলেন, তাহলে তোমাদের সৈন্যবাহিনী ও অর্থনীতি কারা নিয়ন্ত্রণ করবে? গোটা প্রতিনিধিদল একসঙ্গে বলল, কেন? কেন্দ্রীয় সরকার! ভদ্রমহিলা এবার স্পষ্টতই হেসে ফেললেন, তবু তোমরা বলছ, কম্যুনিস্টরা ক্ষমতা দখল করেছে? তোমাদের কথা তোমরাই ভালো বুঝবে।'

অর্থাৎ কীভাবে ক্ষমতা দখল হলো, তার রাজনৈতিক মতাদর্শ কী, এসব প্রশ্ন ঝুলিতে রেখে 'গণতান্ত্রিক' ব্যবস্থাপনায় ক্ষমতা দখল করার ইতিহাস তো বার বার নজির স্থাপন করেছে। ক্ষমতাই যদি সব হয়, কেন ক্ষমতা, কার জন্য ক্ষমতা এসব প্রশ্ন যদি তোলা না যায়, তাহলে বদ্ধঘরে বিষবাস্প জমে ওঠে। মৃত্যু হয় রাজনৈতিক আদর্শের। সাধারণতঃ কম্যুনিস্ট পার্টির কাঠামো হয় লৌহদৃঢ়। উচ্চতম ধাপ থেকে নিম্নতম ধাপ পর্যন্ত থাকবে সেনাবাহিনীর শৃঙ্খলা। সেই শঙ্খলা তৈরি হয় রাজনৈতিক আদর্শের ওপর ভিত্তি করে। বহুমানুষ, বহুদিন ধরে এই রাজনৈতিক আদর্শের জন্য প্রাণ দিয়েছেন, তবেই না গড়ে উঠেছে এই পার্টি। একদল স্বপ্নদেখা মানুষের আত্মত্যাগে আজ পার্টি গড়ে তুলেছে ক্ষমতার এক গগনচুম্বী প্রাসাদ। তার নেতারা সবাই সিপাহসালার। ফলে যা হবার তাই হচ্ছে। আজ সুব্রত-র ইমেজ ও বুদ্ধবাবুর ইমেজ পাশাপাশি। দুজনেই উন্নয়নের এক সার্থক মডেল। শিক্ষা ও স্বাস্থ্য থেকে শুরু করে সর্বত্রই এই অবস্থা। 'কম্যুনিস্ট' বলে নিজেদের অভিহিত করতে নেউটিয়ারাও আজ পিছপা নন। খাতায় নাম লেখালেই এখন কম্যুনিস্ট। শিলিগুড়িতে কংগ্রেস, উত্তরপাড়ায় কম্যুনিস্ট। কলকাতায় নকশাল, মফঃস্বল কলেজে সি পি এম। কারও চাই নিরাপত্তা, কারও চাই ক্ষমতা, কারও চাই স্ত্রীর চাকরি, কারও ভাই-এর ব্যবসায় হেল্প। বিজেপি থাকলে এরা বিজেপি করত, সিপিএম আছে তাই সিপিএম করছে। এই হচ্ছে বর্তমানে ধান্দাবাজ বাঙালি মধ্যবিত্ত চরিত্র। বাম মতাদর্শের কথা যে সব পার্টি বলে ভোট নেয়, তাদের সবার চরিত্রই এক হয়ে গেল কেন?

মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব বাবুকে এক সাংবাদিক একবার প্রশ্ন করেছিলেন, আচ্ছা সমস্ত

বিশ্ববিদ্যালয়ে চাপরাশি থেকে ভি. সি পর্যন্ত সবটাই যে আলিমুদ্দিনের লোক এটা কি ঠিক? বুদ্ধবাবু প্রথমে ব্যাঙ্গাত্মক উত্তর দিলেন, তাহলে বিজেপি হলে কি আপনি খুশি হতেন? তারপরে নিজের থেকেই বললেন, প্রথম-প্রথম বাড়াবাড়ি হয়ে থাকতে পারে, কিন্তু এ-ভাবে চললে পরবর্তী প্রজন্ম আমাদের ক্ষমা করবে না। অর্থাৎ তিনিও বুঝছেন, ছাত্রসমাজের যে বিপুল অবদান ছিল বামপন্থী আন্দোলন গড়ে তোলার ক্ষেত্রে, তারাও প্রতিবাদহীন। দীর্ঘদিন ক্ষমতায় থাকার ফলে এবং বামদলগুলি ভোটকেন্দ্রিক দলে পরিণত হবার ফলে পার্টির মধ্যে ধান্দাবাজ এবং দুর্নীতিগ্রস্থ লোক বাড়ছে। হারিয়ে যাচ্ছে প্রতিবাদের ভাষা, প্রতিবাদী সংস্কৃতি। এখানে মার্কেজ তৈরি হবে না, হবে কিছু চাটুকার লেখক ও মোসাহেব। তৈরি হচ্ছে আর এক তোতা কাহিনী।

পতিতপাবন সরকার

মাই ব্রাদার নিখিল : এক আধুনিক সংলাপ

'চন্দ্রাহত কে নয়, শুধু তাঁর নামে কলঙ্ক রটে
বিশ্বভুবন ওই ডুবে যায় কাঁসাই নদীর চিত্রপটে।'

'লোকাল' 'গ্লোবাল' সব এখন মিলেমিশে চেটেঘেঁটে একশা। মূলের আগেই কপি এসে যায়। এই সিমুলারকা-কে বোঝাতে ৮৭ সাল নাগাদ হাইপার রিয়েলিটি শব্দটা ব্যবহার করেছিলেন একো।

তা এই হাইপাররিয়েল বাজারে স্বভাবতই ছবির আগেই প্রোমোয় প্রোমোয় ছেয়ে যায় চ্যানেল চরাচর। ফলে দর্শক দেখার আগেই ছবি দেখা না দেখার সিদ্ধান্তটা নিয়ে ফেলেন, পরিচালকের কাছে এ এক নতুন চ্যালেঞ্জ, 'মাই ব্রাদার নিখিল'-এর পরিচালক অনির্বাণের সামনেও সে চ্যালেঞ্জ ছিল।

দিনের পর দিন আমরা এই ছবি টেলিভিশন প্রোমোতে দেখেছি। করন জোহর বা সানিয়া মির্জার মতো নয়া সেলিব্রিটিদের, এই ছবির সঙ্গে যাদের সরাসরি কোনো যোগ নেই, তাঁদের মুখে শুনেছি এই ছবির নানাতর তারিকার কথা।

ছবির পরিচালক বাঙালি, কলকাতার ছেলে। ছবির বিষয়বস্তু এইডস ও সমকামিতা। ছবির নায়ক নিখিলের চরিত্রাভিনেতা সঞ্জয় সুরি ছবির প্রযোজক। স্ক্রিপ্টে মুগ্ধ জুহি চাওলা প্রায় বিনে পয়সায় কাজ করেছেন এই ছবিতে ইত্যাদি ইত্যাদি। তাহলে হাতে কী রইল? মাই ব্রাদার....এর টিকিট ছাড়া আর কিই বা।

ছবির মূল মজা লুকিয়ে আছে তার আখ্যানের আঙ্গিকে। আটের দশকের গোড়ায় গোয়ার মতো ছোট্ট শহরে এইডস সত্যিই এক 'ট্যাবু'। তাই মেডিক্যাল টেস্টে ওই রোগ ধরা পড়ার পর স্টেট লেভেল চ্যাম্পিয়ন নিখিল কাপুরকে একঘরে করে দেওয়া হয়। এক ঝটকায় হাসিখুশি প্রাণবন্ত এই ছেলেটির জীবনে নেমে আসে এক অদ্ভুত আঁধার। কফিনে শেষ পেরেক পোঁতা হয় যখন নিখিলকে জেলে পোরা হয়। আর তখনই যেন ছবিটি আরও বেশি মানবিক হয়ে যায়। গল্প বাঁধা হয় নিখিলের দিদি অনামিকা বা অনু, নিখিলের প্রেমিক ও বন্ধু নাইজেল ডি কোস্টা আর নিখিলের বাবা-মাকে নিয়ে। এরা সবাই মিলেই নিখিলের পরিবার। পুরো গল্পটা বলা হয় পরিবারের মুখ দিয়েই। এই চরিত্রগুলোই কখনো দর্শক, কখনো কথক। অনেকটা ইন্টারভিউ দেবার ঢঙে স্মৃতিচারণা চলে। এভাবেই অনেকগুলো মানুষের গল্পকে একটা সুতোয় বেঁধে ফেলা হয়। আমাদের মনে পড়ে রবার্ট এপস্টাইন জেফ্রি ফ্রিডমানের ডকুমেন্টারি

"কমন থ্রেডস : স্টোরিজ ফ্রম দ্য কুইল্ট' (১৯৮৯)-এর কথা। সেখানেও অনেকটা এই একইভাবে এইচ. আই. ভি/ এইডস-এর সমস্যাকে ধরার চেষ্টা হয়েছে।

ইস্যুভিত্তিক ছবি তৈরি করার নিজস্ব কিছু ঝামেলা থাকে। এ ছবিও তা এড়াতে পারেনি। বিরতির পরে ছবিটা বড্ড বেশি বক্তব্যধর্মী হয়ে ওঠে এবং তখনই ন্যারেটিভের গতি ঢিলে, ঢিমে তেতালা। এই অংশের মিনিট পনেরো তো অনায়াসেই ছেঁটে ফেলা যেত। বিশেষ করে সেইসব স্টাটিক শট যেখানে চরিত্রগুলো একে অপরের সঙ্গে এইডস কী এবং কেন বিষয়ে এক অনন্ত আলোচনায় মেতে ওঠে। এখানে এডিটর অনির্বাণকে কিছুটা কম নম্বর দিতেই হয়। একই সঙ্গে পরিচালক অনির্বাণের বেশ অনেকটা প্রশংসাই প্রাপ্য বিশেষ করে সমকামিতার মতো এক স্পর্শকাতর বিষয়কে তিনি যেভাবে ব্যবহার করছেন সেই জন্য। কোথাও বাহুল্য নেই, কোনো সিদ্ধান্তে পৌঁছে যাওয়া নেই, নেতিবাচন নেই, আছে শুধু আধুনিক নাগরিক মন নিয়ে বিষয়টিকে দেখার প্রচেষ্টা। আর সেটা সফল হয়েছে পুরোপুরি চরিত্রচিত্রণ এবং চরিত্রায়ণের জন্য। নাইজেলের ভূমিকায় পুরব কোহলি এক কথায় দুর্দান্ত। একই বিশেষণ অনুর ভূমিকায় জুহি চাওলা এবং নিখিলের ভূমিকায় অঞ্জ সুরিরও প্রাপ্য। বাকিরাও কমবেশি যথাযথ। বরঞ্চ কিছুটা ফিকে লাগে নিখিলের বাবার ভূমিকায় ভিক্টর ব্যানার্জিকে তাঁর চড়া অভিনয়ের ও অতিনাটকীয়তার জন্য।

'মাই ব্রাদার নিখিল'-এ বিশেষভাবে প্রশংশনীয় ক্যামেরা (অরবিন্দ কান্নাবিরান), সঙ্গীত (বিবেক ফিলিপ)। উল্লেখযোগ্য এ ছবির নামকরণ। 'মাই ব্রাদার নিখিল' নামটি প্রথমেই আমাদের আখ্যানের নন-ফিকশনাল ব্রেখটীয় আঙ্গিকের আভাস দেয়। ছবিরই কোনো চরিত্র যেন আমাদের ডাক দেয় তার ভাই নিখিলের গল্প শোনার জন্য। এইভাবে এক গল্প থেকে অন্য গল্পের মধ্যে দিয়ে দর্শক ঢুকে পড়ে নিখিলের জগতে। ছবির শেষে আমরা দর্শকরা নিখিলের ওই জগতেরই অংশ হয়ে উঠি। আমাদের সাইকোলজিকাল 'স্পেস' এক স্বতঃস্ফূর্ত জবানীতে বলে ওঠে 'মাই ব্রাদার নিখিল।'

দেবাশিস সেনশর্মা

দেখছি সুমন-কে

সুমনকে নিয়ে লেখা যে কটি আলোচনা পড়েছি, তার অধিকাংশই হয় বহির্মুখী, নয় বাহ্যিক চর্চা। প্রথমে ছিল এক উচ্ছ্বাসের পর্ব, যেখানে গানকে প্রস্থানভূমি করে আলোচনা চলে যেত কৈশোরলালিত বিদ্রোহী স্বপ্নগুলিকে অদূরভবিষ্যতে বাস্তবায়িত দেখবার আশার দিকে। তার অল্প কিছু পরের পর্বে চোখে পড়ত গণমাধ্যম-তাড়িত ও লালিত দুটি ছদ্ম-বিতর্ক, যার একটির প্রস্থানভূমি গান নয়, পারফরম্যান্সের সময়ের পার্শ্বমন্তব্যগুলি, এবং অন্যটির বিষয় সুরের দেশি-বিদেশি গোত্রবিচার। পরের আলোচনাগুলি ক্রমশ *মা কি ছিলেন, মা কি হইলেন*-এর স্রোতে দীর্ঘশ্বাস চয়ন। (অবশ্য সুমনের ব্যক্তিজীবন নিয়ে কেচ্ছামালা পরিবেশনকে এ বিচারে বাহ্য বলেই মনে করছি।) অর্থাৎ গান বা সুমন থেকে অন্যত্র বিহার করাই আলোচনাগুলির প্রধানস্বভাব। আমার এ আলোচনায় তেমন বিস্তৃতির উচ্চাশা নেই। এ একান্তভাবে আমার সুমন-গান শোনা ও না-শোনার বৃত্তান্ত। তাই, এ লেখা সমালোচনা নয়। বরং নিজের কিছু সাধারণ পর্যবেক্ষণ, কিছু পুঞ্জিত আক্ষেপের উচ্চারণ, যা মুখ্যত কবীর সুমনকে ঘিরে, বিশেষত তাঁর সাম্প্রতিকতম গানের ক্যাসেটটিকে ঘিরে আবর্তিত।

'দেখছি তোকে' ক্যাসেটটি বোধহয় প্রযুক্তিগত কারণে মাঝারি মাপের ইতিহাস সৃষ্টি করেছে। এই প্রথম কোনো ক্যাসেটে একই লোক (একা-একাই) রেকর্ডিং, এডিটিং মিক্সিং ও মাস্টারিং সবকটি কাজই করেছেন। এ খবর জ্যাকেটে প্রাপ্ত। তবে কিনা, এইসব প্রক্রিয়ার কোনোটির সম্বন্ধেও বিন্দুবিসর্গ ধারণা আমার নেই, তাই কাজটা ঠিক কতটা বড় মাপের বা কতটা দুঃসাহসিক, তার আন্দাজ আমার নেই।

ক্যাসেটের নাম 'দেখছি তোকে'। এই 'তুই' যে সুমনের নিজের শৈশব, বা শৈশবের সুমন, সেকথা জানিয়ে দেয় ক্যাসেটের জ্যাকেট। জ্যাকেটে ২০০৫-এ ছাপ্পান্ন বছর বয়স্ক কবীরের একটি কফির-মগ-হাতে ছবি, সেটি তাকিয়ে আছে ১৯৫০-এ তোলা (কার তোলা?) একটি ফ্রক-পরা শিশুর ফোটোগ্রাফের দিকে। এমন একটা ইঙ্গিত ছিল যে জনসমক্ষে দুই সুমনের সংলাপে এক আত্মজৈবনিক সাবজেকটিভিটির পরিচয় পাওয়া যেতে পারে। মোড়ক খুললে অবশ্য ভুলটা ভাঙে। দুই সুমনের উপস্থিতি নেই, তবে '৫০-এর সুমনের উদ্দেশে '০৫-এর সুমনের একটি গান আছে। একটিই, প্রথম গানটিই শুধু। সে গানে ফুটে উঠছে আত্মমুখী বাৎসল্য, স্বভাবতই তাতে বিশ্লেষণ নেই, বিস্তারও সীমিত। গান শেষ হয় যে আশ্বাসে—"গাইছি তোকে/আমার ছোট্ট/আমির মতো/স্মৃতির সুর,/গাইছি তোকে/এ্কলা যাব/আমরা দুজন/অনেক দূর",

তা আক্ষরিকভাবেই রক্ষিত হয়—তাঁরা 'দু'-জনে একলাই চলে যান অন্য কোথাও। আমরা আর তাঁদের সঙ্গী নই, আমাদের জন্য রয়েছে অন্য গান, ভিন্ন গান।

বলা যেতে পারত বিভিন্ন রকমের গান। মোট আটটি গান, প্রথমটি বাদ দিলে অন্য প্রতিটি গানই তাঁর অতীত Ouevre-এর প্রতিষ্ঠিত কোনো না কোনো এক ঘরানার। সেইসব গানের মধ্যে দিয়ে পায়চারি করতে করতে এগোলেই মনে পড়ে যায় অতীতে তাঁর গানের সঙ্গে আমার, আমাদের ওঠাবসা, ঘোরাফেরা।

তাঁর উত্তাল আবির্ভাবের পর্বের কোলাজগুলির হাত ধরে আমার মন মিছিলে মিছিলে স্লোগানে স্লোগানে মজেছে, তাঁর গানের ইচ্ছেগুলোর সঙ্গে গঙ্গাফড়িঙের ডানায় চেপে কখনো একা মেয়েটার নরম গালের পাশে প্রহরীর মতো রাত জেগেছে, কখনো গোলাপের কুঁড়ি হাতে কুচকাওয়াজ করেছে। পরের এক রসস্থ পর্বে বৃথা প্রশ্নের হয়রানি ছেড়ে তিনি যেমন জল্পনা করেছেন মেঘ কতটা ঘন হলে হবে ঘনশ্যাম, আমিও তেমনই তাঁর চোখে অবলোকন করেছি কীভাবে স্রোত ভেঙে দেয় নদীর জড়তা। তাঁর হৃদয় রাতভর পায়চারি করলে আমিও ভেবেছি বয়স হলে প্রেমে কেন এত পাক ধরে। যখন তিনি দৃঢ় প্রত্যয়ে, অমরত্বের প্রত্যাশা ব্যতিরেকেও কালগতিকে ছাপিয়ে যান, এবেলা-ওবেলা-য় একই শবদেহ বয়ে ভেসে যাওয়া ভেলাও যখন তাঁর গানে জীবনের মানেকে স্বচ্ছ আতস কাচে ধরে রেখেছিল, যখন তিনি অনায়াসে 'আগেও মরেছি' জেনেও প্রেমের দিব্যি দিয়ে আবারও মরবার প্রত্যয় পান, আমি তখন সশ্রদ্ধ ও নিরাপদ দূরত্বে দাঁড়িয়ে থাকলেও সেই ভেলার গমনপথের দিকেই তাকিয়ে থেকেছি।

ক্রমে নতুন গানের সংখ্যা কমে এল। যা এল, তার মধ্যে একটি প্রধান প্রবণতা ছিল সাম্প্রতিক ঘটনাবলির গীতিভাষ্য। এই ধারার গান সুমন বরাবরই গড়েছেন, তবে পরের পর্যায়ে এদের সংখ্যাবাহুল্য চোখে পড়ার মতো। গানগুলো এক অদ্ভুত পরিস্থিতির সৃষ্টি করে। প্রকাশ্যে গানগুলোর তেমন কোনো সমালোচনা তাঁর শ্রোতারা করতেন না। বক্তব্য পোলিটিকাল এবং কারেক্ট (নিছক শ্লেষার্থে *পোলিটিকালি কারেক্ট* নয়)। তাছাড়া কথাগুলো তো বলা দরকার, মনে রাখা দরকার, বিশেষত সংবাদপত্রের আলোচনার মেয়াদ তো এক সপ্তাহ, বড় জোর তিন মাস, তারপর গানগুলোই ধরে রাখবে এসব ঘটনার দগদগে স্মৃতি। কিন্তু সুমনের অন্য গান যেমন অহরহ গুনগুনিয়ে গাইতাম আমি বা আমরা, সেভাবে তো নয়ই, এমনকি ক্যাসেটগুলোকে বারবার ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে শোনাটাও থেমে গেল। একের পর এক ক্যাসেটকে সযত্নে তুলে রাখলাম তাকের একটু পেছন দিকে—পরে আবার শুনতে হবে, এই দ্রুত-বিস্মৃত অঙ্গীকারে।

কিন্তু যা ভাল কথা, জরুরিও বটে, তাকে এভাবে অস্বস্তিতে এড়িয়ে যাই কেন?

এ প্রসঙ্গে শিল্পে কাঙ্ক্ষিত গুণাবলি প্রসঙ্গে যে আলোচনা ইতালো কালভিনো করেছেন, 'সহস্রাব্দের উদ্দেশে ছটি মেমো' নামক সংকলনে, তার একটি ধারণা টেনে আনছি। এই পৃথিবী স্থূল; এখানে গড্ডলিকা প্রবাহের ক্ষমতার বিন্যাস যেন মেডিউসার চোখের মতো, তা সকল প্রাণী, তথা সকল প্রাণকেই প্রস্তরীভূত করে। আমরা দেখতে পাই, বুঝতে পারি, 'স্বাভাবিকতা'-র ক্ষমতার মুখোমুখি হয়ে ও তার প্রাবল্যের অভিঘাতে

সে-সব মেনে নিই। আমাদের এই সহ্য করার, মেনে নেওয়ার বাস্তবতা আমাদের যাবতীয় প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ অভিজ্ঞতাকেই পরিণত করে এক প্রস্তরশীলায়। তার ভরবেগ, তার জাড্য এক অবধারিত অস্বচ্ছ প্রাচীরের সামনে দাঁড় করায় আমাদের; 'স্বাভাবিক' ও প্রত্যাশিত ঘটনাপরম্পরা অবধারিত, অপ্রতিরোধ্য এবং অপ্রতিশোধ্য বলেই স্থাপিত হয়। আমাদের দৃষ্টির সামনে নেমে আসে যবনিকা। চোখ বাহুল্য হয়ে ওঠে, আমরা চোখ বন্ধ করে ফেলি। এইখানে কবি (বা ভাষা, বা সাহিত্য) নিয়ে আসে এক সম্ভাব্য উদ্ধার। পায়ে পারসিউস-এর ডানা জুড়ে নিয়ে সে আকাশযুদ্ধে পরাজিত করে মেডিউসাকে, কেটে নেয় তার মাথা। এ কোনো ইচ্ছাপূরণের রূপকথা নয়, বাস্তবতা থেকে তার স্থূল ভাবের ভরবেগকে সরিয়ে নেওয়ার মধ্যে দিয়ে গড়ে ওঠে যে নির্ভার কবিতা, গান, সেই সৃষ্টিই পাঠক-শ্রোতার চোখ থেকে পার্থিব স্থূলতার কালো পর্দা সরিয়ে দেয়; প্রশ্নের মুখে, পরিহাসের মুখে ফেলে দেয় অন্ধ ইতিহাসের অমোঘ ক্ষমতার বিন্যাসকে, মেনে নেওয়ার আপসকে অপ্রিয়তর করে তোলে। এইভাবে স্বচ্ছ হয়ে ওঠা পৃথিবী আবারো সহনীয় বাসযোগ্য হয়ে ওঠে—কবিতার, বা সাধারণভাবে শিল্প-সাহিত্যের প্রশ্বাসের ছোঁয়ায়। কবির বিদ্রোহ এইখানেই, ভাষার আধারে পারসেপশন-এর চোখ খুলে দেওয়ার কাজে।

[কবি নিজে বন্দুক ধরে না, অন্তত কবি-পরিচিতিতে নয়। বন্দুকধারীকে অনুপ্রেরণা সরবরাহ করা বা তাদের মার্চিংসঙ লেখাটাও তার দায় নয়, শখ হলেও হতে পারে। বন্দুক যে ধরবে, তার অনুপ্রেরণার উৎস অন্যত্র—রাজনৈতিক বিশ্বাসে, কৌশল-বাছাইয়ের নিক্তিতে মাপা সিদ্ধান্তে।]

সে কাজটা সুমন অহরহ করেছেন। উদাহরণের উদ্ধৃতি দেওয়াটা নেহাতই বাহুল্য হয়ে উঠবে, একটু আগে যে গানগুলির কিছু পঙ্ক্তির উল্লেখ করেছি, তার প্রতিটিই তো উদাহরণ; তবু একটি তুলনামূলক স্বল্পপরিচিত গানের পঙ্ক্তি ব্যবহারের লোভ সামলানো যাচ্ছে না। বছর সাত-আট আগের এক বর্ষণমুখর সন্ধ্যায় তিনি গেয়েছিলেন :

এই যে বলছিলে কিচ্ছু হচ্ছে না এই তো হোচ্-ছে
চোখের জলে ভেজা রুমালটা ছাদের তারে শুকোচ্-ছে

গেয়েছিলেন সতেজ গদ্যোচ্চারণের ছন্দে, সটান আঙুল তুলে (না, এটা বোধহয় স্মৃতিবিভ্রম—আঙুল তুলবেন কী করে, গিটার বাজাচ্ছিলেন যে!)

এবং আমরা দেখতে পেলাম—ছাদের তারে শুধু রুমালটাই নয়, সদ্য চোখের জল ফেলা বান্ধবী/প্রেমিকাকেই শুধু নয়, গাঢ় হয়ে আসা প্রেম/দাম্পত্যই শুধু নয়—দেখলাম সামাজিক আশাপূরণের অভিমুখে ঘটা কোনো কিছুর সম্ভাবনাকে। ওই 'কিচ্ছু হচ্ছে না'-টা সেই নব্বইয়ের দশকে প্রায়শই আমাদের মুখে মুখে উচ্চারিত হত, এবং সেটা রাজনৈতিক পালাবদলের অনুষঙ্গে। স্রেফ অনুষঙ্গ বদলে দিয়েই সুমন শব্দবন্ধটির বিশ-মনি ওজনকে সাবানের বুদবুদের মতো উড়িয়ে দিলেন।

কিন্তু যে গানের কথা বলছিলাম, সেই সাম্প্রতিক ঘটনাবলির গীতিভাষ্যে এই প্রক্রিয়া কাজ করছে না। গানে ঘটনাটির উল্লেখ থাকে। থাকে ধিক্কার, কিন্তু সে তো অকবি আমার মনেও ইতিমধ্যে একইভাবে ধ্বনিত হয়েছে। থাকে শ্লেষ, যা ক্লান্ত

রাজনৈতিক কর্মীর তিক্ততায় যত্রতত্র পেয়েছি। কিন্তু তারপরই গান শেষ হয়ে যায়। ঘটনাটি তার নির্মম স্থূলতায় প্রস্তরীভূত হয়ে আমার বুকে চেপে বসে। আমি চোখ বন্ধ করি, ক্যাসেটকে তাকের পেছনে ঠেলে দিই।

এমন গান এই সংকলনেও আছে। দুটি গান, দুটিতেই মনোরমার নামোল্লেখ, একটিতে সমগ্র মণিপুরের, আর তার পাশাপাশি মন্তাজ কৌশলে মহানগরের ক্রমবর্ধমান ডিস্কোথেক-নেশা। ধিক্কার আছে, আছে শ্লেষ। শোনার প্রতিক্রিয়াও আগের মতোই। কিন্তু এমন গানের সংখ্যা আটটিতে দুটি। তাই, ক্যাসেট-টা তাকের সামনের দিকেই থেকে যায়।

বরং *পেটকাটি চাঁদিয়াল থেকে হেলিকপ্টার হেলিকপ্টার* হয়ে যে স্মার্ট শ্লেষের ধারায় এবারে লিখেছেন 'হুজুর বান্দা হাজির', তাতে কিছুটা স্বস্তি পাই। কলেজের সিঁড়িতে বসে গাইবার মতো গানে ব্যান্ড-ব্র্যান্ডের প্রেম বা ওই ব্র্যান্ডের ক্যারিকেচারের পাশাপাশি একচিলতে শাসক-বিরোধ এনে দিতে পারে "এই তো দেখুন প্রশস্তি গেয়ে/ আপনার নুন ফেললাম খেয়ে/ হুজুর বান্দা হাজির"। শাসক-বিরোধ আর বিরোধী রাজনীতির মধ্যে কিছু ফরাক তো থেকেই যাবে। এ গানে আশাবাদের ফর্মুলা প্রযুক্ত হয় না, ভবিষ্যৎ সম্ভাবনার আশাকে বর্তমানে হাজির চেহারায় দেখানো হয় না, গান শেষ হয় এইভাবে : "কিছু লোক বড় স্পর্শকাতর/ কাঁপছে এখন তাদের পাঁজর/ হুজুর বান্দা হাজির"। দেড় দশক পেরিয়ে গেল, স্টেডি স্টেট-কে যে সুমনও তেমন অস্বীকার করছেন না! আজ না হলেও একদিন কি তবে পারসিউসের পায়ের ডানাতেও মেডিউসার দৃষ্টি লাগবে?

বরং ওম পোয়াই প্রেমে। এ ক্যাসেটে আবারো রয়েছে প্রগাঢ় প্রেমের গান। শুধু প্রেমহীনতার আক্ষেপেই নয়, (তা-ও আছে, শেষ গানে) রয়েছে সেই প্রেমের তীব্রতার উচ্চারণ যা সুমনকে চিহ্নিত করে, সিগনিফই করে আমার গান-শোনার স্মৃতিতে।

"তুমি ছিলে হাফিজের প্রথম প্রেমিকা/ তুমি ছিলে পুরুষের বুদ্ধি হারানো" দিয়ে যে গান শুরু হয়, তা এই লেট পর্যায়ের সুমনের সঙ্গে মধ্য পর্যায়ের সুমনের ধারাবাহিকতা গড়ে দেয়। গেয়ে চলেন "তুমি ছিলে গালিবের দারিদ্র দেনা/ তুমি ছিলে গজলের পালিয়ে বেড়ানো/ বুদ্ধিমানেরা ওই গান গাইবে না/ গান যে অসার কত তুমিই তো জানো"।

অন্য একটি প্রেমের গানে আবার শুধু মধ্য পর্যায়ই নয়, লক্ষ্য করা যেতে পারে এমনকি প্রথম পর্যায়ের সুমনের সঙ্গে যোগাযোগ : "শরীরে জ্বলছে কামনার বিদ্রোহ/ গেরিলার মতো নির্ভীক তার চোখ/ আমার স্পর্ধা তোমারই জীবন-মুখী/ আমার লড়াই এবার তোমারও হোক"।

এইখানে তাঁর গানে বিধৃত প্রেমের ধারণাটির একটু আলোচনা করে নেওয়া যাক।

প্লেটো তাঁর *Phaedro*-য় এবং *Symposium*-এ মানব-মানবীর যৌন বাসনার প্রসঙ্গটি উত্থাপন করেছিলেন, এই কামনার বিষয়ী বা অবজেক্ট-রূপে ব্যক্তিবিশেষের স্থানটি নিয়ে আলোচনা প্রসঙ্গে। শরীরী কামনা আর তাত্ত্বিক কামনার মধ্যে একটা

বিভাজন করে নিয়েছিলেন; বিভাজন করে নিয়েছিলেন কামনার দেবী আফ্রোদিতে-কেই। আফ্রোদিতে পানদেমস পার্থিব কামনা-বাসনার দেবী, আর ভালবাসার বা আত্মিক কামনার দেবী আফ্রোদিতে ইউরেনিয়া। প্লেটোর আলোচনায় দেখিয়েছিলেন যে, শরীরী কামনার উদ্দেশ যে কোনো শরীর, তাই যে বাসনার অবজেক্ট কোনো ব্যক্তিবিশেষ নয়, শরীরের এক সাধারণ (ইউনিভার্সাল) ধারণা। সেই সাধারণ অনন্ত, কারণ অনন্ত তার আকারবদল। অতএব, তাঁর সিদ্ধান্ত ছিল, শরীরী কামনা তার অবজেক্টের কাছ অবধি কখনোই পৌঁছতে পারে না, আগেই মুখ থুবড়ে পড়ে। *(কুন্দেরা এই ধারণাটা নিয়ে আরো কিছু জল্পনা করেছেন, তবে এখানে সে কথা তুললে কথা বেড়ে যাবে।)* অন্য দিকে আত্মিক কামনাতেও *(যে ধারণাটার সরলীকৃত রূপ ক্রমশ প্লেটনিক ভালবাসা নামে পরিচিত হয়ে ওঠে)*, কিন্তু ব্যক্তিবিশেষের পথ গন্তব্যে পৌঁছয় না, অন্তত দার্শনিক বিচারে। আত্মিক কামনা তো ধাবিত হবে কাঙ্ক্ষিতের সৌন্দর্যের প্রতি, অথবা কমনীয়তা অথবা দৃঢ়তা অথবা এমনই কোনো এক বা একাধিক গুণ-বৈশিষ্ট্যের প্রতি। সেই গুণগুলো তো প্রতিটিই এক-একটি সাধারণ, এক-একটি ইউনিভার্সাল। অতএব, আবারো, ব্যক্তিবিশেষের দিকে নয়, কামনা ধাবিত হয় এক ধারণার প্রতি। এবার প্রেম তার অবজেক্ট-কে ছাড়িয়ে ছাপিয়ে চলে যায়। গোটা মধ্যযুগ জুড়ে এবং রেনেসাঁস-এর প্রথম পর্বেও কামনার এই বিচার বহাল থাকে। ক্যাথলিক চার্চ এবং ইসলামেও প্লেটোর এই ধারণাটির একটি সংস্করণ বিশেষ মর্যাদা পায়। কামনা যদি ব্যক্তি ছাপিয়ে সাধারণ ধারণার দিকে ধাবিত হয়, তবে যৌনমিলন বস্তুত প্রথম দুই আত্মার মিলন, এবং সেই থেকে ঈশ্বরের প্রেমসমুদ্রে এই দুই আত্মার বিলীন হয়ে যাওয়া : এইভাবে মানুষের যৌন বাসনার বাস্তবতাকে ধর্মীয় দর্শনের আওতায় এনে ফেলার যুক্তিকৌশল নির্মিত হয়। এদেশের বৈষ্ণব পদাবলি বা সহজিয়া ধর্মাচরণ বা সুফি দর্শনের সমগোত্রীয় ধারণাগুলি বহুল প্রচলিত, বহু-আলোচিত; তাই সে নিয়ে আর কথা বাড়ালাম না। ওই পশ্চিমেও ভরা রেনেসাঁস-এ ধারণাটা ক্রমশ খাত বদলায়, মিলটন, ড্রাইডেন বা রাসিনের হাত ধরে। এখন এখানে আমরা আর শরীর-মনের সীমিত বাতুল দ্বন্দে সময় বা বাক্য অপচয় না করে, তাকে প্রতিস্থাপিত করতে পারি বিশেষব্যক্তি ও ইউনিভার্সল ব্যক্তির দ্বন্দ্ব দিয়ে।

এত কথা সুমনের প্রেমের গান নিয়ে বলাটা হয়তো কিছুটা বাহুল্য। কারণ আমরা তো জানিই, সুমনের গানের প্রেমিকারা কেউই ব্যক্তিবিশেষ নয়। বস্তুত, তাঁর গানে কাঙ্ক্ষিতারা তো ব্যক্তিরূপে অনুপস্থিতই থেকে যান। প্রেমের অভিমুখ এক তুমি সর্বনাম-ধারী ব্যক্তি-বিন্দুর মধ্যে দিয়ে প্রবেশ করে অবাধ-বিশ্বে, ছড়িয়ে পড়ে সেই বিশ্বের প্রতি ভালবাসায়, সৌভ্রাতৃত্বে এবং সেই সৌভ্রাতৃত্বকে বিপর্যয়ে ফেলে যে শক্তি, প্রেম বিদ্রোহে ফুঁসে ওঠে তার বিরুদ্ধে। প্রেম থেকে ঘর বাঁধার বাসনা নয়, জেগে ওঠে বিদ্রোহের উদ্দীপনা। সুমনের প্রেমের গান আমার কাছে এইজন্যেই প্রেমময় বাংলা গানের স্রোতে এক ভিন্ন জোয়ার।

ওই দ্বিতীয় প্রেমের গানে কথাটা সুমন উল্টে বলেছেন : ভালবাসা থেকে বিদ্রোহে নয়, বিদ্রোহই ভালবাসা। "এক ধরনের বিদ্রোহ ভালবাসা/ এক ধরনের বিদ্রোহ হল

দাবি/ উগ্র প্রেমের ছুরিতে দিচ্ছি শান/ দখল করব জীবনের মৃগনাভি।" প্রথম পর্যায়ের সুমনকে পেয়ে যাই এই বিরোধাভাষে : "ধ্বংসের দাবি সৃষ্টিতে উদ্বেল/ কামনায় আজ আগুন লেগেছে দ্যাখো/ ভাবনায় ফাটে মলোটভ ককটেল"। হঠাৎ নস্টালজিয়া জাগে। শেষ কবে এমন গান শুনেছিলাম, সে কথা মনে করিয়ে দেয় আমার আমাদের বেড়ে চলা বয়সের কথা।

এহ বাহ্য। সুমন বলছেন, এই সংকলনেই : এক ধরনের বিদ্রোহ হ'ল কবিতা/ এক ধরনের বিদ্রোহ হ'ল গান।

বিদ্রোহের আছে নানা রকমফের। বেশ কয়েক বছর আগে সুমন লিখেছিলেন দু লাইনের একটি হাইকু সদৃশ গান। লাইনগুলো পরপর মনে পড়ছে না, দুটি পায়রা (নাকি চড়ুই) চান করেছিল সেই দুই লাইনের জলে, এইটুকু মনে আছে। ঠিক ওই গানের সহোদর আর দেখিনি তাঁর লেখা গানের তিনটি বইয়ে বা কোনো ক্যাসেটে। আজ এই ক্যাসেটের দ্বিতীয় গানটিতে সে অভাব মিটল। এটি দীর্ঘতর, কিছুমাত্রায় প্রগলভতর। বাংলা-হাইকু বলা যেতে পারে হয়তো। নাম যা-ই হোক, পারসিউসের উড়ান চেনা যায়। তাই এই পরিক্রমা শেষে, সুমনের অনুমতিক্রমে, গোটা গানটিই উদ্ধৃত করব। কিন্তু সেই শেষের আগে শেষের কিছু কথা রয়ে গেছে।

সুমন ইদানীং কমই গাইছেন। যতিটা কিছুটা তাড়াতাড়ি আসছে, এমন একটা অনুযোগ থাকতেই পারে, তবে সেটা খুব বড় কথা নয়। একদিন তিনি থামতেনই, সেটা নাহোক কিছুটা আগেই হল। কিন্তু ইতিমধ্যে তো তাঁর প্রভাব সুদূরপ্রসারী হয়েছে, তাঁর আবির্ভাবের পরের গত দেড় দশকে বাংলা গানের জগতের গান অনেকটাই বদলে গেছে। বদলে গেছে গানের ইডিয়ম। এটাই তো বড় কথা হবার কথা ছিল।

[কেউ কেউ আজকের ব্যান্ড-গানে সুমনের বা প্রতুলের প্রভাব দেখছেন না, দেখছেন বিশ্বায়ন ও তার শিখণ্ডী ভি বা এম টিভি-কে। আমাদের চেতনায় কেবল টিভি আর সুমনের আগমন প্রায় সমসাময়িক, একথা ঠিকই। কিন্তু এ বঙ্গের বাংলা ব্যান্ডে যেসব পশ্চিমী গ্রুপের প্রভাব বেশি লক্ষণীয়, তারা—অর্থাৎ পিংক ফ্লয়েড থেকে গানস অ্যান্ড রোজেস প্রমুখের রক—আর ভি বা এম-এর উপজীব্য নয়। এই গ্রুপেরা তো সেখানে ইতিহাস, বড়জোর ক্লাসিকস নামে মাঝে মধ্যে মুখ দেখায়। ভি বা এম-এব প্রভাব হিন্দি পপ-এ স্পষ্ট দেখা গেলেও বাংলা-ব্যান্ড, তার অগ্রজ বাংলাদেশের ব্যান্ডের মতোই, কিছুটা অন্য পথের পথিক। এখানে, অন্তত আমার চোখে, সুমনের ভূমিকাটাকে বড় বলেই মনে হয়।]

কিন্তু যা ঘটেছে, তাতে কথা বড় বেশি হলেও, বড়-কথাটা হয়নি। তাঁর উত্তরসূরিরা তাঁর থেকে নিয়েছেন অনেক, কিন্তু কর্তিত আকারে, টুকরো টুকরো করে। সতীদেহের মতো, বা মন্থনজাত প্রভূত ঐশ্বর্যের মতো। অনেকেই তাঁর অনুপ্রেরণায় পশ্চিমী সুর ধারের লাইসেন্সটুকু নিয়েছেন, তাঁদের মধ্যে অধিকাংশই সেই সুরের ছন্দকে বাংলাভাষার উচ্চারণের স্বভাবে বদলে নেওয়ার প্রয়োজনটুকু অনুভব করেননি। অন্যরা নিয়েছেন গানের কথায় ব্যঙ্গ-শ্লেষের ব্যবহার, আর সেখান থেকে চোট-পায়ে চলে বায়বীয়

চটুলতার নিহিলিজ্ম-এ পৌঁছেছেন। অনেকে, প্রায় সকলেই, নিয়েছেন গানে প্রেমের তীব্র আশ্লেষ। তবু এইখানে কবি কাঁদলেন। সে প্রেমে শরীরী উল্লেখ যৎসামান্যই, কিন্তু তার গতিপ্রকৃতিতে রয়েছে প্রেটোর আফ্রোদিতে পানদেমস-এর উপাসনা। তার অবজেক্ট মুখ্যত এক-এক ব্যক্তিবিশেষই, ফলে সে তার অবজেক্ট পর্যন্তও পৌঁছয় না, মুখ থুবড়ে পড়ে। এখন প্রেমের গান তাই বাধ্যতামূলকভাবেই ব্যর্থ প্রেমের গান। সতেরো-আঠারোর যুবক-যুবতী, বাংলাদেশের আদুরে আবহাওয়ায় যাদের বয়ঃসন্ধিই হল এই সদ্য, যারা প্রথম প্রেমের ভাবনা ভাঁজছে সবে—তারাও বৃন্দগানের মতো ব্যর্থ প্রেমের অসহায় হুতাশ গাইছে। যত বয়স কম তত নস্টালজিয়ার গান গাইছে : যাদের মনে রাখার মতো স্মৃতিই নেই, তারা স্মৃতিকাতর হয়ে পড়ছে! অর্থাৎ, সেই সত্তরের শেষ আশির দশকের মতোই, গান আবারো অনুভূত-আবেগের বাস্তবতা থেকে বিচ্ছিন্ন এক রীতিবদ্ধ অলঙ্কারচর্চা হয়ে উঠেছে। এবং, শিল্পের ইতিহাসের পাঠকমাত্রেই যা জানেন, অলঙ্কারচর্চা বড় নেশাময়, বড় মশগুল করে সংক্রান্ত সকলকে; ভঙ্গুরতম মুহূর্তে তার গায়ে চড়ে সর্বাধিক কারুকার্যমণ্ডিত ঐশ্বর্যবাহুল্য।

কার্নিসে দুটো পায়রা আদর করল
সকালটা সেই আদর হয়েই ঝরল

সাড়ে সাতটার সকাল দারুণ খুশি
ফিক করে হেসে ফেলল পাড়ার পুষি
বাঘিনীর মতো বসেছে বেড়ালছানা
কিছুতে চড়ুই হচ্ছে না তালকানা।

ব্যস্ত কাকের সন্ধানী চোখদুটো
খুঁজছে খাবার এমনকি খড়কুটো
পিঁপড়ের সারি চলেছে কুচকাওয়াজে
সবাই ব্যস্ত খাবার খোঁজার কাজে।

টুসটুসে পাকা আমের আদল দেখে
পাড়ার ছেলেটা দাঁড়িয়ে আদল দেখে
গাছপাকা আম বৈশাখ চেনে ভালো
টাটকা সবুজ কোথাও একটু কালো।

কালো ঝুঁটিটাই বুলবুলি নেড়ে চলে
আমটাকে সেও খেতে চায় কৌশলে
কৌশল নয় খাবার দাবারও নয়
কার্নিসে দুটো পায়রার ভাব হয়।

অভিজিৎ ঘোষ

আলেখ্য

অক্ষরের অভিমান, হরফের আড়াল : মুদ্রণশিল্পী প্রভাতকুমার ঘোষ

স্বপন চক্রবর্তী

প্রভাতকুমার ঘোষের নাম প্রথম কবে শুনি ঠিক মনে নেই, তবে কার মুখ থেকে শুনি মনে আছে। সেটা ১৯৭৩ কি ১৯৭৪ সাল, আমি প্রেসিডেন্সি কলেজ ছাত্র সংসদের প্রকাশনা সচিব। নকশাল আন্দোলনের সময় বেশ ক'বছর কলেজ পত্রিকা বেরোয়নি। তারপর ইউনিয়ন ছাত্র পরিষদের দখলে আসার পর ১৯৭২ সালে বেশ ঘটা করে বেরোয় পত্রিকা। সম্পাদক ছিলেন অনুপ সিংহ, যাঁকে অর্থনীতিবিদ হিসেবে আজ লোকে একডাকে চেনে। 'ঘটা করে' কথাটা আলগাভাবে বলিনি, বেশ দেখবার মতো হয়েছিল সেবারকার কাগজ। প্রচ্ছদলিপি ও নামপত্র করেছিলেন সত্যজিৎ রায়, ছেপেছিলেন শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেস। কাগজ আর ছাপার মানও বেশ ভালো। বোধহয় কয়েক বছর পত্রিকা বন্ধ থাকায় এ বাবদ কলেজের তহবিলে খানিকটা টাকা জমে গিয়েছিল।

পরের বছর পত্রিকার সম্পাদক হলেন রুদ্রাংশু মুখোপাধ্যায়, আমি সেক্রেটারি। রুদ্রাংশু ছিলেন আগেকার সংখ্যাটির প্রকাশনা সচিব, বইপাড়ার ও লেখাপড়ার জগতের অনেক ডাকসাইটে লোককে তখন থেকেই চেনেন তিনি। ফলে কোন ছাপাখানায় কাগজ যাবে তা নিয়ে আমি আদৌ মাথা ঘামাইনি। কলেজের অধ্যাপকদের মধ্যে একজনকে দায়িত্ব দেওয়া হত পত্রিকার কাজ দেখাশোনা করার। সেবার ভারপ্রাপ্ত অধ্যাপক ছিলেন আমাদের মাস্টারমশাই ইংরেজির অরুণকুমার দাশগুপ্ত। একদিন অরুণবাবু আমাকে বললেন অন্তত ইংরেজি অংশটুকু প্রভাতবাবুকে দিয়ে ছাপানো যায় কি না দেখতে। অরুণবাবুর কাছে যাঁরা পড়েছেন তাঁরা জানবেন যে, তিনি ছাত্রদের ঠিক আদেশ করতেন না, যেন ব্যাপারটা তাঁর থেকে ছাত্রই ভালো বোঝে, এরকম একটা ভাব করে মৃদুস্বরে প্রস্তাব পাড়তেন। প্রভাতবাবুর নাম শুনিনি বুঝতে পেরে একটু যেন বিস্ময় প্রকাশ করেছিলেন। আমি থাকি কনভেন্ট রোডে, অথচ ইস্টএন্ড প্রিন্টার্সের নাম শুনিনি, তা কেমন করে হয়—এ গোছের কিছু একটা বলেছিলেন। ইস্টএন্ডের কাজ শুরু হয় ১৫ নম্বর কনভেন্ট রোডে ১৯৫০ নাগাদ, বছরখানেক বাদে ছাপাখানা উঠে আসে ৩ নম্বর সুরেশ সরকার রোডে, বঙ্গবাসী কলেজের প্রতিষ্ঠাতা গিরীশচন্দ্র বসুর

বাড়ির উলটোদিকে। তখন অবশ্য আমি এসব কিছুই জানি না। পাড়ার ছাপাখানার খবর রাখি না বলেই স্যার অবাক হচ্ছেন, এর বেশি কিছু মনে হয়নি। আরেকটা কথাও ভেবে দেখতে বলেছিলেন অরুণবাবু। প্রেসিডেন্সি কলেজ পত্রিকার পুরোনো সংখ্যাগুলির প্রচ্ছদে একটা প্রদীপের ছবি থাকত। ওঁর ইচ্ছে ছিল প্রদীপটিকে যেন আমরা ফিরিয়ে আনি, প্রচ্ছদে না হলেও অন্তত নামপত্রে। তখন আমি নেহাতই অর্বাচীন, ওই প্রদীপের মহিমা একেবারেই বুঝিনি। আর স্যারও বোঝাবার লোক নন, তিনি ধরেই নিতেন প্রেসিডেন্সির ছাত্র হিসেবে আমার যা জানা উচিত, তা আমি নিশ্চয়ই জানি, না জানলে নিজের গরজেই জেনে নেব।

স্বীকার করতে হবে, এসব তথ্য সম্পর্কে কোনো নিষ্কলুষ জ্ঞানস্পৃহা আমার তখন ছিল না, অজ্ঞতার লজ্জা নিবারণের খাতিরেও সেরকম কোনো তাগিদ সেদিন অনুভব করিনি। স্যারের প্রস্তাবের মর্ম বোঝা তখন আমার পক্ষে সম্ভব ছিল না। বরঞ্চ মনে হয়েছিল, দিব্যি তো ছেপেছেন শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেস আগের সংখ্যাটি। ভালো ম্যাপলিথো কাগজে ঝকঝকে লাইনোর কাজ, ভুলের সংখ্যা নগণ্য, ওঁদের ফের ছাপতে বললেই তো চুকে যায়। আর এত কাঠখড় পুড়িয়ে জোগাড় করা গেছে সত্যজিৎবাবুর করা দুটো ডিজাইন, গতবারে নামপত্রে যেটা ব্যবহার করা হয়েছিল সেটাকে এবার প্রচ্ছদ করার কথা, এর মধ্যে আবার প্রদীপের জন্য মন-কেমন কেন? যাই হোক, অরুণবাবুর প্রস্তাব রুদ্রাংশুর কানে পৌঁছে দেওয়া ছাড়া এ ব্যাপারে আর কোনো তৎপরতা দেখিয়েছিলাম বলে মনে পড়ে না। কাগজ শেষমেশ শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেসেই গেল। সত্যজিৎবাবুর কাছ থেকে প্রচ্ছদলিপি জোগাড় করাটা ছিল রুদ্রাংশুর কৃতিত্ব, অতএব প্রচ্ছদ আর নামপত্র এবারও নিষ্প্রদীপ থেকে গেল।

পরের বছর ১৯৭৫ সালে পত্রিকার হীরক জয়ন্তী। এবার আমি সম্পাদক, সচিব ইতিহাসের সুরঞ্জন দাশ। অরুণবাবু ফের পাড়লেন প্রভাতকুমার ঘোষের কথা। আমার মধ্যে অজ্ঞানের মহাতিমির কাটার কোনো লক্ষণ দেখতে না পেয়ে তিনি এবারে খানিকটা উদ্যোগী হলেন। হীরক জয়ন্তী বলে কথা, পত্রিকার ইতিহাসটুকু জানা তো সম্পাদকের কতর্ব্য। এই অজুহাতে তিনি একদিন কলেজের আর্টস লাইব্রেরিতে আমাকে পত্রিকার পুরোনো সংখ্যা দেখাতে বসে গেলেন। এই জিনিসটার লোভ এড়ানো আমার পক্ষে ছিল শক্ত। এভাবে আগেও দেখিয়েছেন তিনি বই, বিশেষত ছবির বই। বইগুলো হয়তো তেমন গুরুচালের নয়, হয়তো কেনেথ ক্লার্কের *লুকিং অ্যাট পিকচার্স*-এর মতো গণপাঠ্য কোনো বই। কিছু ছাপা ছবি, সাদা-কালো কিংবা রঙিন, সঙ্গে কয়েক পঙ্ক্তি লেখা—এর বেশি চমকপ্রদ কোনো উপলক্ষের প্রয়োজন হত না তাঁর। পাশে বসে শুনে যেতে হত নির্জন স্বগতোক্তির মতো তাঁর ইতস্তত ভাষ্য। তার মধ্যেকার সংহতির খোঁজ শ্রোতার কাছে হয়ে উঠত এক মদির দিগ্‌ভ্রান্তির অভিজ্ঞতা, স্বচ্ছ বরফের মতো বাহ্যরূপের পাতলা আস্তরণের নীচে ধরা পড়ত অপ্রত্যাশিত সব রহস্যের চকিত আদল, তলিয়ে যাওয়া ইতিহাসের নানা আবছায়া স্তরের অবয়ব। এক ধরনের উদ্‌বিগ্ন

সংযম থাকত তাঁর ছাড়া-ছাড়া বাক্যে, যেন অসতর্ক প্রগলভতার আলতো চাপ পড়লেই ভেঙে যাবে রেখা বা শব্দের অলৌকিক শরীর, বরফ চূর্ণ হয়ে ঝরে যাবে জল, শিল্পরূপের অন্তর মুঠোয় ধরতে গিয়ে হাত ভরে পাব কেবল নির্বস্তুক ভাষ্যের শূন্যতা।

কথাগুলো বলতে হল, নাহলে হয়তো বোঝা যেত না কেন অরুণবাবুর সঙ্গে বসে বই দেখা এবং বই সম্পর্কে শোনা হয়ে উঠত এক অনন্য মননবিলাস, যার কথা ভাবলে তাঁর টিপ্পনীর পাণ্ডিত্য ছাপিয়ে এক মোহময় উদ্দীপনের স্মৃতিই মনে আসে আগে। সামান্য কলেজ পত্রিকা দেখানোর মধ্যেও ছিল সেই কারসাজি। তেমন কিছু বলছেন না, টেকনিকাল কিছু তো নয়ই। হয়তো পত্রিকার লেখক পুরোনো দিনের ছাত্র ও অধ্যাপকদের কথাই বলছেন বেশি। অথচ তার দৌলতেই আমি টের পাচ্ছিলাম যে, প্রভাতকুমার ঘোষের ছাপার মধ্যে কোথাও একটা মিতি ও সামঞ্জস্য রয়েছে যা অন্যদের ছাপার মধ্যে নেই। বইয়ের বাহ্য বস্তুরূপের যে একটা স্বতন্ত্র মাত্রা আছে সেটা যেন অরুণবাবু ও প্রভাতবাবু আমাকে একসঙ্গে শিখিয়েছিলেন।

খুব সম্ভবত প্রেসিডেন্সি কলেজের শবতর্ষ স্মারক গ্রন্থটিও দেখেছিলাম সেদিন, কিন্তু কলেজ পত্রিকার লেখাপত্র তেমন আহামরি ছিল না। তা-ও কেন বইগুলো মনে দাগ কেটেছিল তার একটা কাঠখোট্টা উত্তর আজ সহজেই দিতে পারি। প্রথম কথা, টাইপফেস বাছাই। পরে জেনেছি যে বেম্বো, বাস্কারভিল ও টাইমস রোমান—এই তিনটে ফন্ট দিয়েই কাজ সারতেন প্রভাতবাবু। কিন্তু সব বিষয় সব টাইপে ভালো খোলে না। আমেরিকার স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র ছাপা হয়েছিল ক্যাসলন টাইপে, ওঁর সাধ ছিল ওই হরফে ইতিহাসের বই ছাপবেন, হয়ে ওঠেনি। পয়েন্টসাইজ ও পাতার মাপের মধ্যে, মার্জিন ও লাইনের মাঝখানের ফাঁকের মধ্যে সূক্ষ্ম অনুপাত যে কোনো পাঠ্যবস্তুর চেহারা তৈরি করে দেয়। পাঠ্যবস্তুর প্রকৃতি সম্পর্কে অজ্ঞ হলে মুদ্রাকর এই জ্যামিতি বিশেষ বোঝেন না, আন্দাজে বা প্রকাশকের কথা মেনে কাজ সারেন। এখানেই প্রভাতকুমার ছিলেন অনন্য, অন্তত এদেশে। সে কথায় আসছি পরে।

টাইপফেস ও টাইপের মাপ বাছাই হল প্রাথমিক ধাপ, তারপর যেটা জরুরি সেটা ইমপ্রেশনের পরিচ্ছন্নতা। আজকাল কমপিউটারে স্কেলেব্‌ল ফন্ট্ তৈরি করা সহজ, কমপোজিশন থেকে প্লেট করাও পুরোপুরি যন্ত্রনির্ভর। হট মেটাল প্রযুক্তির যুগে এ কাজ কতটা কঠিন ছিল তা বুঝতে বেশ তরিবত লাগে। শুনেছি প্রভাতবাবু তন্ন তন্ন করে খুঁজে বার করতেন শহরের দক্ষতম কারিগরদের, তাদের গরিবখানায় পড়ে থেকে বানিয়ে নিতেন নিখুঁত ও মসৃণ হরফ, বিদেশ থেকে ছাঁচ আর হরফ আমদানি করতেন অনেক মেহনত করে। প্রথমে ট্রেড্‌ল্ মেশিন দিয়ে কাজ শুরু করেছিলেন, পরে বড় ফ্ল্যাট যন্ত্রে ছাপতেন। লাইনো ও মোনোটাইপেও কাজ করেছিলেন পরে। লাইনো ও মোনো কমপোজিং-এর কল, এগুলোতে ছাঁচে হরফ ঢালাই হয় কমপোজিশনের সঙ্গে সঙ্গেই। কিন্তু যন্ত্রে কমপোজ করা হলেও ছাপার কাজটা হয় সনাতন লেটারপ্রেস প্রণালীতে। আজও ইস্টএন্ডের সেই কাজের মসৃণ ইমপ্রেশন দেখলে অবাক হতে হয়।

ইমপ্রেশন বা ছাপার কাজটা হয় শেষে, তার আগের কয়েকটা ধাপ আছে। কেবলমাত্র সুন্দর সমঞ্জস টাইপ হলেই হবে না, ইমপোজিশনের কাজও হওয়া চাই নির্ভুল। যে হরফগুলো দিয়ে পড়ার জিনিসটা কমপোজ করা হল, তাকে পৃষ্ঠায় ভাগ করে একটা কাঠের ফ্রেমে বাঁধতে হয় এমনভাবে যাতে কাগজের শিট ছেপে ভাঁজ করলে পরে পাতার অনুক্রম নির্ভুল থাকে। এর পর পারফেক্টিং, অর্থাৎ ওরকম আরেকটা ফ্রেমে-আঁটা ধাতুর পৃষ্ঠার বিন্যাস থেকে শিটের উলটোদিক এমনভাবে ছাপা যাতে ভাঁজ করলে পাতার দুই পিঠের মধ্যে ক্রমভঙ্গ না হয়। এই কাজে দক্ষতা প্রয়োজন, বিশেষত যাকে কপি-ফিটিং বলে, অর্থাৎ একটি পৃষ্ঠায় পাণ্ডুলিপির কতটা আঁটতে পারে সে সম্পর্কে আন্দাজ, তা যথেষ্ট পাকা না হলে নানা বিপত্তির সম্ভাবনা থাকে। এসব দক্ষতা অন্য প্রেসেরও ছিল। কমপোজিটররা কাজ করতে করতেই সব মারপ্যাঁচ রপ্ত করে নিতেন। কিন্তু আরো কিছু জিনিস আছে যা সে যুগের ছাপায় মোটেও সুলভ নয়। যেমন পৃষ্ঠার মোট আয়তনের সঙ্গে যে চতুর্ভুজ জায়গাটুকুতে ছাপা হবে তার অনুপাত। প্রিন্ট এরিয়ার মাপজোকের কিছু অঙ্ক আছে, কিন্তু সবটাই 'গোল্ডেন সেকশন' জাতীয় আঁক কষে হয় না, রুচি ও সামঞ্জস্যবোধের দরকার হয়। অবশ্য কমপোজিশন থেকে বাঁধাই পর্যন্ত প্রতিটি ধাপের টেকনিকাল দিকগুলো দখলে না থাকলে কাজে গলদ থেকে যাবার বিপদ আছে। এ কারণেই অনেক বইয়ের ইমপোজিশন ঠিকঠাক হয় না। যেমন, মুখোমুখি দুটো পৃষ্ঠার লাইনগুলো বই বন্ধ করলে এ ওর গায়ে খাপে খাপে বসে যায় না। বাঁধাইয়ের পরে মার্জিন আর গাটারের মাপে, অর্থাৎ প্রিন্ট এরিয়ার লম্বালম্বি দিকটার দু-পাশে যে সাদা জায়গা ছাড়া হয় বা দুই কলামের মাঝখানে যে ফাঁকা জায়গা থাকে তার মাপে, গরমিল ধরা পড়ে।

একই কথা বলা যায় হরফের রেজিস্ট্রেশন নিয়েও। অনেক বইয়ের পাতা আলোতে ধরলে দেখবেন পিঠোপিঠি পঙ্‌ক্তিগুলো ঠিক একই রেজিস্টারে বসেনি, মানে এক পাতার দুটো লাইনের ফাঁক দিয়ে অন্য পাতার লাইনের ছায়া দেখা যাচ্ছে। যে বইয়ে অঙ্ক, ছবি, সারণি, মানচিত্র ইত্যাদি আছে, তাতে এ জিনিস বেশি ঘটে। হয়তো তা পুরোপুরি এড়ানো সম্ভব নয়। কিন্তু প্রকাশনা শিল্পে যাকে 'ট্রেড বুক্‌স্' ও 'ফিক্‌শন' বলে, যা কিনা বৈজ্ঞানিক ও টেকনিকাল বই ও পাঠ্যপুস্তকের চেয়ে আলাদা, তাতে রেজিস্ট্রেশনের অমন খুঁত বাঞ্ছনীয় নয়। তবে এই ত্রুটি সবচেয়ে বেশি দেখা যায় পত্র-পত্রিকায়। বিভিন্ন মাপের নানা গোত্রের লেখা, তৎসহ ছবি, বিজ্ঞাপন, সময়ের অভাব—এতসব দৌরাত্ম্যের মধ্যে ভালো কাজ করা কঠিন। প্রভাতবাবু বেছে বেছে কয়েকটি বিদগ্ধ জার্নাল ছেপেছেন, তাতে পঙ্‌ক্তিসংস্থান প্রায় নিখুঁত। শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেসের কাজও ছিল চমৎকার। কিন্তু কলেজ পত্রিকার যে দুটি সংখ্যার কথা গোড়ায় বলেছি, তাতে ছাপাখানার ভাষায় 'এন্ড মেক আপ' করা সত্ত্বেও, অর্থাৎ প্রতিটি লেখা যাতে প্রিন্ট এরিয়ার তলায় এসে শেষ হয় তেমনভাবে ইমপোজ করা হলেও, এ ব্যাপারে খুঁত থেকে গেছে। এর আগেও কলেজ পত্রিকা ছেপেছিলেন শ্রীগৌরাঙ্গ। আমার হাতের

কাছেই রয়েছে এরকম একটি সংখ্যা, ১৯৫৭ সালে ছাপা। সাড়ে নয়, সাড়ে ছয় মাপের বইটিতে এক পৃষ্ঠার ভেতরেই একটি লেখা শেষ হয়ে আরেকটি শুরু হচ্ছে, মনে হয় তার ফলেই সে সমস্ত পাতার রেজিস্টার মার্কস প্রায় অবান্তর হয়ে গেছে। অন্যদিকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগের জার্নাল *এসেস অ্যান্ড স্টাডিজ*-এর ১৯৬৮ সালের সংখ্যা দেখছি প্রভাতবাবুর ছাপা। একই ফর্ম্যাট, একই টাইম্স রোমান হরফ, কিন্তু রেজিস্ট্রেশন ও ইমপোজিশনে সামান্যতম ভুলচুক নেই। পুরোনো ছাপাখানায় একটা কথা খুব চালু ছিল। কমপোজিশন করার পর ধরা হয় ইমপোজিশনের কাজ, কিন্তু ঝানু ডিজাইনার ইমপোজিশন কীরকম হবে ঠিক করে তবেই কমপোজিশনের খুঁটিনাটি ঠিক করেন। প্রভাতবাবুর কাজ দেখলে টের পাওয়া যাবে যে, তিনি ঠিক এটাই করতেন।

রেজিস্ট্রেশনের কাজ আজকাল প্রায় পুরোটাই যন্ত্রনির্ভর, ইংকিং-এর কাজও তাই। তবু হামেশাই দেখা যায় বইয়ে কালি সর্বত্র ঠিক সমান ঔজ্জ্বল্যের নয়। প্রভাতবাবুর যুগে এই কাজটি ছিল ঢের বেশি যত্ন ও শ্রমের ব্যাপার। নানা গ্রেডের কালির হাড়হদ্দ জানতে হত, রোলারের যত্ন নিতে হত, কাগজে কালি শুকোবার বিভিন্ন উপায়ের খোঁজ রাখতে হত, টিম্পান বা সিলিন্ডারের ড্রেসিং শিখতে হত, কী ধরনের ড্রেসিং বা প্যাকিং লাগবে তা বুঝতে ফর্মে শিসের ওজন কত হবে তা হিসেব করতে হত আগেভাগে, ছবি ছাপার কাজে সেট-অফ্ ঠেকাবার নানা কায়দা জানতে হত। সুরেশ সরকার রোডের ইস্টএন্ড প্রিন্টার্স-এ সীমিত পুঁজি ও পুরোনো যন্ত্র নিয়ে এতসব স্তর বেরিয়ে এমন মসৃণ ইংকিং কী করে সম্ভব হত তা নিয়ে বিস্ময় প্রকাশ করেছেন বিদেশের একাধিক বিশেষজ্ঞ।

অরুণবাবুর অনুরোধ রাখা সেবারও আমার পক্ষে সম্ভব হয়নি। পরপর দু'বছরের বাবুয়ানির পর ম্যাগাজিন তহবিল ফের তলানিতে ঠেকেছে। হীরক জয়ন্তী বলে পত্রিকার কলেবর বড়সড়ো, ফলে সস্তায় কাজ সারতে হয়। তা-ও কুলোতো না। মুখ্যমন্ত্রী সিদ্ধার্থশংকর রায় কলেজের প্রাক্তন ছাত্র, তার ওপর অধ্যক্ষ প্রতুল মুখোপাধ্যায়ের বন্ধু। তাঁর কাছ থেকে বলেকয়ে কিছু টাকা পাওয়া গেল, তাতে কোনোমতে শেষরক্ষা হয়। প্রভাতবাবু প্রেসিডেন্সি কলেজের থেকে তাঁর দস্তুর বুঝে নিতেন না, তিনিও এই কলেজে ইংরেজি পড়েছেন দু'বছর, ১৯৩৭ থেকে ১৯৩৯ পর্যন্ত। কিন্তু তাতেও খরচটা নাগালের বাইরে চলে যাচ্ছিল। তাছাড়া অন্য অসুবিধে ছিল। তিনি সাধারণত একটা বইয়ের কাজ শেষ না করে আরেকটাতে হাত দিতেন না; কাগজের মান নিয়ে খুঁতখুঁত করতেন। আমাদের কাজ সস্তায় করতে গিয়ে টাইপ ও মেশিন আটকে থাকবে, ওঁর পছন্দমতো কাগজের জোগানও আমরা দিতে পারব না। সরকারের কাছে বিল দিয়ে সময়মতো টাকা পাওয়া যায় না, রেট নিয়েও চলে টালবাহানা! এতটা ক্ষতিস্বীকার করতে তাঁকে বলতে বাধল। শেষমেশ কাগজ বেরোল ওয়েলিংটনের মডার্ন ইন্ডিয়া

থেকে, বাংলা অংশ ছেপেছিলেন ব্যবসা ও বাণিজ্য প্রেস। সংখ্যাটিতে বেশ কয়েকটি মূল্যবান লেখা ছিল, তবে সেটা দেখতে হয়েছিল বিতিকিচ্ছিরি। প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি ফণিভূষণ চক্রবর্তীর একটি স্মৃতিচারণ ছিল। যতবার প্রুফ দেখে দেন ততবার লাইনোতে নতুন করে গোটা লাইন কমপোজ করতে হয়, আর ততবারই নতুন নতুন ভুল বেরোতে থাকে। শেষমেশ সংশোধনী জুড়ে দিতে হয়। তাতেও আধডজন ভুল। লেখকের ধাতানি খেতাম প্রতি সপ্তাহে, তার ভয়াল ভাষাবৈচিত্র্য ও প্রাণান্তক উচ্চগুতা একবার হজম করতে পারলে জীবনের হরেক দুর্গতি জলভাত হয়ে যায়। ফণিবাবুকে দোষ দিই কী করে। চঞ্চলকুমার মজুমদার দিয়েছিলেন প্ল্যাংকের সূত্র সম্পর্কে সত্যেন বসুর যুগান্তকারী রচনার সটীক বাংলা অনুবাদ। দুটি প্রেসের কোনোটিতেই গ্রিক হরফ ছিল না। অন্য জায়গা থেকে আনিয়ে কমপোজ করাতে গিয়েও বিপদ, কমপোজিটর ওই হরফ পড়তে পারেন না। শেষে আমাকেই পড়ে দিতে হবে সেই লেখা। আমাদের ব্যাচের সুমিতরঞ্জন দাশ পদার্থবিদ্যার তুখোড় ছাত্র। তাকে টেলিফোনের অপর প্রান্তে আটকে রেখে একের পর এক কূট প্রশ্ন করে যাই: 'ওরে শোওয়ানো ডব্লুটা কী? সিগমা না এপসাইলন?' উত্তর পাই; 'পুরো ইকুয়েশনটা পড়, কী বললি, আচ্ছা ওটা সিগমা।' মেধা ও সংযোগ-মাধ্যমের কী বিচিত্র সমবায়ে সত্যেন বসুর অবদান তাঁর প্রিয় মাতৃভাষায় পাঠক পড়তে পেলেন তা সুযোগ পেয়ে জানানো গেল।

অবশ্য আমার খেদ ছিল না। মডার্ন ইন্ডিয়া থেকে তখন *ফ্রান্টিয়ার* ছাপা হত, ওই প্রেসে না গেলে সমর সেনকে চর্মচক্ষুতে দেখা হত না, তা-ও আবার জরুরি অবস্থার সেন্সরশিপের সময়। ওদিকে এমার্জেন্সির বাজারে লেখা ছাপার ব্যাপারে কলেজের ইউনিয়ন নেতৃত্বের সঙ্গে দর কষাকষি (জয়প্রকাশ নারায়ণের বিরুদ্ধে একটা জোলো লেখা ছেপে অন্য একটি বিপজ্জনক লেখার ঠাঁই করে দিতে পেরেছিলাম), রাজনৈতিক উত্তেজনা, ধরপাকড়, আমার বি.এ. পরীক্ষায় বিপর্যয়—বেবাক ডামাডোলে পত্রিকার চেহারার কথা প্রায় ভুলেই গিয়েছিলাম।

পত্রিকা যতদিনে বেরোলো ততদিনে আমি যাদবপুরে এম.এ-র ছাত্র। সেখানে প্রভাতবাবুর ছেলে অশোক ঘোষ আমার মাস্টারমশাই, মৃদুকণ্ঠে থেমে-থেমে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে খুঁতখুঁতে ভঙ্গিতে পড়াচ্ছেন ড্রাইডেনের *এসে অন ড্রামাটিক পোয়েসি।* দেখে চিনতে পেরেছিলাম পাড়ার লোক। ওঁর মামাতো ভাই জয়ন্ত সুরকে আগে থাকতেই চিনতাম, জয়ন্তর কাছে অশোকদার কথা শুনেছিলাম। এবার দুয়ে-দুয়ে চার করে বুঝে নিলাম এঁরই বাবার ছাপাখানায় আমাকে পাঠাতে দু-বছর ধরে লড়ে যাচ্ছিলেন অরুণবাবু।

অশোকদার সঙ্গে পরিচয়ের সূত্রেই প্রথম দেখি প্রভাতবাবুকে। সেটা ১৯৮৫ সালের শেষদিক। ওই বছর জানুয়ারি মাসে যাদবপুরে শেক্সপিয়র সম্পর্কে একটি সেমিনার হয়, আর ওই বছরেরই মাঝামাঝি আমি ওখানে পড়ানোর কাজ পাই। সেমিনারের প্রবন্ধগুলি জড়ো করে জার্নালের একটি বিশেষ সংখ্যা প্রকাশের তোড়জোড় চলছিল। বিভাগীয় প্রধান নামে সম্পাদক হলেও সম্পাদনার পুরো কাজটাই ছিল

অশোকদার হাতে, আর বইটা ছাপা হচ্ছিল ইস্টএন্ড-এ। অশোকদা আমাকে জুটিয়ে নিলেন সেই কাজে।

সম্পাদনার কাজে আমার হাতেখড়ি অশোকদার কাছে। শুধু 'সম্পাদনা' বললে ব্যাপারটা ঠিক বোঝানো যায় না। এক ধরনের পণ্ডিত সম্পাদক আছেন যাঁরা পুথি-পাণ্ডুলিপির প্রামাণ্যতা বিচার করেন, পাঠ নির্ণয় করেন, পাঠান্তর ইত্যাদির কারণ খোঁজেন, সে সম্পর্কে টীকা রচনা করেন। এজন্য দরকার ধ্রুপদি ভাষার অনুশীলন, লেখা ও ছাপার প্রযুক্তি সম্পর্কে জ্ঞান, বইয়ের ইতিহাস নিয়ে গবেষণা, পাঠ নির্ণয়ের তত্ত্ব বিষয়ে ব্যুৎপত্তি। আমার তৎকালীন পরিচিতদের মধ্যে অশোকদার চেয়ে এ ব্যাপারে যোগ্যতর কেউ ছিলেন না। যদিও এ ধরনের কাজ করার সুযোগ তিনি কখনো পাননি। আর এক ধরনের সম্পাদক কোনো সংকলন বা পত্রিকার পরিকল্পনা করেন, নানা সূত্র থেকে লেখা জোগাড় করে, কখনো কখনো নিজের ভাষ্য যোগ করে, একটা বইয়ের মধ্যে পুরে দেন। এই কাজে অশোকদার আদৌ কোনো উৎসাহ ছিল বলে মনে হয় না। এর পরের পর্যায়ে থাকেন প্রকাশকের সম্পাদক। তাঁরা বইটির সামগ্রিক চেহারা ও মুদ্রিতব্য বস্তুর উপস্থাপনার দিকটি দেখেন, এবং কখনো নিজেরা, কখনো বাইরের কপি এডিটরের সাহায্যে, পাঠ্যবস্তুটিকে যথাসাধ্য ত্রুটিমুক্ত ও সংগতিপূর্ণ করার চেষ্টা করেন। এই শেষোক্ত ধরনের সম্পাদনাই করতেন প্রভাতবাবু ও অশোকদা, যদিও তাঁদের কাজ ঠিক চেনা চৌহদ্দির মধ্যে বেঁধে রাখা যেত না।

ওই শেক্সপিয়র সংক্রান্ত সংখ্যাটির প্রুফ নিয়ে একদিন সকালে অশোকদা আমাদের বাড়ি এলেন। জিজ্ঞেস করলেন আমার কাছে পাস্‌কালের কোনো ফরাসি সংস্করণ আছে কি না। আমার ফরাসি বিদ্যের দৌড় নিতান্তই প্রথম ভাগ-দ্বিতীয় ভাগ গোছের, তবু ভাগ্যবশত *Pensées*-এর একটা দ্বিভাষিক এডিশন ছিল, মুখোমুখি পৃষ্ঠার একদিকটায় মূল ফরাসি, অন্যদিকটায় এইচ. এফ. স্টুয়ার্টের ইংরেজি তরজমা। ম্যাসাচুসেট্‌সের স্মিথ কলেজের একজন বাঙালি অধ্যাপক পাঠিয়েছেন *অ্যান্টনি অ্যান্ড ক্লিওপ্যাট্রা* সম্পর্কে নিবন্ধ রচনা, লেখার শেষে এক পাদটীকায় আছে পাস্‌কাল থেকে ফরাসি উদ্ধৃতি, la fins des choses et leur principe sont pour lui invicìblement cachés dans un secret impénétrable'। মানে, সৃষ্টির নিয়তি ও নীতিনিয়ম মানুষের কাছে চিরতরে রহস্যাবৃত। ওই fins des choses-এ এসে ধাক্কা খেয়েছেন অশোকদা। বই খুঁজে জায়গাটা বার করা হল, দেখা গেল খটকা অমূলক নয়, ওটা হবে fin des choses, প্রথম শব্দটার পর কোনো 's' নেই। যেন বিরাট কোনো সংকট থেকে তাঁকে উদ্ধার করেছি আমি, এরকম একটা মুখ করে পরিত্রাতার হাতে একগুচ্ছ প্রুফ তুলে দিয়ে উঠে পড়লেন অশোকদা।

প্রুফের গোছা নিয়ে পরদিন হাজির হয়েছিলাম প্রেসে। এক কোণে একটা বড় টেবিলের পেছনে বসেছিলেন প্রভাতবাবু, তাঁর ধবধবে ধুতি পাঞ্জাবির সঙ্গে চারপাশের ময়লা আর কালির বৈপরীত্য ছিল চোখে পড়ার মতো। এই পোশাকেই দেখেছি তাঁকে তার পর থেকে, কোট-টাই পরা অবস্থায় তাঁর ছবি দেখেছি কেবল। শীতকালে ঈষৎ

অন্যরকম, ঝোলা-হাতা রঙিন পশমের পাঞ্জাবি, কাঁধে চাদর বা শাল, আর পাম্প শু-র সঙ্গে মোজা। অধ্যাপকসুলভ সৌম্য চেহারা, ব্যাকব্রাশ করা চুলে সামান্য পাক, চোখে মোটা কালো ফ্রেমের চশমা—চলনে-বলনে সবরকম আদিখ্যেতার প্রতি অবজ্ঞা খুব স্পষ্ট। দুর্মুখ নন, তবে ঠোঁটকাটা অবশ্যই। প্রথমেই খানিক হেসে বললেন, 'কী যে ইংরেজি লেখো তোমরা আজকাল, আমি কিছুই বুঝি না।' কথাটার মধ্যে মৃদু ভর্ৎসনার আভাস পেয়ে বলার চেষ্টা করলাম যে, ওতে আমার লেখা নেই। লেশমাত্র প্রতিক্রিয়া দেখা গেল না। ইংরেজি তরজমায় ফের বললেন ওই একই বাক্য, 'I don't follow the English you write nowadays.' পালিয়ে বাঁচলাম।

প্রভাতবাবুর মৃত্যুর পর অশোক মিত্র একাধিক জায়গায় লিখেছেন ও বলেছেন যে, তিনি আদতে ছিলেন একজন শিক্ষক। সেদিন বুঝিনি যে, ওই বাক্যটি দিয়েই তিনি শুরু করেছিলেন আমাকে শেখানো। এর বহুবছর পর তিনি আমাকে পড়তে দিয়েছিলেন স্ট্যানলি মরিসনের লেখা *ফার্স্ট প্রিন্সিপল্স অফ টাইপোগ্রাফি* নামে ছোট্ট বই, যেটি গোড়ায় ছিল *এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকা*-র একটি প্রবন্ধ। সেখানে একটি বাক্যের নীচে প্রভাতবাবু কলমের দাগ দেখতে পাই : 'In all permanent forms of typography, whether publicly or privately printed, the typographer's only purpose is to express, not himself, but his author.' এর আগে নিবন্ধের দ্বিতীয় অনুচ্ছেদের প্রথম বাক্যটির মার্জিনেও রয়েছে তাঁর কলমের খাড়া দাগ : 'Typography may be defined as the art of rightly disposing printing material in accordance with specific purpose; of so arranging the letters, distributing the space and controlling the type as to aid to the maximum the reader's comprehension of the text.' আদর্শ মুদ্রাকর মুছে ফেলবেন তাঁর উপস্থিতির সমস্ত চিহ্ন, নিজেকে আড়াল করে লেখকের অভিপ্রায় আর পাঠকের বোঝার মধ্যে সব ফাঁক ভরানোর দায় তাঁর। লেখকের অভিপ্রায়ের নিরঙ্কুশতা আর পাঠকসত্তার ঐক্য সম্পর্কে এরকম আস্থা আজ পশ্চিমের চিন্তায় নেই, টেক্সটের টেক্সটধর্মিতা সচেতনভাবে জাহির করার গরজও তাই বেড়ে গেছে বহুগুণ। প্রভাতবাবু বই ছাপতেন ইংরেজিতে, ক্ল্যারেন্ডন প্রেসের মতো নামী বিদেশি ইমপ্রিন্টের জন্যেও তিনি বই করেছেন। দেশের ও বিদেশের ইংরেজি ভাষার কপিই তিনি পড়তেন। ইংরেজির ব্যবহারে, বিশেষত মননধর্মী লেখায়, এমন পরিবর্তন তাঁর ভালো লাগার কথা নয়। যা তিনি আত্মবিলয়ের কঠোর অনুশাসন হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন তার জন্য প্রয়োজন ছিল প্রত্যয়ী লেখকের স্বচ্ছ শৈলী, পাঠক-প্রতিক্রিয়ার অখণ্ডতা সম্পর্কে ন্যূনতম আশ্বাস। যতই ক্ষীণ হয়েছে সেই প্রত্যয় ও আশ্বাস, ভাষা ততই হয়ে উঠেছে আত্মবিড়ম্বিত। সার্থক উত্তর-আধুনিকদের লেখায় এই বিড়ম্বনা এক প্রকার সংকোচ। প্রভাতবাবু সেই সংকোচের চিহ্নগুলিকে ভাষার অহেতুক আত্মপ্রদর্শন বলেই মনে করতেন। অবশ্য নিকৃষ্ট লেখকের বেলা তা নেহাতই ভড়ং, অনুকরণ দিয়ে চিন্তার দৈন্য ঢাকার কসরত। আর আমরা বেশির ভাগ নিকৃষ্টদের দলেই পড়ি।

টাইপোগ্রাফি সম্পর্কে যা বলেছেন মরিসন, তা বলা যেত সম্পাদনার বিষয়েও, অর্থাৎ পাবলিশার্স এডিটর ও কপি এডিটরের কাজ সম্পর্কেও। আগেই বলেছি, এই দুই ধরনের সম্পাদনার মিশ্রণই দেখা যেত প্রভাতবাবুর কাজে, যদিও তাঁর কাজ কোনো বাঁধা ফর্মুলায় ফেলা শক্ত। এ পর্যন্ত এই দু-ধরনের কাজের মধ্যে তফাতের কথা বলিনি, কাজগুলির সঙ্গে অ্যাকাডেমিক এডিটিং ও সংকলনের কাজের ভিন্নতা নির্দেশ করেছি কেবল। প্রকাশকের সম্পাদক ও কপি এডিটরের স্বতন্ত্র কর্মবৃত্ত সম্পর্কে এখানে কয়েকটি কথা বললে হয়তো প্রভাতবাবুর কাজের ব্যাপ্তি বুঝতে সুবিধে হতে পারে। ব্রিটিশ ফেডারেশন অফ মাস্টার প্রিন্টার্স এবং দ্য পাবলিশার্স অ্যাসোসিয়েশনের একটি জয়েন্ট ওয়ার্কিং পার্টি ১৯৭০ সালে যে প্রতিবেদন প্রকাশ করেন তাতে বলা হচ্ছে যে, প্রকাশকের সম্পাদকের কাজ হল (১) কপি যাতে সম্পূর্ণ ও তথ্যের দিক থেকে নির্ভুল হয় তা সুনিশ্চিত করা; (২) কপির ভাষা প্রাঞ্জল করা ও সমস্ত অস্পষ্টতা ও পুনরুক্তি দূর করা; (৩) মানহানি, অশ্লীলতা, কুৎসা রটনা ইত্যাদির দায়ে প্রকাশক অভিযুক্ত হতে পারেন এমন সব অংশ বদলানো বা বাদ দেওয়া। এই পর্যায়ে শীর্ষক, সংখ্যা, বিশেষ হরফ ইত্যাদির সমস্যার দিকেও নজর দেবার সুপারিশ করা হয়েছে। কপি এডিটরের দায়িত্ব অন্য। ছাপতে দেবার আগে প্রকাশকের ব্যবহারবিধি অনুসারে বানান, যতিচিহ্ন, অন্বয়, অনুচ্ছেদ ভাগ, সংখ্যা, তারিখ, সারণি ইত্যাদি সংগতিপূর্ণ হয়েছে কি না দেখা তাঁর কাজ।

এ সমস্ত প্রায় সবটাই করতেন প্রভাতবাবু। অনেককাল আগে পশ্চিমের কোনো কোনো ছাপাখানায় 'প্রিন্টার্স রিডার' নামে একটি পদ ছিল। তার কাজ আর প্রকাশকের সম্পাদকের কাজ ঠিক এক না হলেও এদের মধ্যে কিছু কিছু মিল ছিল। কিন্তু এদেশের কথা বাদ দিন, বিদেশেও পদটি বহুদিন হল লুপ্ত। প্রভাতবাবু কাজটা করতেন বিনা পারিশ্রমিকে, নিজের গরজে। ১৯৯৮ সালের ১৫ মার্চ 'দ্য হিন্দু' কাগজে ক্রিস্টোফার হার্স্ট প্রভাতবাবুকে নিয়ে একটি নিবন্ধ লেখেন। তাতে তিনি লিখেছেন যে, কপিতে প্রভাতবাবুর সবুজ কালিতে লেখা প্রশ্ন ও সংশোধন দেখে তিনি ভেবেছিলেন ইস্ট-এন্ড-এ একজন প্রিন্টার্স রিডার এই ঘোর কলিতেও আছেন। বহু বছর পর কলকাতায় তাঁর সঙ্গে সাক্ষাতের পর হার্স্ট বুঝতে পারেন যে, রিডার প্রেসের মালিক স্বয়ং। পঞ্চাশের দশকে এই কাজে তাঁকে সাহায্য করতেন প্রতাপ বন্দ্যোপাধ্যায়, তিনি ছাপাখানাতেই রাত কাটাতেন বলে শুনেছি। সত্তরের দশক থেকে এ ব্যাপারে তাঁর সহায়ক ও সমালোচক অশোকদা।

এত পরিশ্রম করে কপি তৈরি করার ফলে প্রভাতবাবু বই ছাপতেন কম। ছাপাখানা থেকে তাঁর আয় যা হতে পারত তার চেয়ে কমই হত। হরফ ম্যাট্রিক্স ইত্যাদি আমদানি করতে তিনি যে টাকা খরচ করতেন তা ব্যাংকে রাখলেও বেশি আয় হত—একথা অশোকদা বহুবার বলেছেন বাবাকে। প্রত্যেকবার একই জবাব পেতেন, 'এটা আমার কাজ।' অথচ লেখা বা লেখক পছন্দ হলে নামমাত্র রেটে বই ছাপতেন।

বেছে বেছে বই নিতেন বলে রেটটা অন্যদের চাইতে বেশিই ছিল, আবার সময়ও লেগে যেত অনেক। এই নিয়ে অক্সফোর্ড ইউনিভারসিটি প্রেসের এক সাহেব ডেপুটি ম্যানেজার কিছু কথা তোলায় প্রভাতবাবু তাঁর সঙ্গে দেখা করেন। ওইউপি-র আপিসে নয়, এন্টালিতে তাঁর নিজের ছাপাখানায়। ঝাড়া তিন ঘন্টা ধরে প্রভাতবাবুর বকুনি শোনার পর সাহেব মাফ-টাফ চেয়ে চলে যান। হার্স্ট গল্পটা বলেছেন তাঁর লেখায়, একটু অন্যভাবে সেটা আমাকে শুনিয়েছিলেন প্রভাতবাবু। সাহেবকে তিনি বলেন, ভালো বই চাইলে তাঁকে তাঁর রেট তো দিতেই হবে, উপরন্তু তাঁর শিডিউল মেনে নিয়ে হাঁ করে বসে থাকতে হবে, 'you shall also have to dance attendance upon me'। এভাবে সোজাসুজি কথা বলতেন বলে তাঁকে ভয় করতেন অনেকে, কেউ কেউ ধৈর্য হারাতেন হয়তো। কিন্তু গুণী লেখকদের মধ্যে যাঁদের স্পষ্টবাদী বা বদমেজাজি বলে খ্যাতি আছে, যেমন সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত, অশোক মিত্র বা রণজিৎ গুহ, তাঁরা প্রভাতবাবুর হাতে পাণ্ডুলিপি সঁপে দিয়ে পরম নিশ্চিন্তে দিন গুনতে রাজি ছিলেন।

প্রভাতবাবুর মৃত্যুর পর 'দ্য টেলিগ্রাফ' কাগজে এক নিবন্ধে রুকুন আদবানি তাঁকে শ্রীরামপুরের মিশনারি মুদ্রাকরদের সঙ্গে তুলনা করেন। কারো কারো হয়তো রেনেসেন্সের হিউম্যানিস্ট মুদ্রাকর বা উনিশ শতকের বাংলার রামমোহন-বিদ্যাসাগরের কথা মনে হতে পারে। কিন্তু এঁরা প্রিন্টার হলেও মূলত হয় লেখক, নয় টীকাকার, নয় অনুবাদক, নয় সম্পাদক, নয় প্রযুক্তিবিদ। প্রভাতবাবু নিছক প্রিন্টার। বৈদগ্ধ্য ও শিল্পবোধ, মেধা ও কায়িক শ্রম, নিষ্ঠা ও আপোসহীনতার এমন সমন্বয়ের নজির আর কোনো পেশাদার মুদ্রাকরের মধ্যে পাওয়া যাবে কি না সন্দেহ। আদবানি লিখেছেন, 'In his line of bunsiness, there will never be anyone like him, ever.' বাড়িয়ে বলেননি। হার্স্ট লিখেছেন যে, প্রভাতবাবুর দুঃখ ছিল তিনি ভারতীয় মুদ্রণের মান বাড়াতে সফল হননি। কিন্তু তাঁর কাছে হাতেকলমে মুদ্রণ না হোক সম্পাদনা শিখেছেন এরকম অনেকেই আজ নিজেরা প্রকাশক। যেমন রবি দয়াল, উর্বশী বুটালিয়া, রুকুন আদবানি। এঁদের করা ইংরেজি বই পৃথিবীর যে কোনো জায়গায় প্রকাশনা মানের বিচারে উতরে যাবে। একই কথা বলা যায় বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য, অনজুম কাটিয়াল বা শমীক বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত বই সম্পর্কেও। এঁরা প্রত্যেকেই কোনো না কোনো সময় প্রভাতবাবুর কাছে শিক্ষানবিশি করেছেন। আমার নিজের সন্দেহ, প্রভাতবাবুর তাঁর এই সাফল্যের কথা মনে মনে ভালোই জানতেন।

১৯৮৮ সালের সেপ্টেম্বরে আমি বিদেশ যাই, ফিরে আসি ঠিক তিন বছর বাদে। জলপানির শর্ত মেনে বিশ্ববিদ্যালয় আমাকে তিন বছরের সবেতন ছুটি দেয়। এ-সময়টাতে বেশ কিছু মাস আমার মাইনে তুলে বাংকে জমা করতেন অশোকদা। ফিরে আসার পর প্রায়ই বলতেন, তোমার যা টাকা জমেছে তা ভেবেচিন্তে লগ্নি করো, কিন্তু

তা আমার আর করে ওঠা হয়নি। মনে হয়েছিল, অশোকদার মধ্যে কেমন যেন অস্থিরতা এসেছে, বড্ড টাকা-পয়সা নিয়ে চিন্তা করছেন। পরের বছর একদিন সন্ধ্যায় বাড়ি এলেন অশোকদা এক কাজে, চলে গেলেন তাড়াতাড়ি। তার দিন কয়েক পরে একই সময়ে এলেন প্রভাতবাবু। আমাদের বাড়ির একতলায় বসেন ডাক্তার বিশ্বনাথ চক্রবর্তী, আমার আবাল্য বন্ধু। তাঁর চেম্বার থেকেই উঠে এসেছেন। কোনোরকম নাটকীয়তা ছাড়াই জানালেন অশোক গুরুতর অসুস্থ, বাড়াবাড়ি রকমের হেপাটাইটিস। পরের দিন সকালে শুনলাম তাঁকে নিয়ে যাওয়া হয়েছে কোঠারিতে।

হাসপাতালে একবারই দেখা করতে পেরেছিলাম অশোকদার সঙ্গে। বেশির ভাগ সময়টা কাটত হাসপাতালের লবিতে। অনেকেই বলেছেন যে, ছেলের অকালমৃত্যুর ফলে প্রভাতবাবু প্রেস বন্ধ করে দেন। পুত্র অশোক বা কন্যা অনীতার উৎসাহ থাকলে প্রভাতবাবু হয়তো যুগোপযোগী প্রযুক্তিতে বিনিয়োগ করতেন, অশোকদা বেঁচে থাকলে সম্ভবত কাজ চালিয়ে যেতেন আরো কিছুদিন। কিন্তু লেটারপ্রেস গুটিয়ে ফেলার সিদ্ধান্ত তিনি অশোকদার মৃত্যুর আগেই নিয়েছিলেন। যুক্তফ্রন্ট সরকারের আমলে তাঁর ছাপাখানায় শ্রমিক আন্দোলন সংগঠিত করার চেষ্টা হয়, সেই সময়কার লাঞ্ছনার স্মৃতিও তাঁকে মাঝেমাঝে নিরুদ্যম করে তুলত। তাঁর আশঙ্কা ছিল যে, তাঁর কোমল স্বভাবের মুখচোরা ছেলের পক্ষে এই বৃত্তি স্বস্তিকর হবে না। অথচ অনেকটা কর্মচারীদের মুখ চেয়েই তিনি শেষদিকে চালিয়ে গেছেন প্রেস। যে কাজে তিনি তাঁদের দক্ষ করে তুলেছিলেন বাজারে তখন তার কদর কমে আসছে। সত্যিকারের শ্রমকুশলতার সর্বদা কদর ছিল ইস্টএন্ডে। বাবুজান নামে একজন মেশিনম্যানের গুণগ্রাহী ছিলেন প্রভাতবাবু। ১৯৭১-এর পর বাবুজান বাংলাদেশ চলে যান, রঙিন কাজের পুল নেবার সময় প্রভাতবাবু তাঁর অভাব বোধ করতেন। ওপার বাংলায় সুবিধে করতে না পেরে বাবুজান পরে ফিরে আসেন সেই ইস্টএন্ডেই।

আবার এ-ও শুনেছি যে পুত্রশোকে ভেঙে পড়ায় তিনি কারবার তুলে দেন। পুত্রবিয়োগের কষ্ট যত তীব্রই হোক না কেন, 'ভেঙে পড়া' বলতে যা বোঝায় সেরকম কখনোই দেখিনি আমি তাঁকে। অশোকদার মৃত্যুর সময় তাঁর বয়স পঁচাত্তর হবে। ওই বয়সে অসুস্থ পুত্রের সেবা, পরে তাঁর শেয়ার টাকা-পয়সা সামলানো, দুই নাতনির পড়াশোনার তদারকি, প্রেস গুটিয়ে আনার সমস্ত আইনি ঝক্কি পোয়ানো—স্ত্রী ও কন্যার সাহচর্যে তাঁকে এ সমস্ত কর্তব্যই যথাসম্ভব অবিচলিত থেকে করতে দেখেছি।

এর পর প্রায়ই আসতেন—কখনো প্রেস ফেরত, কখনো ডাক্তার ফেরত। আমাদের বসার ঘরে বা অপরিসর বারান্দায় বসে সিগারেট বা বিড়ি ধরিয়ে অনর্গল গল্প করতেন। প্রেসের কথা, নাতনিদের পড়াশোনার কথাই হত বেশি। আর হত এডিটিং নিয়ে কথা—হাতেকলমে কাজ যে করেনি তার সঙ্গে অযথা ছাপার টেকনিকাল দিক আলোচনা করতে চাইতেন না। বিদেশে গ্রন্থতত্ত্ব ও বইয়ের ইতিহাসের সামান্য পাঠ

নিয়েছিলাম ডাকসাইটে বিশেষজ্ঞ ডন ম্যাকেন্‌জির কাছে। ফিরে এসে যাদবপুরে বইয়ের ইতিহাসের একটি কোর্স পড়াতে শুরু করি। তখন বই দিয়েছিলেন বেশ কটি—সন জেনেটের *দ্য মেকিং অফ বুক্‌স*, হিউ উইলিয়ামসনের *মেথড্‌স্ অফ বুক ডিজাইন*, পিটম্যান থেকে ১৯৪৭-এ বার করা *মেকানিকাল টাইপসেটিং*, রুয়ারি ম্যাকলিন-এর *মডার্ন বুক ডিজাইন*, ই. জি. শেপার্ডের *টাইপোগ্রাফি ফর স্টুডেন্টস*, এরকম আরো। ফেরত দেবার কথা তুলতে জিজ্ঞেস করেছিলেন, 'কার জন্যে?'

আর বলতেন প্রেসিডেন্সি কলেজের শিক্ষকদের কথা, শৈলেন্দ্রকুমার সেন, অমল ভট্টাচার্য, কুমুদকান্ত রায়ের মতো সহপাঠীদের কথা। অমলবাবুর প্রতিভার কথা বলতে গিয়ে সেই বয়সেও কেমন বিস্ময় ফুটে উঠত তাঁর মুখে, 'ও-ই ছিল আসল সাহিত্যের ছাত্র, আমরা কেবল রেজাল্ট ভালো করতে জানা ছেলে।' কতটা ভালো? ১৯৩৫-এ সারঙ্গাবাদ গ্রাম থেকে ম্যাট্রিকে প্রথম, ১৯৩৭-এ রিপন কলেজ থেকে ইন্টারমিডিয়েটে প্রথম, ১৯৩৯-এ প্রেসিডেন্সি থেকে ইংরেজি অনার্সে প্রথম শ্রেণিতে প্রথম, পয়সাকড়ির অভাবে দু-বছর লেখাপড়ায় ছেদের পর ১৯৪৩-এ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম.এ.-তে প্রথম শ্রেণিতে চতুর্থ। তারপর ছ-মাস বঙ্গবাসীতে পড়ানোর পর বিজ্ঞাপনের জগতে। বিজ্ঞাপনে তাঁর বিশেষ 'ট্যালেন্ট নেই' ধরে নিয়ে ১৯৫০-এ ছাপাখানা খুললেন, বই ছাপা শুরু করলেন ১৯৫২ সালে। ভালো কাজ না করতে পারলে আর কখনো ওই আপিসের ধার মাড়াবেন না, এই কড়ারে ওরিয়েন্ট লংম্যান থেকে কাজের বরাত পান ১৯৫৭-য়। তারপর থেকে ইস্টএন্ড ভারতীয় মুদ্রণশিল্পের কিংবদন্তী।

১৯৯৬ সালে ক্ল্যারেন্ডন প্রেস থেকে আমার প্রথম বই বেরোয়। বইটা টাইপসেট করা হয় পন্ডিচেরিতে, ছাপা হয়েছিল বিলেতের বাথ্ শহরে। সম্পাদনার সময় খুঁটিনাটি সমস্যার কথা বলেছিলাম তাঁকে। বইটা বেরোবার পর হাতে নিয়ে নেড়েচেড়ে দেখেছিলেন। ছাপা নিয়ে কোনো মন্তব্য না করে সটান চলে গিয়েছিলেন ক্ল্যারেন্ডনের জন্য তাঁর করা নানা কাজের গল্পে, লর্ড অ্যালেন বুলকের ছেলে না নাতির সঙ্গে তাঁর কী নিয়ে মতভেদ হয়েছিল সেই প্রসঙ্গে। আমার স্ত্রী উইলিয়াম মরিস সম্পর্কে গবেষণা করেছিলেন। কিন্তু মরিসের কেল্‌ম্‌স্কট প্রেস নিয়ে তাঁকে দিয়ে বিশেষ কিছু বলাতে পারিনি আমরা।

শেষ কথা হয় টেলিফোনে, ২০০৪ সালের নভেম্বর মাসে। ওঁর শরীর খারাপ শুনেছিলাম আমার ডাক্তার বন্ধুর কাছে। নিরুদ্‌বেগ গলায় জানালেন, রোগটা ক্যানসার, একটা অস্ত্রোপচার হয়েছে, এখন যেন না আসি। ৪ ডিসেম্বর প্রভাতবাবু চলে যাওয়ার আগে আর দেখা করার সবুজ সংকেত মেলেনি।

....

কৃতজ্ঞতা : অনীতা কুমার।

প্র ব ন্ধ

রাষ্ট্র-ভাষাতত্ত্বর দিকে

রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য

হালে উপনিবেশ ও উপনিবেশ-উত্তর চর্চা (কলোনিআল অ্যান্ড পোস্ট-কলোনিআল স্টাডিজ) নামে বিদ্যাচর্চার একটি শাখা গড়ে উঠেছে। মূলত (ইংরিজি) সাহিত্যর ক্ষেত্রে এটি বেশি চলে। তবে সাহিত্য ছাড়াও ইতিহাস, বা আরও ব্যাপক অর্থে, সমাজবিজ্ঞানের জগতে অনেকেই এখন 'কো এন পোকো' নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছেন।[১]

'কো এন পোকো' চর্চার প্রভাব ভাষাতত্ত্বর জগতে কতটা পড়েছে, জানি না। কিন্তু গত দুশ বছরে বাঙালির লেখা বাঙলা ও ইংরিজি লেখাপত্র (মূলত সাংবাদিক রচনা ও আলোচনা) নিয়ে নাড়াচাড়া করতে গিয়ে একটি কথা মাথায় এল। সেটি এই : সমাজভাষাতত্ত্ব (সোশিওলিঙ্গুইস্টিক্‌স্‌) বা মনোভাষাতত্ত্ব (সাইকোলিঙ্গুইস্টিক্‌স্‌) বা আরও নতুন জীবভাষাতত্ত্ব (বায়োলিঙ্গুইস্টিক্‌স্‌)[২]-র মতো রাষ্ট্র-ভাষাতত্ত্ব (পলিটিকো-লিঙ্গুইস্টিক্‌স্‌) নামে একটি শাখা খুবই জরুরি। ভাষাতত্ত্বর জগতে আমি নেহাতই আনাড়ি। অন্তত ভাষাতত্ত্ব নামে এখন যা চলে—চমস্কি-অনুসারী, চমস্কি-বিরোধী বা চমস্কি-উত্তর—তার অনেকটাই আমার পক্ষে দুর্গম। ভাষার ব্যাপারে আমার সমস্ত উৎসাহ আর আগ্রহই ব্যাবহারিক। জটিল জিনিস কীভাবে সহজ করে বলা ও লেখা যায়—সেইটে শেখার জন্যেই বাক্যর গড়ন, রচনার রীতি ইত্যাদি বিষয়ে মাঝে মাঝে ঢুকে পড়ি (কেউ কেউ হয়তো একে অনধিকার প্রবেশ বলবেন)।

তবে আমার প্রকল্পিত রাষ্ট্র-ভাষাতত্ত্বর এলাকাটি মোটামুটি দাগিয়ে দেওয়া যায়।[৩] সাধারণভাবে রাজনীতির আলোচনায় আর বিশেষভাবে সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী প্রচারের কাজে ভাষাকে কত বিচিত্র প্রসঙ্গে ও উপায়ে ব্যবহার করা হয়—তার বিচার-বিশ্লেষণই হবে রাষ্ট্র-ভাষাতত্ত্বর মূল কাজ। উপনিবেশের পটভূমিতে ভাষা বলতে একই সঙ্গে দুটি ভাষা বোঝাবে : উপনিবেশের মানুষদের মাতৃভাষা আর সাম্রাজ্যবাদীদের চাপানো ভাষা। এশিয়া ও আফ্রিকার বিভিন্ন দেশে এমন দু-ভাষাতেই সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী প্রচার ও সংগ্রাম চলেছে। সে-সংগ্রামের রূপ সর্বদা এক থাকে নি : প্রথমে নরমপন্থী কায়দায় আবেদন-নিবেদন, পরে গরম সুরে স্বাধীনতার দাবি পেশ, তারপর সশস্ত্র বিপ্লবের চেষ্টা ও/বা ব্যক্তিসন্ত্রাস। এই সমস্ত ধরণের আন্দোলনের ক্ষেত্রে ভাষার ব্যবহার হয় আলাদা-আলাদা উদ্দেশ্যে। কিছু শব্দ ও শব্দগুচ্ছ ঘুরে-ফিরে আসে (কিন্তু সর্বদা এক

অর্থে নয়), রচনার রীতি খাদ থেকে চড়ায় ওঠে-নামে, লেখার মধ্যে এসে পড়ে গরম বক্তৃতার ঢঙ। তার অনেকটাই বিদেশী সূত্রে পাওয়া। কিন্তু অচিরেই সেগুলো হয়ে ওঠে নিজ ভাষার সম্পদ। মাতৃভাষার স্বাধিকার প্রতিষ্ঠাও যে জাতীয় মুক্তি সংগ্রামেরই এক অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ এই সহজ সত্যটি ঐতিহাসিক ও ভাষাতাত্ত্বিকরা বোধহয় এখনও বোঝেন না।[৪]

রাষ্ট্র-ভাষাতত্ত্বর আলোচনায় শব্দার্থতত্ত্ব (সেম্যান্‌টিক্‌স্‌)-র গুরুত্ব বিরাট। উদাহরণ দিলে বিষয়টি স্পষ্ট হবে। বিজাতীয়করণ (ডিন্যাশনালাইজেশন) বলতে এখন লোকে বোঝেন : কোনো কারখানা বা উদ্যোগকে সরকারি মালিকানা থেকে আবার বেসরকারি হাতে তুলে দেওয়া। অর্থাৎ ব্যক্তিপুঁজির হাত থেকে কেড়ে নিয়ে যে-সংস্থাকে জাতীয়করণ করা হয়েছিল, সেই সংস্থাকে আবার পুরনো বা নতুন মালিকদের কাছে প্রায়শই জলের দরে বেচে দেওয়া। কিন্তু আদিতে শব্দটির তাৎপর্য ছিল মুখ্যত রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক নয়।[৫] অন্যত্র সে-নিয়ে আলোচনা করব। আপাতত স্বদেশী যুগে (১৯০৫-০৮) বাঙলার রাজনীতিতে দুটি ইংরিজি পদ কীভাবে ব্যবহার হয়েছিল সেটি দেখা যাক।

বয়কট (boycott)

একজন ব্যক্তির নাম থেকে বয়কট শব্দটি (ক্রিয়া ও বিশেষ্য) ইংরিজিতে চালু হয় (পরিশিষ্ট ক দ্র.)। খাজনা কমানোর দাবিতে ক্যাপ্‌টেন চার্লস সি. বয়কট (১৮৩২-৯৭) নামে এক আইরিশ (মতান্তরে ব্রিটিশ) প্রাক্তন সামরিক অফিসার ও জমির এজেন্টকে আইরিশ জননেতা পারনেল-এর প্রস্তাবমতো আইরিশ ল্যান্ড লিগ-এর সদস্যরা একঘরে করেছিলেন (১৮৮০)। কিন্তু শব্দটি পরে অনেক ব্যাপক অর্থে ব্যবহার হয়েছে : to refuse to take part in, deal with, handle by way of trade etc; to shut out from all social and commercial intercourse; an act of boyotting (*Chambers' Dictionary*)। লক্ষ্য করার বিষয় হলো : এর মধ্যে কোথাও *দেশী বনাম বিদেশী*-র ব্যাপারটি ওঠে নি।

বাঙলায় কিন্তু বয়কট-এর প্রথম অর্থ দাঁড়াল 'বিলিতি দ্রব্য বর্জন'। অর্থাৎ, উপনিবেশের আওতায় বয়কট শব্দটি এক নতুন মাত্রা পেল, যদিও আমার দেখা কোনো ইংরিজি অভিধানে সেটির উল্লেখ অবধি নেই। সুবলচন্দ্র মিত্র তবু তাঁর বাঙলা-বাঙলা অভিধানে শব্দটিকে রেখেছেন (মানে দেওয়া আছে: বর্জন, একঘরে করা)। হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ও জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস, বোধহয় রাজদ্রোহের দায়ে ধরা পড়ার ভয়ে, শব্দটিকে তাঁদের শব্দকোষ-এ ঠাঁই দেন নি।

হালের কেমব্রিজ আন্তর্জাতিক অভিধানে (১৯৯৫) নির্বাচন বয়কট ছাড়া আর কোনো রাজনৈতিক বয়কট-এর কথা নেই। একমাত্র কলিন্‌স্‌ কোবাল্‌ড্‌ অভিধানে (১৯৮৭) দৃষ্টান্ত হিসেবে লেখা হয়েছে : that boycott of British goods began in 1906. ধরি মাছ না ছুঁই পানি-র এ এক চমৎকার নমুনা। কারা যে কোথায় ব্রিটিশ

মাল বয়কট করল সেটি বলা হলো না! অথচ ঘটনা হচ্ছে বাঙলায় তথা ভারতে বয়কট আন্দোলন শুরু হওয়ার আগেই চীন-এ মে ১৯০৫ থেকে সাংহাই ও ছটি অন্য বন্দরে চীনা বণিক ও শিল্পপতিরা মার্কিন মাল বয়কট শুরু করেন।[৬] চীন-এর বুর্জোয়া শ্রেণীর এই আন্দোলন খুব দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে চীন-এর বন্দরে-বন্দরে। চীন-এর বাইরেও কিছু চীনা ব্যবসায়ী গোষ্ঠী তাতে যোগ দেয়। জনগণও এই বয়কটে অবিচল থাকেন। এর ফলে ১৯০৫-০৭-এর মধ্যে চীন-এর মার্কিন মাল আমদানি দারুণভাবে কমে যায়।[৭]

বয়কট শব্দটি শুধু ইংরিজিতে নয়, ইওরোপের অন্যান্য ভাষাতেও ধার-করা শব্দ থেকে স্বজন শব্দ (indigenous) হয়ে *ওঠে*। যেমন ফরাসিতে boycotter; ওলন্দাজ, জার্মান ও রুশেও তার নানা রূপ দেখা যায়। ১৮৮০ থেকেই শব্দটি *দ টাইম্‌স্*-এর মতো কাগজে লেখা হতে থাকে ছোট হাতের "বি" (b) দিয়ে। ১৮৮০-তে পারনেল বয়কট-এর যে-নিয়ম বেঁধে দিয়েছিলেন তা ছড়িয়ে পড়ে পৃথিবীর দিকে-দিকে। ভারত প্রসঙ্গে মনিএর মনিএর-উইলিয়ম্‌স্ ১৮৮৩-তে লিখেছিলেন : 'বয়কটকারী (Boycotters) ও বয়কটীকৃত (Boycotees)-র নমুনা ভারত কয়েক শতক ধরে জোগান দিয়েছে।"

দেখার ব্যাপার এই যে, আয়ারল্যান্ড ও চীন-এ বয়কট-এর কর্মসূচি ছিল আর্থিক বা বাণিজ্যিক দাবিদাওয়ার সঙ্গে যুক্ত। তার কোনো রাজনৈতিক মাত্রা ছিল না। স্বদেশী যুগের বাঙলাতেই প্রথম বয়কট হয়ে উঠল রাজনীতিক লড়াই-এর হাতিয়ার, স্বাধীনতার পথে এগনোর প্রথম ধাপ। একটি "সোণার বাঙ্গালা" ইস্তাহারে লেখা হয়েছিল :

> বাঙ্গালি! মনে রাখিও তুমি "বয়কট" প্রচলন করিয়া ইংরাজদের সহিত বিরোধ বাধাইয়াছ, এক্ষণে আর-হটিলে চলিবে না, এক্ষণে বল "হয় স্বাধীনতা লাভ, নয় রণক্ষেত্রে মৃত্যু।"
>
> বাঙ্গালি! স্বাধীনতার জন্য প্রস্তুত হও, উঠ জাগ, প্রাণ দিয়া জন্মভূমির বন্ধন মোচন কর।[৮]

'প্যাসিভ রেজিস্‌টান্‌স্' (Passive resistance)/নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ

হালে একটি বইতে লেখা হয়েছে, গাঁধি দেখেছিলেন দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতীয় মেয়েদের কারাবাস কীভাবে শুধু দক্ষিণ আফ্রিকার ভারতীয়দের হৃদয়েই নয়, তাদের মাতৃভূমিকেও গভীরভাবে নাড়া দেয়। এর মধ্যেই গাঁধি দেখলেন—শ্রীঅরবিন্দ আদতে যাকে বলেছিলেন নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ—মেয়েদের দিয়েই সেটি কীভাবে আরও সফলভাবে করা যেতে পারে, আর সত্যাগ্রহ কৌশলের জন্যে মেয়েদেরই তিনি সবচেয়ে উপযুক্ত বলে বিবেচনা করলেন, ইত্যাদি ইত্যাদি।[৯]

গোটা ধারণাটাই খুব গোলমেলে। 'নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ' নামটি ব্যাপকভাবে পরিচিত হয়েছিল ইংল্যান্ড-এ ১৯০২-এর শিক্ষা আইন সংক্রান্ত বিরোধ নিয়ে। শিক্ষার জন্যে

সব নাগরিককেই স্বেচ্ছায় কর দিতে হবে এই সরকারি সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে ইংল্যান্ড-এর ফ্রি চার্চ, অর্থাৎ চার্চ অফ ইংল্যান্ড-এর বাইরের খ্রিস্টানরা, বিশেষ করে ব্যাপটিস্ট সম্প্রদায় তীব্র আপত্তি করে। চার্চ অফ ইংল্যান্ড-এর ধর্মনীতিকে সরকারি অনুমোদন দিয়ে শেখানোর প্রতিবাদে ক্যাথলিক স্কুলগুলিতে কর না-দেওয়ার পথ নেওয়া হয়।

কিন্তু এ হলো অনেক পরের কথা। ১৮১৯-এই ওয়াল্টার স্কট-এর *আইভান হো* উপন্যাসে (অধ্যায় ৩৩) নামটি পাওয়া যাচ্ছে : "এই নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধের মেজাজে আইজাক অন্ধকূপের কোণে বসে রইলেন।" কিন্তু স্কটই যে প্রথম এই নামটি ব্যবহার করেছিলেন তা না-ও হতে পারে। ১৮৪৪-এ ভারতবিদ্ হোরেস হেম্যান উইলসন তাঁর *ব্রিটিশ ইন্ডিয়া* (খণ্ড ১, পৃ. ৪৬৭)-য় লিখেছেন : "তাঁদের আচরণ ছিল সর্বতোভাবে শান্তিপূর্ণ। তাঁরা একটিমাত্র অস্ত্রে বিশ্বাস করতেন সেটি হলো নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ।"[১০] কোয়েকার নামে এক খ্রিস্টীয় সম্প্রদায়ের তরফে দাবিদাওয়া আদায়ের জন্যে 'নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ' অবলম্বনের কথাও নথিভুক্ত আছে।[১১]

অক্স্ফোর্ড ইংরিজি অভিধানে (১৯৮৯) কোয়েকার-দের পরেই লাফ মেরে চলে আসা হয়েছে ১৯০৭-এর দক্ষিণ আফ্রিকার গাঁধির নেতৃত্বে ভারতীয়দের নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধে। বাঙলায় স্বদেশী আন্দোলন, শ্রীঅরবিন্দ ও বিপিনচন্দ্র পালের নামগন্ধ নেই।

অথচ ১১ থেকে ২৩ এপ্রিল ১৯০৭-এ *বন্দে মাতরম্* পত্রিকায় সাতটি প্রবন্ধে অরবিন্দ তাঁর "নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধের নীতি" উপস্থিত করেন। গিরিজাশঙ্কর রায়চৌধুরী, কোনো উপলক্ষ্যেই যিনি শ্রীঅরবিন্দকে খোঁচা মারতে ছাড়তেন না, তিনিও স্বীকার করেছেন : "ঐ মূল্যবান প্রবন্ধগুলি বাংলা দেশে বিংশ শতাব্দীর ইতিহাস রচনা করিয়াছে।"[১২]

গাঁধির নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধের সঙ্গে অরবিন্দর তত্ত্বর আকাশ-পাতাল তফাত। কোনো কোনো লেখক নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ আর আইন-অমান্য (civil disobedience)-কে এক করে দেখেছেন, আর তার দার্শনিক উৎস খুঁজেছেন কিকেরো (খ্রি. প্রথম শতক), আদি খ্রিস্টমণ্ডলী (ঐ), সন্ত টমাস অ্যাকুইনাস (বারো শতক), জন লক (সতেরো শতক), টমাস জেফারসন (আঠেরো শতক) ও হেনরি ডেভিড থরো (আঠেরো-উনিশ শতক) কথায় ও কাজে। তারপরেই আসে অনিবার্যভাবে মোহনদাস করমচাঁদ গাঁধি-র নাম। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য থেকে নানা ধারণা নিয়ে তিনিই নাকি গড়ে তুললেন তাঁর 'সত্যাগ্রহ' দর্শন (*এনসাইক্লোপেডিআ ব্রিটানিকা-য়* এমনই লেখা হয়েছে)।[১৩] অর্থাৎ সর্বত্রই বাদ পড়েন বিপিনচন্দ্র পাল ও অরবিন্দ ঘোষ। অথচ নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধের ধারণাকে আঞ্চলিক বা কোনো বিশেষ সমস্যা ছাড়িয়ে ঔপনিবেশিক পরিস্থিতিতে প্রয়োগ করার আদি কৃতিত্ব এঁদেরই। এঁদের হাতেই বয়কট ও নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ হয়ে উঠেছিল এক সর্বাত্মক রাজনৈতিক তত্ত্ব—সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে উপনিবেশের মানুষকে লড়াই-এর পথ দেখিয়েছিলেন এঁরাই, গাঁধি নন।

আগেই বলা হয়েছে, বয়কট বা নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ কোনোটিই প্রথম ভারতে দেখা

দেয় নি। উনিশ শতকের দৃষ্টান্ত ছেড়ে দিলেও, ১৯০২-এ খোদ ইংল্যান্ডে ফ্রি চার্চগুলির কর-বন্ধ আন্দোলন আর মে ১৯০৫-এ সাংহাই-এ চীনা বুর্জোয়া শ্রেণীর উদ্যোগে মার্কিন পণ্য বয়কট—এই দুটি ছিল স্বদেশী আন্দোলনের সময়কার দুটি অব্যবহিত পূর্বদৃষ্টান্ত। স্বরাজ কথাটিকে যেমন বাঙলার জাতীয়তাবাদীরা নতুন ব্যঞ্জনা দিয়েছিলেন, নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ ও বয়কট-এর ক্ষেত্রেও একই ঘটনা ঘটতে দেখা গেল। যে বিষয়গুলির কোনো সুনির্দিষ্ট রাজনৈতিক তাৎপর্য ছিল না, উপনিবেশবাদের পটভূমিতে সেগুলির মধ্যে সঞ্চার করা হলো সচেতন সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী সারবস্তু। বাঙলার জাতীয়তাবাদীদের এই কৃতিত্বকে অথচ কেউই স্বীকার করেন নি। অভিধানকাররা হয় এ বিষয়ে অজ্ঞ, না হলে বয়কট ইত্যাদি শব্দের রাজনৈতিক তাৎপর্য মানতে নারাজ। শুধু অক্সফোর্ড বা চেম্বার্স্ বা ওয়েবস্টার-এর মতো বিদেশে তৈরি ইংরিজি অভিধানই নয়, ভারতীয় প্রকাশকদের সঙ্কলিত ইংরিজি অভিধানেও ঐ পদ দুটির বিশিষ্ট ব্যঞ্জনা ধরা হয় নি, কোথাও তার উল্লেখ পর্যন্ত করা হয় না।[১৪]

একটি প্রশ্ন অবশ্য উঠতে পারে : নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধের ব্যাখ্যায় অরবিন্দ ও বিপিনচন্দ্র কি একমত ছিলেন? এর স্পষ্ট উত্তর : না, সবদিক থেকে একমত ছিলেন না। বিপিনচন্দ্র সবরকমের সশস্ত্র আক্রমণের—ব্যক্তিসন্ত্রাস বা সামরিক অভ্যুত্থান ইত্যাদি—ঘোর বিরোধী; গাঁধির আগে থেকেই তিনি অহিংসা পথে অবিচল যাত্রী। তার জন্যে বাঙলার তরুণ বিপ্লবীরা তাঁকে অপছন্দ করতেন।[১৫] কিন্তু অহিংসা বিষয়ে অরবিন্দর মনে তেমন কোনো গোঁড়ামি ছিল না।[১৬] তবু এও দেখার যে, সম্পূর্ণ অরাজনৈতিক আন্দোলনের দুটি রূপ, বয়কট ও নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ-কে এঁরাই উপনিবেশের পটভূমিতে দুটি শক্তিশালী রাজনৈতিক অস্ত্রে পরিণত করলেন। সেই পথেরই অনুবর্তন করেছিলেন গাঁধি। বাঙলার স্বদেশী আন্দোলনের কাছে তিনি যে পুরোপুরি ঋণী এ-কথা তিনি বারেবারে কবুল করেছেন।[১৭] তবু, বাঙলার বাইরের ঐতিহাসিকদের কথা ছেড়েই দিচ্ছি, বাঙালি ঐতিহাসিকরাও এই বিষয়টিতে উদাসীন কেন?

পরিশিষ্ট ক

বয়কট শব্দটি আদতে নামবাচক, ভাষাতত্ত্বে যাকে বলে eponym।[১৮] সামাজিক বর্জনের সময়ে, ক্যাপ্টেন বয়কট-এর করুণ অবস্থার কথা আয়ারল্যান্ড ও ইংল্যান্ড-এর পত্রপত্রিকায় বেরিয়েছিল। তার পেছনের ইতিহাসটি যেমন মজাদার তেমনি চমৎকার।[১৯]

আয়ারল্যান্ড-এর এনিস-এ ১৯.৯.১৮৮০-তে চাষিদের সভায় বক্তৃতা দিচ্ছিলেন আইরিশ প্রবাদপ্রসিদ্ধ নেতা, চার্লস স্টুআর্ট পারনেল (১৮৪৬-৯১)। খামার থেকে উচ্ছেদ হওয়া চাষির জমি যদি কেউ কেনে, তার ক্ষেত্রে কী ব্যবস্থা নেওয়া হবে? জনতার মধ্যে থেকে আওয়াজ উঠল, "shoot him!" তাকে গুলি করে মারো। সভায় অনেকে সে-আওয়াজ জোর গলায় সমর্থন করলেন। পারনেল তাঁর স্বভাবসিদ্ধ শান্ত

ভঙ্গিতে বলে চললেন : "মনে হলো আমি শুনলুম কে যেন বললেন 'তাকে গুলি করে মারো'—সভায় আবার নতুন করে আওয়াজ উঠল 'ঠিক তাই তো'—কিন্তু আমি আপনাদের কাছে তার চেয়ে অনেক বেশি ভালো পথ—আরও খ্রিস্টানসুলভ ও আরও দয়ালু পথ দেখাতে চাই—যেটি সেই পতিত পাপীকে অনুতাপের সুযোগ দেবে।"

পারনেল একটু থামলেন : সকলে চুপ করে আছেন অধীর আগ্রহে। শান্ত ও স্পষ্টভাবে পারনেল বলে চললেন : "যখন কোনো লোক এমন খামার নেবে যেখান থেকে কাউকে উচ্ছেদ করা হয়েছে, রাস্তার ধারে তার সঙ্গে দেখা হলে আপনারা অবশ্যই তাকে (অন্যদের) দেখিয়ে দেবেন (show him), শহরের রাস্তায় তাকে অবশ্যই দেখিয়ে দেবেন, দোকানের কেনাবেচার জায়গা তাকে অবশ্যই দেখিয়ে দেবেন, মেলায়-বাজারে তাকে অবশ্যই দেখিয়ে দেবেন, আর এমনকি ধর্মস্থানেও, যাতে সে ভীষণভাবে একা হয়ে যায়—পুরনো আমলে কুষ্ঠরোগীদের যেমন অন্যদের থেকে আলাদা করে রাখা হতো, তেমনি তাকে এক ধরণের নীতিগত বর্জনের অবস্থায় নিয়ে যাবেন। আর, আপনারা ভরসা করতে পারেন, এমন কোনো লোক নেই, সে যত লোভীই হোক, যত নির্লজ্জই হোক, যে সমস্ত সচ্চিন্তাশীল মানুষের মতের পরোয়া করবে না, আর আপনাদের অলিখিত আইনের বিধি লঙ্ঘন করবে।"

এক উত্তেজিত শ্রোতা *"you must show him"*-এর বদলে *"shun him!"* বলে উঠেছিলেন। পারনেল কিন্তু শান্তভাবে অথচ জোর দিয়ে আবার বললেন, "you must *show* him"।

এর তিনদিন পর থেকেই লর্ড আর্ন (Erne)-এর জমির গোমস্তা, ক্যাপ্‌টেন বয়কট চাষিদের উচ্ছেদের নোটিশ জারি করলেন। গণ প্রতিরোধের ঠেলায় সেসব নোটিশ ধরানো গেল না। আইরিশ ল্যান্ড লিগ-এর স্থানীয় শাখা বয়কট-কে একঘরে ঘোষণা করলেন (সেই গাঁ-এর পাদরি ছিলেন ঐ শাখার মাথা)। বয়কট-এর বাড়ির সমস্ত কাজের লোক, খেতের লোক—সবাই তাঁকে ছেড়ে গেলেন। দোকানদাররা তাঁকে কোনো জিনিস বেচতে রাজি হলেন না; ধোপানি ও কামাররা তাঁর কোনো অর্ডার জোগান দিতে রাজি হলেন না, এমনকি ডাক পিয়নও তাঁর চিঠি ও টেলিগ্রাম বাড়িতে দিয়ে গেলেন না, সেগুলো দিয়ে যেতে হলো পুলিশকে।

এইবার বয়কট নিজের পায়ে কুড়ুল মারলেন। নিজের দুর্দশার কথা জানিয়ে তিনি একটি চিঠি লিখলেন *দ টাইমস্*-এ। ফলে খবরটা আরও বেশি জানাজানি হয়ে গেল, আর ধার-করা গ্রীক শব্দ ostracism (বিশেষ্য, ক্রিয়াপদের রূপ ostracize)-এর ইংরিজি প্রতিশব্দ হয়ে গেল বয়কট।

বয়কট-এর খেতে চাষ করার লোক ছিল না বলে আলস্টার থেকে পঞ্চাশ জন স্বেচ্ছাসেবক আনিয়ে তাঁকে ফসল তুলতে হলো। রেলওয়ে স্টেশন থেকে তাঁর খামার ছিল দশ মাইল দূরে। প্রচণ্ড বৃষ্টির মধ্যে পুরো রাস্তাটাই ঐ স্বেচ্ছাসেবকদের হাঁটতে

হয়েছিল, কারণ পয়সা দিয়েও কোনো গাড়ি ভাড়া পাওয়া যায় নি। ঐ স্বেচ্ছাসেবকদের সঙ্গে ছিল দুটো ফিল্ড্গানধারী একপাল পুলিশ আর সৈন্য।

খেতের কাজ চুকিয়ে ঐ স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী ও তার রক্ষীরা যে-দিন ফিরে গেল (যথারীতি হেঁটে), গ্রামের সমস্ত বাড়ির জানলা সে-দিন বন্ধ ছিল, সব দোকানের ঝাঁপ ছিল ফেলা। রাস্তায় জনমানব ছিল না, শুধু গ্রামের পাদরিটি ঐ বাহিনীকে 'বাঁচানো'র জন্যে তাদের সামনে হেঁটে চললেন।

ক্যাপটেন বয়কট-এর খুব শিক্ষা হলো। কয়েকদিনের মধ্যেই গোমস্তাগিরি থেকে ইস্তফা দিয়ে মেয়ো ছেড়ে সপরিবার ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে গেল।

বয়কট আন্দোলনের প্রভাব শুধু এনিস-এই পড়ে নি। সারা আয়ারল্যান্ড-এর চাষিরা এতে অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন। ইংল্যান্ড-এর শ্রমিক ইউনিয়ন-এর কর্মীরাও শিখলেন আন্দোলন ভাঙার দালালদের কী করে শায়েস্তা করতে হয়।

গ্ল্যাডস্টোন-এর সরকার খেপে গিয়ে পারনেল ও আইরিশ ল্যান্ড লিগ-এর নেতাদের বিরুদ্ধে "রাজদ্রোহমূলক ষড়যন্ত্র"-র অভিযোগ আনে। ৫.১.১৮৮১-তে বিচার শুরু হয়। কিন্তু জুরিরা একমত না-হতে পারায় মামলা ফেঁসে যায়।

আজ গ্ল্যাডস্টোনও নেই, পারনেলও নেই, কিন্তু বয়কট-এর হাতিয়ারটি মজুত আছে। ভুবনীকরণের বিরুদ্ধে সেটি কাজে লাগাতে পারলে মন্দ হয় না।

পরিশিষ্ট খ

উনিশ শতকের আগেও বাঙলায় গ্রামে গ্রামে জাত-মারা, একঘরে করা, ধোপা নাপিত হুকাপানি বন্ধ ইত্যাদির চল ছিল। সমাজের মাতব্বররা এই করেই নিজেদের প্রতিপত্তি বজায় রাখতেন। উনিশ শতক থেকে ইংরিজি শিক্ষার সুবাদে গ্রামসমাজে অল্প হলেও কিছু পরিবর্তন দেখা দেয়। কাউকে একঘরে করলে তিনি অন্য গ্রামে বা শহরে এসে বসত গাড়তেন, মাস্টারি বা কোনো চাকরি জুটিয়ে নিতেন। পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়ের *চলমান জীবন*, খণ্ড ১-এ এই ধরণের এক বিদ্রোহীর কথা আছে।

কিন্তু এইসব সামাজিক "অনাচার" রোধের ক্ষেত্র ছিল খুব সীমাবদ্ধ আর এগুলোর সঙ্গে কোনো আর্থিক-রাজনীতিক প্রশ্ন যুক্ত থাকত না। সম্পন্ন লোক হলে তিনিই গ্রামের সমাজপতি হতেন, আর সমাজপতি না-হলেও তাঁকে কেউ সহজে ঘাঁটাত না। কিন্তু স্বদেশী যুগের বয়কট আন্দোলন কাউকে রেহাই দেয় নি। শশিশেখর বসু লিখেছেন :

> একটি বাঙ্গালী সম্ভ্রান্ত ব্যবসায়ী সুরেন্দ্রনাথের কাছে প্রাণ রক্ষার জন্য বরিশাল থেকে এসে আছড়ে পড়লেন, 'মুদি চাল বেচে না! ধোপা কাপড় কাচে না, নাপিত কামায় না, গোয়ালা দুধ দেয় না, স্টীমার বুকিং অফিসে টিকিট দেয় না, ছেলেপিলে নিয়ে উপবাস করছি!' লিভারপুল নুন বেচতেন! ইংলণ্ডের মাল বয়কটের জন্য নেপোলিয়ন আর সুরেন বাঁড়ুজ্যে জগৎবিখ্যাত। তাঁদের

হুকুম যে অমান্য করেছে জব্দ হয়েছে![২০]

হাল্‌কা চালে লেখা হলেও কথাটা মিথ্যে নয়। প্রথমে খানিক দ্বিধা সত্ত্বেও শেষ পর্যন্ত বয়কট-এ সায় দিয়ে সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সত্যিই কিছুদিনের জন্যে বাঙলার মুকুটহীন রাজা হয়ে উঠেছিলেন।

টীকা

১. এই সংক্ষিপ্ত নামটি অধ্যাপক দীপেন্দু চক্রবর্তীর দেওয়া।

২. এই শাখায় একই সঙ্গে জীববিদ্যা ও ভাষাকে ধরা হয়। চমস্কি এখন এই শাখারই গুরু। তবে এর ঝোঁকটি মূলত ভাববাদী ও ডারউইন-বিরোধী। জেনকিন্‌স্‌, ২০০০ দ্র.।

৩. ভাষার রাজনীতি ও রাজনীতির ভাষা নিয়ে যে কোনো আলোচনাই হয় নি, তা নয়। 'আইনি ইংরিজি', 'সাদামাটা ইংরিজি' ইত্যাদির মতো 'রাজনীতিক ইংরিজি' নিয়েও বিস্তর কাজকর্ম হয়েছে। ডেভিড ক্রিস্টাল (সম্পা.). ৩৭৮-৭৯ দ্র.। এছাড়া 'জার্নালিঙ্গুইস্টিক্‌স্‌'-এরও চর্চা হচ্ছে (ঐ, ৩৮২-৮৩)। আরও ভারী লেখাপত্রর নমুনা পাওয়া যাবে সি. পি. ওটেরো (সম্পা.) দুটি বইতে (১৯৮৩, ১৯৮৮)। এগুলো দেখার সুযোগ হয় নি।

৪. এ বিষয়ে থিওঙ্গো, ২০০৩ দ্র.।

৫. রব্যের-এর ফরাসি অভিধান ও অক্‌স্‌ফোর্ড ইংরিজি অভিধান দ্র.। পরে বয়কট ও প্যাসিভ রেজিস্‌টান্‌স্‌-এর প্রয়োগের দৃষ্টান্তগুলি এই ধরণের অভিধান থেকেই নেওয়া হয়েছে।

৬. জিআন বোজান প্রমুখ, ১২৬।

৭. কমপাইলেশন গ্রুপ....., ৭৬-৭৮।

৮. চিন্মোহন সেহানবীশ-এ পুনর্মুদ্রিত।

৯. ইয়ং, ৯৪।

১০. অক্‌স্‌ফোর্ড ইংরিজি অভিধান, "রেজিসটান্‌স্‌"-এ উদ্ধৃত।

১১. ১৮৮৩ সংস্করণের *এনসাইক্লেপিডিআ ব্রিটানিকা,* খণ্ড ২০, ১৪৭/২। অক্‌স্‌ফোর্ড অভিধানে উদ্ধৃত।

১২. রায়চৌধুরী, ৫৭৫। *অরবিন্দ রচনাবলি*-র প্রথম খণ্ডে (*বন্দে মাতরম্‌*) ঐ প্রবন্ধগুলি পাওয়া যাবে। বাঙলা সারসংক্ষেপের জন্যে রায়চৌধুরী, ৫৭৫-৯১ দ্র.।

১৩. বারীন্দ্রকুমার ঘোষকে লেখা একটি চিঠিতে শ্রীঅরবিন্দ অনেক আগেই (১৯২০) সে-কথা লিখেছিলেন : "গান্ধী কি করছেন? অহিংসা পরম ধর্ম্ম Jainism, হরতাল, passive resistance ইত্যাদির খিচুড়ি করে সত্যাগ্রহ বলে একরকম Indianised Tolostoyism দেশে আনছেন....." (*বাঙলা রচনা,* ৩৩৮)। এ ছাড়া ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত, ১৯৮৩, ১৫৯ দ্র.।

১৪. সবচেয়ে দুঃখের বিষয়, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমির *বিদ্যার্থী বাংলা অভিধান*-এ আয়ারল্যান্ড-এর বিষয়ে ডাহা ভুল খবর দেওয়া হয়েছে : "চাষিদের কাছ থেকে জোর করে খাজনা আদায়ের জন্যে (!) ক্যাপটেন বয়কটকে একঘরে করার চেষ্টা হয়" (চেষ্টা!!)। এই লেখার পরিশিষ্ট ক-এ এ বিষয়ে সঠিক তথ্য পাওয়া যাবে। আনন্দ পুরস্কার-প্রাপ্ত *Everyman's Dictionary*-তে বয়কট-এর দৃষ্টান্ত দেওয়া হয়েছে: *"Our people boycotted British goods during the Non-cooperation Movement."* বাঙলার স্বদেশী আন্দোলন তাহলে কিছুই নয়! অন্যান্য ইংরিজি-বাঙলা অভিধান-এ শুধু সামাজিক ও বাণিজ্যিক দিকটির কথাই থাকে, নতুন রাজনৈতিক ব্যঞ্জনাটি ধরাই পড়ে না।

১৫. রায়চৌধুরী, ৫৯৪-৯৫; শঙ্করীপ্রসাদ বসু, খণ্ড ৩, ১১৬। ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত তাঁর দুটি বই-এ প্রায়ই কংগ্রেস-এর তথাকথিত গরম দলের নেতাদের সম্পর্কে, ও বিশেষ করে বিপিনচন্দ্র সম্পর্কে বিরূপ মন্তব্য করেছেন (১৯৮৩, ৫৩, ১৫৯-৬১; ১৩৯০, ৭২-৭৪)।

১৬. *বন্দে মাতরম্*, ২ সেপ্টেম্বর ১৯০৭-এ বিপিনচন্দ্র 'হিন্দু মেজাজে হিংসা সম্পর্কে স্বাভাবিক অসহানুভূতি'র কথা লেখেন। কিন্তু অরবিন্দ বলতেন : পরিস্থিতি অনুযায়ী নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ, সক্রিয় প্রতিরোধ ও খোলাখুলি সশস্ত্র বিদ্রোহ—যে কোনো পথই নেওয়া যেতে পারে। *বন্দে মাতরম্*, ১৯৭৩, ৯৪, ৯৮-৯৯। এ ছাড়া ঐ প্রবন্ধগুচ্ছের ষষ্ঠ প্রবন্ধ ("Its Limits"), ঐ, ১১৩-১৭ দ্র.। অরবিন্দ এখানে আয়ারল্যান্ড ও রাশিয়ার নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধের দৃষ্টান্ত দিয়েছেন, কিন্তু সেগুলোর থেকে তাঁর প্রস্তাবিত পথ যে আলাদা—সে-কথাও বারবার বলেছেন। ঐ, ৯৭, ১০৪-০৫, ১০৮ দ্র.।

১৭. রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য, ১৯৯৬, ৯৮-৯৯ ও পরিশিষ্ট গ দ্র.।

১৮. এ ধরণের শব্দর তালিকার জন্যে ম্যানসার দ্র.।

১৯. নিচের বিবরণটি নেওয়া হয়েছে টি. এ. জ্যাকসন, ৩২৫-২৭ থেকে।

২০. শশিশেখর বসু, ১১৯।

রচনাপঞ্জি :

শ্রীঅরবিন্দ। *শ্রীঅরবিন্দের বাংলা রচনা*। পণ্ডিচেরী : শ্রীঅরবিন্দ আশ্রম, ১৯৯৪।

গিরিজাশঙ্কর রায়চৌধুরী। *শ্রীঅরবিন্দ ও বাঙ্গালায় স্বদেশী যুগ*। নবভারত পাবলিশার্স, ১৯৫৬।

চিন্মোহন সেহানবীশ। *রুশ বিপ্লব ও প্রবাসী ভারতীয় বিপ্লবী*। মনীষা, ১৯৭৩।

পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়। *চলমান জীবন*। ক্যালকাটা বুক ক্লাব, তারিখ নেই।

ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত। *অপ্রকাশিত রাজনীতিক ইতিহাস*। নবভারত, ১৩৯০।

—*ভারতের দ্বিতীয় স্বাধীনতার সংগ্রাম*। নবভারত পাবলিশার্স, ১৯৮৩।

রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য, অনির্বাণ অগ্নিশিখা।

অনুষ্টুপ, ১৯৯৬। শঙ্করীপ্রসাদ বসু। *নিবেদিতা লোকমাতা* খণ্ড ৩। আনন্দ পাবলিশার্স, ১৩৯৫।

শশিশেখর বসু। *যা দেখেছি যা শুনেছি*। মিত্র ও ঘোষ, ১৩৬৮।

Sri Aurobindo. *Bande Mataram.* Pondicherry; 1973.

Compilation Group for the "History of Modern China" Series. *The Revolution of 1911.* Peking: Foreign Languages Press, 1976.

Gandhi, M.K. *Collected* Works, Vols. 99-100. Delhi : Publication Division, 2000-2001.

Jackson, T.A. *Ireland Her Own. An Outline History of the Irish Struggle.* Berlin : Seven Seas Pub., 1973.

Jenkins, Lyle. *Biolinguistics. Exploring the Biology of Language.* Cambridge : Cambridge University Press, 2000.

Jian Bozan, et al. *A Concise History of China.* Beijing : Foreign Languages Press, 1986.

Manser, Martin, H. *The Wordsworth Dictornary of Eponyms.* Ware: Wordsworth Editions, 1996.

Young, Robert J.C. *Postcolonialism. A Very Short Introduction.* Oxford: Oxford University Press, 2003.

কৃতজ্ঞতা স্বীকার : শ্রীশ্যামসুন্দর ভট্টাচার্য।

পৌরুষের সুযোগ, বিভ্রম ও বিপর্যয় : লিঙ্গচর্চার অন্য আধখানা

জয়ন্তী বসু

নারীবাদ এবং উত্তর-আধুনিকতা আমাদের শিখিয়েছে যে, 'বাস্তব' কোনো ধ্রুব অস্তিত্ব নয়। বাস্তবতার নির্মাণে সমাজের ভূমিকা নিয়ে গত তিন দশকের বিস্তারিত আলোচনা সমাজতত্ত্বের ভিত্তি বদলে দিয়েছে[১]। লিঙ্গের বাস্তবতা, এই সামগ্রিক পাঠের বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ অংশ। যৌনচিহ্ন অনুসারে শরীরভিত্তিক লিঙ্গের ধারণা এখন আর এককথায় গ্রহণযোগ্য নেই। স্ত্রী শরীর এবং নারীত্ব (feminity), পুরুষ শরীর এবং পৌরুষ (masculinity) এই দুয়ের সম্পর্ককে অবিচ্ছেদ্য বলে না জেনে, বরং সমাপতন ভিত্তিক বলেও আমরা ভাবতে পারছি। মূল বিষয়ে যাবার আগে লিঙ্গের আপেক্ষিকতা নিয়ে দু-এক কথা বলা যাক।

সমাজতাত্ত্বিক বার্জার ও লাকম্যান[২] ষাটের দশকে লিঙ্গচেতনার দ্বান্দ্বিক উৎপত্তি নিয়ে আলোচনা করেছিলেন। তাঁদের মতে, সমাজের অন্তঃস্থ ব্যক্তিমনে লিঙ্গসংক্রান্ত আদর্শের উদ্ভব হয় তিনটি স্তরে। এই স্তরগুলির নাম বহিঃপ্রক্ষেপ (externalization), যাথার্থীকরণ (objectification) এবং অন্তঃপ্রক্ষেপ (internalization)। শারীরবৃত্তীয় দিক থেকে নারী-পুরুষের যে তফাত, তাকে সমাজ বিভিন্ন বাহ্য চিহ্নের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত করে। একেই বলে বহিঃপ্রক্ষেপ। যেমন, সব সভ্য সমাজেই নারী ও পুরুষের পোশাক-পরিচ্ছদ, কাজ, খেলা ও বিনোদন আলাদা। এই তফাতগুলি শারীরিক কারণে নয়, সম্পূর্ণ সমাজের নির্দেশেই তৈরি, এবং কখনো কখনো ছোটবেলা থেকে জোর করে শেখানো। অর্থাৎ এগুলি হল সমাজের নিজস্ব প্রয়োজনে শারীরবৃত্তীয় চিহ্নের স্বেচ্ছাচারী বহিঃপ্রক্ষেপ। যতক্ষণ এই স্তর চলছে, তখন পর্যন্ত শরীরের যৌনচিহ্ন থেকে এই সমাজনির্মিত লিঙ্গকে সহজেই আলাদা করে চেনা যায়।

দ্বিতীয় স্তরে এই কৃত্রিম লিঙ্গবাস্তবকে অকৃত্রিম, বিজ্ঞানসম্মত, ধ্রুব এবং মানুষের সনাতন অতীত বলে প্রচার করা হয়। এই প্রচারপর্বের নামই যাথার্থীকরণ। এই পর্বে যা আসলে সমাজনির্মিত তাকে ঐশ্বরিক অথবা বৈজ্ঞানিক সত্য বলে রটনা করা হয়। যারা প্রচার করে, তারা যে সর্বদা সচেতনভাবে লক্ষ্য স্থির করে বক্তব্য প্রস্তুত করে

তা-ও নয়। সাময়িক সঙ্কীর্ণ কোনো প্রয়োজন মেটাতেই হয়তো এই প্রচার করা হয়। কিন্তু এর ফল হয় দূরপ্রসারী। বুদ্ধিমান এবং শক্তিশালী প্রচারকের রটনাকে অপেক্ষাকৃত কম বুদ্ধিধারী দুর্বল মানুষেরা যথার্থ বলে ধরে নেয়। অবশ্য এই স্তরেও চলে বাদ-প্রতিবাদ, ব্যক্তিগত বিদ্রোহ। ব্যক্তির বোধের উপর সমাজের জয় এই স্তরেও সর্বাঙ্গীণ নয়।

পরবর্তী ও শেষ পর্যায় অন্তঃপ্রক্ষেপের। এই পর্যায়ে বিবাদ থেমে গেছে। সমাজের অধিকাংশ মানুষ বিশ্বাস করে নিয়েছে যে যৌনচিহ্ন ও সমাজ-সমর্থিত লিঙ্গের আদর্শ একই সূত্রে গাঁথা। ভাবনার এই স্তরে এসে নারী নিজেই স্বেচ্ছায় নারীত্বের বাহক, পুরুষ পৌরুষের। নারীত্ব অর্থ এখানে বহিঃপ্রক্ষেপের স্তরে নির্মিত নারীর আচরণীয় কাজ ও বোধ, পৌরুষ মানে সমাজ পুরুষের কাছে যা আশা করে। সমাজনির্মিত বোধ এই শেষ পর্যায়ে এসে আন্তরিক ও ব্যক্তিগত বিশ্বাসের রূপ নেয়। একজন পুরুষ যখন বলে যে বাস্তবিকই শত বেদনাতেও তার চোখের জল ঝরে না, একজন নারী যখন বলে সংসারের খুঁটিনাটি কাজে ব্যস্ত থাকাই তার অন্তরের সুখ—তখন তা এই সমাজনির্মিত লিঙ্গধারণার অন্তঃপ্রক্ষেপ। এই স্তরে সমাজরূপী শাসক/ক্ষমতাবানের চিন্তা এবং উপস্থিতি শাসিত/দুর্বলের ব্যক্তিগত চিন্তাও বাস্তব হয়ে ওঠে। অর্থাৎ সামাজিক শিক্ষা 'হেজিমনি'তে পরিণত হয়।

নারীবাদ ও নারী আন্দোলন এবং পরবর্তীকালে সমকামী ও যৌনরূপান্তরকামীদের আন্দোলন সারা পৃথিবীতেই লিঙ্গ ও যৌনচিহ্নের এই অভিন্নতাকে প্রশ্ন করে। নারীবাদ প্রাথমিকভাবে নারীত্বের সামাজিক নির্মাণকে চ্যালেঞ্জ করে। বস্তুত কুড়ির দশকে ভার্জিনিয়া উলফের সৃষ্ট চরিত্র যখন নারীত্বের সংজ্ঞার খোঁজে ব্রিটিশ লাইব্রেরি তোলপাড় করে দেখতে পেয়েছিল যে নারীত্ব মানে কিছু শব্দসমষ্টি মাত্র[৩], তখনই নারীত্বের বিনির্মাণের বীজটি বোনা হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু পরবর্তী কয়েক দশকের টালমাটাল রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে নারীশরীর থেকে নারীসত্তাকে আলাদা করে বিশ্লেষণ করার মতো স্থিতিশীল অবস্থাই তৈরি হয়নি। ষাটের দশকে, অপেক্ষাকৃত শান্ত, রাজনৈতিক কলোনিহীন বিশ্বে যৌনচিহ্ন ও লিঙ্গের প্রভেদ নিয়ে সুস্থির আলোচনা সম্ভব হয়। মনস্তাত্ত্বিক রবার্ট স্টোলার যৌনচিহ্নকে শারীরিক এবং লিঙ্গকে সামাজিক সাংস্কৃতিক বলে স্পষ্ট সংজ্ঞা দেন[৪]। অর্থাৎ এই সময় থেকে নিশ্চিত হয়ে যায় যে লিঙ্গ হচ্ছে একটি সামাজিক নির্মিতি যা শারীরচিহ্নের উপর সামাজিক প্রয়োজনে আরোপিত হয়।

কিন্তু সমাজের এই প্রয়োজনটি ঠিক কিরকম? বহু শতাব্দীর অভিজ্ঞতা পর্যালোচনা করে সমাজবিজ্ঞানীরা একমত যে সামাজিক নির্মিতির উৎস ক্ষমতার লিপ্সায়[৫]। সমাজের ক্ষমতাবান গোষ্ঠীই নির্ধারণ করে কোন যৌনচিহ্নের বহিঃপ্রক্ষেপণের ধরনটি কী হবে, এবং ফলত কিরকম হবে তার লিঙ্গের বৈশিষ্ট্য।

পেশিশক্তিতে পুরুষই ক্ষমতাবান। তাই স্বভাবত যৌনচিহ্নের সঙ্গে সম্পৃক্ত লিঙ্গবৈশিষ্ট্যগুলি কী হবে সে বিষয়ে পুরুষের মতামতটিই প্রধান হয়ে উঠল। সমাজের

রূপ হল পিতৃতান্ত্রিক। পঞ্চাশের দশক থেকে আশির দশকের মাঝামাঝি পর্যন্ত নারীবাদী আন্দোলনের মূল বিষয়বস্তুই ছিল পিতৃতন্ত্রের পরিপ্রেক্ষিতে নারীর অবমূল্যায়ন ও অবহেলা। এর সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত ছিল নারীর নিজস্ব চেতনা, সত্তা, আইডেনটিটির সমস্যা। নারীবাদের মূল প্রতিপাদ্য ছিল যে মানবজাতির ইতিহাস পুরুষেরই ইতিহাস; নারীর নিজস্ব অস্তিত্বের কথা প্রথাগত ইতিহাসে বা বিজ্ঞানে অনুপস্থিত[৬]। নারীবাদী আন্দোলনের প্রভাবেই ইতিহাস, বিজ্ঞান, সাহিত্য ও সমাজবিজ্ঞানের চর্চায় নতুন ভাবনা ও ভাষার জোয়ার আসে। কিন্তু এই নতুন চিন্তাধারার অন্য একটি বিচিত্র ফলও দু-তিন দশকের মধ্যে প্রকট হয়ে ওঠে। নারীবাদী ধারণা ও বিষয়নির্বাচনের জন্য লিঙ্গ সংক্রান্ত চর্চা মানবীবিদ্যাচর্চার সমার্থক হয়ে যায়। যেহেতু ধরে নেওয়া হয় যে মানবসভ্যতা মানে পুরুষের সভ্যতা, তাই পুরুষ সম্পর্কে সার সত্যগুলি জানা হয়ে গেছে এরকম একটা বিশ্বাস সমাজবিজ্ঞানের সব স্তরেই বিরাজ করতে থাকে।

আশির দশকের শেষপর্ব থেকে পৌরুষের নির্মাণকেও লিঙ্গচর্চার বিষয়বস্তু হিসাবে গুরুত্ব দেওয়া আরম্ভ হয়। পিতৃতান্ত্রিক সমাজ পৌরুষকেও সঠিকভাবে মূল্যায়ন করে কিনা এই প্রশ্ন উঠতে থাকে। প্রশ্ন ওঠে নারীবাদের বিভিন্ন শাখা থেকে; প্রশ্ন ওঠে লিঙ্গরূপান্তরকামীদের মধ্যে থেকে, বিশেষ করে যাঁরা পুরুষশরীরকে বর্জন করে নারীশরীর কামনা করেন; প্রশ্ন ওঠে সমকামীদের মধ্যে থেকে, যাঁদের নিয়ত ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের প্রেক্ষাপটে নিজের লিঙ্গভূমিকাকে ব্যাখ্যা করতে হয়; প্রশ্ন ওঠে পুরুষদের মধ্যে থেকে, যাঁরা নিজেদের অস্তিত্ব ও বোধ নিয়ে ভাবতে চান। এই প্রসঙ্গে লক্ষণীয়, যেসব পুরুষ পৌরুষের নির্মাণ নিয়ে চর্চা করতে এগিয়ে আসেন, তাত্ত্বিক দিক থেকে তাঁরা কেউ নারীবাদের সমর্থক এবং কেউ নারীবাদের বিরোধী। নারীবাদ-বিরোধী পুরুষেরা মনে করেন যে দীর্ঘদিনের নারীচর্চার ফলে পুরুষেরাই এখন সমাজে অসুবিধাজনক অবস্থানে আছেন। তাই সামাজিক ভারসাম্য বজায় রাখার জন্য পৌরুষের ধারণা স্পষ্ট করা দরকার। আবার নারীবাদের সমর্থক পুরুষেরা মনে করেন যে ক্ষমতার প্রকৃত অধিকারী পিতৃতন্ত্র—যা নারী ও পুরুষকে সমানভাবে নিষ্পেষিত করে। তাই নারীত্ব ও পৌরুষ দুয়ের সঙ্গেই পিতৃতন্ত্রের সম্পর্ক বোঝার প্রয়োজন আছে[৭]।

যে দৃষ্টিভঙ্গি নিয়েই পৌরুষের আলোচনার সূত্রপাত হয়ে থাক না কেন, এই আলোচনার প্রাসঙ্গিকতা নিয়ে বিশেষ দ্বিমত নেই। প্রতীচ্য সমাজবিদ্যায় একথা এখন স্বীকৃত সত্য যে, লিঙ্গচর্চা এতদিন আধখানা মাত্র হয়েছিল। তবে প্রাচ্যে, বিশেষত ভারতে, পৌরুষচর্চা এখনো শৈশব পেরোয়নি। নারীত্বের 'স্টিরিওটাইপ' নিয়ে এখন পর্যন্ত দেশে-বিদেশে যত কাজ হয়েছে, পৌরুষের 'স্টিরিওটাইপ' নিয়ে তার ক্ষুদ্র অংশমাত্র হয়েছে বলা চলে।

পৌরুষের সমস্যার গভীরে যাবার আগে নারীত্ব বনাম পৌরুষের 'স্টিরিওটাইপ' নিয়ে কিছু তথ্য অবশ্যই জানা দরকার।

লিঙ্গ সংক্রান্ত 'স্টিরিওটাইপ' : মনস্তাত্ত্বিক সমীক্ষা

১৯৩৬ সালে sex and personality নামে একটি গবেষণাগ্রন্থ প্রকাশিত হয়[৮]। লেখক দুজনের নাম টারমান এবং মাইল্‌স। বইটির প্রতিপাদ্য বিষয় নারী ও পুরুষের ব্যক্তিত্বের বৈশিষ্ট্য। বইটি অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়, কারণ এখানে সমাজে সচরাচর লক্ষিত নারী-পুরুষের তফাতগুলির বৈজ্ঞানিক সমর্থন পাওয়া যায়। লেখকদের দুটি স্বতঃসিদ্ধ ধারণা এই বইতে স্পষ্ট। প্রথম, পৌরুষব্যঞ্জক বৈশিষ্ট্যগুলি পুরুষের পক্ষে এবং নারীত্বব্যঞ্জক বৈশিষ্ট্যগুলি মেয়েদের পক্ষে স্বাভাবিক (normative)। দ্বিতীয়, নারীত্ব ও পৌরুষ পরস্পরবিরোধী। অর্থাৎ, টারমান ও মাইল্‌স্ যৌনচিহ্ন ও লিঙ্গের সম্পর্ককে অবিচ্ছেদ্য মনে করতেন, এবং লিঙ্গ সংক্রান্ত স্টিরিওটাইপের গতানুগতিক ধারণার মধ্যে থেকেই গবেষণা শুরু ও শেষ করেছিলেন। এই বিখ্যাত বইটির ফলশ্রুতি স্বরূপ, নারীত্ব ও পুরুষত্ব পরিমাপ করার জন্য অনেকগুলি 'স্কেল' বা পরিমাপক তৈরি হয়, যেগুলি দিয়ে নারী কতটা যোগ্য নারী তা-ও বিচার করার চেষ্টা করা হয়। যেহেতু টারমান ও মাইল্‌সের মতে স্ত্রীশরীরধারীর পক্ষে নারীত্বই স্বাভাবিক, অতএব যে স্ত্রীশরীরধারীর নারীত্ব কম তার উপরে কিছু কলঙ্ক বা 'স্টিগমা' এসে পড়ে। কম পৌরুষসম্পন্ন পুরুষশরীরধারীর পক্ষেও একই কথা সত্য। পরবর্তী তিন দশক ধরে বুদ্ধি, বিশেষ দক্ষতা ও ব্যক্তিত্বের বিভিন্ন ক্ষেত্রে নারী-পুরুষের পার্থক্য নিয়ে প্রচুর গবেষণা হয়, যার মধ্যে ম্যাক্‌কবি ও জ্যাকলিনের কাজ বিশেষ উল্লেখের অপেক্ষা রাখে[৯]।

সুদীর্ঘ গবেষণার ফলে দেখা যায় যে নারী ও পুরুষের তফাতগুলি অনেক সময়ই অস্পষ্ট ও অনিশ্চিত। একটি গবেষণায় যে তফাত পরিষ্কারভাবে ফুটে উঠছে, পরবর্তী সমীক্ষায় তা হারিয়ে যাচ্ছে। সমসাময়িক গবেষণাগুলির দীর্ঘ আলোচনার পরে ম্যাক্‌কবি ও জ্যাকলিন এই সিদ্ধান্তে আসেন যে, নারী ও পুরুষের সামগ্রিক বুদ্ধিবৃত্তিতে বিশেষ তফাত নেই, কিন্তু ভাষাগত দক্ষতায় নারীরা এগিয়ে আছে, আর স্থানিক দক্ষতায় পুরুষেরা। ব্যক্তিত্বের বিষয়ে তফাতগুলি আরো বেশি আপেক্ষিক ও অস্পষ্ট হয়ে যায়।

নারীর নারীত্ব ও পুরুষের পৌরুষ যে স্বাভাবিক বা ধ্রুব না হয়ে সমাজসম্মত 'স্টিরিওটাইপ' মাত্র, এই ধারণাটিকে বিজ্ঞানভিত্তিক মনস্তাত্ত্বিক গবেষণার ক্ষেত্রে কার্যকর ভাবে ব্যবহার করার কৃতিত্ব ব্রোভারম্যানের[১০]। ব্রোভারম্যান ও তাঁর সহকর্মীরা মনে করেছিলেন যে নারী-পুরুষের ব্যক্তিত্বের বৈশিষ্ট্য কোনো সার্বজনীন স্বতঃসিদ্ধ তত্ত্ব নয়; সমাজের চাপে এই বৈশিষ্ট্যগুলি মানুষের আত্মপরিচয় বা 'আইডেনটিটি'র অঙ্গ হয়ে দাঁড়ায়। নিজেকে বর্ণনা করার সময় জ্ঞাত বা অজ্ঞাতভাবে পুরুষ ও নারী আলাদা মাপকাঠি ব্যবহার করে। অতএব, সমাজ-সংস্কৃতির পার্থক্যে এই বৈশিষ্ট্যগুলি আলাদা হয়ে যাওয়াই স্বাভাবিক, যদিও সারা পৃথিবীর সভ্য সমাজের মধ্যে সাধারণ কিছু বৈশিষ্ট্যও খুঁজে পাওয়া যেতেই পারে।

অতঃপর ব্রোভারম্যান আমেরিকার কলেজ ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে লিঙ্গসংক্রান্ত স্টিরিওটাইপের স্বরূপ বোঝার চেষ্টা করেন। তিনি সমীক্ষার মাধ্যমে এমন অনেকগুলি বৈশিষ্ট্যের সন্ধান পান যেগুলি নারী ও পুরুষের মধ্যে আলাদা বলে উত্তরদাতারা মনে করেন। যেসব বৈশিষ্ট্যের ক্ষেত্রে ৭৫% উত্তরদাতা সহমত পোষণ করেন সেগুলিকে আমেরিকার যুব সমাজের চালু স্টিরিওটাইপ বলে ধরে নেওয়া যায়। ছেলেদের উপযোগী বৈশিষ্ট্যগুলি পৌরুষের স্টিরিওটাইপ, মেয়েদের উপযোগী বৈশিষ্ট্যগুলি নারীত্বের নির্দেশক।

ব্রোভারম্যানের সময় পর্যন্তও মনে করা হচ্ছিল যে নারীত্ব ও পৌরুষ পরস্পরবিরোধী। অর্থাৎ একজন ব্যক্তির মধ্যে নারীত্ব যত বাড়বে, পৌরুষ তত কমবে। ১৯৭৩ সালে অ্যানি কনস্টানটিনোপল এই মৌল ধারণাটিকে প্রশ্ন করেন[১১]। তাঁর মতে, একজন ব্যক্তির মধ্যে নারীত্ব ও পৌরুষের বৈশিষ্ট্যগুলি সহাবস্থান করতেই পারে; বস্তুত সকলের মধ্যেই এই সহাবস্থান দেখা যায়।

এই ধারণার তাত্ত্বিক তৎপর্য বিপুল। যতক্ষণ যৌনচিহ্ন ও লিঙ্গকে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত বলে মনে করা হচ্ছিল, অর্থাৎ নারীর নারীত্ব ও পুরুষের পৌরুষ স্বাভাবিক বা প্রাকৃতিক বলে ভাবা হচ্ছিল, ততক্ষণ অবধি যে তাত্ত্বিক মডেলটি ব্যবহার করা হচ্ছিল তা শারীরবিজ্ঞান ভিত্তিক, যেখানে নারী এবং পুরুষশরীরকে দ্ব্যণুক (binary) বিভাজনে দেখা হয়। অপরপক্ষে লিঙ্গ যদি সামাজিক আরোপ হয়, তবে তা যে-কোনো ধরনের রূপই নিতে পারে। এর পরের পদক্ষেপেই বলা যায় যে, মানুষের 'আইডেনটিটি' যেহেতু সামাজিক স্টিরিওটাইপকে অন্তর্ভুক্ত করে, অতএব আইডেনটিটি শুধুমাত্র শারীরিক নয়, সামাজিক। লিঙ্গভিত্তিক আইডেনটিটিতে শারীরিক বা সামাজিক কোন প্রভাব বেশি থাকবে, তারা পরস্পর অনুগামী হবে না বিপরীত হবে, তার স্বরূপ কী হবে, সমস্তটাই অনিশ্চিত ও প্রশ্নযোগ্য হয়ে পড়ে। আমরা বড়জোর বলতে পারি যে একটি বিশেষ স্থানে ও কালে স্ত্রীশরীরধারী ব্যক্তির নারীত্ব বেশি, পুরুষশরীরধারীর পৌরুষ বেশি। কিন্তু একথা বলতে পারি না যে স্ত্রীশরীরধারীর নারীত্বর পরিমাণ তার পৌরুষের চেয়ে বেশি হওয়া উচিত।

পরবর্তী পর্যায়ে সান্ড্রা বেম ও জ্যানেট স্পেন্স পৃথকভাবে এই নতুন দৃষ্টিভঙ্গিকে স্পষ্টতর করে প্রকাশ করেন[১২]। বেম নারীত্ব ও পৌরুষকে দুটি পরস্পরছেদী অক্ষরেখার মতো কল্পনা করেন। কোনো ব্যক্তি, তাঁর যৌনচিহ্ন যা-ই হোক না কেন, যদি পৌরুষের পরিমাপকে মধ্যমানের নীচে ও নারীত্বের পরিমাপকে মধ্যমানের উপরে থাকেন তবে তিনি নারীত্বব্যঞ্জক মনোভাবের (feminine) অধিকারী। পৌরুষের পরিমাপকে মধ্যমানের উপরে ও নারীত্বের পরিমাপকে মধ্যমানের নীচে থাকলে তিনি পৌরুষব্যঞ্জক মনোভাব (masculine) রাখেন। উভয় পরিমাপকেই মধ্যমানের উপরে থাকলে তিনি উভলিঙ্গ মনোভাব (androfyrons) ধরেন। উভয় পরিমাপকেই মধ্যমানের নীচে যাঁর অবস্থান তিনি অবিশ্লিষ্টলিঙ্গ মানসিকতার (undifferentiated) মানুষ। শেষোক্ত দুই শ্রেণীর পুরুষ বা নারী, স্পষ্টতই, সাধারণের থেকে একটু আলাদা। আবার

পুরুষশরীরধারী ব্যক্তি যদি নারীত্বব্যঞ্জক ব্যক্তিত্বের অধিকারী হন, অথবা নারীশরীরধারী ব্যক্তির পৌরুষের প্রাধান্য থাকে, তবে তাঁদেরও সমাজে কিছু কিছু সমস্যা হতেই পারে। তবে এর অর্থ কখনোই এরকম নয় যে সমাজের আরোপিত ভঙ্গি থেকে বিচ্যুতি মনস্তাত্ত্বিক অর্থে 'অসুস্থ' বা 'খারাপ'। বস্তুত প্রত্যেকটি বৈশিষ্ট্য ভঙ্গিরই আলাদা আলাদা তাৎপর্য, দ্যোতনা ও ফলাফল আছে, যার কিছু খারাপ, কিছু ভাল।

বিগত দুই দশকে ভারতবর্ষে ও প্রাচ্যের অন্যান্য দেশেও লিঙ্গ স্টিরিওটাইপ নিয়ে গবেষণা হয়েছে। প্রতীচ্যের সঙ্গে প্রাচ্যের বৈশিষ্ট্যগুলি কোথাও মিলেছে, কোথাও বা আলাদা হয়েছে। তবে মোটের উপর দেখা গেছে যে সর্বত্রই পুরুষকে বলবান, যুক্তিবাদী, কর্মী, কষ্টসহিষ্ণু, উদ্যোগী, নেতা হিসাবে চিত্রিত করা হয়েছে। নারীর বৈশিষ্ট্য হিসেবে লক্ষিত হয়েছে সমর্পণ, কোমলতা, সৌন্দর্য, আবেগপ্রবণতা। প্রতীচ্যে পারিবারিক বন্ধন নারীত্বের ও বুদ্ধি পৌরুষের লক্ষণ বলে চিহ্নিত হয়েছে। প্রাচ্যে এই বৈশিষ্ট্য দুটি সচরাচর নারী-পুরুষের মধ্যে সমভাবে বর্তমান বলে মনে করা হয়েছে। তবে স্থান ও কালের সঙ্গে সঙ্গে এই বৈশিষ্ট্যের স্বরূপ যে বদলে যেতে পারে, বিভিন্ন সমীক্ষায় একথা বারবার প্রমাণিত হয়েছে। বর্তমান লেখকও কলকাতা শহরের মধ্যবিত্তদের মধ্যে সমীক্ষা করে দেখেছেন যে বয়স অনুসারে লিঙ্গ স্টিরিওটাইপ পরিবর্তিত হয়ে যায়।

পৌরুষের স্টিরিওটাইপ: সুবিধা ও সঙ্কট

লিঙ্গের স্টিরিওটাইপ নিয়ে যাবতীয় সমীক্ষায় দুটি বৈশিষ্ট্য দেখা গেছে। প্রথমটি হল নারীত্ব বনাম পৌরুষের সাধারণ মূল্যায়ন বিষয়ে। যদি উত্তরদাতাদের প্রশ্ন করা যায় যে 'বলবান', যুক্তিবাদী', 'কোমল', 'সুন্দর' ইত্যাদি নারীত্ব ও পৌরুষের নির্দেশক যাবতীয় গুণাবলীর মধ্যে সাধারণভাবে মানবসমাজের পক্ষে কোনগুলি বেশি প্রশংসণীয়, তবে পৌরুষসূচক গুণগুলিই বেশি গুরুত্ব পেয়ে থাকে। অর্থাৎ জনমত বলছে যে সর্বদাই মানবতার পরিপ্রেক্ষিতে নারীত্বের চেয়ে পৌরুষ ভাল। একটু অন্যভাবে বললে, মানুষের হওয়া উচিত পুরুষের মতো, মেয়েমানুষে আর মানুষে তফাতটা একটু বেশিই।

দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্যটি নারীত্ব বনাম পৌরুষের স্পষ্টতা নিয়ে। সব সমীক্ষাতেই দেখা গেছে পৌরুষের গুণাবলী সম্পর্কে বেশি সংখ্যক মানুষ সহমত পোষণ করেন, এবং বেশিসংখ্যক গুণের সমন্বয়ে পৌরুষের সংজ্ঞা নির্ধারিত হয়। তুলনায় নারীত্বব্যঞ্জক গুণের সংখ্যা কম, আর এ বিষয়ে কম সংখ্যক মানুষ একমত হতে পারেন। অর্থাৎ পৌরুষ কী, তা সমাজ নিশ্চিতভাবে জানে; নারীত্ব কী, তা আবছা ও অনিশ্চিত। নারী 'রহস্যময়ী'।

অতএব স্পষ্টতই পিতৃতান্ত্রিক সমাজে পৌরুষের স্টিরিওটাইপ পুরুষকে সুবিধাজনক অবস্থানে এনে দেয়। নারীমুক্তি আন্দোলনের প্রতিটি স্তরে এই সুযোগ-সুবিধার বৈষম্যকে স্পষ্ট করে তুলে ধরা হয়েছে। এই বিষয়ে কোনও সন্দেহই নেই যে পুরুষের 'আইডেনটিটি' স্পষ্ট, প্রশংসিত ও সোচ্চার; পুরুষের হাতেই আছে আর্থসামাজিক ও রাজনৈতিক

ক্ষমতা। ভোগবাদী সমাজে পুরুষই ভোক্তা, বিষয়ী ও অধিকারী। পৌরুষের স্টিরিওটাইপ যেহেতু নেতৃত্ব ও উদ্যম, তাই পুরুষই স্থির করে কী তার চাই। নারীত্বের স্টিরিওটাইপ সৌন্দর্য ও সমর্পণ, তাই নারী পুরুষের চাহিদার জোগান দেয়। পৌরুষের স্টিরিওটাইপ সুনিশ্চিত বৈশিষ্ট্যের নিরিখে চিহ্নিত; তাই পুরুষ নিজেকে বদলায় না। নারীর আইডেনটিটি তরল ও বহমান; তাই নারী কখনো কামিনীরূপে পুরুষের যৌনতার ইন্ধন, কখনো আত্মত্যাগে মহীয়সী যৌনতাহীন মা।

কিন্তু যে কোনও প্রাপ্তির জন্যই মূল্য দিতে হয়। মানবজাতির অর্ধেককে পৌরুষের হাতিয়ারে দমিত করে রাখতে গিয়ে পুরুষকেও দাম দিতে হয়েছে। নারীত্বের স্টিরিওটাইপ যেমন নারীর মধ্যে নানারকম সামাজিক ও মানবিক বাধা তৈরি করেছে, পৌরুষের স্টিরিওটাইপও নানা সমস্যার জন্ম দিয়েছে। কিন্তু নারীর সমস্যাগুলি শারীরিক ও সামাজিক বলে স্থূল এবং প্রকট; পুরুষের বিপন্নতা সূক্ষ্ম ও কিছুটা গোপন। এতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই, পিতৃতান্ত্রিক সমাজগঠন অবশ্যই পুরুষকে অন্তত আপাতভাবে সুখী ও সুবিধাভোগী করবেই। পৌরুষকে মহিমান্বিত করে দেখানোও এই একই ছকে পড়ে। কিন্তু এর ফলে পুরুষ যা হারায় তা হল মানসিক স্থিতিশীলতা ও আবেগের স্বাচ্ছন্দ্য। হয়তো খাদ্য-অর্থ-বিলাসের সিংহভাগ অধিকার করতে গিয়ে তার হৃদয়ের প্রাপ্তিতে কোথাও ঘাটতি ঘটে গেছে।

কিছু তথ্য খতিয়ে দেখা যাক[১৩]। নারী ও পুরুষের মানসিক রোগের পরিসংখ্যান দেখলে দেখা যায় যে কতকগুলি বিশেষ ধরনের রোগ নারীর মধ্যে বেশি—এর মধ্যে প্রধান হচ্ছে বিষাদরোগ, উৎকণ্ঠা এবং উদ্বেগজনিত শারীরিক সমস্যা। স্কিৎসোফ্রেনিয়া গোষ্ঠীর যে-সব রোগে মানুষ বাস্তবতাবোধ থেকে বিচ্যুত হয়ে যায় সেগুলি মোটের ওপর নারী ও পুরুষের মধ্যে সমানভাবেই দেখা যায়। আর পুরুষের মধ্যে যে রোগগুলির হার বেশি সেগুলি অনুভূতি সম্পর্কিত নয়, বরং মানসিক রোগ আর সামাজিকভাবে অনৈতিক এবং উৎপীড়ক মানসিকতার মাঝামাঝি অবস্থান, যার মধ্যে প্রধান হল বিভিন্ন ধরনের নেশা ও অপরাধপ্রবণতা। অর্থাৎ নারী তার সমস্যা ও হতাশাজনিত অবসাদ ও ক্রোধে নিজেই বিষণ্ণ ও উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ে। পুরুষ অনুরূপ অবস্থায় হয় নেশার মধ্যে ডুবে গিয়ে সমস্যার সমাধান করার চেষ্টাকে এড়িয়ে চলে, অথবা নিজের ক্রোধ ও হতাশার প্রকাশ ঘটায় আগ্রাসী অপরাধমূলক কাজে অন্যের ক্ষতি করে।

নারীত্ব ও পৌরুষের গুণাবলীর সঙ্গেও মানসিক স্বাস্থ্যের সম্পর্ক বিশ্লেষণ করলে একই ধরনের ফল পাওয়া যায়[১৪]। বিষাদ বা উদ্বেগের সঙ্গে কোমলতা, সমর্পণ প্রভৃতি নারীত্বব্যঞ্জক বৈশিষ্ট্যের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। আবার পৌরুষের ব্যক্তিত্ব যার মধ্যে প্রধান তার আগ্রসনের অপযোজনমূলক প্রকাশ বেশি। নারী বা পুরুষ উভয়ের ক্ষেত্রেই এই কথা সত্য। আবার যদি পুরুষের মধ্যে পৌরুষসূচক গুণের অভাব থাকে তবে তার মানসিক সমস্যা অনেকটাই বেড়ে যায়। মেয়েলি পুরুষের ব্যক্তিগত ও সামাজিক অসুবিধা পুরুষালি মেয়ের চেয়ে বেশি।

সমাজতাত্ত্বিক ও মনোবিজ্ঞানীদের মতে পৌরুষের দুটি প্রধান সহযোগী—ক্ষমতা ও যুক্তি। এই দুয়ের সঙ্গেই, অন্তত আপাতদৃষ্টিতে, অনুভূতিপ্রবণতা, সংবেদনশীলতা ও আবেগের বিরোধ। সম্ভবত পৌরুষের স্টিরিওটাইপ ধরে রাখার চেষ্টাতেই বহু পুরুষ নিজের হৃদয়ের সঙ্গে যোগাযোগ হারিয়ে ফেলে এবং যখন আবেগের দ্বারা সমস্যার সমাধান করা উচিত, তখন ক্ষমতার প্রকাশ ও কুযুক্তির অস্বাভাবিক পথ বেছে নেয়।

আশির দশকের শেষভাগ থেকে রিচার্ড আইসলার ও তাঁর সহকর্মীরা পৌরুষের লিঙ্গভিত্তিক চাপের (masculine gender role stress) উৎসগুলি চিহ্নিত করার চেষ্টা করে চলেছেন[১৫]। আইসলারের মতে, নারীত্বের মতো পৌরুষও এক ধরনের বিভ্রমের উৎস। যখন পৌরুষের নির্দেশ 'হেজিমনিক' হয়ে ওঠে, পৌরুষের ব্যতিক্রম মাত্রেই নিজেকে অসফল বা ভ্রান্ত মনে হয়, তখনই তৈরি হয় পৌরুষের চাপ। জীবনের নঞর্থক পরিস্থিতিতে যখন তীব্র আবেগ জমা হয়, তখন একজন নারীত্বপ্রধান মানুষ সহজেই তার মোকাবিলা করতে পারেন, কিন্তু পৌরুষসর্বস্ব মানুষের পক্ষে পরিস্থিতি জটিল হয়ে যাবার সম্ভাবনা থাকে। পৌরুষের স্টিরিওটাইপে আবদ্ধ ব্যক্তির কাছে আবেগের স্বীকৃতি ক্ষমতাহীনতা ও যুক্তিহীনতারই নামান্তর।

আইসলার ও তাঁর সহ-গবেষকরা পৌরুষের লিঙ্গভিত্তিক চাপের পাঁচটি প্রধান উপাদান বর্ণনা করেছেন। এগুলি একে একে আলোচনা করা যাক।

(ক) শারীরিক সামর্থ্য হারানোর ভয়—ডন জুয়ানের পেশিবহুল কপাটবক্ষ নাকি এত প্রশস্ত ছিল যে সেখানে একসঙ্গে বহু সুন্দরী রমণীর স্থান হতে পারত। যেহেতু পিতৃতন্ত্রের জয়ের আদিম উৎস পেশিশক্তি, তাই একুশ শতকেও শারীরিক শক্তি ও পেশিবহুল পুরুষালি চেহারা পৌরুষের দ্যোতক হয়ে আছে। পৌরুষের এই শারীরিক রূপায়ণের মধ্যে যৌন আকর্ষণ ও যৌনক্ষমতাও একটি বড় উপাদান। শরীরভিত্তিক পৌরুষের আদর্শের উদাহরণ ফিল্মের দুনিয়ায় অজস্র। সোয়ার্জেনেগারকে এর প্রতিভূ হিসাবে ধরা যায়।

পেশিক্ষমতায় ও যৌনক্ষমতায় হেরে যাবার সম্ভাবনা পুরুষের মধ্যে নানা ধরনের ভয় তৈরি করে। শরীরচর্চা সম্পর্কে অত্যুৎসাহ, বার্ধক্যকে সহজে গ্রহণ করার অক্ষমতা, শারীরিক রোগে কাতর হয়ে পড়লে বিষাদগ্রস্ত হওয়া—এগুলি এই ভয়ের প্রকাশ। আবার যৌনতার বিভিন্ন 'মিথ', পুরুষাঙ্গের ক্ষমতা নিয়ে নানাবিধ রঙ্গরসিকতা, পুরুষাঙ্গের দৈর্ঘ্য-প্রস্থ নিয়ে উদ্বেগ ও অহঙ্কার, যৌনক্রিয়ার স্থায়িত্ব ও শক্তি সম্পর্কে অর্ধসত্য ধারণা—এগুলিও এই শারীরিক শক্তি হারানোর ভয় থেকেই উদ্ভূত।

পুরুষের শারীরিক অক্ষমতার ভয়ের আরেকটি দিক হল সমকামের ভয় (homophobia)। পৌরুষের স্টিরিওটাইপ অনুসারে বিপরীতকাম, এমনকি উৎপীড়নমূলক হলেও, গ্রহণযোগ্য ও পুরুষালি। দুজন পুরুষ তাদের কথোপকথনে নারীদেহকে ভোগ করার প্রসঙ্গ এলে আনন্দ উপভোগ করে; নারীরা তাকে দেখে কামতাড়িত হচ্ছে, একথা বলে অহঙ্কার করে। কিন্তু কোনও পুরুষের দিক থেকে অনুরূপ ইঙ্গিত এলে তারা লজ্জা ও ভয় পায়।

কেউ বিপরীতকামী, কেউ সমকামী রুচির হতে পারে—এইটুকুই এর প্রাসঙ্গিকতা। অস্বস্তি, লজ্জা বা ভয়ের স্থান এখানে কোথাও থাকার কথা নয়। তা সত্ত্বেও সমকামের প্রসঙ্গ যে মানসিকভাবে ব্যক্তিকে বিচলিত করে দেয় তার মূলে আছে পুরুষের যৌনতার একটি একমুখী ধারণা: নারীযোনিতে প্রবিষ্ট হওয়া, দীর্ঘস্থায়ী যৌনক্রিয়ার ক্ষমতা রাখা এবং নারীকে অন্তঃসত্ত্বা করতে পারাই পৌরুষের মাপকাঠি। সমকাম পুরুষের সক্ষমতাকেই যেন চ্যালেঞ্জ করে।

(খ) আবেগ প্রকাশের অক্ষমতা—Boys don't cry, একটি সিনেমার নাম। নারীশরীরধারী এক যৌনরূপান্তরকামী মনে মনে পুরুষ। পুরুষদেহ ধারণের কামনা করার পাশাপাশি সে পৌরুষের স্টিরিওটাইপকেও গ্রহণ করেছে। তাই দেহেমনে শত বেদনা-যন্ত্রণাও সে মুখ বুজে সহ্য করে, এবং অবশেষে ঘটনাচক্রে মুখ বুজেই মৃত্যুবরণ করে।

চোখের জল, অকারণ হাসি, লজ্জা, ভয় অকপট বিস্ময়—এসবই নারীর বৈশিষ্ট্য। ক্রোধ এবং বিজয়ের উল্লাস ছাড়া অন্য কোনও আবেগ প্রকাশ পুরুষের পক্ষে শোভা পায় না। তাই, বিশেষত শোক ও বেদনার প্রতিক্রিয়ায় পুরুষ থাকে নির্বাক। পুরুষের লজ্জার প্রকাশ স্থানত্যাগে, ভয়ের প্রতিক্রিয়া অস্বীকৃতিতে, স্নেহের প্রকাশ রক্ষকের ভূমিকা পালনে।

পৌরুষের আবেগহীনতার স্টিরিওটাইপ পুরুষের মানসিক স্বাস্থ্যসমস্যার সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে জড়িয়ে আছে। আবেগ যে একটা বাস্তব, পৌরুষের আদর্শ এ কথা অস্বীকার করে। ফলে অভ্যন্তরীণ বেদনা সীমা ছাড়ালে পুরুষকে হয় সুরা ও মাদকের মাধ্যমে বাস্তবকে ভুলে যাবার চেষ্টা করতে হয়, অথবা আগ্রাসন-ভায়োলেন্সের মাধ্যমে বাস্তবকে জোর করে বদলে দেবার চেষ্টা করতে হয়। কোনও কোনও ক্ষেত্রে সমস্যার সমাধানে বিফল পুরুষ দুটিই একত্রে করে। অভাবী পরিবারের উপার্জনে অক্ষম পুরুষটির সামান্য উপার্জিত অর্থে মদ খেয়ে এসে স্ত্রীকে মারধর করার মধ্যে পৌরুষের এই স্টিরিওটাইপ প্রচ্ছন্নভাবে বর্তমান থাকে।

কোমল আবেগকে প্রকাশ করার এই অসুবিধার ফলে বহু পুরুষ পিতৃত্বের সুখপ্রদ অভিজ্ঞতা থেকে নিজেদের বঞ্চিত করে রেখেছেন। পুরোনো ভারতীয় সমাজের কর্তাদের ক্ষেত্রে একথা বিশেষভাবে প্রযোজ্য। এই প্রবণতা এখনো পুরোপুরি কাটেনি, যদিও চোখে পড়ার মতো বদলও ঘটেছে। অনেক পিতাই আজকাল সন্তানপালনের দায়িত্ব মায়ের সঙ্গে ভাগ করে নিচ্ছেন। মিডিয়াও পুরুষের এই স্নেহকোমল ভূমিকাকে সমর্থন করছে। 'সম্পূর্ণ পুরুষের' বিজ্ঞাপনে শিশুর কাছে বিনত পুরুষ এর প্রমাণ। আধুনিক ফিল্মের নায়কও অনেক সময় সংবেদনশীল স্নেহপরায়ণ পিতা। সেই স্নেহের প্রকাশ চোখের জলে ও সন্তানের কাছে আবেগের প্রকাশে।

তবে নারীর সঙ্গে আচরণে কোমলতার স্বচ্ছন্দ উৎসার, সাবলীল অশ্রুপাত এখনো সমাজে সহজ নয়। সম্ভবত নারীত্বের ক্ষমতার সঙ্গে বোঝাপড়া সম্পূর্ণ না হলে এই সহজ অনুভূতিকে রূপ দেওয়া যাবেও না।

(গ) নারীর কাছে নত হবার লজ্জা—নারীকে মা হিসেবে মেনে নিয়ে তার স্নেহ-মমতা গ্রহণ করতে, তার আশীর্বাদ চাইতে বা আদেশ পালন করতে, অন্তত নীতিগতভাবে, অধিকাংশ পুরুষের অসুবিধা হয় না। নারীকে স্ত্রীরূপে দেখে তার আব্দার, অনুরোধ মেনে নেওয়াও অধিকাংশ স্বামীর কাছে বিশেষ সমস্যা তৈরি করে না। কিন্তু সেই নারীই যদি 'বস্' হয়, শাসক হয়, কর্মজগতে টেবিলের ওপারে হেলানো চেয়ারে বসে চাকরিতে নিয়োগ ও বিয়োগ করার অধিকারী হয়? নারীর কাছে আর্থসামাজিক ক্ষেত্রে নীচু হলে পুরুষের মনে এক ধরনের দ্বন্দ্ব ও ভয় তৈরি হয়—অক্ষমতার ভয়।

এই ভয় ও অগৌরবের মোকাবিলাও পুরুষ করে লিঙ্গ স্টিরিওটাইপ দিয়ে। নারীর জগৎ আবেগের, তাই যুক্তিবুদ্ধির প্রতিযোগিতায় সে অযোগ্য—এই বিবেচনায় মেয়েদের উচ্চপদে নিয়োগের ক্ষেত্রে তৈরি হয়েছে অলক্ষ্য কাঁচের ছাদ। কোনো নারী যদি ঘটনাচক্রে কোনো প্রতিষ্ঠানের উচ্চতম পদে আসীন হন, তবে তা 'খবর'। আবার নারী অর্থেই সৌন্দর্য ও পুরুষের ভোগ্য যৌনতা। তাই যদি কোনো নারী উচ্চপদে ওঠে তবে নিশ্চয়ই তা তার রূপ বা গোপন সম্পর্কের জন্য, কৃতিত্বের জন্য নয়! এই মানসিকতারই অন্য প্রকাশ কর্মক্ষেত্রে যৌন উৎপীড়ন, এমনকি উৎপীড়নকে পুরুষের অধিকার বলে মনে করা।

রাজনৈতিক ক্ষমতার ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য। তবে এই বিষয়ে এশিয়ার একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্যের কথা উল্লেখ না করলে ভুল হবে। এশিয়ার বহু দেশেই রাষ্ট্রের উচ্চতম পদে মেয়েরা আছেন বা ছিলেন। পৃথিবীর অন্য কোনো মহাদেশে এত বেশি সংখ্যক মহিলা রাজনৈতিক ক্ষমতার শীর্ষে থাকেননি। এক্ষেত্রেও অনেকে বলেন যে এই মহিলারা ক্ষমতায় এসেছেন পিতা বা স্বামীর উত্তরাধিকারে, নিজগুণে নয়। কিন্তু একথা যদি প্রাথমিকভাবে সত্যও হয়, তাহলেও রাজনৈতিক ক্ষমতা কিন্তু ধরে রাখতে হয়েছে মেয়েদেরই, এবং পৌরুষের স্টিরিওটাইপের বিরুদ্ধে। এক্ষেত্রে কোনোভাবে প্রাচ্যের লিঙ্গ স্টিরিওটাইপ মৌলিক স্তরে প্রতীচ্যের চেয়ে আলাদা কিনা সে বিষয়ে গভীরতর আলোচনার অবকাশ আছে।

(ঘ) বিদ্যাবুদ্ধির প্রাধান্য হারানোর ভয়—যেহেতু পৌরুষের অন্যতম প্রাথমিক শর্ত যুক্তিবুদ্ধির প্রাধান্য, তাই তথ্য ও যুক্তির ব্যাপারে এগিয়ে না থাকলে পুরুষ অসুবিধা বোধ করে। মেয়েরা অনেক সহজে 'আমি বুঝি না' বলতে পারে, বিশেষ করে প্রসঙ্গ যেখানে বহির্জগৎ। পুরুষকে বহু ক্ষেত্রে মিথ্যা অহঙ্কার করেও 'বুঝি' বলতে হয়।

এর দুটি কুফল দেখা যায়। প্রথমত, বিদ্যাবুদ্ধিতে জয়ী হবার আপ্রাণ চেষ্টায় পুরুষ কখনো কখনো আত্মরক্ষামূলক কুযুক্তির (defensive rationalization) উপর নির্ভর করে। দ্বিতীয়ত, ঘনিষ্ঠ মেয়েদের, বিশেষত স্ত্রীকে বা প্রেমিকাকে বিদ্যায় বেশি এগিয়ে যেতে দেবার ক্ষেত্রে পুরুষের মনে অবচেতন বাধা তৈরি হয়। আমাদের দেশে

একসময় মনে করা হত মেয়েরা লেখাপড়া শিখলে বিধবা হয়। রূপকার্যে, পৌরুষের মাপকাঠিতে স্ত্রী যদি বিদ্যায় এগিয়ে থাকে, তবে স্বামীর কাছে তা মৃত্যুতুল্য।

(ঙ) অসাফল্যের ভয়—কর্মজীবনে বা ব্যক্তিজীবনে সাফল্যের কোনো একক মাপকাঠি নেই। উচ্চপদ, যশ, অর্থ প্রতিপত্তি এগুলি যেমন সাফল্যের মাপকাঠি হতে পারে, ভালবাসা বা আনন্দে থাকা, অন্যকে সাহায্য করাকেও কেউ ব্যক্তিগত স্তরে সাফল্য মনে করতে পারেন। সম্পর্কের ক্ষেত্রে, এমনকি যৌন সম্পর্কের ক্ষেত্রেও একই কথা। কেউ মনে করেন অন্যের কাছে আকর্ষণীয় হওয়াই সাফল্য, কারুর কাছে অন্যের প্রতি যত্নবান হওয়া সফলতার চিহ্ন। কেউ কেউ বিপরীত লিঙ্গের ব্যক্তির সঙ্গে সাফল্যের সংজ্ঞা দেন যৌনক্রিয়ার বা সন্তান উৎপাদনের ক্ষমতার নিরিখে, কেউ প্রীতির দাবিতে।

যে যেভাবেই সাফল্যের সংজ্ঞা দেবার চেষ্টা করুক না কেন, তাতে বিফলতা আসতেই পারে। বিশেষ করে সাফল্যকে যখন অর্থ, পদ, ক্ষমতা বা নিজের আকর্ষণী শক্তির হিসাবে বিচার করা হয়, তখন সফল হবার চেষ্টা কতটা সার্থক হবে তা পারিপার্শ্বিকের ঘটনাবলীর উপরেও অনেকটা নির্ভর করে। পৌরুষের অন্যতম স্টিরিওটাইপ হল এই বাহ্যজগতের সাফল্য, এবং তার অভাবে বহু পুরুষের অভিযোজনের সমস্যা দেখা দেয়। মিডিয়াও বাহ্যজগতের সাফল্যই আসল সাফল্য, এই ধরনের একটা ছবি তৈরি করে। বহির্জগতের অর্থনীতির মাপকাঠিতে তৈরি ক্ষমতার অতিমূল্যায়নের ফলে আরেক ধরনের সমস্যাও গড়ে ওঠে। আমাদের প্রত্যেকের মনে একটা নীতি ও মূল্যবোধের প্রাথমিক ভিত্তি থাকে। বাজারি সাফল্যের অতিমূল্যায়ন ব্যক্তিকে নীতিনিষ্ঠতার প্রয়োজন সম্পর্কে সংশয়াচ্ছন্ন করে তোলে, নিজের সম্পর্কে ধারণার স্পষ্টতা ও আত্মবিশ্বাসকে টলিয়ে দেয়। এই উদ্বেগের অনিবার্য ফল মূল্যবোধে ভাঙন ও যে-কোনো ভাবে সাফল্যলাভের চেষ্টা। আবার এই অনৈতিক সাফল্যকেও সকলে সহজভাবে নিতে পারে না। বিবেকদংশন এবং অপরাধবোধজনিত কারণে নিজের চোখে নিজের ছোট হয়ে যাওয়ার প্রক্রিয়াটিও চলতে থাকে।

সাফল্যকে যদি অন্তর্জগতের নিরিখে সংজ্ঞা দেওয়া যেত, অর্থাৎ অন্যের প্রতি সংবেদনশীল হওয়া, অন্যের দায়িত্ব নেওয়া যদি সাফল্যের মাপকাঠি হত তবে এই আন্তর এবং বহির্জগতের বিরোধ হয়ত এত প্রকট হত না। কিন্তু পৌরুষের প্রচলিত স্টিরিওটাইপ আবেগসম্পর্কিত অস্বাচ্ছন্দ্যের কারণে অন্তর্জগতের মাপকাঠিকে গ্রহণ করে না। তারই ফলশ্রুতি বিফলতার বোধ, নৈরাশ্য ও নৈতিক দ্বন্দ্ব।

যৌনতার ক্ষেত্রেও যৌন অসাফল্যের ভয় মিশে যায় শারীরিক অক্ষমতার ভয়ের সঙ্গে। এর দুটি ফল হতে পারে। যৌন অসাফল্যে ভীত পুরুষের স্বাভাবিক যৌনক্রিয়ার সমস্যা দেখা দিতে পারে—মূলত উদ্বেগজনিত অনিয়ন্ত্রিত বীর্যপাত (premature ejaculation) অথবা বীর্যপাতের অক্ষমতা (male orgasmic dysfunction) রূপে। আবার কোনো কোনো ক্ষেত্রে আগ্রাসী মনোভাবের সঙ্গে জড়িয়ে গিয়ে যৌন অসাফল্যের

ভয় পুরুষকে যৌন উৎপীড়ক করে তুলতে পারে। এক শ্রেণীর ধর্ষকের মধ্যে এই মানসিকতার সন্ধান পাওয়া যায়।

একটু ভাবলেই বোঝা যাবে এই পাঁচ ধরনের চাপের মূলে আছে একটি বিশেষ উপাদান—যার নাম ক্ষমতা। এককথায় বলতে গেলে পৌরুষের স্টিরিওটাইপের মূল সূত্রই হল ক্ষমতার লিপ্সা। পরবর্তী দুটি পর্বে ক্ষমতা ও পৌরুষের সম্পর্ক নিয়ে বিশদ আলোচনা করব।

প্রথমে বোঝা দরকার সমাজ ও সংস্কৃতি কিভাবে পুরুষ-শিশুর মনে সাধারণ মানবিক চাহিদাগুলিকে ক্ষমতার সঙ্গে জড়িয়ে দেয়। এই আলোচনার জন্য মনঃসমীক্ষণের কিছু প্রাথমিক তত্ত্বের সাহায্য নেওয়া দরকার।

মনঃসমীক্ষণের নিরিখে পৌরুষের নির্মাণ

সিগমুন্ড ফ্রয়েড কখনো সচেতনভাবে লিঙ্গচর্চা করতে চাননি। কিন্তু ভিয়েনার মধ্যবিত্ত শ্রেণীর নিউরোসিস সারাতে গিয়ে উনিশ শতকীয় সমাজের যৌনতা ও লিঙ্গ-ধারণার গভীরে তাঁর দৃষ্টি পড়ে। ফলত নিজের অজান্তেই ফ্রয়েড পরবর্তী দুই শতাব্দীর লিঙ্গচেতনার নির্মাণে চিরস্থায়ী প্রভাব রেখে গেছেন। ফ্রয়েডের লিঙ্গ সম্পর্কে ধারণাকে গভীরভাবে অনুধাবন করলে কিন্তু আবার অন্য একটা প্রবণতা চোখে পড়ে। যে-কোনও তত্ত্বই একটি বিশেষ আর্থসামাজিক পরিস্থিতির সৃষ্টি। উনিশ শতকের শেষভাগ থেকে বিশ শতকের প্রথম দু-তিন দশক পর্যন্ত মানবমনের ক্রিয়া সম্পর্কে ধারণা ও যুক্তিবাদের যে স্রোত জ্ঞানের জগৎকে নিয়ন্ত্রণ করছিল, ফ্রয়েডের তত্ত্বও তাকে আত্তীকরণ করেছে, তত্ত্বস্রষ্টার সজ্ঞানে বা অজ্ঞানে। অতএব মানবমন ও পুরুষের মন সমার্থক— এই বিশ্বাস ফ্রয়েডের রচনাতেও ফুটে উঠেছে। হয়ত সেইজন্যই লিঙ্গ-ধারণার ভিত্তি হিসাবে শিশুর মানসযৌন বিকাশের স্তরগুলিকে, বিশেষ করে ঈডিপাস গূঢ়ৈষাকে ফ্রয়েড যখন ব্যাখ্যা করেছেন তখন তা পুরুষশিশুর বিকাশ। অথচ 'পৌরুষ' নিয়ে তাঁর আলাদা কোনও প্রবন্ধ নেই, যদিও 'নারীত্ব' নামধারী দুটি রচনা আছে। এই একদেশদর্শিতার জন্য বহু নারীবাদী ফ্রয়েড-বিরোধী। আবার উনিশ শতকীয় যুক্তিবাদের প্রাধান্য ও চিকিৎসক সমাজের দেকাতীয় মনোভাবের পরিবেশের মধ্যে ফ্রয়েড মনের অযৌক্তিক অংশ, অর্থাৎ অবচেতনের ক্রিয়াকে ব্যাখ্যা করতে বাধ্য হয়েছেন। ফলে তাঁর লেখার মধ্যেও যেন একটা আলো-আঁধারি অবস্থান কখনো কখনো তৈরি হয়েছে, যা পরে সমালোচনার কারণও হয়েছে।

এইসব বিরোধ ও অস্পষ্টতা সত্ত্বেও পৌরুষের প্রাথমিক ধারণার বিকাশে ঈডিপাস গূঢ়ৈষার ভূমিকা নিয়ে খুব বেশি সন্দেহের অবকাশ নেই। অবশ্য অনেক কট্টর ফ্রয়েডিয়ান ঈডিপাস পর্বকেই পৌরুষের (বা নারীত্বের) একমাত্র উৎস বলে প্রচার করে তত্ত্ব ও তথ্যের বিকৃতি ঘটান—সে বিষয়েও সতর্ক থাকা প্রয়োজন।

ঈডিপাস গূঢ়ৈষার বক্তব্যটি সরলীকৃতভাবে সকলেই জানেন, তাই বিশদ ব্যাখ্যায়

যায় না। সংক্ষেপে বলা চলে যে আড়াই-তিন বছরের কাছাকাছি বয়সে শিশুর সুখপ্রাপ্তির মূলকেন্দ্র হয়ে দাঁড়ায় তার যৌনাঙ্গ। আজন্ম সব শিশুর মধ্যেই বিপরীতকামী ও সমকামী যৌনতার সম্ভাবনা থাকে। ফ্রয়েডের মতে স্বাভাবিক বিকাশ হল বিপরীতকাম, যা শারীরবৃত্তীয় কারণে ঈডিপাস পর্বে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। অবশ্যই সমকামী মানুষেরা এই মতের বিরুদ্ধে থাকেন।

যাই হোক ঈডিপাস পর্বে পুরুষ-শিশু তার মায়ের প্রতি আকর্ষণ অনুভব করে। এই আকর্ষণ প্রাক্-ঈডিপাস পর্বের মাকে ভালবাসার থেকে আলাদা—কারণ এতে যৌনতার প্রাধান্য ও জটিলতা মিশেছে। এর অন্যতম পরিণতি মায়ের প্রতি শিশুর অধিকারবোধ। বস্তুত পরবর্তীকালের যৌন ঈর্ষার বীজ ঈডিপাস পর্বে। ঈর্ষার অর্থই ক্ষমতার লড়াই এবং শিশুর কাছে এক অত্যন্ত অসম লড়াই—কেননা প্রতিদ্বন্দ্বী তার ক্ষমতাবান পিতা। এই অর্থে সব সংসারই পিতৃতান্ত্রিক এবং ঈডিপাস গূঢ়ৈষা ব্যাপারটিই পিতৃতন্ত্রের ফসল। হেরে যাওয়ার ভবিতব্যের সামনে দাঁড়ানো শিশুটি তার কল্পনায় মায়ের অধিকার এবং বাবার অপসরণ (মৃত্যু) কামনা করলেও তাকে বাস্তবের মুখোমুখি এসে শেষ অবধি দাঁড়াতেই হয়। মা-ও যে 'সম্পূর্ণ' তার নয়, বাবার প্রতি আনুগত্যই মাকে সংসারে স্থান দিয়েছে—এই বোধ থেকে সে মাকে অবজ্ঞাও করতে শেখে, আর অসম্মানের ভয় থেকে, পুরুষাঙ্গ ছেদনের ভয় থেকে বাঁচার জন্য বাবার সত্তাকে আত্মস্থ করে।

অতঃপর স্মৃতির চরিত্র অনুসারে প্রকৃতির নিয়মে এই সমগ্র জটিল অভিজ্ঞতার অবদমন ঘটে। কিন্তু শিশুর জন্মগত মানসিকতা ও প্রবণতার (temperament) সঙ্গে ঈডিপাস পর্যায়ের অভিজ্ঞতা মিশে গড়ে তোলে শিশুর লিঙ্গচেতনা ও যৌনতা সম্পর্কে নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি। গঠিত হয় তার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য, সমলিঙ্গ ও বিপরীত লিঙ্গ সম্পর্কে পছন্দ-অপছন্দ, শ্রদ্ধা, ঘৃণা, ভালবাসা এবং কখনো বা বিকৃতি। তবে একটি বিষয় খুব স্পষ্ট—ঈডিপাস গূঢ়ৈষার প্রথম পর্বে যদি মায়ের প্রতি কামনার ভূমিকা প্রধান হয়, শেষ পর্যায়ে বাবাকে ক্ষমতাবান দেখার ভূমিকা বড় হয়ে ওঠে। এরই চূড়ান্ত পরিণতি পৌরুষের আত্তীকরণ। তাই ফ্রয়েডীয় তত্ত্ব অনুসারে পিতৃতান্ত্রিক সমাজে পৌরুষ ও ক্ষমতার সম্পর্ক স্বতঃসিদ্ধ।

ঈডিপাস গূঢ়ৈষার বিষয়টি ফ্রয়েড ১৯০০ থেকে ১৯১০ সাল পর্যন্ত বিভিন্ন পর্যায়ে আলোচনা করেন। ১৯১১ সালে ভিয়েনার সাইকোঅ্যানালিটিক সোসাইটির সভাপতি ছিলেন ফ্রয়েডের শিষ্য আলফ্রেড অ্যাডলার[১১]। এই সময় লিঙ্গের স্বরূপ নিয়ে অ্যাডলারের সঙ্গে ফ্রয়েডের তীব্র মতবিরোধ হয়। পৌরুষ ও নারীত্বের পার্থক্যকে অ্যাডলার মূলত ক্ষমতার পার্থক্য হিসাবে দেখতে চান। ফ্রয়েডের মতোই অ্যাডলারও মনে করতেন যে পৌরুষ ও নারীত্ব সমাজ ও ব্যক্তিজীবনে একটি প্রধান মাপকাঠি। কিন্তু এই দুয়ের মূল্য বা মান সমান নয়। নারীত্ব সমাজ-সংস্কৃতিতে কম ক্ষমতার সঙ্গে সমার্থক। অন্যভাবে দেখলে, কম ক্ষমতাসম্পন্ন মানুষকেই নারীত্বের অবস্থানে থাকতে

হয়; তার শরীরের পুরুষত্ব বা স্ত্রীত্ব এখানে বিবেচ্য নয়। আবার একই অর্থে সব শিশুই তার পিতার তুলনায় নারী। আর নারীত্ব মানে অক্ষমতা, তার মানে অপমান ও অবজ্ঞা।

অ্যাডলারের মতে, বালকের ঈডিপাস পর্বে পুরুষাঙ্গ ছেদনের ভয় নারীত্বের জন্য অপমানের ভয়। তাই মানুষ সারাজীবন ধরে খোঁজে প্রাধান্য (superiority), যার যার নিজস্ব ভঙ্গিতে ও মাপকাঠিতে। প্রাধান্য বা ক্ষমতা অর্জনই নারীত্ব থেকে মুক্তির উপায়। এরই অপর নাম 'পৌরুষের প্রতিবাদ" (masculinity protest)। সমগ্র সভ্যতা-সংস্কৃতিই এই অর্থে একটা নিরন্তর ক্ষমতার লড়াই।

পৌরুষ ও নারীত্বের বিরোধিতা ও সামঞ্জস্যের বিষয়ে কার্ল ইয়ুং-এর বক্তব্য বিশেষভাবে জনপ্রিয়, যদিও তার বৈজ্ঞানিক মনস্তাত্ত্বিক সত্যতা নিয়ে সংশয়ের অবকাশ আছে[১৮]। পৌরুষ ও নারীত্বের মধ্যে, ইয়ুং-এর মতে, প্রকৃতি সব সময়ে একটা ভারসাম্য রেখে চলে। তাই পুরুষ বাইরে যত বেশি পৌরুষের মুখাবয়ব (persona) রেখে চলে, তার অন্তরে থাকে ততটাই নারীবৈশিষ্ট্য (ahima), কোমলতা ও ভঙ্গুরতা। পৌরুষ ও নারীত্বের কয়েকটি চিরায়ত রূপায়ণকে ইয়ুং চিহ্নিত করেন মূলত বিভিন্ন প্রাচীন সভ্যতার উপকথা ও কাহিনী থেকে। এগুলিকে তিনি নাম দেন 'আর্কিটাইপ'। মানবসভ্যতার ইতিহাসে সম্রাটরূপে, প্রেমিকরূপে, সৈনিক রূপে, সন্ন্যাসীরূপে পৌরুষের 'আর্কিটাইপ' কাজ করে।

পৌরুষ ও নারীত্ব সম্পর্কে ইয়ুং-এর মত খুবই জনপ্রিয়। এরই একটি অতিসরল রূপ পৌরুষচর্চার প্রয়োজনীয়তাকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য ব্যবহারও হয়। অর্থাৎ কেউ কেউ মনে করেন যে দীর্ঘদিনের নারীবাদ নারীত্ব ও পৌরুষের ভারসাম্যকে টলিয়ে দিয়েছে; তাই পৌরুষবাদও চর্চা হওয়া দরকার। জনপ্রিয়তা সত্ত্বেও ইয়ুং-এর মতবাদের বাস্তব সত্যতা নিয়ে সংশয় আছে। নিজ তত্ত্বের সমর্থনে ইয়ুং যেভাবে ঐতিহাসিক তথ্য ও উপকথাকে চয়ন, পরিবর্তন, পরিমার্জন ও ব্যবহার করেছেন তাও মনোবিজ্ঞানের জগতে সমালোচিত হয়েছে।

পরবর্তী মনঃসমীক্ষকদের মধ্যে[১৯] ভাষা ও ভাবনার কিছু কিছু বদল সত্ত্বেও মোটের উপর পৌরুষের সঙ্গে সক্রিয় ক্ষমতা ও নারীত্বের সঙ্গে নিষ্ক্রিয় গ্রহণ ও দুর্বলতার সম্পর্কটি সমর্থিত হয়। হেলেন ডয়েশ্চ, মেলানি ক্লাইন প্রমুখ ফ্রয়েড-পরবর্তী মহিলা মনঃসমীক্ষকরা নারীমনের অজানা অধ্যায়গুলিকে পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণ করেন ও সেই প্রসঙ্গে পৌরুষের স্টিরিওটাইপ কিভাবে ক্ষমতার প্রকাশ করে নারীত্বকে হেয় করে সে বিষয়ে আলোচনা করেন। এই প্রসঙ্গে সমাজের ভূমিকাকে স্পষ্টতর করে তোলেন নারীবাদী মনঃসমীক্ষকেরা, যাঁদের মধ্যে ন্যানসি চোডোরৌ, হেলেন সিক্সাস, ডরোথি ডিনার স্টাইনের নাম উল্লেখযোগ্য।

দুরূহ ও দুর্বোধ্য হলেও জাক লাঁকার নাম উল্লেখ না করলে এই আলোচনা অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। লাঁকার তত্ত্বে[২০] মন ভাষার সৃষ্টি। শব্দের বাহ্য ও গূঢ় অর্থ

তাদের স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে অনুভূতি ও চিন্তনকে রূপ দেয়। আদিযৌনাঙ্গ বা phallus মৌলিক অর্থে লিঙ্গহীন যৌনচিহ্ন, যা থেকে নারীযোনি ও পুরুষযৌনাঙ্গ উভয়ই সৃষ্টি হয়। কিন্তু সভ্যতা তার বাচনিক ক্ষমতার মাধ্যমে 'phallus'-কে 'penis' বা পুরুষাঙ্গের সঙ্গে এক করে ফেলেছে। ফলে স্ত্রীশরীর বা মাতা হয়ে উঠেছে পুংশরীর বা পিতার 'অপর' (other)। মানবযৌনতার প্রতীক 'phallus-এর প্রাধান্য পৌরুষের প্রাধান্যে পর্যবসিত হয়েছে। এর ফলে মানবসভ্যতার চাবিকাঠি যে ভাষা, তা কেবলমাত্র পুরুষের ভাষাই থেকে গেছে। লাঁকানীয় অর্থে পৌরুষের ভাষার অপর নামই ক্ষমতা বা প্রাধান্য।

পরবর্তী পরিচ্ছেদে ক্ষমতাময় পৌরুষের সামাজিক ও ব্যক্তিক তাৎপর্য বিশদভাবে দেখব।

পৌরুষের ক্ষমতা এবং ক্ষমতার সুযোগ-দুর্যোগ

সমাজের অন্তর্ভুক্তি যে-কোনো মানুষ, নারী-পুরুষ নির্বিশেষে, তার ব্যক্তিক বিকাশের পদে পদে পৌরুষ ও ক্ষমতার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক অনুভব করে। ক্ষমতার প্রধান প্রকাশ নিয়ন্ত্রণে। তাই পৌরুষ আর নিয়ন্ত্রণের অধিকারও পরস্পর অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। পৌরুষের স্বাভাবিক অধিকারী হিসাবে পুরুষ নিজেকে ক্ষমতাবান ও নিয়ামক মনে করে, বিশেষত নারী ও শিশুর তুলনায়। নারী এই নিয়ন্ত্রণের সঙ্গে অভিযোজন করতে শেখে, কখনো সমর্পণ করে, কখনো ছলনা দিয়ে, কখনো সরাসরি পৌরুষ তথা নিয়ন্ত্রণের অধিকার দাবি করে। সম্ভবত এই নিয়ত পরিবর্তনশীল অভিযোজনের জন্যই নারীর স্বরূপও পরিবর্তনশীল। নারীত্বের স্টিরিওটাইপগুলি সংখ্যায় কম এবং অস্পষ্ট।

পুরুষ কী কী বিষয় নিয়ন্ত্রণ করে? উৎপাদন, বাজার এবং বণ্টন তো অবশ্যই তার অধিকৃত বিষয়। এছাড়াও পুরুষ নিয়ন্ত্রণ করে যুক্তি, নীতি, আইন, বিচারবুদ্ধি, সৃজনশীলতা এবং আবেগ প্রকাশের সীমানা। পুরুষ নিয়ন্ত্রণ করে ভাষা—ভালবাসার ভাষা, ক্রোধের ভাষা, আদেশের ভাষা আর আদেশ পালনের ভাষা।

যে মুহূর্তে পুরুষের কাছে তার নিজস্ব পৌরুষ এবং নিয়ামক ক্ষমতা একার্থক হয়ে ওঠে, সেই মুহূর্তটি পুরুষের বিজয়ের মুহূর্ত। আবার অন্য দৃষ্টিকোণ থেকে সেই মুহূর্তটিই তার পরাজয়ের মুহূর্তও বটে। বস্তুত ক্ষমতাবান ব্যক্তি এক ধরনের বিচারে যতটা সুযোগসুবিধা উপভোগ করে, আন্তর অবস্থানের মাপকাঠিতে তার ততটাই দারিদ্র্যের সম্ভাবনা থাকে। একটু ব্যাখ্যা করা যাক।

নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতার পাশাপাশি পুরুষের কিন্তু অন্য কতকগুলি চাহিদাও থাকে। এই চাহিদাগুলির কোনো কোনোটির সঙ্গে নিয়ন্ত্রণের এবং আধিপত্যের সরাসরি বিরোধ আছে। যে দুটি চাহিদার কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করা যায় তা হল কোমল স্পর্শভিত্তিক ভালবাসার চাহিদা এবং নারীর কাছে সমর্পণ ও নির্ভরতার চাহিদা। এই দুয়ের জন্যই প্রয়োজন আবেগের ও অনুভূতির স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশ এবং প্রাধান্যের অহঙ্কার থেকে

বেরিয়ে এসে নারীকে সমমর্যাদায় ভালবাসতে পারা। পৌরুষ ও ক্ষমতার স্টিরিওটাইপ এই দুটিকেই ব্যাহত করে এবং তার ফলে দুটি বিশেষ বিপর্যয় দেখা যায়।

এই দুটি সমস্যা বা বিপর্যয়ের কথাই আগেও বলা হয়েছে, কিন্তু সংক্ষেপে[১১]। এই পর্বে, মনস্তাত্ত্বিক তত্ত্বের সাহায্য নিয়ে সমস্যা দুটিকে বিশদভাবে আলোচনা করব। এই বিশেষ সমস্যা দুটিকে বেছে নেবার কারণ হল এগুলি ব্যক্তিগত সুবিধা-অসুবিধার সীমানা ছাড়িয়ে সামাজিক এমনকি রাষ্ট্রীয় স্তরে প্রভাব বিস্তার করতে পারে।

প্রথম সমস্যাটিকে নাম দেওয়া যায় নারী সম্পর্কে বিভ্রান্তি। দ্বিতীয় সমস্যাটি আগ্রাসন-সন্ত্রাস বা Violence সংক্রান্ত। এই দুটি সমস্যা আলাদা হলেও মনস্তাত্ত্বিক গঠনের দিক দিয়ে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন নয়। আলোচনার সময় একথা স্পষ্ট হয়ে উঠবে।

(ক) নারী সংক্রান্ত বিভ্রান্তি—ঈডিপাস গূঢ়ৈষার আলোচনা করার সময় আমরা দেখেছি যে বালকের মনে মায়ের সম্পর্কে আকর্ষণ ও ঘৃণা দুই-ই তীব্রভাবে কাজ করে। প্রাক্-ঈডিপাস পর্বে এবং ঈডিপাস-উত্তর পর্বেও আরো কিছু বছর এই বালককেই মায়ের উপর পদে পদে নির্ভর করে থাকতে হয়। আবার মায়ের কোমল স্পর্শই বালকের একমাত্র মানসিক আশ্রয়ও বটে। ঈডিপাস পর্বে পিতাকে চূড়ান্ত ক্ষমতাবান দেখার ফলে বালকের মনে নারী সম্পর্কে একটা বিভ্রান্তি তৈরি হবার সম্ভাবনা থাকে। মা তার নির্ভরতার জায়গা, তার শান্তি, তার শ্রদ্ধা-প্রীতি-প্রেমের আধার। আবার এই মা-ই বাবার ক্ষমতা প্রদর্শনে বিনত, ভীত, এবং কিছুটা অসৎ-ও। বিশেষ করে, আমাদের সমাজে স্ত্রীরা যেখানে স্বামীর উপর আর্থিকভাবে নির্ভরশীল সেখানে পুরুষের ক্ষমতার প্রকাশ ও স্ত্রীর নানারকম ছলচাতুরীর মাধ্যমে তাকে খুশি করার চেষ্টা প্রকট হয়ে উঠতে পারে। বালকের মনে, বিশেষত ঠিক যে সময় মাকে আদর্শায়িত করার ইচ্ছা তীব্র, তখন এই ক্ষমতার বৈষম্য ও নারীত্বের স্বেচ্ছাকৃত অপমান বালককে ক্ষুব্ধ করে। পরম ভালবাসার মা-কে তার দুর্বল ও দ্বিচারিণী মনে হয়।

এই অবস্থাটি তথাকথিত পিতৃতান্ত্রিক সভ্য সমাজে প্রায়ই একটি বিচিত্র মনোভাবের জন্ম দেয়। যে বালক মাকে ভালবাসতে গিয়ে মার 'অক্ষমতা' ও 'ছলনা' দেখে বাধ্য হয়েছে স্বৈরাচারী বাবাকে অন্তরে গ্রহণ করতে, সে যখন বয়স্ক পুরুষ হয়ে ওঠে তখন তার নারী সম্পর্কে দর্শনে এই দ্বৈত অনুভূতির ছায়া পড়ে। মনঃসমীক্ষকরা লক্ষ্য করেছেন যে নারী সম্পর্কে পুরুষের ধারণায় প্রায়শই একটি চিড় (split) থেকে যায়। প্রিয় নারীকে সে হয় দেখতে চায় জাগতিক তুচ্ছতা-মালিন্যের ঊর্ধ্বে ম্যাডোনা/জগন্মাতা রূপে, অথবা দেখে ছলনাসর্বস্ব পতিতা রূপে। আবার যেহেতু প্রাক্-ঈডিপাস পর্বে মায়ের ক্ষমতাকে শিশু ভয়ও পায়, কেননা মা-ই তার আনন্দ-বেদনার প্রধান নিয়ন্ত্রক, পরবর্তী কালে জগন্মাতা/পতিতা মায়ের চিত্রণে এই ভয়ও মিশে যায়। তখন এই নারীই হয় কালী কিংবা ডাইনি। ব্যবহারিক জীবনে পুরুষকে ক্রমাগত এই দ্বিধার নিরসন করতে হয়।

ব্যক্তিগত অবচেতনের এই নারীদর্শনের সামাজিক তাৎপর্য বিপুল। মনে রাখতে

হবে যে লিঙ্গ স্টিরিওটাইপের প্রভাব নারী ও পুরুষ দুজনের উপরেই ক্রিয়াশীল, এবং পিতৃতান্ত্রিক সমাজে পৌরুষের স্টিরিওটাইপকে নারীও মনে মনে স্বীকার করে নেয়। অর্থাৎ নারীর 'জগন্মতা বনাম পতিতা' চিত্রটি নারী-পুরুষ উভয়ের মনেই ক্রিয়াশীল থাকে। ফলে সংসারে 'সতী' নারী চেষ্টা করে তার জগন্মাতা রূপটিকে অনুসরণ করতে। প্রাচীনকালে তার প্রকাশ ছিল স্বামীর সেবা-শুশ্রূষায়, 'গৃহদীপ্তি' রূপে বিরাজ করার চেষ্টায়। এখন তার প্রকাশ ঘরে-বাইরে দশভুজা হয়ে সংসারের সমস্যা সমাধানের অসম্ভব প্রয়াসে। দু'ক্ষেত্রেই আত্মত্যাগের নামে আত্মনিপীড়ন ও মাতৃত্বের আদর্শায়ন সাধারণ লক্ষণ। কখনো কখনো এই আদর্শায়ন বাস্তবতার সীমা ছাড়িয়ে যায়; নারী বিশ্বাস করে যে সে যথার্থই অতিপ্রাকৃত শক্তির অধিকারী। প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের 'দেবী' গল্পে এর চূড়ান্ত সাহিত্যিক প্রকাশ।

আবার দেবী যেহেতু যৌনতার উর্ধ্বে, তাই সাংসারিক যৌনতা অনেক সময় তার কাছে আর গ্রহণীয় বা উপভোগ্য থাকে না। তাই স্ত্রী হয় সন্তান উৎপাদনের উপায়, আর যৌনতা উপভোগের জন্য পুরুষের প্রয়োজন হয় 'পতিতা'। মাতৃত্বের মহত্ত্ব থেকে এই নারীরা পতিত, এরা ছলনাময়ী, মিথ্যাভাষিণী। কিন্তু যৌনতার সুখও এদেরই কাছে। তাই সভ্যসমাজ পতিতাবৃত্তি ছাড়া অচল। নারী পুরুষের 'অপর' মাত্র, তাই এই দর্শনের জন্য সমাজের নৈতিক গ্লানিও হয় না।

এই মানসিকতার তাৎপর্য হল নারীকে সম্পূর্ণ মানুষ রূপে না বুঝতে পারা, তাকে সমমান বা সমমর্যাদা না দিতে পারা। মাতৃরূপা নারীকে পুরুষমনস্ক সমাজ বঞ্চিত করে সহজ যৌনতা থেকে, আর যৌনসঙ্গিনী নারীর মাতৃত্বকে অসম্মান করে। এর অবশ্যম্ভাবী ফল নারীর দিক থেকেও পুরুষের প্রতি অসম্মান এবং আগ্রাসন। এইভাবে পিতৃতান্ত্রিক সমাজের ক্ষমতাবান পুরুষের স্টিরিওটাইপ সংসার আর সমাজজীবনে মিথ্যাচার, পারস্পরিক আগ্রাসন আর অতৃপ্তির বীজ বোনে।

(খ) ভায়োলেন্স-যুদ্ধ সংহারের আদর্শায়ন—পৌরুষ অর্থে ক্ষমতা, আর ক্ষমতা অর্থে নিয়ন্ত্রণ, একথা আমরা আগেই বলেছি। পেশিশক্তির প্রাধান্যের কারণে শারীরিক সক্ষমতার প্রকাশ হিসাবে যোদ্ধা পুরুষের 'আর্কিটাইপ' সভ্যতার আদিযুগ থেকে চলে আসছে। টেকনোলজির যুগে পেশিশক্তিকে সরাসরি ব্যবহার করে যুদ্ধের সুযোগ কম। কিন্তু তাতে ভায়োলেন্সের নির্মমতার মানসিকতা কমেনি, বরং টেকনোলজির সাহায্যে তাকে আরো তীব্র, আরো নিষ্ঠুর করে তোলা হয়েছে। যুদ্ধ এখন একটি পরিশীলন।

পুরুষশরীর ঘাতসহ, পুরুষ মন আঘাত করতে ভয় পায় না—এই স্টিরিওটাইপ আত্মস্থ করে বালক পুরুষ হয়ে ওঠে। পুরুষ সত্তা যেন আগ্রাসন সৃষ্টি ও গ্রহণের যন্ত্র। অথচ একথা একেবারেই সত্য নয় যে শারীরিক যন্ত্রণা সহ্য করার ক্ষমতা পুরুষের নারীর চেয়ে বেশি। দু'ক্ষেত্রেই অভ্যাসের সাহায্যে সহ্যশক্তি বাড়ানো যায়। মেয়েরা কিছু কিছু বিশেষ ধরনের যন্ত্রণা সামাজিক কারণে বেশি সহ্য করতে শেখে। এর মধ্যে শীত উত্তাপ, প্রসব যন্ত্রণা, দৈনন্দিন রোগযন্ত্রণা, মলমূত্রত্যাগের বেগ ধারণের ব্যথা।

কিন্তু বহিঃশত্রুর মোকাবিলায় এগুলির তত মূল্য নেই। তাই যোদ্ধার ভূমিকা পৌরুষেরই দ্যোতক। যে নারী যুদ্ধকে পেশা হিসাবে নিয়েছে তাকে আমরা পুরুষালি ভাবতে চাই।

সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় স্তরে যুদ্ধ বা ভায়োলেন্সকে পৌরুষের নিজস্ব এলাকা মনে করার ফলে পুরুষ এককভাবে বা দলবদ্ধভাবে বহু সমস্যার সমধান করতে চায় আগ্রাসনের মাধ্যমে। যুদ্ধজয় তার সম্মানের চিহ্ন, ক্ষমতা দখল তার জীবনের লক্ষ্য। আবারও যদি ঈডিপাস পর্যায়ের বিকাশের ইতিহাস মনে করি, আমরা দেখব যে শিশু ক্ষমতাবান পিতাকে তার প্রতিদ্বন্দ্বী ভেবে, পিতার মৃত্যুকামনা করে জীবন শুরু করেছিল। গ্রীক উপকথায় প্রাচীন পৃথিবীর ইতিহাস পিতৃহননের ইতিহাস। আর যুদ্ধ ও হিংসায় যে বিজয়ী হয়, রাজ্য ও রাজকন্যাও তারই জন্য। ফলে আগ্রাসন ও হিংসার আদর্শায়নও পৌরুষের স্টিরিওটাইপের মধ্যে মিশে থাকে।

এই ক্ষমতা প্রদর্শন ও জয়পরাজয়ের নিরিখে সম্পর্কগুলিকে বোঝার ফলে নারী ও শিশুর উপর ক্ষমতাবান পুরুষের অত্যাচার সমাজে, অন্তত একটা স্তর পর্যন্ত, গ্রহণযোগ্য হয়। পুরুষশিশু বড় হয় এই অতাচারকে ঘৃণা করে, কিন্তু একই সঙ্গে অত্যাচারী মানসিকতাকে আত্মস্থ করেও। তাই পরবর্তীকালে নির্যাতিত হয়ে ওঠে নির্যাতক। যে-সব পুরুষের শৈশবে অত্যাচারের ইতিহাস আছে তারা অনেকেই বড় হয়ে হিংসাত্মক কাজকর্মে, বিশেষত নিপীড়নমূলক কাজে জড়িয়ে পড়ে।

সারা বিশ্বে অপরাধমূলক কাজের খতিয়ান নিলে দেখা যায় যে নারী ও পুরুষ অপরাধী সংখ্যায় প্রায় সমান। কিন্তু ভায়োলেন্সের ব্যবহার পুরুষের মধ্যে বেশি। নারী যেখানে হত্যাকারী সেখানেও তার পদ্ধতিতে দীর্ঘায়ত শারীরিক যন্ত্রণা দেবার চেষ্টা কম দেখা যায়। অর্থাৎ অপরের যন্ত্রণা দেখে নিজের পরাজয়ের গ্লানি ভোলার চেষ্টা, আনন্দ পাবার প্রবণতা, ধর্ষকামী মানসিকতা পুরুষের মধ্যে বেশি।

পৌরুষ ও ভায়োলেন্সের এই সম্পর্ক সমাজে যুদ্ধ ও নির্মমতার বিরুদ্ধে মানবিক প্রতিরোধের ক্ষেত্রে একটি বড় বাধা। যুদ্ধবিরোধী শ্লোগান দিচ্ছে যে-মুখ, তারই পিছনে লুকিয়ে থাকতে পারে যুদ্ধকামী এক মন। ক্ষমতার মধ্যেই পৌরুষের সার্থকতা— এই দর্শন যতক্ষণ ক্রিয়াশীল, ততক্ষণ যুদ্ধের ভবিতব্য থেকে মুক্তি পাওয়া কঠিন।

উপসংহার

পিতৃতান্ত্রিক সমাজে পৌরুষের স্টিরিওটাইপ পুরুষ ও নারীর জীবনে এবং সমগ্র সমাজজীবনে ভালয়-মন্দয় মিশিয়ে যে চালচিত্রটি গড়ে তুলেছে তার কিছুটা অংশ এই স্বল্প পরিসরে দেখা হল। বোঝার বাকি রইল অনেক কিছু।

বর্তমান আলোচনা মূলত পাশ্চাত্য দৃষ্টিভঙ্গি ও তত্ত্বকে ভিত্তি করে এগিয়েছে। পুবের পৃথিবীর চোখে নারীত্ব ও পৌরুষের একটু আলাদা মানে থাকাটা খুব স্বাভাবিক। মনঃসমীক্ষকদের মধ্যেও অনেকে মনে করেন ভারতীয় ঈডিপাস গূঢ়ৈষার চেহারাটি পশ্চিমের চেয়ে অন্যরকম। তার ফলে পুরুষদর্শন এবং নারীদর্শনও একটু ভিন্ন ভাব

নেবে। ভারতীয় সংস্কৃতির ইতিহাসকে আরো বিশদভাবে বিচার করে পৌরুষের সম্পূর্ণ রূপটি এখনো উন্মোচন করা হয়নি।

পৌরুষের স্টিরিওটাইপ যে সমস্যাগুলি তুলে ধরে তার থেকে কিভাবে মুক্তি পাওয়া যায় এ প্রশ্নটিও থেকেই গেল। নারীবাদের কোনো কোনো শাখা মনে করে, নারী যদি পৌরুষের ক্ষমতা অর্জন করে তবে হয়ত সমস্যা মিটবে। আবার কোনো কোনো শাখা নারীত্ব ও পৌরুষের ক্ষেত্রে পৃথক কিন্তু সমমর্যাদার অবস্থান দাবি করে। এরা উভয়েই মনে করে যে সমাজে লিঙ্গ স্টিরিওটাইপ কোনো না কোনো ভাবে থেকেই যাবে। উভয়েরই পক্ষে ও বিপক্ষে কিছু কিছু যুক্তি আছে। এই প্রসঙ্গে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ তথ্য হল যে পুরুষ নারীত্বের ক্ষমতাহীনতা গ্রহণ করলে সুবিধা হবে, এই ধরনের মতবাদ বিশেষ নেই। অর্থাৎ পুরুষ ক্ষমতা হারালে নারী ক্ষমতার প্রয়োগ ও অপপ্রয়োগ করবে, ক্ষমতার লড়াই ছাড়া সমাজ চলা অসম্ভব—এই রকম ধারণাই প্রচলিত আছে। কেউ কেউ আবার লিঙ্গ স্টিরিওটাইপ বর্জিত সমাজ গঠনের কথাও ভেবেছেন। সেক্ষেত্রে ক্ষমতার উৎস হবে লিঙ্গ ছাড়া অন্য কিছু। কিন্তু বাস্তবিক লিঙ্গবোধবর্জিত অবস্থান সমাজ মনস্তত্ত্বের নিরিখে আদৌ সম্ভব কিনা, সে বিষয়ে সংশয় আছে। ক্ষমতার লড়াইয়ে যুযুধান দুই পক্ষ যে-কোনো সম্ভাব্য বিষয়কেই লড়াইয়ের অঙ্গ করবে। লিঙ্গের মতো ব্যাপক একটি ধারণাকে নীতিবোধের কারণে সমাজ তার ক্ষমতার যুদ্ধ থেকে বাদ রাখবে, এ কথা বোধহয় বিশ্বাসযোগ্য নয়।

সমস্যা সমাধানের সুনিশ্চিত কোনো সূত্র দেওয়া নিশ্চয়ই এই মুহূর্তে সম্ভব নয়। তবে 'ক্ষমতা' বিষয়টিকে নিয়ে অনেক গভীরে না ভাবলে, ক্ষমতার বিনির্মাণ না করলে, সার্বিক অর্থে সম্ভবত কখনোই লিঙ্গের সাম্যে পৌঁছোনো যাবে না। কোনো কোনো নৃতাত্ত্বিক বলতে চেয়েছেন যে মাতৃতান্ত্রিক সমাজে 'ক্ষমতা'র সংজ্ঞা অন্যরকম ছিল। তাকে প্রচলিত অর্থে ক্ষমতা বলা চলে কিনা তা-ও ভাববার বিষয়। পৌরুষের চর্চা লিঙ্গ ও সমাজের সম্পর্কের মধ্যে নতুন যে দৃষ্টিভঙ্গিটি আনতে পেরেছে তা হল এই যে, পৌরুষের অঙ্গস্বরূপ যে ক্ষমতা, এমনকি পুরুষকেও তা সম্পূর্ণ ভাল থাকার হদিশ দেয় না। তার নিজের মধ্যেই, এক অর্থে, আত্মঘাতী প্রবণতা লুকিয়ে আছে।

অন্তত এটুকু বোধহয় আমরা ভাবতে পারি যে যুক্তির ভাষাই যোগাযোগের শ্রেষ্ঠ ভাষা নয়, ক্ষমতা উপভোগই পৃথিবীর সবচেয়ে স্বস্তিদায়ক অভিজ্ঞতা নয়। আরো একটু এগিয়ে এটাও ভাবা যায় যে যৌনাঙ্গ ও লিঙ্গের সম্পর্ক অবিচ্ছেদ্য নয়; নারীত্ব ও পৌরুষ প্রকৃতপক্ষে আরোপিত দুটি ভাব মাত্র। এই বোঝাটুকুর বলে ব্যবহারিক জীবনে লিঙ্গ স্টিরিওটাইপের প্রভাবকে ব্যক্তিগত বোধের নিরিখে যাচাই করে, জীবনছন্দকে আরেকটু সহজ, সাবলীল করা চলে। সম্ভবত পালাবদলের এই পর্যায়ে এই চেষ্টাই প্রথম ধাপ। পৌরুষ এবং নারীত্ব, যাকে আমরা অস্তিত্বের অঙ্গ হিসাবে আবহমান কাল ধরে লালন করেছি, তাকে যে আমরা জানি না, এই বোধই হয়ত কোনোদিন ক্ষমতার মানে বদলে দেবে[২২]।

টীকা

১. সামাজিক বাস্তবতার নির্মিতির প্রসঙ্গটিকে সূত্রাকারে প্রকাশ করে একজন সমাজতাত্ত্বিক বলেছেন "people create society and that society comes to be an objective reality which, in turn, creates people." অর্থাৎ মানুষের কল্পনা বাস্তবতা ও মানুষ উভয়েরই জনক। তথ্যসূত্র : Ritzer, G-(1992). Sociological theory (3rd ed.) New York. McGraw Hill. পৃ-৪১৩।

২. Berger, P. & Luckmann, T. (1966). The social construction of reality: A treatise in the sociology of knowledge. New York : Anchor.

৩. Woolf, V. (1929/1977). A room of ones own. London.

৪. Stoller, R. (1968). Sex and gender : On the development of masculinity and femininity. London :

৫. সামাজিক বাস্তবতার নির্মাণে 'ক্ষমতা' ও ক্ষমতাবানের ভূমিকা এবং 'হেজিমনি'-র আলোচনায় ক্লাসিকাল পাঠ হিসাবে অন্তত তিনটি দৃষ্টিভঙ্গিকে বোঝা একান্ত প্রয়োজন। তিনটিরই তাত্ত্বিক উৎস মার্ক্সীয় চিন্তাধারা—যদিও পরে এর প্রত্যেকটিই নিজস্ব বাঁক নিয়েছে। এই তিনটি মৌলিক পাঠ্য হল আলথুজার, ফুকো এবং গ্রামসি।

*Althusser, L. (1971). Ideology and ideological state apparatuses–in Lenin and philosophy and other essays. (B. Boewster, trans)-London : New Left Books.

*Gramsci, A. (1971). Selections from prison notebooks of Antonis Gramsci. New York : International Pub.

*Foucault, M. (1995). Discipline and punish. (A Sheridan, trans.). New York : Vintage Books.

৬. কিছু প্রাসঙ্গিক পাঠ্য যা পরবর্তী আলোচনাকে বুঝতে সাহায্য করবে তার নাম দেওয়া হল :

*Connell, R.W. (1987). Gender and power. Palo Alto. CA : Stanford University Press.

*Lorber, J. (1994). The paradoxes of gender. New Haven, CT : Yale University Press.

*Kaufman, M. (Ed)-(1987). Beyond patriarchy: Toronto : OUP.

*Smith, D.E. (1992), Sociology from womem's experiences sociological Theory, 10, 88-98

৭. Coltrane, S. (1994). Theorizing masculinites in contemporary social science. In H. Brod & M. Kaufman(Ed.). Theorizing masculinities. London : Sage. pp 39-60.

৮. Terman. L.L. & Miler, C.C. (1936). Sex and personality. New York McGraw Hill.

৯. Mc Coby, E.E. & Jacklin, C.N. (1974). The psychology of sex difference. Stanford University Press.

১০. Broverman, I.K., Vogel, S.R., Broverman, D.M., Clarkson, F.E & Rosen Krantz, P.S. (1972). Sex role stereotypes : A current appraisal. Journal of Social Issues, 28, 59-78.

১১. Constantinopole, A. (1973). Masculinity-femininity : An exception to a famous dictum. Psychological Bulletin, 80, 389-407.

১২. সান্দ্রা বেমের প্রধান লক্ষ্য ছিল উভলিঙ্গ মানসিকতার (androgyny) অস্তিত্ব ও সুবিধাকে পরীক্ষণ ও তত্ত্বের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত করা। ১৯৮৪ সালে Nebraska Symposium on Motivation-এ Androgyny and gender schema theory : A conceptional and empirical integration নামে একটি গবেষণাপত্র পাঠ করে বেম তাঁর বক্তব্যকে সুপ্রতিষ্ঠিত করেন। জ্যানেট স্পেন্স অনুরূপ দৃষ্টিভঙ্গিতে কাজ করলেও তাঁর মূল প্রতিপাদ্য ছিল যে পৌরুষ হচ্ছে সক্রিয় উপযোগিতামূলক (instrumenta), নারীত্ব হচ্ছে প্রকাশমূলক (expressive)। স্পেন্স ও তাঁর সহযোগীর বিখ্যাত বইটি হল Spence, J.T. & Helmreich. J.R. (1978)–Masculinity and femininity : Their psychological dimensions, correlates and antecedents.

১৩. তথ্যসূত্র :
*Russo, N.F. & Green, B.L. (1993)-Women and mental health : In F.L. Denmark & M.A. Paludi (eds) Psychology of women : A handbook of issuses and theories. Westport, CT; Gresnwood Press. pp 379-436.
*Venkataswamy, R.M. & Chandrasekhar, C.R. (1998), Prevalence of mental and behavioural disorders in India : A meta-analysis.
* WHO Report (1998), World Health Report, 1998. Executive Summary. Geneva.

১৪. তথ্যসূত্র :
Busfield, J. (1996). Men, women and madness. Hampshire : MacMillan.
*Denton, M. & Walters, V. (1999). Gender differences in structural and behavioural determinants of health : An analysis of the social production of health. Social Science & Medicine 48, 1221-1235.
*Taylor, M.C. & Hall J.A. (1982). Psychological androgyny : Theories. methods and conclusions. Psychological Bulletin, 92, 347-366

১৫. Eisler, R.M., Skidmore, J.R. & Ward, C.H. (1988) Masculine gender role stress : Implications for the assessment of men. Clinical Psychology Reveiw, 11, 45-60

১৬. Freud, S. (1905/1953). Three essays on the theory of sexuality. In the Complete psychological works of Sigmund Freud. Standard Edition. Vol. 7. London : Hogath.

১৭. Adler, A. (1956)-The individual psychology of Alfred Adler : A systematic presentation in selections from his writing, New York : Basic Books.

১৮. Jung, C.G. (1923/1953), The relations between the ego and the unconscions. In Collected works. Vo 7. London : Routledge.

১৯. ফ্রয়েডোত্তর মনঃসমীক্ষকদের বিষয়ে পাঠের জন্য প্রাথমিকভাবে পাঠ্য :
*Deutsch. H. (1925) The Psychology of woman in relation to the functions of reproduction. International Journal of Psychoanalysis.
*Klein, M. (1953-1984) Love, guilt, and reparation and other works 1921-1945, In the writings of Melanie Klien. London : Free Press.

*Chodorow, N. (1978). The reproduction of mothering. Berkelay University of California Press.
*Dinnerstein, D. (1976). The mermaid and the minataur. New Yourk : Harper and Row
*Cixous, H. (1975). Sorties. In H. Cixious & C. Clement (eds) The newly born woman. (Trans. B. Wing). Manchester University Press. pp. 63-132.

২০. Lacan, J. (1966/1989). Ecrits. (A. Sheridan, Trans). London : Routledge.

২১. পৌরুষের সুযোগ-দুর্যোগ সম্পর্কে বিশদ পাঠের জন্য এই বইগুলি দেখা যেতে পারে :
*Brod, H. & Kaufman, M. (1994). Theorizing masculinities. London : Sage.
*Bowker, L.H. (1989) Masculinities and violence. London : Sage.
*Fogel, G.I, Lane, F.M. Liebert, R.S. (1986) The psychology of man. New Haven : Yale University Press.
*Kimmel, M. (Ed.) (1987). Changing men : New directions in research on men and masculinity. London : Sage.
*Thompson, K. (Ed.). (1991). In Search of the deep masculine. Los Angels; Tarcher.

২২. প্লেটো-র 'Statesman' থেকে একটি উদ্ধৃতি : "Everyone of us is like a man who sees things in a dream and thinks that he knows them perfectly and then wakes up to find that he knows nothing." প্রথমে নারীবাদ এবং পরে পৌরুষচর্চা যদি লিঙ্গ স্টিরিওটাইপের ক্ষেত্রে আমাদের এই বোধে পৌঁছে দিয়ে থাকে, তবে তার প্রয়োগকে সার্থক বলা চলে।

প্রসঙ্গত উল্লেখ করা উচিত যে ৯০-এর দশকে লিঙ্গ ও যৌনতার সম্পর্ক বিষয়ে চিরাচরিত ধারণাকে সম্পূর্ণ উল্টে দিয়ে জুডিথ বাটলার এমন কথাও বলেছেন ও যৌনচিহ্ন ও শরীরের অর্থ নির্মিত হচ্ছে লিঙ্গবোধের দ্বারা : লিঙ্গের অনুশাসনেই শরীর কাজ করে। তথ্যসূত্র : Butler, J. (1993), Bodies that matter : On the discussive limits of sex. New York : Routledge.

মেজাজের হেরফের আর বাংলা ক্রিয়াপদ

প্রবাল দাশগুপ্ত

সবাই জানি ক্রিয়াপদে কাল প্রকাশ পায়। বর্তমান কালের "আসে যায়", অতীত কালের "আসত যেত", ভবিষ্যৎ কালের "আসবে যাবে"। এসব শুধু ব্যাকরণের ডালভাত নয়। সাধারণ পাঠকেরও চেনা জিনিস। কিন্তু যখন দেখি বাক্যটা প্রতিবেদন নয়, অনুজ্ঞা, তখন ক্রিয়াপদের চেহারা "আসুক, যাক", সেটা না বর্তমান, না ভবিষ্যৎ। কারণ, প্রতিবেদনই তো করছ না। হুকুম বা অনুরোধের সঙ্গে প্রতিবেদনের তফাতটাকে বলব মে জা জে র তফাত। ক্রিয়াপদের প্রধান দুই মেজাজ অনুজ্ঞা আর প্রতিবেদন। এ দুটোকে এই নামে না চিনলেও সকলেই খানিকটা চিনি। আরেকটু বেশি আলাপ করার দরকার থাকতেও পারে। যাকে চেনা বলে মনে করি তাকে আরও চিনতে গিয়ে যে চমক লাগে তার জুড়ি নেই।

অনুজ্ঞা মেজাজের "আসুক" আর "যাক"-এর সঙ্গে আরেকটু ঘনিষ্ঠ আলাপ জমাবার চেষ্টা করলে পারি প্রথমে। ব্যাকরণের বইয়ে ক্রিয়াপদের চেহারার সারণি খুলে দেখি, "করা" ক্রিয়াপদের অনুজ্ঞা-মেজাজি রূপ নাকি "করুক করুন করো কর্", অর্থাৎ—

১. ক। সে/তারা করুক
খ। তিনি/ আপনি/ তাঁরা/ আপনারা করুন
গ। তুমি/ তোমরা করো
ঘ। তুই/ তোরা কর্
ঙ। (আমি/ আমরা, "কোনো রূপ নেই"; মতান্তরে; "আমি/ আমরা করি")

(১ঙ)-য় যে মতভেদটুকুর কথা তুললাম সেটা বর্তমান আলোচনায় জরুরি নয়। বিষয়টা বৈয়াকরণদের চোখে না পড়ে থাকতে পারে এই ভাবনায় কেউ কেউ যাতে আটকে না যান তাই আদৌ উল্লেখ করছি। ধরে নিতে বোধহয় পারি যে (১)ক, খ, গ, ঘ-কে সবারই সহজ মনে হয়। এগুলোর বেলায় তর্কের কোনো অবকাশ আছে বলে কেউ বোধহয় ভাবেন না। আলাপ ঘনিষ্ঠ হলে অবশ্য দেখতে পাব যে সহজ কথাও ঠিক ততটা সহজ নয়।

হুকুমের বেলায় (১ঙ)-র প্রথম মতটা খাটে।

২. ক। ও/ ওরা দরজার পাশে গিয়ে দাঁড়াক

খ। উনি/ ওঁরা দরজার পাশে গিয়ে দাঁড়ান

গ। তুমি/ তোমরা দরজার পাশে গিয়ে দাঁড়াও

ঘ। তুই/ তোরা দরজার পাশে গিয়ে দাঁড়া

ঙ। (নিজেকে হুকুম করা যায় না)

জোরালো ইচ্ছা প্রকাশের বেলায় (১ঙ)-য় উল্লিখিত মত প্রযোজ্য :

৩. ক। আগে ওরা ফিরুক

খ। আগে ওঁরা ফিরুন

গ। আগে তোমরা ফেরো

ঘ। আগে তোরা ফের্

ঙ। আগে আমরা ফিরি

এই যে (২ঙ)-য় "আমি দাঁড়াই!" বলে কোনো আত্মহুকুম হয় না বলে (২ঙ) -টা ফাঁকা, আর (৩ঙ)-য় "আগে আমরা ফিরি" ইচ্ছা-প্রকাশ-বাক্যের বেলায় অনুজ্ঞা মেজাজের উত্তম পুরুষের ক্রিয়াপদ আস্ত একখানা চেহারা দেখাতে পারছে, এ তফাতটা কোনো কোনো বৈয়াকরণকে কেন ভাবিয়ে তুলতে পারে, সে তো বোঝাই যায়। সারণি পরিষ্কার থাকলে বৈয়াকরণের বেশ লাগে। উত্তম পুরুষে অনুজ্ঞা মেজাজের আদৌ কোনো চেহারা থাকে কি থাকে না এ প্রশ্নটার জবাব এতটা ঝাপসা দেখে তো গোছালো কর্মীর অস্বস্তি হতেই পারে। তবে এই ছোট ব্যাপারটাকে পাত্তা দিয়ে মাথায় তুলতেও চাইবে না কেউ।

অনুজ্ঞার সূত্রে যে কথাটা লোকে মাঝে মাঝে তোলে সেটা হল উপভাষা বিভিন্নতার একটা দিক। ঘটিরা বলে, আসুন, বসুন। বাঙালরা বলে, আসেন, বসেন। আপনি থেকে তুমিতে নামলে ঘটিরা বলে, এসো, বোসো, আর বাঙালরা—আসো, বসো। সম্পূর্ণতার খাতিরেই কথাটা এখানে উল্লেখ করছি। এ নিয়ে বিশেষ কিছু বলার আছে বলে জানি না।

পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাইছি "তুমি যেটাই বাছো না কেন" এই বিশেষ প্রয়োগটার দিকে (বাক্যের বাকিটা হয়ত—"তাতে রমেশের কী")। ওই ধরনের বাক্যবন্ধে প্রথম মধ্যম উত্তম পুরুষের ছক কাটলে যা বেরোয় তা হল—

৪. ক। সে যেটাই বাছুক না কেন

খ। আপনি যেটাই বাছুন না কেন

গ। তুমি যেটাই বাছো না কেন

ঘ। তুই যেটাই বাছিস না কেন

ঙ। আমি যেটাই বাছি না কেন

ভাল করে খুঁটিয়ে (৪ক-ঙ) লক্ষ করলে যে বোমাটা ফাটে তার অকুস্থল ঙ-তেও

নয়, উপভাষা-বৈচিত্র্যস্থল খ-য়েও নয়। বিস্ফোরণের জায়গাটা (৪ঘ)। লক্ষ করা দরকার যে এর কোনো বিকল্প নেই। যে চেহারা "প্রত্যাশিত" সেই (৫) একান্তই অচল :

(৫)* তুই যেটাই বাছ না কেন

অথচ আমরা তো এতদিন ধরে নিয়েছিলাম যে অনুজ্ঞা মেজাজে তুই-এর বেলায় ক্রিয়াপদের সংযত বা ন্যাড়া চেহারাই থাকে, যেমন (২ঘ)-য়ের "দাঁড়া" আর (৩ঘ) য়ের "ফের্"। কোনো কারণে যদিবা (৪ঘ)-য়ের "বাছিস" সহ্যসীমার ভেতরে এসে পড়েও থাকে তাহলেও আমাদের তাই প্রত্যাশা থেকে যায় সে (৫) চেহারাটা তবু চলবেই। (৫) যে একেবারে অচল, প্রত্যাশাটা যে একদম চুরমার হয়ে যায়, এটাই চমকের বিষয়। "যেটাই...না কেন" প্রয়োগের বেলায় ক্রিয়াপদের ইস-ভাগান্ত "দেখিস শুনিস চলিস ফিরিস দাঁড়াস খাস যাস" চেহারাটাই যে একমাত্র গ্রহণযোগ্য, ক্রিয়াপদের ন্যাড়া ন্যাড়া "দেখ্ শোন্ চল্ ফের্ দাঁড়া খা যা" চেহারাটা যে এই প্রয়োগে অবৈধ, এই বলিষ্ঠ সাধারণ সূত্রের কোনো ব্যতিক্রমই নেই। সারা ভাষায় একটা ক্রিয়াপদও নেই যা দলছুট হয়ে সূত্রটাকে ফুটো করে দেয়।

এ নিয়ে চিন্তিত হবার কী কারণ থাকতে পারে তা হয়ত অনেক পাঠক দেখতে পাবেন না, সূত্রটাতে কোনো ফাঁক নেই এ কথা জানার পরেও। অনেকেই তাই জিগেস করতে পারেন, কোনো কি বিশেষ মুশকিল বাধছে এখানে? অনুজ্ঞার তুই-চেহারায় (অর্থাৎ মধ্যম পুরুষের লঘু গৌরবের বেলায়) একটা প্রয়োগে "বাছ্" এবং আরেকটা প্রয়োগে "বাছিস" মাঠে নামছে, নাহয় ব্যতিক্রমহীন দৃঢ়তার সঙ্গেই এই খেল দেখাচ্ছে, তাহলেও তাতে এতটা চমকে যাওয়ার কারণ কী? এটা কি নজর টানবার মতলবে অতিরিক্ত লাফালাফি কেবল? সেরকম কারসাজির গন্ধ পেলে তখনই যে "নাক গললেই মাথা সরে" এই নবীন প্রবাদের মর্যাদা রেখে দর্শকবৃন্দ সরে যাবেন অন্য কোনো সার্কাসে, এ কথা তো আজকের রুটি আর সার্কাস বিদ্ধ রোমে অবশ্যজ্ঞাতব্য।

"বাছ্ দেখ্ শোন্ চল্ ফের্"-এর শূন্য বিভক্তি পরিহিত ক্রিয়াপদের ওপর আর তার আশপাশে বিশেষ নজর দেবার দরকারটা ভাষাতত্ত্বের একেবারে ভেতর থেকে আসছে। যেখানে এমনিতে স্পষ্ট স্পষ্ট আলাদা আলাদা বিভক্তি পরানো থাকে পদের গায়ে, সেখানে শূন্য বিভক্তি দেখলে তাত্ত্বিকরা ছুটে যায়। বাঙলা বিশেষ্য এ ব্যাপারে উৎসাহব্যঞ্জক এলাকা নয়। "কুকুর দৌড়চ্ছে" বাক্যের কর্তা কুকুর আর "ওরা কুকুর পোষে"-র কর্ম কুকুর আর "এই কুকুর, এদিকে আয়"-এর সম্বোধনপদ কুকুর সবারই বাঙলায় শূন্য বিভক্তি। এ জিনিস নিয়ে তাই লোকে ততটা চমকে ওঠে না যতটা চমকায় বিভক্তিতে ভরতি সংস্কৃত শব্দরূপে "নরঃ, নরম্, নরেণ"-এর পাশে সম্বোধনপদের ভূমিকায় বিভক্তিশূন্য "নর!"-কে নামতে দেখে। বাঙলা "বাছ্!"-এর বিভক্তিহীনতা সেইরকম উত্তেজনার জায়গা, কেননা বাঙলা তার বিশেষ্যকে পারলেই খালি গায়ে রাখে বটে, কিন্তু ক্রিয়াকে তা রাখে না।

বিভক্তি ঠিক কখন শূন্য হয়ে যায় তা যে আমরা পুরো বুঝতে পেরেছি এমন নয়। দেখতে পাই যে সম্বোধনের সঙ্গে তুইতোকারি-বিদ্ধ অনুজ্ঞার কিছু মিল রয়েছে।

দুটোই চট করে ডেকে বলার ব্যাপার। আপনি-আজ্ঞের আদিখ্যেতা নেই। লম্বা বাক্যের বাহুল্য নেই। চট করে ডাক দিচ্ছি। অথবা হুকুম করছি। এই বাহুল্যহীন কাটা-ছাঁটা প্রত্যক্ষতাকে স্পষ্ট করার জন্যেই যেন ভাষার শরীর বিভক্তির জায়গাটাকে খালি করে দেয়, এইরকম বলে উঠতে ইচ্ছে করে। এটুকু সেকালের ঐতিহাসিক ব্যাকরণতাত্ত্বিকরাও লক্ষ করেছিলেন। এখন আরও এক ধাপ এগোনো সম্ভব বলেই কথাটা আবার তোলা। শূন্য বিভক্তির স্থলগুলো আজকাল যাকে কাণ্ডবাক্যের বিশেষত্ব বলে সেইসব ঘটনার অকুস্থল বলে মনে করার কারণ আছে।

অর্থাৎ ব্যাপারটা নিয়ে গবেষকরা কেন উত্তেজিত হয়েছেন এবং দর্শকরাও কেন উত্তেজনায় যোগ দিতে চাইতে পারেন, সেটা স্পষ্ট করার জন্যে "কাণ্ডবাক্যের বিশেষত্ব" ব্যাপারটা প্রথমে বুঝিয়ে বলা ভাল।

বাক্যতত্ত্ব ওরফে অন্বয় সচরাচর জটিল বাক্যের চেহারাটা এঁকে দেখায় গাছের আদলে; (৬) গাছটাতে মূল বাক্য যেন গাছের গুঁড়ি আর তার অধীনস্থ "শ্যাম আসছে" যেন শাখার মতো (এসব ছবিতে মাটিটা থাকে ওপরে, আকাশটা নীচে!)

(৬) (বাক্য)

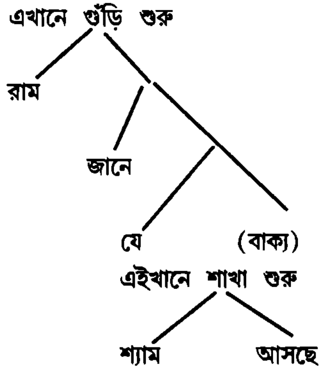

"রাম জানে"-র মতো গুঁড়ি-স্থানীয় বাক্যকে কাণ্ডবাক্য বলা আজকালকার অন্বয়বিদের অভ্যেস (ইংরিজিতে রুট সেনটেন্স)। কিছু জিনিস আছে যা শুধু কাণ্ডবাক্যেই দেখা যায়। সেগুলোকে বলে কাণ্ডবাক্যের বিশেষত্ব। "তুমি কি বিকেল পর্যন্ত থাকবে?" এই প্রশ্নে "কি"-অব্যয়ের উপস্থিতি বাঙলা অন্বয়ে কাণ্ডবাক্যের বিশেষত্বের সহজ উদাহরণ। সম্বোধনপদও তাই। মনে করবার কারণ আছে যে অনুজ্ঞাপদও তথৈবচ। শূন্য-বিভক্তি-পরা ক্রিয়াপদ "বাছ্" নিয়ে এত উত্তেজনা সেজন্যেই।

(৫) অর্থাৎ "তুই যেটাই বাছ্ না কেন" যে অচল, তার বদলে (৪ঘ)-য়ে "তুই যেটাই বাছিস না কেন"-ই যে একমাত্র বিকল্প, এই তথ্যটা তাই এতটা জরুরি। (৪) -এর দৃষ্টান্তগুলো কোনোটাই কাণ্ডবাক্য নয়, সবই পরাধীন বাক্য।

যেখানে অনুজ্ঞাপদ স্বাধীন কাণ্ডবাক্যে, যেখানে সে স্পষ্টতই কারুর ধার ধারে না, সেসব জায়গায়, যেমন (২ঘ)-য়ে, নিঃশর্তে আসল শূন্য বিভক্তি ব্যবহৃত হয়, এরকম বলা চলে কি?

(২) ঘ। তুই/তোরা গিয়ে দাঁড়া

তা যদি বলা যেত, তাহলে বলতে পারতাম (২)-য়ের "বিশুদ্ধ" অনুজ্ঞায় দাঁড়া/দাঁড়াও/দাঁড়ান আর (৪)-এর "মিশ্র" অনুজ্ঞায় দাঁড়াস/দাঁড়াও/দাঁড়ান পাচ্ছি, ব্যাকরণে একটুখানি পাদটীকা জুড়লেই মুশকিল আসান হয়ে যাবে। কিন্তু এই প্রবন্ধটাকে লম্বা করবার আয়োজনে পাছে কোনো ত্রুটি থাকে সেই ভয়ে বাঙলা আরও একটা প্যাঁচ রেখে দিয়েছে। "বল্ না শোন্ না"-র মতো নকল অর্থাৎ অনেতিবাচক না-নিপাতের পাশ কাটিয়ে বাঙলা অনুজ্ঞাপদের আসল নেতিবাচন এইরকম দেখতে :

(৭) খ। আপনি আর দাঁড়াবেন না

গ। তুমি আর দাঁড়িয়ো না

ঘ। তুই আর দাঁড়াস না

কী রে বাবা। এক দিকে দাঁড়ান-দাঁড়াও-দাঁড়া থেকেও (৭) আলাদা, অন্য দিকে দাঁড়ান-দাঁড়াও-দাঁড়াস থেকেও আলাদা, আবার তৃতীয় দিকে সাধারণ ভবিষ্যতের দাঁড়াবেন-দাঁড়াবে-দাঁড়াবি-র চেহারাতেও লীন হয়ে যায় না, এ আবার কী ছক? কোথাও নিয়ম নেই, সবই ব্যতিক্রম?

পাশের বাড়িতে তো শৃঙ্খলা এর চেয়ে অনেক বেশি। হিন্দিতে পাই ইতিবাচনে (৮), নেতিবাচনে (৯) :

(৮) খ। আপ জলদী চলিয়ে

গ। তুম জলদী চলো

ঘ। তূ জলদী চল্

(৯) খ। জলদী মৎ চলিয়ে

গ। জলদী মৎ চলো

ঘ। জলদী মৎ চল্

ছকের সঙ্গে ছকের একেবারে পরিষ্কার সমীকরণ। (৮)-এর ক্রিয়াপদের গায়ে নেতিবাচক "মৎ" নিপাত জুড়লেই (৯)। হিন্দি যে এই এলাকায় বাঙলা থেকে বেশ আলাদা, এ ব্যাপারটা একটুখানি তলিয়ে দেখা দরকার।

হিন্দি নেতিবাচনে পাচ্ছি অনুজ্ঞা মেজাজের নিপাত "মৎ", প্রতিবেদন মেজাজের নিপাত "নহীঁ", আর তৃতীয় একটা মেজাজের ক্রিয়াপদের নিত্যসঙ্গী স্বতন্ত্র নিপাত "ন"!

(৯)খ। (আপ) জলদী মৎ চলিয়ে

(১০) আপ জলদী নহীঁ চলেঙ্গে

(১১) অনুরোধ হৈ কি আপ জলদী ন চলেঁ

সমানে প্রত্যেকটা জিনিস নিয়ে পরে হবে পরে হবে করলে কথা বলা শক্ত, তাই (১১)-র ওই "চলোঁ" ক্রিয়াপদের না-প্রতিবেদন না-অনুজ্ঞা মাঝামাঝি মেজাজটার "সাকাঙ্ক্ষ মেজাজ" নামকরণ করে ফেলছি এখনই (পাঠকের অন্য কিছু পছন্দ হলে পালটে নেবেন একটু)।

প্রতিবেদন মেজাজের অতীত-বর্তমান-ভবিষ্যৎ কালের সঙ্গে "নহীঁ" নিপাতটার আমরা যোগ জানি, সাজশ জানি না। "করতা হৈ"-এর নেতি "নহীঁ করতা", লোকে "নহীঁ করতা হৈ" বলে না। অথচ "হৈ" আস্ত ক্রিয়া হিসেবে "নহীঁ"-র ধার ধারতে রাজি, এই তো "মেরে পাস পৈসে নহীঁ হৈঁ" বলতে পারছি। মুশকিল অনেক দূর পাকিয়ে ওঠে যখন "এল"-বাচক "বচ্চা আয়া"-র সঙ্গে "এসেছে"-বাচক "বচ্চা আয়া হৈ"-এর তফাত ঘুচিয়ে "বচ্চা নহীঁ আয়া" মাঠে নামে, সে একইসঙ্গে "এল"-রও নেতি, "এসেছে"-রও। কিন্তু সে দায় হিন্দির একার মোটেই নয়, বাঙলা "ছেলেটা আসে নি"-ও একই ভাবে যুগপৎ "এসেছে, এসেছিল, এল"-র নেতি ("এল না" বললে সীমাঙ্কিত একটা বিশেষ নেতি বোঝায়)। সব জট একসঙ্গে ছাড়ানো যায় না; প্রতিবেদকীয় নেতির রহস্য তমসাবৃত থেকেই গেল। কিন্তু আমরা স্বস্তির সঙ্গে লক্ষ করি যে হিন্দি যে তিন মেজাজে তিনরকম নেতির নিপাত পোষে এ ব্যবস্থাটা পাকা।

অর্থাৎ হিন্দি নেতিবাচক নিপাতের সঙ্গে মেজাজের বিশেষ সম্পর্ক যে আছে এ খবরটার নড়চড় হবে না। অন্যদিকে এটাও পাকা খবর যে অতীত কালের "আসে নি"-র ওই রহস্যময় "নি"টাকে হিসেবের বাইরে রাখলে বাঙলার বেলায় স্পষ্ট বলে দেওয়া যায় যে একটাই নেতিবাচক নিপাত আছে, "না", যার চেহারা মেজাজ পালটালেও সমান থাকে। চেহারা নাহয় সমান থাকে। কিন্তু ক্রিয়াপদের মেজাজের আর কালের ডাকে বাঙলা নেতির নিপাত "না"-ও যে সাড়া দেয় তার প্রমাণ আছে। সেই দিকটার জট যদি এবার খানিকটা ছাড়ানো যায় তাহলে অনুজ্ঞা মেজাজে বাঙলা ক্রিয়াপদের আপাতদৃষ্টিতে যে অবিশ্বাস্য ব্যতিক্রমী আচরণ নজর কাড়ে সেইসমস্ত প্রক্রিয়াকে আরেকটু বোধগম্য দেখাবে।

বর্তমান বিশ্লেষণের প্রথম প্রস্তাব এই যে, কাণ্ডবাক্য এমন কিছু মেজাজি রঙবেরঙ চড়াতে দেয় যা শাখাবাক্যে সম্ভব নয়। আর দ্বিতীয় প্রস্তাব হল, মেজাজের এইসব রঙবেরঙেই রয়েছে অনুজ্ঞাপদের চেহারার বৈচিত্র্যের ব্যাখ্যা এবং ক্রিয়াপদের সঙ্গে নেতিনিপাতের সম্পর্কের চাবি। এই দুই প্রস্তাবের একটা যৌথ ফল এই দাঁড়াচ্ছে যে চিরাচরিত ব্যাকরণে আমরা যে ধরে নিতাম বাঙলায় অনুজ্ঞা বলে একটা মেজাজ আছে, সেই ধারণটাকে ভেঙে টুকরো টুকরো করে সযত্নে নতুন খণ্ডগুলোর জন্যে নতুন নতুন বাসা খুঁজে বার করতে হবে।

সৌভাগ্যক্রমে বৈয়াকরণরা অনুজ্ঞা মেজাজের বেলায় এটুকু জটিলতা চিরকালই স্বীকার করেছেন যে, সাধারণ অনুজ্ঞা বাছুক বাছুন বাছো বাছ্ থেকে যে ভবিষ্যৎ অনুজ্ঞা বাছবে বাছবেন বেছো বাছিস আলাদা, এ তফাতটুকু রাখতেই হবে। সাবেক

কালের বৈয়াকরণদের ওই অর্জনটাকে মূল্যবান পাথেয় মনে হয় আজ। স্পষ্টতই ভবিষ্যৎ অনুজ্ঞা কালাঙ্কিত। বাঙলা নেতিবাচক নিপাত "না" তো দেখছি কালের সঙ্গে জোট বেঁধে চলে। বাঙলায় (৭) তাই অনুজ্ঞার নেতি; সুবিধার্থে পুনরাবৃত্তি করছি—

৭. খ। আপনি আর দাঁড়াবেন না
গ। তুমি আর দাঁড়িয়ো না
ঘ। তুই আর দাঁড়াস না

কথাটা আরেকভাবে বললে দাঁড়ায়, (১২) যে অচল (সেইজন্যে তারকাচিহ্নিত) আর তার বদলে (৭)-ই যে বলতে হয়, বাঙলার এই বৈশিষ্ট্যের কারণ হল (১২) -য় কালাঙ্কনের অভাব এবং নেতিবাচক "না"-য়ের কালাঙ্ক-কামনা:

১২.খ। *আপনি আর দাঁড়ান না
গ। *তুমি আর দাঁড়াও না
ঘ। *তুই আর দাঁড়া না

এই নিরিখে বিচার করে দেখানো যায় যে ভবিষ্যৎ অনুজ্ঞার ক্রিয়াপদ কালাঙ্কিত। আর অনুজ্ঞার ওই যে বিশেষ রঙ শুধু কাণ্ডবাক্যেই পাওয়া যায় বললাম, সেই রঙে যে ভবিষ্যৎ অনুজ্ঞাও বঞ্চিত নয় সে কথা ধরা যায় আরেকরকম আলো ফেলে দেখলে। সে আলোর উৎস হল সূচকার্থক নিপাত "তো"। যদি বাক্যের দ্বিতীয় খোপে, সর্বনামের ঠিক পরেই "তো" রাখি আর ক্রিয়াপদকে যথারীতি বাক্যের শেষে বসাই তাহলে প্রতিবেদন মেজাজের ক্রিয়া খুশি থাকে, যেমন (১৩), কিন্তু সাধারণ অনুজ্ঞা আর ভবিষ্যৎ অনুজ্ঞা দুইই অচল হয়ে যায়, এর উদাহরণ (১৪):

১৩.অ। ওরা তো এলাহাবাদ গেছে
আ। তুমি তো কালকে ফিরে যাবে
ই। তুই তো বিকেলে ফিরিস
ঈ। আপনি তো অজিতকে এটা বলবেন

১৪.অ। *তুই তো নটায় শুনে পড়
আ। *তুমি তো কালকে ফিরে যেয়ো
ই। *তুই তো কালকে বিকেলে ফিরিস
ঈ। *আপনি তো অজিতকে কথাটা বলুন

কালাঙ্কিত হলেও ই-বাক্যের "ফিরিস" (১৩)-য় প্রতিবেদন মেজাজের, বর্তমান কালের, তাই বৈধ। কিন্তু (১৪)-য় তার গায়ে কাণ্ডবাক্যের অনুজ্ঞার রঙ চড়াতে বাধ্য করছে "কালকে" কথাটা, ফলে দ্বিতীয় খোপের "তো" নিপাতের সঙ্গে ঝগড়া বাঁধিয়ে সে বাক্যটাকে অচল করে দিচ্ছে। এই মাপকাঠিতে স্পষ্ট হয় যে (১৪) আর "যেয়ো" কালাঙ্কিত হলেও তবু অনুজ্ঞা মেজাজেরই বটে। তার গায়ে সেই মেজাজি রঙ চড়েছে যেটা কাণ্ডবাক্যের বিশেষত্ব, যদিও সে যে কালাঙ্কিত এটা (৭) গ থেকেই জানি।

আশা করি ভাবছেন না যে কাণ্ডবাক্যের সঙ্গে "তো" নিপাতের কোনো বিরোধ কল্পনা করছি। ক্রিয়াপদের ল্যাজে "তো" লাগিয়ে দিলেই অনুজ্ঞাপদও ঠিক হয়ে যায়, সবই অবস্থানের ব্যাপার।

১৫.অ। তুই একটু আজ সকাল সকাল শুয়ে পড়্ তো

আ। বলুন তো ওকে একটু

ই। একটু বেছে দিয়ো তো

অর্থাৎ কাণ্ডবাক্যের বিশেষত্ব যাচাই করবার জন্যে (১৩)-(১৪)-য় যে মাপকাঠি ব্যবহার করছি সেটা বিশেষ করে "তো" নয়। "সর্বনাম, তো, অন্য কথা, ক্রিয়াপদ", বাক্যের এই জ্যামিতিটাই তাহলে মাপকাঠি।

এবার একটু সাবধানে পা ফেলা দরকার। এতক্ষণ আমরা ধরে নিয়েছি ক্রিয়াপদের "করুক দেখুক হোক" চেহারাটা অনুজ্ঞা মেজাজের। তা যদি হয় তাহলে (১৩)-(১৪) -র মাপকাঠির যাচাইয়ে সে কেন অচলের দলে পড়ছে না?

১৬.অ। কাজটা তো আগে শেষ হোক

আ। রমেশরা তো আগে ফিরুন

বিচারগুলো একটু সূক্ষ্ম। একজনের কানে যা ঠেকছে, আরেকজনের কানেও ঠিক সেরকমই লাগবে, এমন প্রত্যাশা থাকবার কথাও নয়, নেইও। ব্যাকরণ কোনো মেকি ঐক্য চাপিয়ে দেয় না, মিল আর তফাতের নকশা বার করে বুঝবার চেষ্টা করে কেবল। আমার কানে (১৭অ) সবচেয়ে অচল শোনাচ্ছে, (১৭ঈ) সবচেয়ে স্বাভাবিক, (১৭আ, ই) মাঝামাঝি। কিন্তু অন্য কারুর মনে হতেই পারে সীমারেখাটা আর-কোথাও—

১৭.অ। *তুই তো আগে ফের্

আ। ??? আপনি তো আগে ফিরুন

ই। ?ওঁরা তো আগে ফিরুন

ঈ। ওরা তো আগে ফিরুক

সীমারেখা ঠিক কোথায় তা নিয়ে তর্ক করার দরকারও নেই। হাওয়াটা কোন্ দিকে, সে বিষয়ে একমত হতে পারলেই হল। আমার ধারণা, সবাই মানবেন যে (১৭অ)-র চেয়ে (১৭ঈ) বেশি স্বাভাবিক শুনতে। এটারই ব্যাখ্যা লাগবে।

আপাতত ধরে নেওয়া যাক, "সর্বনাম, তো, অন্য কথা, ক্রিয়াপদ" এই বাক্যছক যে ক্রিয়াপদের সহ্য হয় সেই পদের গায়ে কাণ্ডবাক্যের আসল অনুজ্ঞা বেজাজের রঙ লাগে নি। সেই নিরিখে (১৭আ) বাক্যের "ফের" প্রকৃত অনুজ্ঞার রঙে রাঙা, (১৭ঈ)-র "ফিরুক" সে রঙে বঞ্চিত।

আমি প্রস্তাব করছি যে এই বিচার মেনে নিয়ে আমরা "ফিরুক, যাক, দেখুক" চেহারার ক্রিয়াপদকে অনুজ্ঞা মেজাজের না ভেবে তার পরিবর্তে তৃতীয় এক কোঠায় রাখলে পারি, যেটা না অনুজ্ঞা, না প্রতিবেদন। তৃতীয় এই মেজাজকে সাকাঙ্ক্ষ বলবার

সিদ্ধান্ত নিয়েছি আগেই (ইংরিজিতে সাবজাঙ্কটিভ)। এবার (৪)-এর দৃষ্টান্তগুলো একটু ঝালিয়ে নিন—

৪. ক। সে যেটাই বাছুক না কেন
খ। আপনি যেটাই বাছুন না কেন
গ। তুমি যেটাই বাছো না কেন
ঘ। তুই যেটাই বাছিস না কেন
ঙ। আমি যেটাই বাছি না কেন

আলোচনার ওই পর্বে অবাক লাগছিল এটা দেখে যে (৪ঘ)-য়ের বিকল্প হিসেবে "*তুই যেটাই বাছ্ না কেন" অচল। এবার (৪)-এর দিকে আরেকটু নজর দিই। ক্রিয়াপদের এই সাকাঙ্ক্ষ মেজাজকে প্রায়ই দেখা যায় কামনার্থক ক্রিয়ার অধীনস্থ উপবাক্যে—

১৮.রমেশ চিকেন বিরিয়ানি বাছুক তা আমি চাই নি

এ যে স্বতন্ত্র মেজাজ তার স্পষ্ট প্রমাণ পাই পড়শিদের ভাষায়। হিন্দি ব্যাকরণে এই সাকাঙ্ক্ষ মেজাজের পূর্ণাঙ্গ ধাতুরূপ "উও করে, আপ করেঁ, তুম করো, তূ করে, মৈঁ করূঁ" অন্যান্য মেজাজ থেকে যথেষ্ট আলাদা। সাকাঙ্ক্ষ বলে চিনতে পারি 'মৈঁ চাহতা হূঁ কি ওয়ে ইয়ে কাম করেঁ" বলা যায় বলে। লক্ষ করা ভাল যে এমন প্রয়োগ পাই যার অর্থ অনুজ্ঞার মতোই। কৃপয়া ধূম্রপান ন করেঁ বলাও যা, মৎ কীজিয়ে বলাও তাই। অথচ সাকাঙ্ক্ষ মেজাজের দোসর যে নেতিনিপাত সেই "ন"-টা অনুজ্ঞাসুলভ "মৎ"-ও নয়, প্রতিবেদনের অভ্যস্ত "নহীঁ"-ও নয়, এ থেকে বোঝা যায় সাকাঙ্ক্ষ সত্যিই আলাদা মেজাজ, হিন্দি নেতিনিপাতের চেহারা তো মেজাজভেদেই বদলায়।

বাঙলা সাকাঙ্ক্ষ ক্রিয়াপদের চেহারা আরেকটু গোলমেলে জিনিস বলেই অনুজ্ঞা মেজাজের সঙ্গে সাকাঙ্ক্ষর এমন জট পাকিয়ে যায়। এই প্রতিগ্রহটা দেখুন না—

১৯.অ। আমি চাই না যে ওরা বিকেলে আসে
আ। ??আমি চাই না যে ওরা বিকেলে আসুক
ই। ??ওরা বিকেলে আসে এটা আমি চাই না
ঈ। ওরা বিকেলে আসুক এটা আমি চাই না

মনে তো হচ্ছে সাকাঙ্ক্ষ ক্রিয়াপদ হিসেবে (১৯অ)-র "আসে" চেহারাটা "চাই না"-র ডানদিকে বসতে ভালবাসে (তাই (১৯আ) তার চেয়ে শ্রুতিকটু), আর সাকাঙ্ক্ষ মেজাজের যে "আসুক" তার সুবিধে হয় "চাই না"-র বাঁদিকে বসলে, যেজন্যে (১৯ই)-র চেয়ে (১৯ঈ) খানিকটা বেশি গ্রহণযোগ্য। এখানেও বিচারকভেদে বিচার পালটাবে। তবু আপাতত যদি এই দিকে হাওয়া বইছে ধরে নিয়ে এগোনো যায় তাহলে কূল পাব।

সাকাঙ্ক্ষ মেজাজের ক্রিয়াপদ ডানদিকে বসলে যে "আসে" চেহারাটাই সমীচীন আর বাঁ দিকে বসলে যে "আসুক" চেহারাটাই বেশি জুতসই, এই সিদ্ধান্ত জোর পায় যখন "বলে" আর "যেন" নিপাতদুটো খেলায় যোগ দেয়—

২০.অ। ওরা বিকেলে আসুক বলে তোমার যে ইচ্ছে সে ইচ্ছেটা বোধহয় মিটবে

আ। *ওরা বিকেলে আসে বলে তোমার যে ইচ্ছে সে ইচ্ছেটা বোধহয় মিটবে

ই। *তোমার ইচ্ছে তো এই যে ওরা যেন বিকেলে আসুক, তাই তো?

ঈ। তোমার ইচ্ছে তো এই যে ওরা যেন বিকেলে আসে, তাই তো?

২০-র প্রতিগ্রহে আপেক্ষিক অচলতার বিচার (১৯)-এর চেয়ে স্পষ্ট; (২০আ), (২০ই) স্পষ্টতই অচল।

"বলে" নিপাতের একটা সুপরিচিত কাজ হল, উপবাক্যের ভেতরের যে শক্তি পাশ দিয়ে পথ কেটে কাণ্ডবাক্যে পৌঁছে ফলপ্রসূ হতে চায় সেই শক্তিকে কাণ্ডবাক্যের নাগাল পেতে সাহায্য করা। যেমন, প্রশ্নপদের জিজ্ঞাসাশক্তি এমনিতে কাণ্ডবাক্যেই জাগ্রত ("তুমি কাকে ডাকছ?") আর শাখাবাক্যে ঘুমন্ত ("রুচিরা বুঝতে পেরেছে তুমি কাকে ডাকছ")। কিন্তু "বলে"-নিপাত যে-উপবাক্যের আশ্রয়িক সেই উপবাক্যের ভেতরের প্রশ্নপদ ওই "বলে"-র চেষ্টায় কাণ্ডবাক্যের নাগাল পেয়ে জাগ্রত প্রশ্নপদ হিসেবে স্বীকৃত হয়। তাই (২১)-এর শেষে জিজ্ঞাসাচিহ্ন, অর্থাৎ "কাকে" এখানে জাগ্রত, যদিও "তুমি কাকে ডাকছ" উপবাক্য মাত্র :

(২১) তুমি কাকে ডাকছ বলে রুচিরার ধারণা?

তা, এই যে অন্যথা-নিদ্রিত জিজ্ঞাসাশক্তিকে কাণ্ডবাক্যের দোরগোড়ায় নিয়ে যায় "বলে"-নিপাত, এই নিপাতের চেষ্টায় (২০অ) বাক্যে "আসুক" ক্রিয়াপদের বিশেষ কোনো শক্তি একইভবে কাণ্ডবাক্যের নাগাল পাচ্ছে ধরে নিলে আমরা কিছু জট ছাড়াতে পারি। খুলে বলছি।

বিশ্লেষণের ধাপে ধাপে আমরা ক্রমশ ধরতে পেরেছি যে "আসুক বাছুক ফিরুক" জাতীয় ক্রিয়াপদের মেজাজটা অনুজ্ঞা নয় (তাই (১৭ঈ) সম্ভবপর), সাকাঙ্ক্ষ (যে জন্যে (১৮) ঠিক আছে)। অথচ এও জানি যে হ্রস্ব সরল কাণ্ডবাক্যে সাকাঙ্ক্ষ মেজাজের ক্রিয়াপদ অনুজ্ঞার অর্থবহন করার শক্তি রাখে বলেই বৈয়াকরণরা বাঙলায় চিরকাল "আসুক বাছুক ফিরুক"-কে অনুজ্ঞার সারণিতেই ঠাঁই দিয়েছেন, "মাঝিরা ভালয় ভালয় ফিরে আসুক"-এর মতো বাক্যের কথা ভেবে। এবার আমরা সিদ্ধান্ত নিচ্ছি যে, একটা ক্রিয়াপদের আকৃতি সাকাঙ্ক্ষ মেজাজের হলেও তার প্রকৃতি যদি অনুজ্ঞা অর্থবাহকের হয়, তখন বলব এই সাকাঙ্ক্ষ ক্রিয়াপদটি তার সেই বিশেষ কাণ্ডশক্তি খাটাচ্ছে যাকে বলব অনুজ্ঞাশক্তি। (কথাটা ফস করে বলে দিলাম, যাঁরা উত্থাপনতত্ত্ব বা প্র্যাগম্যাটিকস চর্চা করেন তাঁরা দেখতে পাবেন যে এটা কেন ঘটে সে প্রশ্ন ব্যাকরণের নয়, উত্থাপনতত্ত্বের।) এ শক্তির সঙ্গে প্রশ্নপদের জিজ্ঞাসাশক্তি তুলনীয়। উপবাক্যের ভেতরের কোনো পদের কাণ্ডশক্তি চাপা পড়ে যাবার আশঙ্কা থাকলে তাকে "বলে"-নিপাতটা কাণ্ডবাক্যের নাগাল পাইয়ে দিতে জানে। তাই (২১)-এ "বলে"

যেমন জিজ্ঞাসাশক্তির নাগালটাকে কাণ্ডবাক্য পর্যন্ত টেনে নিয়ে যায়, তেমনি (২০অ) বাক্যে সেই একই "বলে"-নিপাত অনুজ্ঞাশক্তিকে কাণ্ডবাক্য পর্যন্ত পৌঁছে দেয়।

(২০)-র দুই সাকাঙ্ক্ষ চেহারা "আসে" আর "আসুক"-এর তফাত তাহলে এই যে এদের মধ্যে একমাত্র "আসুক"-ই অনুজ্ঞাশক্তিতে বলীয়ান, যদিও তারও মেজাজ কিন্তু অনুজ্ঞা নয়, সাকাঙ্ক্ষ। দুটোই যে সাকাঙ্ক্ষ মেজাজের ক্রিয়াপদ, এই সিদ্ধান্তের তরফে নেতিনিপাত এজাহার দেয়। বাঙলার নেতি সাকাঙ্ক্ষ ক্রিয়াপদের বেলায় বাঁদিকে বসে—

২২.অ। আমি চাই যে ওরা যেন আজ না আসে

আ। ওরা কোনো শাস্তি না পাক এটাই তোমার ইচ্ছে

(২২)-এর উভয় দৃষ্টান্তেই ক্রিয়াপূর্ব নেতি দেখে বোঝা যায়, অনুজ্ঞাশক্তি যদিও (আ)-য়ে হাজির আর (অ)-য়ে গরহাজির তবু মেজাজ দু জায়গাতেই সাকাঙ্ক্ষ। বাঙলায় কালাঙ্কবিহীন অনুজ্ঞা মেজাজের সঙ্গে নেতি বসে না, আগেই দেখেছি।

আসল অনুজ্ঞামেজাজি ক্রিয়া তাহলে খালি কাণ্ডবাক্যেই কাজ করতে পারে, যেমন "সরে যা!", এবং তার গায়ে লেপটে থাকে অনুজ্ঞাশক্তি। সাকাঙ্ক্ষমেজাজি ক্রিয়ার দুই জাত, তাদের নমুনা অনুজ্ঞাশক্তিওয়ালা "বাছুক" আর শক্তিরহিত নিতান্তই সাকাঙ্ক্ষ "বাছে"। অনুজ্ঞাশক্তি চেষ্টা করে শাখাবাক্য থেকে হাত বাড়িয়ে কাণ্ডবাক্যকে ছুঁতে; কোনো কোনো বাক্যজ্যামিতি এবং বিশেষ নিপাত "বলে" তার সেই চেষ্টাকে সার্থক করে। এই হিসেবটা বলে দেয়, শাখায় আর কাণ্ডবাক্যে কে কোথায় বসে কী কাজ করতে পারে।

কালাঙ্কনের হিসেবটা এর পাশ দিয়ে চলছে। অনুজ্ঞা মেজাজের সঙ্গে ভবিষ্যৎ কালাঙ্কন মিশতে পারে, মিশলে পাই "যেয়ো খেয়ো কোরো", তার ডানদিকে নেতি বসতে পারে কালাঙ্কের দৌলতে, "যেয়ো না, খেয়ো না"। কালাঙ্কহীন খাঁটি অনুজ্ঞা মেজাজের নেতি সহ্যই হয় না। আর সাকাঙ্ক্ষ মেজাজ কালের ধার না ধেরে ক্রিয়াপদের বাঁদিকে নেতি বসাবার এজাজত দেয়, তাই পাচ্ছি "না যাক" আর "যেন না খায়", এই পদের অনুজ্ঞাশক্তি আছে কি নেই সেটা ধর্তব্যের মধ্যে পড়ে না।

ক্রিয়াপদের শূন্য বিভক্তি যে বাঙলায় কাণ্ডবাক্যের বিশেষত্বের কোঠাতেই পড়ে এই স্বীকৃতিকে পাকাপোক্ত বলে ঘোষণা করবার মোটামুটি নির্ভরযোগ্য চালচিত্র আয়ত্তে এসে গেল তাহলে। অনুজ্ঞার সারণি ছকে দাও বলে হঠাৎ হাঁক পাড়লেই বৈয়াকরণ কেন চটজলদি সারণি গুছিয়ে দিতে পারে না সে বিষয়ে একটুখানি স্পষ্টতাও পেলাম হয়ত। কিছু জবাব জোগাড় করলে যে আরও বেশ কয়েকটা নতুন প্রশ্ন হাজির হবে এটা তো প্রত্যাশিত। বর্তমান প্রবন্ধে যেসব প্রশ্ন ঝুলে রইল সেগুলোর সঙ্গে পরের কোনো কিস্তিতে মোলাকাত করা যেতে পারে। অবধানে অবধান মিলিয়ে যে সাবধানীদের সঙ্গে পথ চললাম, আবারও হয়ত চলব, তাদের জানাই এবারের অভিবাদন, এবং হয়ত পরের কিস্তিরও।

বিবাহিতের ব্রহ্মচর্য্য প্রসঙ্গ

চিরন্তন সরকার

রাত্রি ন'টায় দীনদয়ালের গান শোনা সাঙ্গ করে পৌষমেলার মাঠে ঘুরে বেড়াচ্ছি। 'বিবাহিতের ব্রহ্মচর্য্য প্রসঙ্গ' নামে একটি পুস্তিকা চোখে পড়ল। কিনলাম। এ-যাবৎ অবিবাহিতদের রক্ষা করার জন্য লেখা ব্রহ্মচর্যের বইপত্রই দেখেছি। খুলে দেখি, তন্ত্রমতে রচিত পুস্তিকা। রচয়িতা দেবাশিস মুখোপাধ্যায় ওরফে মাধবানন্দ পরমহংসদেব। বীরভূমের রাজনগর থেকে মাধবানন্দ যোগাশ্রমের পক্ষে শ্রী দেবীপ্রসাদ ব্রহ্মচারী এটি প্রকাশ করেছেন। সন্দেহ হয়, অনেকের হাতেই পৌঁছচ্ছে এই স্বল্পমূল্যের পুস্তিকা। তেত্রিশ কোটি দেব-দেবীর দেশে ব্রহ্মচর্য বিষয়ক বই পড়ার লোকের অভাব থাকার কথা নয়। বিবাহিত ধর্মপ্রাণ ব্যক্তিদের দিশা দিতে প্রস্তুত এই পুস্তিকাটিতে ধর্ম, যৌনতা এবং সামাজিক জীবনের অভিজ্ঞতা ঘিরে গড়ে ওঠা রাজনীতির একটি বর্ণময় চেহারা ধরা পড়েছে। একটি প্রিজমের নানা কোণ থেকে আলো ঠিকরে পড়ে ফুটে উঠেছে ফাঁকফোকর, অনেক কাটাকুটি ও টানাপোড়েনের চিহ্ন। স্পষ্ট হয়ে যাচ্ছে দুঃসহ সময়ের সাথে রফা করতে বসা একটি ধর্মসম্প্রদায়ের গুটিকয় সদস্যের মুখচোখ, তাদের নিজেদের অক্ষে স্থির ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে থাকতে না পারার যন্ত্রণা।

বিপরীত লিঙ্গের সান্নিধ্যে কাটাতে হয় বলে সংসারী ব্যক্তিদের পক্ষে ত্যাগমার্গ নেওয়া কঠিন। তাই যোগ ও তন্ত্রের যথাযথ সাধনায় তাঁদের এমনভাবে দেহমিলন সম্পন্ন করা প্রয়োজন যাতে বীর্যপতন না হয়। এই 'পতনহীন শৃঙ্গার' ব্যাখ্যা করার সময় লেখক অবিবাহিত নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারীদের থেকে নিজেদের সচেতনভাবে পৃথক করেছেন এবং তাঁদের প্রতি উষ্মা প্রকাশ করতেও দ্বিধা করেননি: 'অবিবাহিত সংসারত্যাগী মহান গুরুবাবাদের যুগল সাধনার নামে ঘৃণায় নাক সিটকানোতে বিবাহিত স্বামী-স্ত্রীর কতটা উপকার হয় তা.....একবার বিচার করে দেখবেন' (নজরটান লেখক)। বলেছেন, গেরুয়া ভেকধারীর কৌপীনে এক ফোঁটা রেতঃপাত হলে সেই ব্যক্তি 'নরকস্থ' হয়। অবিবাহিত নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারীরা যেহেতু নারীসঙ্গকে ব্রহ্মচর্যের পথে অন্তরায় মনে করেন তাই লেখককের মতো যুগল সাধনার মতাবলম্বীদের পক্ষে সে পথ অনুমোদন করা সম্ভব হয় না। অথচ মজা হল, কামের প্রশ্নে, লেখকের প্রতিক্রিয়াও, তত্ত্বগতভাবে

মাধবানন্দ পরমহংসদেব, প্রকাশক মাধবানন্দ যোগাশ্রম, রাজনগর, বীরভূম

পরিপন্থক। আলোচ্য পুস্তিকাটি নিশ্চিতভাবেই একটি বাসনা-বিরোধী রচনা (anti-pleasure text)। দেহের মিলন স্বীকার করলেও যুগল সাধনার মূল লক্ষ্য ব্রহ্মচর্য পালন। বিবাহিত জীবনে ব্রহ্মচর্য পালনের প্রশ্নটি অনেক দিন ধরেই ভাবিয়েছে বিভিন্ন বর্গের সাধকদের। পারস্কর গৃহ্যসূত্রে আছে, ঋতুমতী স্ত্রীর প্রতি 'শাস্ত্র-বিধানমত' উপগত হলে গৃহস্থের ব্রহ্মচর্য রক্ষিত হয়।[১] যোনি লিঙ্গের যেমন মন্থনের কথা এ পুস্তিকায় বিধৃত তা নিছক দেহবাদ অথবা শৃঙ্গার কলা নয়। সাধারণ মানুষের যৌনমিলনে রতিবিলাস এসে পড়ে বলে লেখকের মতে সেটি 'ইতরজনোচিত ব্রহ্মচর্য হানিকর ক্রিয়া।' পত্নীর সাথে 'স্থূল' মিলনের মাধ্যমে 'সূক্ষ্মভাবে' শিবশক্তির মিলনের যে ব্যবস্থার কথা তিনি বলেছেন তাতে কামক্রিয়ার বাস্তবাতিক্রমী ধর্মীয়করণ ঘটে। তন্ত্রমতে আত্মোপলব্ধির ক্ষেত্রে যৌনতা একটি গুরুত্ববহ কিন্তু প্রতীকী ভূমিকা পালন করতে পারে। যৌনক্রিয়ার সময় তন্ত্রসাধকরা প্রবৃত্তিগত উদ্দামতা সরিয়ে রাখতেন।[২] মুলুকরাজ আনন্দ লিখেছেন : 'Cohabitation (Mithuna) is not possible in the usual animal way of desiring, fearing and enjoying but when the hero knows himself to be identical with Siva' (নজরটান লেখক)।[৩] উপভোগের চরিত্রে পরিবর্তন এনে তাকে উৎক্ষিপ্ত করা তন্ত্রসাধনার লক্ষ্য। শশীভূষণ দাশগুপ্তর মতে, সাধনার চূড়ান্ত স্তরে শরীরী অস্তিত্বকে অস্বীকার করা হয় না। কিন্তু তাকে স্থানচ্যুত করে এক স্থায়ী আধ্যাত্মিক অস্তিত্ব এবং তান্ত্রিকদের সব সম্প্রদায়ের ক্ষেত্রেই একথা প্রযোজ্য।[৪] যদিও শরীরকে কেন্দ্র করেই সাধনার শুরু ও বিস্তার, তবু শেষে তার রূপান্তর ঘটে। ব্রিটানিকায় লেখা হয়েছে : 'Tantrism, in an attempt to reach a supramental and depersonalized cestasy, advocates the methodical use of sexual union without the pleasurable completion of the sex act'(নজরটান লেখক) [৫]। প্রতীচ্যে পর্নোগ্রাফির প্রভাবে 'আচ্ছন্ন' নরনারীদের কথা ভেবে লেখা অপর একটি গ্রন্থেও একইভাবে তন্ত্রের এই 'শুদ্ধতম' শরীর-অতিক্রমী ভূমিকাটিকে চিহ্নিত করা হয় : 'Instead of sex being a purely physical experience—a kind of genital sneeze—it becomes a way of opening your heart and mind to the purest form of love and unity.'[৬] মাধবানন্দ এ পর্যন্ত স্বীকার করেছেন যে পতনহীন শৃঙ্গার আয়ত্ত করতে হলেও প্রাথমিক অবস্থায় সাধককে ত্যাগের পথে থেকেই ব্রহ্মচর্য অভ্যাস করতে হয়। তাঁর অবিচল প্রত্যয়, জৈবিক চাহিদা না মেটা পর্যন্ত আধ্যাত্মিক তো বটেই, কোনো 'উচ্চতর মানবিক গুণের'ও বিকাশ হয় না। 'নরনারীর পরস্পরের আকর্ষণের হাত থেকে মুক্তি লাভের উপায়' নামে একটি অধ্যায়ই আছে পুস্তিকাটিতে। সন্তান উৎপাদন ব্যতীত অন্য কারণে বীর্যপতন লেখকের অপছন্দ। স্বমেহনকে বলা হয়েছে 'কুকর্ম', 'অবৈধ ক্রিয়া'। স্বমেহনবশত 'মানসিক রোগ', এমনকি 'সোসাইটি থেকে দূরে থাকতে চাওয়া'র নিবারণকল্পে হোমিওপ্যাথিক দাওয়াই-এর তালিকা দেওয়া হয়েছে। তন্ত্রবিশ্বাসী মাধবানন্দই শুধু নন, কোনো গোত্রের ব্রহ্মচারী সাধকই স্বমেহনের ধারণাটি সহ্য করতে পারেন না। 'অবৈধ উপভোগের' বদলে সমাজ-

নির্দিষ্ট 'বৈধ ভোগের' দ্বারা মায়ার বন্ধন কাটানোই তাঁদের অন্বিষ্ট। মুদ্রা, প্রাণায়ামের সুযোগ না পেলে অভিজ্ঞ চিকিৎসককে দিয়ে 'শক্তিহীনতা' ও সংশ্লিষ্ট ব্যাধিগুলি থেকে মুক্তি পেয়ে যথাসাধ্য ব্রহ্মচর্য পালন করতে হবে—এমনই মাধবানন্দের পরামর্শ। যৌনতাকে সামাজিকভাবে নজরদারির আওতায় নিয়ে আসতে ধর্ম ও চিকিৎসাবিদ্যার গলাগলি তাৎপর্যময়। উনিশ শতকের ফ্রান্সে স্বমেহনবিরোধী লেখালেখিতে স্বমেহনকামী ব্যক্তিদের জাতীয় স্বাস্থ্য ও শুচিতার ক্ষেত্রে 'বেয়াড়া' বিপদ বলে গণ্য করা হত।[৭] একবিংশ শতকে বীরভূমে মাধবানন্দ লিখছেন : '....প্রতিটি সৎ ব্যক্তির দু-একটি সৎ সন্তানের জন্ম দেওয়া উচিত।' 'সৎ সন্তান।' জন্ম থেকেই সৎ। যিনি 'অবৈধ উপায়ে' বীর্যক্ষয় করেন না তাঁর সন্তানের জন্মেই সততা প্রাপ্তি হয়। এভাবেই সমাজে 'ন্যায় নিষ্ঠা সততা' বজায় থাকতে পারে। স্বাস্থ্যের মধ্যেই আছে জাতি গঠনের দাবি। মাধবানন্দ জানেন, বংশপরম্পরায় বয়ঃসন্ধিতে 'অবৈধ উপায়ে' বীর্যক্ষয় করে 'মস্তিষ্ক চালনার ক্ষমতা' হারিয়েই আমরা এখন বেদের জ্ঞান কাণ্ড বুঝতে পারি না। ব্রহ্মচর্য পালিত হচ্ছে না বলেই বেদান্তকথিত সাম্যবাদের দেখা মিলছে না। তাই তিনি জন্মদিন, উপনয়ন ও বিয়ের অনুষ্ঠানে ব্রহ্মচর্য বিষয়ক গ্রন্থাদি উপহার দিতে আবেদন করেছেন। সিনেমা, ভিডিও দেখতে নিষেধ করেছেন। অলস ও অসংযত রসনার ব্যক্তিদের ভর্ৎসনা করেছেন তাঁদের 'ইন্দ্রিয় লালসার' জন্য। উপলব্ধি করেছেন যে ব্যস্ত রাস্তার মোড়ে অশ্লীল বিজ্ঞাপনের ফলেই 'দুর্ঘটনার হার' ক্রমবর্ধমান। যৌনতার প্রতি এই দৃষ্টিভঙ্গি নিয়েও মাধবানন্দের মতো সাধকরা কীভাবে সংসারত্যাগী নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারীদের থেকে নিজেদের বিচ্ছিন্ন করেন এবং সেই বিচ্ছিন্নতার, স্বতন্ত্রতার স্বাভিমানে প্রতিষ্ঠিত থাকতে চান, সে এক বিস্ময়।

তন্ত্রসাধনা নিয়ে সাধারণ মধ্যবিত্ত-মনে কুণ্ঠা আছে। অনেকের ভুল ধারণা, 'বামাচার'ই হয়ত তন্ত্রসাধনার সবকিছু। কেউ তন্ত্রকে শিক্ষিত মননের পক্ষে অসহ্য অশ্লীলতা জ্ঞান করেন, অনেকের কাছে তন্ত্র কেবলই কালো জাদু। সে কথা মাধবানন্দ জানেন বলেই সাধনার বিস্তারিত বিশ্লেষণ করতে তিনি দ্বিধায় পড়েছেন। স্বমূত্র ছাড়া আরও কয়েকটি দেহজ পদার্থ যোগীতান্ত্রিকরা পূর্ণগ্রহণ করেন—এই তথ্য সাধারণ ভক্তকে দেবার পরই দু' পা পিছিয়ে যেতে দেখি তাঁকে : 'তার সবগুলো সর্বসাধারণে প্রকাশ করা সম্ভব নয়।' বাউলরা এবং মারফতী ফকিররা যাকে 'চারচন্দ্রের' সাধনা' বলেন বাধবানন্দ হয়ত সে কথাই বলতে যাচ্ছিলেন। মূত্র ও বীর্যের কথা বললেও রজ আর মলের কথাটা দ্বিধায় তুলতে পারেননি। কাম দিয়ে কামের কাঁটা তোলার ক্রিয়ানুষ্ঠান 'তথাকথিত আধুনিক ভদ্র সমাজের' অনেকের কাছে 'অশ্লীল' মনে হতে পারে 'আশঙ্কা করে' তিনি সবকিছু লেখেননি। তবে তাঁদের সাথে যোগাযোগ করে যোগ্যতার পরিচয় দিলে 'সুগুপ্ত' ক্রিয়াগুলি শিখিয়ে দেবেন। সামাজিক লাঞ্ছনার ভয়েই এই গোপনীয়তা। বামাচারী সাধকরা পঞ্চতন্ত্রের ক্রিয়াকরণ করতে গিয়ে কোনো কোনো ক্ষেত্রে ক্ষমতার অপব্যবহার করেছিলেন।[৮] এ কথা অবশ্যই অজানা নয় লেখকের। অবিবাহিত ব্রহ্মচারীদের মধ্যে যাঁরা যৌগিক ক্রিয়ার প্রয়োজনে পরকীয়ার সাহায্য নিতে

গিয়ে প্রহৃত হয়েছেন তাঁদের অনেককে তিনি নিজে চেনেন বলে দাবিও করেছেন। বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী বহুদিন আগে বলেছিলেন : 'তন্ত্রের উদ্দেশ্য ও অর্থ কেহ বোঝে না। তাই না বুঝে সাধন করতে গিয়ে মারা পড়ে।'[১০] তবে সামাজিক হেনস্থার প্রসঙ্গটি বাদ দিয়েও বলা যায়, গোপনীয়তা ছাড়া সাধন সম্ভব নয়, এমন বিশ্বাস আছে অনেক তন্ত্রসাধকেরই। গল্পচ্ছলে তাঁদেরই একজন বলেছেন : '...ঐ যে বিষ্ণুপদ, জান তো? ও প্রথম প্রথম একটু বেশি একাগ্র হয়ে কাজ করেছিল। কিছু পেয়েও ছিল। মহা উৎসাহে বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে জাঁক করে আলোচনা করতে শুরু করে দিলে, ফলে ঐ পর্যন্ত হয়েই ঠেকে গেল, আর অগ্রগতি নেই'।[১১] অথচ অতি সতর্কতা নিতে গিয়ে পরম্পরার অনেক গুপ্ত সাধনকর্ম অবলুপ্ত হয়েছে, এই চিন্তাও মন থেকে মুছে ফেলা মাধবানন্দের পক্ষে কঠিন। তা তিনি স্পষ্ট করে বলেওছেন।

লেখক একবার রমণী মূর্তিতে জননীভাব আরোপ করে ব্রহ্মচর্য পালনের কথা বলেছেন। পরে আবার বলেছেন, সেটা সর্বদা সম্ভব নয়। শিব সংহিতা থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে বোঝাবার চেষ্টা করেছেন, মূত্রধারা আকর্ষণ ও ত্যাগের নির্দিষ্ট কৌশল গুরুবাক্য মেনে ছ'মাস রোজ অভ্যাস করলে সাধকের 'শত শত স্ত্রী সহবাসেও' বিন্দুপতন হয় না। ব্রজোলী মুদ্রাটি এমন ফলপ্রদ যে সেটির অভ্যাসে যোগশাস্ত্রের কোনো নিয়ম না মেনেই, 'যথেচ্ছাচারে প্রবৃত্ত' হয়েও মোক্ষলাভ সম্ভব। অথচ, শেষ মুহূর্তে, সাধারণ ভক্তের প্রতি তাঁর পরামর্শ, শত শত স্ত্রী সহবাসের লক্ষ্য না রেখে 'আপন বিবাহিতা সহধর্মিণীর' সাহায্যে ঊর্ধ্বরেতা হবার চেষ্টা করতে হবে। এই পরামর্শের পেছনে একটি কারণ ব্যাধি ও তৎপ্রসূত মৃত্যুভয়। দ্বিতীয় কারণ উপর্যুক্ত সামাজিক নিগ্রহের আশঙ্কা। আর তৃতীয় কারণটি নৈতিক। তন্ত্রশাস্ত্রে পরস্ত্রীগমন ও অগম্যাগমন-এর অনুমোদন থাকলেও এবং পরমারাধ্য শিউজির দেবাদিদেব মহাদেব বচন সত্ত্বেও নৈতিকভাবে পরকীয়াকে স্বীকার করতে আপত্তি আছে লেখকের। পত্নীর সাথে সাধনকর্ম চালালে 'পরদ্বার গমনজনিত দোষ' হয় না। তাই সেটিই কাম্য। বিবাহের মতো ঐতিহ্যানুসারী পরম্পরাকে অব্যাহত রাখার তাগিদও আছে এতে।

তন্ত্রসাধনায় নারীরা গুরু হতে পারেন। শোনা যায়, তন্ত্রসাধকদের সব সম্প্রদায়ই নারীর প্রতি সশ্রদ্ধ।[১২] হিন্দু ও বৌদ্ধ তন্ত্রে নারীর অবস্থান একটি প্রভূত তর্কযোগ্য বিষয়। অনেক প্রতীচ্য তার্কিক এই আলোচনায় পুরুষ-আধিপত্য ও যৌন শোষণের ওপর জোর দেন। আবার এমন গবেষণা দুর্লভ নয় যেগুলিতে তন্ত্রসাধনায় নারীর সক্রিয় ও সোৎসাহ অংশগ্রহণের ক্ষমতা চিহ্নিত করা হয়েছে।[১৩] এই তাত্ত্বিক তর্কের গণ্ড থেকে বেরিয়ে আলোচ্য পুস্তিকাটির শব্দযোজনার দিকে দৃষ্টি দিলে এর পুরুষবাদী চিন্তার অভিমুখটি চিনতে বিলম্ব হয় না। লেখকের মতে, নারী মাত্রেই বন্ধনের কারণ নয়। তবে তাকে 'ব্যবহার' করতে জানা চাই। যথার্থ 'ব্যবহার'-এ নরক নয়, স্বর্গের পথই প্রশস্ত হবে। অর্থাৎ সাধন-লক্ষ্যে পৌঁছনোর পথে নারী একটি ব্যবহার্য উপাদান। 'ঠিকমতো' ব্যবহার করতে না পারলে, যা বোঝা যাচ্ছে, বন্ধনের কারণ হয়েই রইবেন তাঁরা। মাধবানন্দ লিখেছেন : 'বিয়ের সময় বর যাঁতি হাতে প্রতিজ্ঞা করে যে এই

শক্তিরূপিণী স্ত্রীর সাহায্যে আমি মায়াপাশ ছেদন করব।' নারী নিজে কি কিছু নিরুপণ করতে পারে এই সম্পর্কে? যেখানে পুরুষ তার স্ব-আরোপিত ঐতিহাসিক দায়িত্বে স্থির? বদল আনতে পারে এর ঠাসা বিন্যাসে? কোথাও লেখক প্রশ্নটিকে ছুঁয়ে দেখার সাহস করেননি। তাঁর ভাষাভঙ্গি দেখে ঝুঁকে পড়তে ইচ্ছে হয় নিচের সিদ্ধান্তের দিকে : '....though tantra admits equality between men and women the rituals and practices for female tantriks are the mirror images of those for males...the text invariably proceed from...the viewpoint of male practitioners'[১৪]

শিউজির নির্দেশ অকাট্য বলে মেনে নিতে হবে নাকি 'বিচার'কে প্রাধান্য দিতে হবে, এই নিয়ে মাধবানন্দের দ্বিধা আছে। তিনি লিখেছেন 'একমাত্র শিবোক্ত তন্ত্র শাস্ত্র নির্দেশিত প্রণালী' অনুযায়ী সাধন করলে ধর্মজগতে উন্নতি সম্ভব। কিন্তু রামাকৃষ্ণদেব, ক্যাথলিক বা সুফি ধর্মাবলম্বীদের যে বিভিন্ন প্রসঙ্গে নিজের মত প্রতিষ্ঠায় এই পুস্তিকায় উল্লেখ করা হল তাঁরা সবাই কি 'শিবোক্ত' প্রণালী মেনে সাধনকর্ম করেছেন? নারীদেহ নিয়ে রামকৃষ্ণদেবের চূড়ান্ত বীতরাগ তো সুবিদিত।[১৫] তন্ত্রে উদ্বেগ, জন্ডিস, মূর্ছা, চক্ষুরোগ, শ্বাসকষ্ট ইত্যাদির কারণ নির্ণয় ও সমাধানের চেষ্টা করা হয়। চিকিৎসাবিদ্যার যে চেহারা চরকসংহিতা ও সুশ্রুতসংহিতা-য় পাওয়া যায়, তার মূল তন্ত্রে। চরক ও সুশ্রুতের রচনায় অবশ্য নানা অসম্পূর্ণতা আছে। তান্ত্রিকদের শবসাধনার পেছনে শবব্যবচ্ছেদ ও অঙ্গসংস্থান সংক্রান্ত জ্ঞানার্জনের উদ্দেশ্য ছিল বলেও অনেকে অনুমান করেন। এই পুস্তিকাটিতেও নানা শারীরিক, মানসিক ও তথাকথিত 'গুপ্ত' ব্যাধি রুখে দেবার উপায় জানানো আছে। এতে আপত্তির কিছু নেই। খটকা লাগে তখনই, যখন পরামর্শ পাওয়া যায় যে সাধনার সুবিধার্থে 'শাস্ত্রীয় প্রাচীন নির্দেশ ও আধুনিক বৈজ্ঞানিক গবেষণা' জেনে রাখা দরকার। যৌনতা ও আত্ম-লালনের মতো বিষয়ে তাত্ত্বিক ভাবনার ক্ষেত্রেও তো যোগশাস্ত্র বা কামসূত্র পশ্চিমী কেন্দ্রিকতার বাইরে অবস্থান করে।[১৬] তবু, নানা প্রেক্ষিতে, যৌনতাই হোক্ বা স্বাস্থ্য, 'আধুনিক বৈজ্ঞানিক গবেষণা' নামক পশ্চিমী আদরাটিকে সর্বমান্য ধরে নেওয়ার আগ্রহ পরিব্যাপ্ত কেন? তন্ত্রবিদরা তো নিজেদের মতো করে মনের স্বাস্থ্য নিয়ে ভেবেছিলেন। তার সাথে 'আধুনিক বৈজ্ঞানিক গবেষণা'র একটা গাঁটছড়া বেঁধে দিয়ে নিজের অভিজ্ঞানচ্যুত হয়ে 'স্বতন্ত্র আধুনিকতার সন্ধান'[১৭]-কে খারিজ করার দরকার হচ্ছে কেন? এ কি নয়া জাতীয়তাবাদী চিন্তার স্ববিরোধী চরিত্রের দিকেই অঙ্গুলিনির্দেশ করে না? এ যেন সাপও মরবে, লাঠিও ভাঙবে না—'শাস্ত্রীয়' নির্দেশের অকাট্যতাই প্রমাণ করা হবে, আবার 'আধুনিক বিজ্ঞান'কে উড়িয়েও দেওয়া যাবে না। 'শাস্ত্রীয় প্রাচীন নির্দেশ' এক অনৈতিহাসিক অতীতকে তুলে ধরে আর 'আধুনিক বিজ্ঞান' ঔপনিবেশিক শিক্ষার হাত ধরে পাওয়া। মাধবানন্দ সেই বহুচর্চিত তর্কের বাঁকেই আটকে আছেন। কোন্ খাদ্যে আয়রন, প্রোটিন, ফসফরাস কতটা আছে তার একটা হাস্যকর রকমের বিস্তারিত বিবরণ আছে পুস্তিকাটিতে। লক্ষ্যণীয় যে, প্রকাশকও একজন চিকিৎসক। আসলে আধুনিক

মানুষ, যে প্রতি মুহূর্তে ধর্মীয় আচরণকে সন্দেহ করতে শিখছে, তার কাছে যুক্তিগ্রাহ্য হয়ে উঠবার জন্য কতকগুলি মামুলি স্বাস্থ্যবিধি নিয়ে চর্বিতচর্বন এবং 'আধুনিক বিজ্ঞান'-এর সাথে মিতালি করতে হয়। বলেই ফেলেন মাধবানন্দ যে, এই যন্ত্রাশ্রিত যুগকে তাঁদের পক্ষে কিছু বিশ্বাস করানো শক্ত। অবিবাহিতদের জন্য রচিত ব্রহ্মচর্যের বইগুলিতেও এই কৌশলের ব্যত্যয় হয় না।[১৮] অবশ্য এই সূত্রে যোগ করা প্রয়োজন যে, সময়কে যদি কেউ বহতা নদীর বদলে কুণ্ডলী পাকানো গ্রন্থির মতো দেখতে পান, তবে তিনি 'প্রাচীন' ও 'আধুনিক'-এর মধ্যে অনড় কোনো বাধা খুঁজে পাবেন না। দীপেশ চক্রবর্তী যেমন বলেছেন, আমাদের আধুনিকতার অভিজ্ঞতার একটি উপাদান হল 'পরস্পর বিসদৃশ দুটি বস্তুর বা অভ্যাসের বা রীতির একই সময়ে সহাবস্থান।'[১৯]

আধুনিক বিজ্ঞান ও অধ্যাত্মবাদের মধ্যে সেতুবন্ধনের মাধবানন্দ-কৃত প্রক্রিয়াটি আবার ভিন্ন পথে, একটি শুদ্ধতাবাদী এবং জাত্যাভিমানী হিন্দুত্বের বয়ানের অন্তর্ভুক্ত। মীরা নন্দার সাথে এ ব্যাপারে অনেকে একমত হবেন যে, '....by framing the trditional Hindu worldview in a modernist vocabulary, I lindutva is co-opting modern ideas, giving traditions a modern gloss to make them palatable to the educated middle clasess.'[২০] আগ্রাসী হিন্দুত্বের বা বলা ভাল 'হিঁদুয়ানি'র যে ধরনের বিকাশ গত কয়েক বছর ভারতবর্ষের মানুষ প্রত্যক্ষ করেছেন, তাতে ঐতিহ্যের প্রতি ছিটেফোঁটা শ্রদ্ধাও যেমন নেই তেমনি মাধবানন্দেরও নিরুৎসাহিত হবার অবকাশ নেই। বস্তুতান্ত্রিক বিশ্ব সম্পর্কে ক্রমক্ষীয়মাণ আস্থা নিয়ে এইখানে তিনি প্রত্যয়ের ভূমি পেয়ে যান এবং ভোরবেলায় যুবকদের ঘুম তাড়ানোর জন্য 'জয় হর মনোরমা জয় শিব রাণী' নাম মুখে নিয়ে টহল দিতে বলেন। ফলাও করে ঘোষণা করেন কিভাবে আমেরিকা, ব্রিটেনে ভারতীয় হিন্দু যোগী-ঋষিদের শাস্ত্রের গবেষণা চলছে এবং তাতে প্রতীচ্যের 'মহা মহা পণ্ডিতগণ' অভিভূত হচ্ছেন। গোটা বই জুড়ে সনাতন ভারতের জন্য আক্ষেপ করেন: 'ভারতবর্ষ হারিয়ে ফেলছে ত্যাগ, তিতিক্ষা, বিবেক বৈরাগ্য, জ্ঞান গরিমায় ভরপুর অতীতের গৌরবোজ্জ্বল দিনগুলিকে'। অপূর্ণ বর্তমানের ভিন্নতা প্রতিষ্ঠা করার জন্যই এই 'গৌরবোজ্জ্বল' অতীতের নির্মাণ। প্রকাশক মশায়ের দাবি, এই পুস্তিকায় যা আছে তা 'ভারতবর্ষ ব্যতীত' এতদিন অজানা ছিল এবং আজ 'বিশ্বের মঙ্গলের নিমিত্ত' প্রকাশিত হল। পতনহীন মৈথুনের পদ্ধতি শাক্ত, শৈব, বৈষ্ণব, চীনের তাওবাদী, ইসলামের সুফিবাদী, বৌদ্ধ সহজিয়া প্রভৃতি সম্পদায়ের মানুষরাও প্রয়োগ করছেন এবং তন্ত্রোক্ত যোগসাধনা নিজেদের সাধনায় যুক্ত করেছেন—এ। কথাটা এমনভাবে বলা হয়েছে যাতে মনে হয় যে এঁরা সবাই একটি মৌলিক ও অবিমিশ্র হিন্দু তন্ত্রমতের কাছ থেকে এই জ্ঞান পেয়েছেন। কোথাও ভারতীয় তন্ত্রচর্চার উপর বহির্দেশীয় প্রভাবের[২১] উল্লেখ নেই। যৌনতার নিয়ন্ত্রণকে রাষ্ট্রিক কল্যাণের একটি মুখ্য উপায় বলে তো মানেন গৈরিক দেশসেবকরা। পুস্তকাটির 'প্রার্থনা' অংশে সেই ।।।। জাতীয়তাবাদী চৈতন্যের একটি গৎ-বাঁধা স্বপ্ন ভাষা পেয়েছে : 'ব্রহ্মচর্য্য তেজদৃপ্ত আধ্যাত্মিক ভারত আবার পৃথিবীর মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ আসন ফিরে পাক।'

শারীরিক ক্রিয়া এবং যোগের সাহায্যে দম্পতিরা যাতে ব্রহ্মচর্য অটুট রাখতে সক্ষম হন সেই লক্ষ্যে বিস্তর আলোচনার পর লেখকের অন্তিম নিদান : 'মাতৃমন্ত্র জপ ও মাতৃনাম কীর্ত্তনের দ্বারাতেই ব্রহ্মচর্য্যে প্রতিষ্ঠিত হয়ে সাধক-সাধিকারা ধর্ম-জগতে চরম অবস্থা লাভ করতে পারবে...' (নজরটান লেখক)। অনেক মহাপুরুষ স্বপ্নদোষে আক্রান্ত হয়েও 'একমাত্র ভগবানের নাম জপের গুণে' ব্রহ্মচর্য পেয়েছেন। তন্ত্রসাধনায় মন্ত্রের ভূমিকা সামান্য নয়। কিন্তু এখানে 'নামজপ' বলতে 'মন্ত্র' বোঝানো হয়েছে কিনা স্পষ্ট করে বলা যায় না। তদুপরি, 'একমাত্র' নামজপেই কার্যসিদ্ধি হলে দুঃসাধ্য ক্রিয়াগুলির কী মূল্য? উত্তর নেই। নামজপের ছোঁয়া না থাকলে পুরো প্রক্রিয়াটি সাধারণ ভক্তের কাছে ঐহিক হয়ে যেতে পারে এমন সম্ভাবনায় ত্রস্ত নন তো মাধবানন্দ? 'ধর্মোন্নতিকামী', বিবাহিত, গৃহী সাধক-সাধিকাদের বীর্যরক্ষার জন্য পুস্তিকাটি প্রকাশ পেলেও শুধু ধর্মকথায় কাজ হবে না অনুমান করে ধর্ম-নিরপেক্ষ ক্ষেত্রগুলিকেও আত্মসাৎ করা হয়েছে। প্রকাশক তাঁর চিকিৎসক-জীবনে 'অবৈধ বীর্যক্ষয়ে' দুর্বল যে রোগীদের দেখেছিলেন তাঁরা সকলেই নিশ্চয়ই 'ধর্মোন্নতিকামী' ছিলেন না। কিন্তু তাঁদের কথাটাও মাথায় আছে তাঁর। সুতরাং ছাপ-পড়ে-যাওয়া 'ধর্মোন্নতিকামী' নন এমন সাধারণ গেরস্তরা যদি যৌনতা নিয়ে তাঁদের ভয় ও দ্বিধাগুলি নিয়ে 'বিবাহিতের ব্রহ্মচর্য্য' নামক ধর্মীয় নির্দেশতন্ত্রটির দ্বারা কোনোক্রমে প্রভাবিত হন তাহলে তো মেঘ না চাইতেই জল। ডিম, মাছ, মাংস প্রভৃতি খাদ্যে রজগুণ বাড়ে বলে তা, লেখকের মতে, ত্যাগী ব্রহ্মচারীদের খাওয়া ঠিক নয়। তবে সংসারী সাধকদের 'এক-আধ টুকরো মাছ-মাংসে' ক্ষতি নেই। বাসি পান্তা গ্রহণ না করার পরামর্শ দেবার পাশাপাশি এ ঘটনাটিও তিনি জানিয়ে রাখতে ভোলেননি যে মহাবৈষ্ণব রঘুনাথ দাস গোস্বামী তিন-চার দিনের বাসি খাবার জল দিয়ে ধুয়ে 'ভগবানের নাম' জপ করতে করতে গ্রহণ করতেন এবং তাতে, বলা নিষ্প্রয়োজন, সাত্ত্বিকতার হানি ঘটেনি। এই গল্পটির মধ্যে দিয়ে নামজপের উপযোগিতা প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে। তদুপরি, স্বাস্থ্য বা খাদ্যবিধির প্রসঙ্গ নিয়ে কঠোরতা অবলম্বন করলে এখনকার গৃহী ভক্তরা মুখ ফিরিয়ে নিতে পারে এই ভয়ে বিধিগুলি শিথিল করে গ্রহণযোগ্যতাও বাড়িয়ে তোলা যাচ্ছে। 'অন্নগত' প্রাণ কলিকালের মানুষকে বেশি চটালে যে ঘোর বিপদ, সেই উপলব্ধিটি ফাঁস হয়েছে : 'এহেন সময়ে আহারীর বিষয়ে অতি কঠোরতা আরোপ করলে, ইন্দ্রিয় সুখ ভোগ ত্যাগের কথা বললে দুর্বলচিত্ত মানবগণ শুনবে কেন?' মুদ্রা বা প্রাণায়ামের পাশাপাশি দৈনিক কীর্ত্তন ও ইষ্টমন্ত্রাদি জপ করার প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করা হয়েছে। আর যাঁরা নিতান্তই ব্রহ্মচর্য পালনে অক্ষম তাঁদের প্রতিদিন লাল কালি দিয়ে অন্তত একশো আট বার 'জয় দুর্গা শ্রী শ্রী দুর্গা', 'মা তারা তারিণী মঙ্গলদায়িনী' ইত্যাদি নাম জপ করতে বলা হয়েছে। মর্মার্থ এই যে, 'পরমা করুণাময়ী জগৎ জননীর কৃপা' ছাড়া 'প্রারব্ধ কর্মজনিত' কোনো ব্যাধি থেকে মুক্তি নেই, মনঃসংযোগ বা শারীরিক ক্রিয়ার ফল নেই। এইভাবে বারবার স্বাস্থ্যের প্রসঙ্গটি মনে করিয়ে দেবার সঙ্গে সঙ্গে প্রতিবার তার ধর্ম-বিমুক্ত অর্থটিকে মুছে ফেলা হয়। তন্ত্র ধর্মশাস্ত্রগুলি সম্পর্কে নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যের

মূল্যায়ন স্মরণ করলে এই প্রক্রিয়ার উৎসে পৌঁছতে সুবিধে হতে পারে : '....though they [the Tantric religious texts] begin with a purely scientific approach to the question of the formation of the body....ultimately the approach is given a religious and metaphysical orientation in accordance with a demand of the philosophy of *karma* and *moksha*.'[১১]

শুধু সাধক-সাধিকা নন, সমাজের সর্বস্তরের মানুষের কাছে পৌঁছনোর ব্যাকুলতা লেখককে যৌনশিক্ষার মতো একটি বিষয়ের অবতারণা করতে প্রভাবিত করেছে। আঠেরো থেকে পঁচিশ বছরের ছেলেমেয়েদের মধ্যে 'যৌন উচ্ছৃঙ্খলা' বেড়ে যাচ্ছে বুঝে প্রকাশক তাদের যৌনশিক্ষা দেবার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেছেন এবং শেষে, 'উঠতি বয়সের ছেলেমেদের প্রকৃত যৌনশিক্ষার জন্য' বইটি প্রকাশ করে নিজেকে 'ধন্য' মনে করেছেন। একে একটি বিরাট ভাঁওতা বললেও কম বলা হয়। প্রথমত স্কুল স্তরে যৌনশিক্ষার পাঠ্যক্রম শুরু করার প্রস্তাবটি অধুনা বহু-আলোচিত। অতএব, এই বিসদৃশভাবে যৌনশিক্ষার কথা তোলা হয়েছে। দ্বিতীয়ত, 'উঠতি বয়সের ছেলেমেয়েদের প্রকৃত যৌনশিক্ষার' জন্য নয়, প্রকাশিকার ভাষায়, এটি রচিত হয়েছে বিবাহিত সাধক-সাধিকাদের ব্রহ্মচর্যের কথা চিন্তা করে। 'প্রকৃত' যৌনশিক্ষা কী বস্তু সে প্রশ্ন না তোলাই ভাল। মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের প্রতি মাধবানন্দের পরামর্শ : 'অসৎ সংসর্গ হতে দূরে থাকো।' এ তো বোধোদয় পাঠ হয়ে গেল স্যার! ছুটির দিনে কিছুক্ষণ 'সাধুসঙ্গ' করতে বলা হয়েছে। অত সাধুই বা বেচারিরা পাবে কোথায়? যৌনশিক্ষার মতো জন্মনিয়ন্ত্রণের ধারণাটিকেও নিজেদের উদ্দেশ্যানুসারী করে ব্যবহার করতে যত্নবান হয়েছেন লেখক, এডস্‌-এর জুজু এগিয়ে দিয়ে প্রায় তৃতীয় শ্রেণীর গোয়েন্দা গল্পের ঢঙে মৃত্যুভয় দেখিয়েছেন : 'আসছে সে চুপিসাড়ে যৌন স্বেচ্ছাচারিতার মধ্যে দিয়ে হয়তো বা এইডস এর রূপ ধরে।' এই সূত্রে জন্মনিয়ন্ত্রণ নিয়ে লম্বা বক্তৃতা ফাঁদা হয়েছে : 'জাতি, ধর্ম, সম্প্রদায় নির্বিশেষে সকলের উচিত দ্রুতহারে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হারকে নিয়ন্ত্রণ করা। নতুবা দেশ চরম সঙ্কটে পড়ে যাবে' এমনভাবে কথাগুলি লেখা হয়েছে যেন পরিবার পরিকল্পনাই মাধবানন্দের মূল গন্তব্য এবং সেটির মতো সামাজিক সঙ্কটের সমাধানকল্পেই যেন তাঁদের আধ্যাত্মিক কৌশলগুলি প্রযুক্ত হচ্ছে। অথচ কয়েক পৃষ্ঠা আগেই তিনি বলেছেন যে প্রচলিত পরিবার পরিকল্পনায় শুধু জন্মনিয়ন্ত্রণের সাহায্য হয়, বীর্য ধারণে কোনো সাহায্য হয় না বলে সাধকদের পরিবার পরিকল্পনায় কোনো আগ্রহ নেই। যৌগিক মৈথুন আধুনিক জন্মনিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার তুলনায় উৎকৃষ্ট, যেহেতু তাতে বীর্যক্ষয় রোধ করা যায়। আগ্রহই যদি নেই তবে যাঁরা পরিবার পরিকল্পনা অনুসরণ করছেন না তাঁদের নিয়ে এত উদ্বেগ কেন? উদ্বেগ একটিই— যৌনতাকে সামাজিকভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে না পারলে স্থিতাবস্থা ভেঙে পড়বে। আর একটি লক্ষ্য, জন্মনিয়ন্ত্রণের মতো জনপ্রিয় আলোচনার বিষয়গুলির সাথে তাঁদের ধর্মচিন্তার সংহতি-অন্বয়কে প্রতিষ্ঠা করা। শুধু ধর্মের বুলি বা মোক্ষলাভের আশ্বাসে সুবিধে হচ্ছে না বুঝে অন্যান্য জাগতিক মুনাফার কথাও তুলতে হচ্ছে। যেমন যৌগোক্ত ক্রিয়ায়

'বড় কোনো অপারেশন' ছাড়াই প্রয়োজনমতো সন্তান উৎপাদন করা যায়। 'প্রচুর ব্যয়সাধ্য' আধুনিক চিকিৎসা পদ্ধতি এড়িয়ে যাওয়া যায়। অবিবাহিত নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারীরাও এই যুক্তি দেন। এ ব্যাপারে তাঁদের সাথে তন্ত্রোক্ত যুগল সাধনার পথিকদের তেমন বিরোধ নেই।[২৫]

মাধবানন্দের পুস্তিকাটি পড়ে তাঁকে উঁচুমানের তাত্ত্বিক কিংবা ব্যাখ্যাতা মনে হয় না। তন্ত্রের কয়েকটি সাধারণ বক্তব্য ও ক্রিয়া সহজ করে তিনি সাধারণ ভক্তের কাছে পেশ করেছেন। স্বভাবতই এ কাজ করতে গিয়ে তাঁকে ভক্তের দোলাচল, দ্রুত পরিবর্তনমান সমাজ-পরিসর, তন্ত্রের প্রয়োগের ক্ষেত্রে বিচ্যুতির অনন্ত সম্ভাবনা এবং তার অন্তর্গঠনের জটিলতা—সবই খেয়াল রাখতে হয়েছে। আর তাতেই বেধেছে গোল। কখনও আপস করেছেন নিরুপায় মুদ্রায়, কখনও স্ববিরোধিতার জালে পা জড়িয়ে গেছে। এই স্ববিরোধ ও আত্মসমর্পণের চিহ্নগুলি মাধবানন্দ ও তাঁর সঙ্গীদের অস্তিত্বের দোদুল্যমানতাকে প্রতিফলিত করে। একটি জনাদরহীন, জটিল গুহ্যতন্ত্রের অনুসারী হিসেবে অবশ্যই পায়ের তলার মাটি সরে যাবার অনুভূতি হয় তাঁর, পণ্যবাদী সমাজের চাপে শ্বাসরুদ্ধ হয়ে আসে। প্রথম লাইনটিতেই ('কলির জীবের অন্নগত প্রাণ আর ইন্দ্রিয়গত মন') বিপুল নৈরাশ্যের ইঙ্গিত। কেননা 'কলিযুগ' কালচক্রের এমন এক পর্ব যা বস্তুত একটি মোটিফ, যার সাথে পুরুষতান্ত্রিক এবং উচ্চবর্ণীয় ঐতিহ্যের সূত্রে আমাদের সংস্কার ও চৈতন্যে যুক্ত থাকে নৈতিক অবক্ষয়ের ধারণা। যে কালপর্বটি, সুমিত সরকারের ভাষায়, 'necessarily decadent.'[২৬] এই নৈরাশ্যই ক্রমে স্ববিরোধিতাগুলি উন্মুক্ত করে। গোপনীয়তাকে প্রামাণ্য জেনেও, সামাজিক নিগ্রহের আশঙ্কা নিয়েও 'অবলুপ্তি' এড়াতে নিজেদের মতের প্রসারের চেষ্টা চালাতে হয়। এই নৈরাশ্য পেরোতেই বিশুদ্ধ ও সনাতন ভারতীয়ত্বের অন্বেষণ, যুক্তিবাদী বুদ্ধিবিভাসার সাথে সখ্যতা প্রমাণের উদ্যোগ, সর্বাত্মক ধর্মমাহাত্ম্য সম্প্রসারণের প্রক্রিয়া জারি। 'সর্বস্তরের' মানুষের কাছে নিজেদের গ্রহণীয় করে তুলবার দায় টের পেয়েছেন মাধবানন্দ। অথচ সর্বজনগ্রাহ্যতার দিকে এগোলেই জনরুচির তোয়াক্কা করতে গিয়ে রাগী সিদ্ধান্তগুলি থেকে ঝাঁঝ উবে যাচ্ছে। জন্মনিয়ন্ত্রণ, এডস্ ও যৌনশিক্ষার মতো বিষয়গুলিকে ঢাল হিসেবে ব্যবহার করতে গিয়ে ফেঁসে যাচ্ছে যুক্তির সংগঠন। গোঁড়া ধর্মমতগুলির নৈতিক শুদ্ধতার সীমা তন্ত্রসাধকরা তাঁদের আচারে ভেঙেছিলেন। কিন্তু আচারের বিস্তৃতি, আনুষ্ঠানিকতা এবং জটিল উপাসনা-পদ্ধতি তন্ত্রমতেও গোঁড়ামি এনেছিল।[২৭] মিলনের প্রবাহ নিরুদ্ধ করতে না চাইলেই, নারীসঙ্গকে মান্যতা দিলেই যৌনতা নিয়ে মুক্ত বীক্ষণের পরিচয় মেলে না। আর পাঁচটা ধর্মসম্প্রদায়ের মতো 'বিবাহিত ব্রহ্মচর্য'-র প্রচারকরাও যৌন আনন্দ, বীর্যপতন ও 'অবৈধ' উপভোগকে স্বীকৃতি দিতে অপারগ। তাঁদের শব্দযোজনা পুরুষতান্ত্রিক কর্তৃত্বের চিহ্নগুলিকে, বিবাহ নামক প্রতিষ্ঠানটিকে মর্যাদা দেয়। অন্তত এই পুস্তিকাটিতে দিয়েছে। এইভাবে বুর্জোয়াদের শ্রেণীক্ষমতা অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য উপযোগী ভাবাদর্শ ও অনুশাসনের একটি প্রকল্প ছড়িয়ে পড়ে মাধবানন্দ যোগাশ্রমের মতো ধর্মীয় সংগঠনের মাধ্যমে। কেন্দ্রহীন, সর্বব্যাপী

এই অনুশাসনতন্ত্রে এইভাবে পুষ্টি জুগিয়ে চলেছে আরো অনেক প্রতিষ্ঠান। একজন মধ্যশ্রেণীর বাঙালি ভদ্রলোকের বাস্তবে কিন্তু তান্ত্রিক আচার গ্রহণীয় নয়। তিনি এদের 'ভোগবাদী' এবং 'অসংযমী' আখ্যা দিয়ে প্রান্তিকায়িত 'অপর'-এ পরিণত করেন। কোনও না কোনওভাবে ধর্ম ও যৌনতাকে দুটি প্রথানুগ বিপ্রতীপ ছাঁচে ঢালাই না করতে পারলে তাঁর নিদ্রায় ব্যাঘাত ঘটে। এই প্রতিক্রিয়া মাধবানন্দের মতো যুগল সাধনার পথিকদের আরো সাবধানী ও কূটাভাসময় অবস্থানে নিয়ে যায়। অথচ গভীরতর স্তরে পৌঁছে তাঁরাও যৌনতা নিয়ে হাড়ে হাড়ে রক্ষণশীল। শত সহবাসে বীর্যক্ষয় হবে না বিশ্বাস করেও নৈতিক অস্বস্তি থেকে তাঁরা সে পথ 'সংশোধন' করেন। দেহগত অনুভূতিতে ধর্মীয় ব্যঞ্জনা আরোপ না করা পর্যন্ত সেই অস্বস্তি যায় না। তন্ত্রমতের একজন সাধারণ প্রচারকের এই বিচিত্রমুখী অন্তর্দ্বন্দ্ব ও বিপর্যস্ত স্বাভিমানের যে লক্ষণ এই পুস্তিকায় পাওয়া যায় তা শেষ পর্যন্ত একটি ধর্মসম্প্রদায়ের ন্যুব্জতা ও সংকটাবদ্ধতারই পরিচয় দেয়।

সূত্র নির্দেশ :

১. শ্রী শ্রী পূর্ণানন্দ ব্রহ্মচারী, সরল যোগ সাধন, মহেশ লাইব্রেরি প্রকাশন সংস্থা, কোলকাতা, নভেম্বর ১৯৯১, পৃষ্ঠা ১১৫।

২. Muluk Raj anand, Kama yoga (Some notes on the philosophical basis of 'Erotic' Art of India), Arnold Publishers, New Delhi, 1991, page 60.

৩. ibid, page 87.

৪. Sashibhusan Dasgupta, Obscure Religious Cults, Firma KLM Private Ltd. Calcutta, Third edition, 1995 reprint, page xxxix, 102

৫. The New Encyclopedia Britannica, Micropedia, 15th edition, 1997, page 548.

৬. Val Sampson, Tantra : The Art of Mind Blowing Sex, Vermilion, London, 2002, page 9.

৭. Veron A. Rosario, 'Masterbation and Degeneracy', in Robert A. Nye (ed.), Sexuality, Oxford University Press, 1999, page 140.

৮. সুধীর চক্রবর্তী, গভীর নির্জন পথে, আনন্দ পাবলিশার্স লিমিটেড, কলকাতা, জুলাই ১৯৮৯, পৃষ্ঠা ১৮২।

৯. Swami Pratyagatmananda, 'Tantra as a way of realization', in The Cultural Heritage of India, The Ramakrishna Mission Institute of Culture, Calcutta, Paperback edition, 2001, Volume IV, page 229, 239.

১০. কুলদানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীশ্রী সদ্‌গুরুসঙ্গ, পুরীধাম ঠাকুরবাড়ি আশ্রমের কমিটি ও সেবাইতের পক্ষে সংসদ প্রকাশনী, কলিকাতা, সপ্তম পুনর্মুদ্রণ, দোলপূর্ণিমা, ১০৯০, ৫ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ১৪৩।

১১. প্রমোদকুমার চট্টোপাধ্যায়, তন্ত্রাভিলাষীর সাধুসঙ্গ, বিশ্ববাণী প্রকাশনী, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ, জুলাই ১৯৮৩, পৃষ্ঠা ২৩।

১২. Atal Behari Ghosh, 'The Spirit and Culture of the Tantra', The Cultural Heritage of India, The Ramakrishna Mission Institute of Culture, Calcutta, paperback edition, 2001, Volume IV, page 243.

১৩. Miranda Shaw, Passionate Enlightenment : Women in Tantric Buddhism, Munshiram Manoharlal Publishers Pvt. Ltd.. New Delhi, 1998 edition, page 6-7.

১৪. Sudhir Kakar, Shamans, Mystics and Doctors (A Psychological Inquiry into India and its Healing Traditions), Oxford University Press, New Delhi, Seventh Impression, 2002, page 153.

১৫. মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত (শ্রীম), শ্রীশ্রী রামকৃষ্ণকথামৃত, উদ্বোধন কার্যালয়, কলিকাতা, চতুর্দশ পুনর্মুদ্রণ, ভাদ্র, ১৪০৭, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ১৪২।

১৬. Debiprasad Bandyopadhyay, 'Soul'd out and In : Representation of body, no-body, male, female etc. in the 'Hindu'(?) Philosophy' in Anirban Das (ed.), from the margins : bodies, beings and genders, Margins Collective, Calcutta, Volume ii, No. 1, February 2002, page 183.

১৭. পার্থ চট্টোপাধ্যায়, ইতিহাসের উত্তরাধিকার, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ, এপ্রিল ২০০০, পৃষ্ঠা ১৮৩।

১৮. স্বামী প্রজ্ঞানন্দ ব্রহ্মচারী, ব্রহ্মচর্য ও যোগ সাধনা, সাধন তীর্থ যোগাশ্রম, বাঁকুড়া, চতুর্থ সংস্করণ, ১৪০৩, ১ম খণ্ড, 'চতুর্থ সংস্করণের নিবেদন'।

১৯. দীপেশ চক্রবর্তী, 'ভারতবর্ষে আধুনিকতার ইতিহাস ও সময় কল্পনা', গৌতম ভদ্র ও অলক ঘোষ (স.), ঐতিহাসিক, কলকাতা, বর্ষ ৬, সংখ্যা ২, সেপ্টেম্বর ১৯৯৭, পৃষ্ঠা ১২১।

২০. Meera Nanda, "Postmodernism, Hindu nationalism and 'Vedic Science'," Frontline, January 16. 2004, page 88.

২১. P.C. Bagchi, 'Evolution of the Tantras' in The Cultural Heritage of India, The Ramakrishna Mission Institute of Culture, Calcutta. paperback edition, 2001, Volume IV, page 224-226.

২২. Narendranath Bhattacharya, History of the Tantric Religion (An Historical, Ritualistic and Philosophical Study), Manohar Publishers & Distributors, New Delhi, Second revised edition, 1999, page 33.

২৩. স্বামী প্রজ্ঞানন্দ ব্রহ্মচারী, ব্রহ্মচর্য ও যোগ সাধনা, সাধন তীর্থ যোগাশ্রম, বাঁকুড়া, চতুর্থ সংস্করণ, ১৪০৩, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ১৯।

২৪. Sumit Sarkar, 'Colonial Times: Clocks and Kali-Yuga', Beyond Nationalist Frames (Relocating Postmodernism, Hindutva, History), Permanent Black, First paperback edition, 2004, page 26.

২৫. Sashibhusan Dasgupta, Obscure Religious Cults, Firma KLM Pvt. Ltd.. Calcutta, Third edition, 1995 reprint, page 76.

কথা, কাহিনি, আখ্যান

সন্দীপ বন্দ্যোপাধ্যায়

আমরা যাকে গল্প বলি, সেই শব্দটার বয়স নাকি দুশো বছরের বেশি নয়। পুরাকালে লোকে বলত : 'কথা'। মুনিঋষিদের মুখের বাক্য যেমন অলঙ্ঘনীয়, কথারও তেমনি অলৌকিক শক্তি আছে বলে মনে করা হত। যে-রাজামশাইয়ের অসুখ আর কিছুতেই সারে না, তিনিও ওস্তাদ কথকের কথার গুণে সুস্থ হয়ে উঠলেন—এমন গল্প আমরা কে না পড়েছি! কথা শ্রবণে শুধু আনন্দলাভ নয়, পুণ্যসঞ্চয়ও হয়। মহাভারতের কথা 'অমৃতসমান'।

ভারতবর্ষ 'কথা'-র দেশ। প্রমথ চৌধুরী বলেছেন, আমরা ধর্ম নিয়ে বড্ড ভাবি বটে, কিন্তু আসলে আমরা 'গল্পপ্রাণ' জাতি। আমাদের শাস্ত্রপুরাণকাব্যের মহাভাণ্ডারে কতই না গল্পের ধনরত্ন সঞ্চিত হয়ে আছে—আমরা শুধু কুড়িয়ে বেড়াই। শাস্ত্রপুরাণই বা শুধু বলি কেন, এ-দেশের পথে-পথে গল্প ছড়ানো। রাজা রাও তাঁর 'কন্থাপুর' উপন্যাসের শুরুতে লিখেছেন, এই দেশে এমন কোনও গ্রাম পাওয়া যাবে না যার সঙ্গে কোনও দেবদেবীর কথা বা কোনও পৌরাণিক আখ্যানের অনুষঙ্গ জড়িত হয়ে নেই। সত্যিই তাই। পুরুলিয়ার বাঘমুন্ডি থেকে হেঁটে আমরা একবার অযোধ্যা পাহাড়ে উঠেছিলাম। যে-আদিবাসীরা আমাদের সঙ্গে সঙ্গে যাচ্ছিলেন, পথে একটি গাছের ঝুরি দেখিয়ে তাঁরা বলেন, ওই সীতামাঈয়ের চুল আটকে আছে। অযোধ্যা থেকে পুরুলিয়া হয়ে রামচন্দ্র কেমন করে তাঁর পত্নী আর ভ্রাতাকে নিয়ে চিত্রকূট পর্বতে পৌঁছলেন, সেই যাত্রাপথের মানচিত্রটা কোনও ভূগোল বইতে পাওয়া যাবে না। তা মানুষের মনে থাকা আছে।

এই যে লিখলাম গল্প-কথা-আখ্যান, এই শব্দগুলো কিন্তু ঠিক সমার্থবোধক নয়। প্রত্যেকটা শব্দের বিশিষ্ট অর্থ আছে, বর্গভেদ আছে। সে-সব পুরো বলতে গেলে একটা বৃহৎকথা হয়ে যাবে। তার চেয়ে বরং আমরা একটু ছোট করে শুনি। এই যে ছোট করে বলা বা ক্ষুদ্রকথা, তারও আবার একটা নাম আছে : 'কথানক'—কাহিনী বা কাহিনি শব্দটা নাকি সেখান থেকেই এসেছে। আমরা অবশ্য এখন কাহিনি বলতে গল্প উপন্যাসই বুঝি। হিন্দিতে উপন্যাস বা নভেল অর্থে 'কহানী' শব্দটিই ব্যবহার হয়।

কিন্তু আদিতে তার অর্থ ছিল অন্য রকম। 'কথা'-রও শ্রেণিবিভাগ ছিল। 'কথাসাহিত্য' প্রবন্ধে প্রমথ চৌধুরী আমাদের স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন, কথা চার রকমের হয় : কথা, খণ্ডকথা, পরিকথা আর কথালিকা। খণ্ডকথা বা ক্ষুদ্রকথার অর্থ তো জানলাম। পরিকথা, যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি বলছেন, কথার বিস্তার। কথালিকা শব্দটার অর্থ অবশ্য আমাদের অজানাই থেকে গেল। হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছ থেকেও কোনও দিশা পাইনি। তবে এইটুকু জেনেছি, গল্প আর কথা ঠিক এক নয়।

অভিধানে লেখে, গল্প কথাটা এসেছে 'জল্প' থেকে। গল্পে জল্পনা-কল্পনা মিশিয়ে দেওয়ার সুযোগ অনেক বেশি। যোগেশচন্দ্র বলেন, গল্প 'মানসিক রচনা বা নির্মাণ'। তার ভেতর জল্পনাই অধিক; কখনও কিছুটা 'অসম্বদ্ধ' বা অগোছালো। এই ধরনের গল্পকেই বোধহয় বলে উপকথা বা রূপকথা। ইংরেজিতে 'টেল'। এখন অবশ্য আমরা লোককথা শব্দটাই বেশি ব্যবহার করি। কিন্তু লালবিহারী দে-র 'ফোক টেল্স অফ বেঙ্গল'-এর বাংলা অনুবাদ করতে গিয়ে লীলা মজুমদার 'উপকথা'-ই লিখেছেন। উপকথা আর রূপকথা, যোগেশচন্দ্র বলছেন, গোত্রের দিক থেকে একই। আঞ্চলিক উচ্চারণবৈশিষ্ট্যে রাত যেমন 'আত' হয়ে যায় উপকথারও তেমনি রূপান্তর হয়েছে রূপকথা-য়।

উপকথা/রূপকথা আমাদের আনন্দ দেয়, মনে বিস্ময় জাগায়; কিন্তু সেই কাহিনির ভেতর কার্যকারণের যোগ 'যৎকিঞ্চিৎ'—অন্তত যোগেশচন্দ্র রায় তাই বলছেন। উপকথা, তাঁর মতে, শিশুসেব্য কাহিনি। আগেকার দিনে সাত-আট বছর বয়স পর্যন্ত শিশুরা শোলোক শুনত—তারপর 'উপকথা শুনবার বয়স'। ইতিহাসের উপাদানও উপকথায় নেই বললেই চলে; কারণ স্থানকাল, এমনকি ব্যক্তি-নামের উল্লেখও সেখানে অনেক সময় থাকে না। এক দেশে এক রাজা ছিলেন—এইটুকু বলাই যথেষ্ট। রাজার নাম কী, তিনি কতকাল আগে রাজত্ব করতেন, সেসব নিয়ে কেউ বড় একটা ভাবে না। 'জাতক' কিন্তু তা নয়। সেখানে স্থাননাম এবং ব্যক্তিনাম সাধারণত নির্দেশ করা থাকে; যেমন : বারাণসী নগরে ব্রহ্মদত্ত নাম রাজা অহোসি। দ্বিতীয়ত, জাতকে সমাজচিত্র, রাজধর্ম, মনুষ্যচরিত্র এইসব বিষয়েও একটা বক্তব্য কখনও ব্যক্ত, কখনও বা প্রচ্ছন্ন আকারে পাওয়া যায়। জাতক-কে তাই বলা যায় আখ্যান।

উপকথার সঙ্গে আখ্যানের একটা পার্থক্য এইভাবে বেরিয়ে এল। 'কথা'-র সঙ্গেও উপকথা আর আখ্যানের প্রভেদ আছে। বিদ্যানিধি মহাশয় আমাদের কথার চরিত্রটা ধরিয়ে দিয়েছেন এইভাবে : কথা-য় কিছু সত্য থাকে, উপকথায় কিছুই থাকে না। কথা তাহলে ইতিহাসের কিছুটা কাছাকাছি চলে এল। আজকের দিনের এক অগ্রগণ্য ঐতিহাসিক রণজিৎ গুহ-ও মোটামুটি তাই মনে করেন। কিন্তু সে-প্রশ্নে যাবার আগে আখ্যানবৃত্তান্তটা আমরা সেরে নিই।

'আখ্যান' আর 'আখ্যায়িকা' এই দুটো শব্দই আমরা শুনে থাকি। প্রমথ চৌধুরীর মতে আখ্যায়িকা আর কথা একই—আমাদের দেশের নন্দনশাস্ত্রীরা তাই বলেছেন। ও-দুটো শব্দের গণ ('জিনাস') এক, প্রজাতি বা প্রকার ('স্পিসিস') আলাদা। ইংরেজি শব্দদুটো আমাদের সংযোজন নয়, প্রথম চৌধুরী-ই ব্যবহার করেছেন।

যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধির ব্যাখ্যান অবশ্য একটু অন্য রকম। আখ্যায়িকা-কে তিনি কথা-রই রূপান্তর বলে চিহ্নিত করে দেননি, আখ্যানের সঙ্গে তার কোনও প্রভেদও করেননি। আজকের দিনেও আমরা আখ্যান আর আখ্যায়িকা-কে মোটামুটি একার্থক মনে করি। এবার প্রশ্ন হল : আখ্যান মানে কী? যোগেশচন্দ্রের সংজ্ঞা, আখ্যান হল 'দৃষ্ট বিষয়ের বর্ণনা'। তার মানে আখ্যানে সত্যের ভাগ কিছু থাকে স্বীকার করতেই হবে। তবে আমাদের মতে বর্ণিত বিষয়টি শুধু দৃষ্ট নয়, শ্রুত বা পঠিতও হতে পারে। 'কতিপয় ইংরেজী পুস্তকে' লিখিত কয়েকজন মনীষীর জীবনচরিত অবলম্বনে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর যে-সংকলনটি গাঁথলেন, তার নাম 'আখ্যানমঞ্জরী'। কয়েকটি সত্য কাহিনির সমাবেশ—তার ভেতর জল্পনা-কল্পনা কিছু নেই, বা সামান্য থাকলেও মূল আশ্রয় একটি সত্য কাহিনি। সে-হিসাবে বাণভট্টের 'হর্ষচরিত'-ও আখ্যান। কিন্তু 'কাদম্বরী' তাঁর কল্পনাসৃষ্ট কাহিনি—তাই উপন্যাস।

রবীন্দ্রনাথ 'কথা ও কাহিনী'-তে স্পষ্ট দুটো ভাগ করে দিয়েছিলেন। 'কথা'-গুলির অবলম্বন কোনও প্রাচীন আখ্যান; কিন্তু 'কাহিনী' তাঁর মানসরচিত। প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় 'দেবী' গল্পের আখ্যানভাগ রবীন্দ্রনাথের মুখে শুনেছিলেন, কিন্তু গল্পটি তাঁরই সৃষ্টি। এর অবলম্বন দৃষ্ট নয়, শ্রুত কাহিনি। রবীন্দ্রনাথের 'শ্রেষ্ঠ ভিক্ষা', 'নগরলক্ষ্মী' বা 'পূজারিণী'-র মতো 'কথা'-গুলির অবলম্বনও লিখিত আখ্যান। এই কারণেই আখ্যানকে শুধু 'দৃষ্ট' বিষয়ের বর্ণনা বললে ঠিক হয় না। তার অবলম্বন শ্রুত বা লিখিত কোনও বিষয়ও হতে পারে, রচিত আখ্যানে লেখকের কল্পনাও কিছু মিশে যাওয়া সম্ভব। রবীন্দ্রনাথ যেমন স্বীকার করেছেন, তাঁর 'কথা'গুলির সঙ্গে মূল আখ্যানের 'কিছু কিছু প্রভেদ লক্ষিত হইতে পারে।' রবীন্দ্রনাথ অবশ্য ভূমিকায় তাঁর রচনাগুলিকে কবিতা বলেই অভিহিত করেছেন সে-হিসাবে কল্পনা কিছু থাকতেই পারে। কবিতা বা কাব্য না বললেও আখ্যানে রচনাকারের কল্পনা একটুও থাকে না—একথা আমরা জোর দিয়ে বলতে পারি না। বাণভট্ট বা সন্ধ্যাকর নন্দী একজন রাজাকে নিয়ে যে-আখ্যান রচনা করেছেন, তার ভেতর কি লেখকের কিছু কল্পনা মিশ্রিত হয়ে নেই? এই যুক্তিতেই জাতককে আমরা আখ্যান বলতে চেয়েছিলাম। বহুশ্রুত বা প্রচলিত আখ্যানের সঙ্গে একটু কল্পনা মিশিয়ে লেখা; সে-হিসাবে আবার জাতকের গল্পগুলিকে 'কথা'-ও বলা যেতে পারে।

আখ্যানবৃত্তান্ত এখানেই শেষ হতে পারত; কিন্তু আর-একটা আনুষঙ্গিক শব্দের বিচার বাকি রয়ে গেছে : 'উপাখ্যান'। রামায়ণ-মহাভারতে আমরা দেখি, কোনও-একটা জটিল প্রশ্ন বা সমস্যা উপস্থিত হলে মুনিঋষিরা একটি উপাখ্যান শুনিয়ে তার দৃষ্টান্তের সাহায্যে প্রশ্নটির নিষ্পত্তি করে দেন। এই কারণেই বোধহয় উপাখ্যান বলতে আমরা সাধারণত বুঝি আখ্যানের অন্তর্গত কোনও ছোট কাহিনি। কিন্তু যোগেশচন্দ্র রায় বলেছেন, উপাখ্যানের আদি অর্থ : 'বহুশ্রুত বিষয়ের বর্ণন'। এই অর্থটিরও বাংলায় ব্যবহার আছে। গিরীশচন্দ্র সেন শুধু কোরান নয়, পারসি গোলস্তান পুস্তকটিও বাংলায় অনুবাদ করেছিলেন এবং তার নাম দিয়েছিলেন : 'হিতোপাখ্যানমালা'।

বহুশ্রুত অর্থাৎ বহুকাল ধরে প্রচলিত যে-কাহিনি, মানুষ তাকে সত্য বলেই মনে করে এবং তার দৃষ্টান্ত দিয়ে বর্তমানের কোনও-এক প্রশ্নের মীমাংসা করতে চায়। মিথ বা পুরাণকথা সম্পর্কেও মানুষের প্রায় একই ধারণা। যে-কাল্পনিক কাহিনির সাহায্যে এককালে বিশ্বরহস্য ব্যাখ্যা করতে চাওয়া হয়েছিল, মানুষ বিশ্বাস করে, একদা তা সত্যিই ঘটেছিল এবং বর্তমানের জীবনেও তার প্রভাব রয়ে গেছে। ম্যালিনৌস্কি এইভাবেই মিথ-কে ব্যাখ্যা করেছেন। আর একজন সমাজবিজ্ঞানী আই. এম. লিউয়িস মজা করে লিখেছেন, মিথ হল এক বিরাট মিথ্যাকাহিনি যা বিরাট সত্যের দাবি করে : 'মিথ্‌স প্রোক্লেম গ্রেট ট্রুথ্‌স বাই টেলিং গ্রেট লাইস।' উপাখ্যান কিন্তু ঠিক মিথ্যাকাহিনি নয়। যোগেশচন্দ্র আমাদের সতর্ক করে দিচ্ছেন : আখ্যান-উপাখ্যানে সত্যের ভাগ কিছু থাকে, কিন্তু কথা-য় নয়। মিথের সঙ্গে তাহলে কথা-রই কিছুটা মিল আছে বলতে হবে। এইভাবে ধরে নিতে পারলে আমরা আপাতত একটা মীমাংসায় পৌঁছতে পারতাম, কিন্তু এরপরও কিছু প্রশ্ন থেকে যাচ্ছে।

যোগেশচন্দ্র বলছেন, কথা-য় একতিল সত্য থাকে না; অথচ রামায়ণ-মহাভারতকে তো কথা-ই বলা হয় এবং বিশ্বাসী লোক মনে করে, তা সত্যকাহিনি। রামায়ণ মানে রামচন্দ্রের জীবনচরিত। আর জনমেজয়র সর্পযজ্ঞে বৈশম্পায়ন ঋষি যে-মহাভারত বিবৃত করছেন, তা তো এককালে ঘটে-যাওয়া ঘটনারই বিবরণ—তার ভেতর আবার কথা-আখ্যান-উপাখ্যান সবই আছে। আধুনিককালে রামায়ণ-মহাভারত নিয়ে যাঁরা গবেষণা করেছেন, তাঁদের মত হল, এই দুই মহাকাব্য বহুপ্রচলিত এবং বহুশ্রুত খণ্ড খণ্ড কথা আর আখ্যানেরই গ্রথিত রূপ। বাল্মীকি এবং কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাস রামায়ণ-মহাভারতের একটি রূপ দিয়েছেন; কিন্তু এর বিভিন্ন আঞ্চলিক রূপও আছে। কথা-আখ্যান-উপাখ্যান এইসব জড়িয়ে-মিশিয়েই তো রামায়ণ-মহাভারত। এটা মনে রাখলে কথা-র সঙ্গে আখ্যান-উপাখ্যানের পার্থক্যকে অত স্পষ্টচিহ্নিত করে দেওয়া যায় কি? হিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায় তো একবাক্যে বলে দিয়েছেন, রামায়ণ-মহাভারতে কথা আর ইতিহাস সমার্থক।

ইতিহাস-প্রসঙ্গ এইবার একটু অবতারণার সুযোগ পাওয়া গেল। আজকের দিনে ইতিহাস বলতে আমরা বুঝি পাথুরে প্রমাণ, নথিপত্র বা পুঁথিপুস্তকের ভিত্তিতে রচিত অতীত বৃত্তান্ত আর তার বিচার-বিশ্লেষণ। প্রাচীন ভারতে 'ইতিহাস' শব্দটার অর্থ কিন্তু ঠিক এরকম ছিল না। ইতিহাস = ইতি + অ + আস্—যা এইভাবে ঘটেছিল। বরুণ দে আর রণজিৎ গুহ দুজনেই এই ব্যুৎপত্তি ধরে দেখিয়েছেন, এই কারণেই প্রাচীনকালে আমাদের দেশে লোকে পুরাণ বা রামায়ণ-মহাভারতকে ইতিহাস বলে জানত; আজও বিশ্বাসী লোক তাই মনে করে। এই ধারণার একটা যুক্তিগ্রাহ্য ভিত্তিও আছে। যা এককালে 'এইভাবে' ঘটেছে, তার মধ্যে নিশ্চয়ই কিছু সত্য আছে; বিশেষত যেখানে স্থাননাম, ব্যক্তিনাম, ঘটনাক্রমের সুবিন্যস্ত বিবরণ—সবই পাওয়া যাচ্ছে। সেই ঘটনা বা অভিজ্ঞতার নিষ্কর্ষ যে-সত্য, তাই-ই পরম্পরার ভেতর দিয়ে যুগ যুগ ধরে তার

বার্তা পৌঁছে দিচ্ছে উত্তরপ্রজন্মের মনে। রবীন্দ্রনাথ মহাভারতকে বলেছিলেন 'জাতির স্বরচিত স্বাভাবিক ইতিহাস'; আর রাজশেখর বসুর মতে, এই মহাগ্রন্থ 'পুরাবৃত্ত, ঐতিহ্য ও প্রাচীন সংস্কৃতির অমূল্য ভাণ্ডার'। লোকে রামায়ণ-মহাভারতকে ইতিহাস মনে করে, কারণ এদের মধ্যে ঐতিহ্য (সত্যের ধারণা) আর পরম্পরা (ধারণার প্রবাহ) দুই-ই বিধৃত হয়ে আছে। আর এই নিয়েই তো ইতিহাস।

রণজিৎ গুহ উপকথাকে 'প্রিমিটিভ এলিমেন্টস' বলে ইতিহাস থেকে প্রায় বিযুক্ত করে দিয়েছেন। কিন্তু সত্য বা আদর্শের একটা ধারণা কি এইসব কাল্পনিক গল্পকথা থেকেও বিচ্ছুরিত হচ্ছে না? প্রাচীন ইতিহাস বা নৃতত্ত্বচর্চায় আমরা কি এদের একেবারে উপেক্ষা করতে পারি? রবীন্দ্রনাথ বহুদিন আগেই বলেছিলেন, লোককথায় 'প্রাচীন ইতিহাস, প্রাচীন স্মৃতির চূর্ণ অংশ'-ও কিছু থাকতে পারে। বস্তুত মানুষের বসতিবিস্তার, চাষবাসের পত্তন এইসবের ইঙ্গিত লোককথায় নানাভাবে ছড়ানো আছে। সাঁওতালি পুরাণে ঈশ্বর যে-ভাবে গোত্রবিভাগ নির্দিষ্ট করে একই গোত্রের ভেতর বিবাহ নিষিদ্ধ বলে নির্দেশ দিচ্ছেন, তা থেকে বোঝা যায়, যৌনসম্পর্কের একটা নীতিই ঠিক করে নেওয়া হচ্ছে এইভাবে। মধ্য ভারতে গঁড়দের একটি কথা-য় আছে, কৃষি বলতে তাঁরা বুঝতেন বন পুড়িয়ে চাষ—ঈশ্বর তাঁদের সেই নির্দেশই দিয়েছিলেন। ক্রমে তাঁদের বংশের এক তরুণ যখন লাঙলচাষ শুরু করতে গেল, কুলপিতা তাকে নিষেধ করেছিলেন, কারণ লাঙলচাষে ধরিত্রীমাতার অঙ্গে আঘাত করা হয়। এই গল্প থেকে বোঝা যায়, লাঙলচাষের প্রতি প্রথম দিকে কোনও-কোনও জনগোষ্ঠীর মনে অনীহা ছিল। সেই ঐতিহ্য বহতা ছিল বহুদিন পর্যন্ত। আজ থেকে একশো বছর আগেও উত্তর বাঙলার মেচ, রাভা এবং আরও কোনও-কোনও গোষ্ঠী 'ঝুম' বা বন পুড়িয়ে চাষেই অভ্যস্ত ছিলেন।

ইংরেজদের হাতে পড়ে আমরা টেল, ফেয়ারি টেল, ফেব্‌ল—এইসব শব্দ শিখলাম। পশুপাখিদের নিয়ে যে গল্প, তাই-ই হল ফেব্‌ল। আমাদের দেশের লোককথায় কিন্তু এ রকম কোনও ভাগ নেই। এখানে আমরা দেখি, মানুষ পশুপাখির পাশাপাশি বাস করছে, তাদের মধ্যে কথাবার্তা হচ্ছে, এমনকি ভাব-ভালোবাসাও। এইসব গল্পে যেন মানুষের আদিম আরণ্য জীবনেরই একটা অধ্যায় প্রকীর্ণ হয়ে আছে। তার থেকে আমরা ইতিহাসের কিছু ইঙ্গিতও পেতে পারি।

কথা-উপকথা, আখ্যান-উপাখ্যান সম্পর্কে কিছু কিছু জানা হল। ইতিহাসের সঙ্গে তাদের যোগ-সম্পর্কটাও আমরা একটু খুঁজে দেখলাম। কিন্তু আর ভণিতা নয়। এবার আমরা দুটো গল্প শুনব। দু-ধরনের গল্প।

প্রথমটাকে বলতে পারি ইতিহাস বা ইতিহাসের গল্প; আর দ্বিতীয়টা আখ্যান। আমরা দেখতে পাব, কথা বা আখ্যানের ভেতর যেমন ইতিহাসের ইঙ্গিত থাকে, ইতিহাসও কখনও কখনও গল্পের মতোই হয়ে ওঠে।

১. ইতিহাস : এক স্বাধীনতা-সংগ্রামীর গল্প

বাঁকুড়া জেলার ইঁদপুর থানার এক প্রত্যন্ত গ্রাম, বাথান। সেখানে এখন আমরা আলাপ করতে এসেছি এমন একজন মানুষের সঙ্গে, যিনি একদিকে নিম্নবর্ণ এবং নিম্নবর্গের প্রতিনিধি; অন্যদিকে স্বাধীনতা-সংগ্রামী বলে সম্মানিত। তাঁর জীবনের সঙ্গে আমাদের জানা কোনও স্বাধীনতা-সংগ্রামীর জীবনকে মেলানো যাবে না। তাঁর সংগ্রামী জীবনে কোনও সুবিন্যস্ত ঘটনাক্রম নেই, তেমন কোনও মহৎ গৌরবগাথায়ও যুক্ত করা যাবে না তাঁর জীবনকে। তিনি সরকারের কাছ থেকে তাম্রপত্র পেয়েছেন, আজও সাম্মানিক ভাতা পেয়ে আসছেন; অথচ তাঁর রাজনৈতিক জীবনের কথা শুনতে চাইলে বিচ্ছিন্ন কিছু ঘটনা, অসংলগ্ন কিছু উক্তি, হঠাৎ আবেগের উত্তেজনায় মুখর হয়ে ওঠার পরই ঝিমিয়ে পড়া—সব মিলিয়ে টুকরো একটা ইতিহাস আর কিছুতেই গড়ে উঠতে চায় না। তাঁর অসম্বদ্ধ কথন থেকে আমরা শেষ পর্যন্ত যা পাই, তা তাঁর গায়ের জীর্ণ চাদরটির মতোই ছিন্নবিচ্ছিন্ন।

মানুষটির নাম দুলালচন্দ্র বাউরি। তাঁর বয়স এখন ৮৩ বা ৯০; কারণ জন্মবর্ষ জানতে চাইলে তিনি বলেন : 'বাইশ সাল'। সেটা ১৯২২ না ১৩২২, তা তিনি স্পষ্ট করে বলে উঠতে পারেন না। খ্রিস্টাব্দ-বঙ্গাব্দর কোনও ধারণা তাঁর নেই। ঠিক কোন্ আন্দোলনে তিনি যুক্ত হয়েছিলেন, তা-ও আমাদের বুঝে নিতে হয় তাঁর অসংলগ্ন কথনের সঙ্গে আমাদের জানা ইতিহাসকে মিলিয়ে নিয়ে। দুলালচন্দ্র বাউরি বারবার মহাত্মা গান্ধীজির নাম উল্লেখ করেন। ক্ষুদিরাম, সুভাষচন্দ্র আর মাতঙ্গিনী হাজরার নামও তিনি জানেন; কিন্তু যতবারই তাঁকে জিজ্ঞাসা করি, তিনি কোন্ আন্দোলনে যোগ দিয়েছিলেন? তাঁর একটিই উত্তর : 'মহাৎমাজি বুললেন সকলকে একতা [এক] হতে হবে। বন্দি মাতরম!'

আমাদের তখন উত্তর খুঁজতে হয় অন্য সূত্র থেকে। দুলাল বাউরি বাঁকুড়ায় এসেছেন পরে, তাঁর আদিনিবাস পুরুলিয়া। মানবাজার থানা দখল করতে গিয়ে তিনি ধরা পড়েন এবং ছ মাস কারাবাস করেন। সেটা কি ১৯৪২ সাল? ভারত ছাড়ো আন্দোলন? দুলালচন্দ্রের উত্তর থেকে মনে হয়, 'ভারত ছাড়ো আন্দোলন' কথাটির অর্থ তিনি বুঝতে পারছেন না। 'মহাৎমাজি' ছাড়া আর কিছুই তিনি বলতে পারেন না এবং দুঃখ করে জানান, 'অতবড় একজন নেতা—তিনি শুধু দিল্লিতেই থাকতেন। বাঁকুড়া-পুরুলিয়ায় একবারটি আসেননি।' দিল্লিই যে গান্ধীজির একমাত্র বাসস্থান ছিল না, তিনি যে পুরুলিয়াতেও এসেছিলেন—এই তথ্য গান্ধীশিষ্য দুলাল বাউরির জানা নেই।

আমাদেরই তখন সূত্র ধরিয়ে দিতে হয়, বলতে হয় পুরুলিয়ার গান্ধীবাদী জননেতা নিবারণচন্দ্র দাশগুপ্তর কথা; আর শোনামাত্রই তিনি উচ্চারণ করে যান আরও কয়েকটি নাম : অতুল ঘোষ, বিভূতি দাশগুপ্ত, অরুণ ঘোষ। এতক্ষণে দুলালচন্দ্রকে আমরা চিনে নিতে পারি বিয়াল্লিশের আন্দোলনের এক অখ্যাত সৈনিকরূপে। দু-চারজন সহযোদ্ধার

নামও এবার তিনি বলে দিতে পারেন : রঘু বাউরি, গোপাল মাহাতো, গিরীশ মাহাতো। পুরলিয়ার আঞ্চলিক ভাষা দুলাল বাউরি বিশেষ ব্যবহার করেন না। তাঁদের উদ্বুদ্ধ হওয়ার কাহিনিটি তিনি বিবৃত করে যান এইভাবে :

'আমরা মহাৎমাজির নামে গ্রামে গ্রামে মিটিং করে পাবলিককে বুঝাতাম—বন্দি মাতরম। সকলকে একতা করে শাস্তি করে ইংরেজকে ধ্বংস করতে হবে। মহাৎমাজি বুলেছেন, সকল মানুষ সমান; কোনও বিভেদ নাই। তিনি রাজা জমিদার তালুকদার গরিব সকলকে এক করে বুললেন : ওঠ্‌রে চাষি ভারতবাসী, হিন্দু-মুসলমান/আয় ভাই সব জড়ো হয়ে, দেখ্‌রে ভারত কত মহান। আমরা ভারতমায়ের গর্ভে জন্ম নিয়েছি, স্বাধীনতার জন্যে বুক পেতে দিয়েছি। আজ ভারত স্বাধীনতা [স্বাধীন] হয়েছে। মানুষ দুটি খেতে পাচ্ছে, জলপানিটি পাচ্ছে। স্বাধীনতার জন্যেই তো ইসব হচ্ছে।'....

এরপর দুলাল বাউরি যা বলেন, তা খুবই সংক্ষিপ্ত। ১৯৫৯ সালে তিনি স্বাধীনতা সংগ্রামীর সাম্মানিক ভাতা পান। মাসে ১২০ টাকা। ১৯৬৫ সালে ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধের সময় তা বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। 'পরে ইন্দিরা গান্ধী এসে আবার চালু করল। তাম্রপত্রটি দিল।' এখন ভাতা পান মাসে চার হাজার টাকা। টিপছাপ দিয়ে নিতে হয়। 'লেখাপড়াটি শিখি নাই।' —আমাদের লজ্জায় নতশির করে দিয়ে দুলাল বাউরি হেসে ওঠেন। তাম্রপত্রটি দেখতে চাইলে উদাসস্বরে বলেন : 'ওটি থানায় জমা আছে।'

এই শেষ হয়ে গেল দুলালচন্দ্রর আখ্যান। তাঁর মনে গর্ববোধ আছে; কারোর বিরুদ্ধে কোনও অভিযোগ নেই। এলাকায় জলকষ্ট, বর্ষানির্ভর চাষ। বাউরিদের অনেকেই ভূমিহীন। কিন্তু দুলাল বাউরি কোনও অভাব-অভিযোগের কথা বলেন না। আমরা স্বাধীনতার জন্যে বুক পেতে দিয়েছিলাম—এই একটি বাক্যই তিনি বারবার উচ্চারণ করেন। হয়তো ওটাই তাঁর একমাত্র আশ্রয়। তাম্রপত্রটি থানায় জমা রেখে এসেছেন। কিন্তু স্মৃতিটা তো নিজের মনের মধ্যেই আছে। সেই স্মৃতির সঞ্চয়টুকু নিয়েই বেঁচে আছেন দুলালচন্দ্র বাউরি। তাঁর মুখ থেকে যে-ইতিহাস আমরা শুনি, সে তো একটা অসম্বন্ধ গল্পেরই মতো। একে কি আমরা ইতিহাস বলব, না 'কথা'?

। আখ্যান : কুড়িয়ে পাওয়া গল্প

বিশ্বাস করুন, আমি রাস্তা থেকেও গল্প কুড়িয়ে পেয়েছি। শুধু গাঁয়েগঞ্জে নয়, এই কলকাতা শহরেই। মেডিক্যাল কলেজের পূর্ব দিকে আরপুলি লেন—সেই গলি দিয়ে যেতে গিয়ে একদিন দেখতে পাই, একজন বৃদ্ধ বাঁশ চিরে সরু সরু ফালি বের করছেন আর পাশে বসে ঝুড়ি বুনছেন কয়েকজন মহিলা। দেখে বড় আহ্লাদ হল। এই কলকাতা শহরের গলির ভেতর কুটিরশিল্পের এমন একটা কেন্দ্র—কই, আগে জানা ছিল না তো!

বৃদ্ধের গলায় কণ্ঠিমালা, বয়স প্রায় ৬৫, নাম রামবালক মল্লিক। তিনি জানালেন, বাবার আমল থেকেই তাঁরা কলকাতায় বাস করছেন—সে প্রায় ৭০/৭৫ বছর হয়ে

গেল। দেশ ছিল বিহারের বেগুসরাই। বাঁশের কাজ? হ্যাঁ, ওটাই তাঁদের পেশা। 'এসব ফাইন কাজ আছে। এইরকম বাঁশ ফাঁড়তে কেউ পারবে না; মেসিনও ফেল হয়ে গেছে।'—এই পর্যন্ত বলে বৃদ্ধ আবার নিপুণ হাতে বাঁশ চিরতে শুরু করলেন। চেরা বাঁশের সরু সরু ফালি থেকে কী চমৎকার সোনালিমতো একটা রঙ বেরিয়ে আসে!

বাংলা-বিহারে বাঁশের কাজ করেন প্রধানত ডোম আর মহালিরা। উত্তর কলকাতার রামবাগানে ডোমপাড়ার শিল্পীদের সঙ্গে আমার আগেই আলাপ হয়েছিল। তাঁরা অবশ্য নিজেদের ডোম বলে পরিচয় দেন না; বলেন, আমরা হরিশচন্দ্রবংশ। সেই রাজা হরিশচন্দ্র যিনি সব ত্যাগ করে শ্মশানে চাঁড়ালদের সঙ্গে থাকতেন—জানেন না? রামবাগানের সমীরণ ঘাটি আমাকে সেই জানা গল্পটাই আর-একবার শুনিয়ে দিলেন, তারপর বললেন, 'আমরা সেই রাজার বংশ, বুঝলেন, ডোমফোম নই। ডোম হল ওই যারা মড়া পোড়ায়। আমরা ওদের জন্যে বাঁশ চ্যালা করে দিই, তাই লোকে আমাদেরও ধরে নিয়েছে ডোম। আমরা ডোম হতে যাব কেন?'—সমীরণ ঘাটি বলেছিলেন, তাঁদেরই জাতের এক বুড়ি এই ঝুড়ি-ডালা বোনার কাজটা ভগবানের কাছ থেকে চেয়ে নিয়েছিল, সেই থেকে ওটাই তাদের বৃত্তি হয়ে গেছে।

আরপুলি লেনে যাঁদের দেখতে পাচ্ছি, তাঁরাও কি রামবাগানের শিল্পীদের সগোত্র? হরিশচন্দ্রবংশ? রামবালক মল্লিক পরিষ্কার বাংলায় বলেন, 'না, ওরা আলাদা, আমরা আলাদা। আমরা নন-বেঙ্গলি আছি, লেকিন বাংলা বলতে পারি। রাজা হরিশচন্দ্র? হ্যাঁ, তাঁকেও আমরা মানি। আমরা বলি কাশীমিত্র। তবে আমাদের গুরু সুপন ভগত।'—শুনে আমার বেশ রোমাঞ্চ বোধ হয়। সুপন ভগত ছিলেন এক দলিত সাধক—কোথায় যেন পড়েছিলাম; আর তাঁরই শিষ্যদের আজ দেখতে পাচ্ছি চোখের সামনে। আজ এই গলিতে না ঢুকলে জানাই হত না সে-কথাটা!

বৃদ্ধকে অনুরোধ করি, সুপন ভগত কে ছিলেন তাঁর গল্পটা বলুন। রামবালক বলেন, 'চামারদের গুরু রবিদাসজি, জানেন তো। আর আমাদের গুরু সুপন ভগত। তিনি খুব বড় ঋষি ছিলেন—ভগওয়ানের সমান। কাশীতে তাঁর মন্দির আছে। তার গায়ে 'সুপ'—এই আপনারা যাকে কুলো বলেন—সেই ঝোলানো থাকে। আর কী বলি!'

মহিলারা ঝুড়ি বুনতে বুনতে এতক্ষণ সব শুনছিলেন। এবার তাঁদের জিজ্ঞাসা করি, আপনারা কী কী তৈরি করেন? তাঁরা বাংলা-হিন্দি মিশিয়ে বলেন, কুলা-ডালা ঝুড়ি সব চিজ বানাই আমরা। —শুনে মনে পড়ে যায়, কয়েক বছর আগে মালদহ জেলার দাল্লা বলে এক জায়গায় দেখেছিলাম, কয়েকজন লোক বাঁশ চিরে তাই দিয়ে ছোট্ট ছোট্ট কুলো, ঝুড়ি, ফুল, পাখি এইসব তৈরি করছেন। আমরা তখন ভ্যানগাড়ি চেপে ভেতরের দিকে একটা গ্রামে যাচ্ছিলাম। ভ্যান থেকে নেমে জানতে চাই, এসব কি মেলায় বিক্রি হয়! তাঁরা বলেন, না, মেয়ের বিয়েতে লাগে। মেয়ে যখন শ্বশুর ঘরে যাবে, ডালা ভরে এইসব খেলনা দিতে হয় তার সঙ্গে। —বলেই একটা বাঁশের

ফালি বাঁকিয়ে-চুরিয়ে চমৎকার একটা ল্যাজঝোলা পাখি বানিয়ে তাঁরা তুলে দেন আমার হাতে।

সময়ের অভাবে এর বেশি আর জানা হয়নি। এখন আরপুলি লেনের মহিলা শিল্পীদের কাছে সেই কথাটা তুলতেই তাঁরা হেসে গড়িয়ে পড়েন। তারপর বলেন, ওসব তো আমরাও বানাতে জানি। ঝুড়ি, কুলা, সুরজমুখী ফুল, তোতা, চিড়িয়া— এইসব বড় ডালা ভরে মেয়েকে দিতে হয়। বৃদ্ধ রামবালক এক মিনিটের জন্যেও হাতের কাজ থামাননি। তিনি এবার গম্ভীর হয়ে বলেন, 'শুনুন, আমাদের জাতে ওটা না দিলে মেয়ের সাদি-ই হবে না। এখন শহরে এসব উঠে যাচ্ছে। আমরা অর্ডার পেলে বানিয়ে দিই।' আমি তাঁকে সুপন ভগতের গল্পটার কথা আর-একবার মনে করিয়ে দিয়ে বলি, সুপন ভগত কে ছিলেন? রামবালক মল্লিক বলেন, 'বললাম তো, সে খুব বড় মুনি ছিল। একবার দোরপদীজি (দ্রৌপদী) যজ্ঞ করল। সব মুনিঋষিদের ডাকল; সুপন ভগতকে ডাকল না—'।

রামবালক তাঁর কাহিনি শেষ করার আগেই এক মহিলা বলে ওঠেন, আপনি ইতিহাস লিবেন? সে অনেক বড় ইতিহাস আছে। হামার ছেলে জানে। এই শংকরকে ডাক তো—

বাচ্চারা গিয়ে যাকে ডেকে নিয়ে আসে সেই শংকর মল্লিক বছর পঁচিশের এক যুবক। ক্লাস সেভেন পর্যন্ত ইসকুলে পড়েছেন। পাড়ার ছেলেদের নিয়ে হরিজন সঙ্ঘ বলে একটা ক্লাব করেছেন। সুপন ভগতের যে-গল্প তিনি তাঁর বাবার মুখে শুনেছিলেন, সেই কাহিনিটাই এবার আমাকে বলেন। তাঁর জবানিতেই সেটা অনুলিখন করে দিচ্ছি :

'সুপন ভগত ছিলেন ডোমজাতের একজন ঋষিমতো লোক, মানে তপস্বী। হ্যাঁ, আমরা ডোমজাত; কল্লু ডোমের বংশধর। সেই কল্লু ডোম, যে রাজা হরিশচন্দ্রকে খরিদ করেছিল। রাজা যখন হাটে দাঁড়িয়ে বলছে, আমাকে কে কিনবে বলো, কল্লু ডোম সেখান দিয়ে যাচ্ছিল। সে দেখল, ভাল হট্টকট্টা চেহারা, শ্মশানে মুর্দা জ্বালানোর কাজে লাগালে মন-মন কাঠ বইতে পারবে। তাই সে হরিশচন্দ্রকে কিনে নিল। কল্লু ডোম আমাদের পিতা। তারপর বংশবৃদ্ধি হয়ে আমরা সারা ইন্ডিয়ায় ছড়িয়ে গেছি। আমাদের কাজ ছিল মুর্দা জ্বালানো, মানে শ্মশানে বডি পোড়ানো আর কী! ব্রামহনকে যেমন দক্ষিণা দিতে হয়, আমাদেরও তেমনি চার্জ দিতে হয়। না দিলে বডি পুড়বে না।

লেকিন এখন আমরা বাঁশের কাজটাই করি। আমাদের তাই বলে বাঁশফোঁড়। ওসব একই অছে। আসলে আমি বলি, সব মানুষই এক। তুমি বামুন, তাই উঁচুজাত— ওটার কোনও মানে নেই। মানুষ মানুষ। সুপন ভগত তা-ই বলেছেন।

হ্যাঁ, সুপন ভগত ঋষি ছিল। ও মাছ-মাংস খেত না, দারু পিতো না। সাধনা নিয়ো থাকত। ও আমাদের গুরু আছে। বৈশাখ মাসে পুজো হয়। পুজো মানে আমরা ফটোতে মালা দি। দুধ-বাতাস-সন্দেশ পরসাদ করি। মেয়েরা ডালা দেয়—এই-আর কী।'

আমি মনে করিয়ে দিই : কহানিটা—

শংকর মল্লিক বলেন, 'হ্যাঁ, একবার দ্রৌপদী ঠিক করেছে খুব বড় যজ্ঞ করবে। যুধিষ্ঠির ব্যবস্থা করল। সব মুনিঋষিদের ডাকল, লেকিন সুপন ভগতকে নিমন্তন করল না। মুনিদের ভোজন হয়ে গেছে। এবার যজ্ঞ শুরু হবে; কিন্তু ঘণ্টা আর বাজে না। কত মেহনত করল। ঘণ্টা বাজল না। তখন মুনিঋষিরা বলল, তোমরা সুপন ভগতকে ডাকোনি কেন? যাও, ডেকে নিয়ে এসে।

ভীম ডাকতে গেল। সে ভাবল, ডোমজাতের মুনি—তাকে আবার অত খাতির কী! গিয়ে বলল, লে, চল্—রাজা ডেকেছে।

শুনে সুপন ভগতের মনে খুব লাগল। সে বলল, যাব। তার আগে তুমি এই মালাটা উঠাও দেখি। ভীম কত চেষ্টা করল, মালা ওঠে না। সারা শরীর ঘামে ঘাম। অত বড় বীর, তার সব তাগদ চুরচুর হয়ে গেল। সে তখন সুপন ভগতকে পরনাম করে বলল, তুমি চলো। তুমি নিমন্তন না খেলে ঘণ্টা বাজবে না।

সুপন ভগত যজ্ঞসভায় গিয়ে দেখে, দ্রৌপদী ছাপান্ন পরকার (প্রকার) রান্না করেছে। সব একটা-একটা করে খেতে গেলে অনেক সময় লাগবে। যজ্ঞ শুরু হতে লেট হয়ে যাবে। সে তাই করল কী, সব খাবার একসাথ মিশিয়ে চারটে দলা করে ফেলল। তিনটে দলা খেয়েছে আর অন্দরে বসে দ্রৌপদী ভাবছে, এবার যজ্ঞ শুরু করে দিলেই হয়।

সুপন ভগত বলে, আমি আর খাব না। মুনিঋষিরা হাঁ হাঁ করে বলল, কেন খাবে না? সুপন ভগত বলল, আমি জানি, দোরপদী এই ভাবছে। তখন মুনিঋষিরা বুঝল, সুপন ভগত কত বড় ঋষি আছে। দ্রৌপদী মনে মনে কী ভাবছে, এ-লোক সব জেনে গেছে। তারা অনেক বলেটলে সুপন ভগতকে খাওয়ালো; আর ব্যস, ঘণ্টা বেজে উঠল।

শুনুন দাদা, আমি শুনেছি, আসল মহাভারতে এই কহানিটা ছিল। পরে ব্রামহনরা বাদ দিয়ে দিয়েছে। এই যে টিভিতে মহাভারত দেখাল, কত কী দেখাল, সুপন ভগতকে দেখিয়েছে? দেখায়নি। ডোমজাতের লোক তো—তাই। এর ভেতর অনেক পলিটিক্স আছে, বুঝলেন। এসব যতদিন থাকবে, পৃথিবীতে শান্তি আসবে না। সুপন ভগত বলেছেন, আবার একটা মহাভারতের যুদ্ধ হবে, তারপর শান্তি আসবে।'

শংকর মল্লিক কাহিনি শেষ করলেন। পুরো গল্পটা তিনি বললেন রাস্তায় বসে আর আমাকে বসালেন একটা কাঠের টুকরোর ওপর। এইভাবেই একটা গল্প শোনা হয়ে গেল। যে-সে গল্প নয়। এক প্রতিবাদী আখ্যান। দলিতসমাজ উচ্চবর্ণকে বলছেন, মনে রেখ, আমরা ছোট নই। আমাদের সমাজেও তপস্বী সাধক ছিল, তোমরা তার নাম মুছে দিয়েছ।

শংকর মল্লিকের এই গল্প শুনে মনে পড়ে যায়, প্রায় এই রকমই একটা গল্প শুনেছিলাম মেদিনীপুর শহর থেকে মাত্র চার-পাঁচ কিমি দূরে একটা গ্রামে বসে।

গ্রামটার নাম বেশ মজার : গুড়গুড়ি পাল। গল্পটি যিনি বলেছিলেন, তাঁর নাম চিত্তরঞ্জন রণবাজ। আসলে তাঁদের আদি নিবাস উত্তরপ্রদেশে। প্রায় তিন পুরুষ ধরে বাংলায় থাকতে থাকতে তাঁরা এখন বাঙালিই হয়ে গেছেন। চিত্তরঞ্জন বলেছিলেন, আগে তাঁরা লাঠি-সড়কি খেলতেন; তাই তাঁদের নাম : রণবাজ। এছাড়া দাস, সিং এইসব পদবিও আছে।

বাংলায় লাঠিখেলার ঐতিহ্যটা হাড়ি-ডোম-বাগদিদের মধ্যেই বেশি দেখা যায়; জমিদারি আমলে তাদের ভেতর থেকেই লেঠেল-পাইক নিয়োগ করা হত। রণবাজ-ও কি সেই রকম কোনও জনগোষ্ঠী? চিত্তরঞ্জন বলেন, 'না, আমরা হাড়ি-ডোম নই। আমরা ভগতক্ষত্রিয়। আমাদের গুরু ঠাকুর বালক দাস।'

শুনে চমকে উঠি। উনিশ শতকে মধ্যপ্রদেশে সৎনামী চামারদের নিয়ে আন্দোলন করেছিলেন ঘাসি দাস। এখন বিলাসপুরে তাঁর নামে একটি বিশ্ববিদ্যালয়ও হয়েছে। ঘাসি দাসের পুত্র বালক দাস উপবীত ধারণ করেছিলেন বলে উচ্চবর্ণের লোকেরা তাঁকে হত্যা করে। বালক দাসের সেই বীরত্বগাথা মধ্যপ্রদেশের সীমানা ছাড়িয়ে উত্তরপ্রদেশেও পৌঁছেছিল। শুধু চমর্কার নয়, আরও কোনও-কোনও অন্ত্যজ সম্প্রদায়কেও তা নিশ্চয়ই প্রাণিত করেছিল। আর তাঁদেরই একজন চিত্তরঞ্জন রণবাজকে আমি দেখতে পাচ্ছি মেদিনীপুরের এক গ্রামে।

কালভার্টের ওপর বসে শোনা এই গল্পে আমি দলিত ইতিহাসের একটা খণ্ড খুঁজে পাই। মনে হয়, চারপাশে যাদের দেখি, এ-রকম কত গল্পই না লুকিয়ে আছে তাদের যাচনপরম্পরায়। সে-সব গল্প লেখা হয় না; আর তাই ইতিহাসটাকেও আমরা সম্পূর্ণ আকারে পাই না। গ্রামের পথে কুড়িয়ে-পাওয়া গল্প আমাকে ইতিহাসের সেই ছিন্নসূত্রের একটা ইঙ্গিত দিয়ে যায়।

আর তখন ভাবতে হয়, এই যে কয়েকটা গল্প শুনলাম, এর মধ্যে কোনটা কথা, কোন্টা আখ্যান, কোন্টাকেই বা বলব ইতিহাস? দুলাল বাউরির কাছে তো আমরা ইতিহাস শুনতেই গিয়েছিলাম; কিন্তু শেষ পর্যন্ত যা পেলাম, তা দু-একটা গল্পের টুকরো ছাড়া কিছু নয়। বারাণসী নগরে যেমন ব্রহ্মদত্ত নামে এক রাজা রাজত্ব করতেন, দিল্লি প্রদেশেও তেমনি ছিলেন মহাৎমাজি মহারাজ। তিনি সকলকে বলেছিলেন, একতা হও। বন্দি মাতরম। —এইটুকুই। সতীনাথ ভাদুড়ীর 'ঢোঁড়াইচরিত মানস' বা রাজা রাও-এর 'কন্থাপুর' এই-রকম গল্পের আরও অনেক সুবিস্তৃত এবং শিল্পমণ্ডিত আখ্যান। নিস্তরঙ্গ গ্রামজীবন কেমন আলোড়িত হয়ে উঠছে গান্ধী-নামের জাদুতে।

অন্যদিকে শংকর মল্লিক যা বলেছেন, তাকে আমরা গল্প বলেই ধরে নিচ্ছি; অথচ সেই গল্পের ভেতর থেকেই উঠে আসছে ইতিহাসের দু-একটা প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত। শংকর নিজেও তাঁর কাহিনিকে যুক্ত করে দিচ্ছেন সমকালীন রাজনীতির কূটকৌশলের সঙ্গে। কথা আর আখ্যান, গল্প আর ইতিহাস এইভাবে পরস্পরের সঙ্গে মিলেমিশে যাচ্ছে। কথকরা কেউই তো আর সংজ্ঞা মেনে ইতিহাস বিবৃত করে যাচ্ছেন না। তাঁরা

আসলে গল্পই বলছেন। আর সেই কথনভঙ্গিই সব বর্গবিভাজনকে ভেঙেচুরে ওলটপালট করে দিচ্ছে।

একদিক থেকে দেখলে এ-রকমই তো হবার কথা। কথা-কাহিনি-আখ্যানের সংজ্ঞা আর শ্রেণিবিভাগ কে শুনতে চায়! আসলে মানুষ বোঝে : গল্প। আর গল্প হল ইতিহাসের চেয়েও বড়, এমনকি সত্যের চেয়েও। রবীন্দ্রনাথের 'সে' মনে পড়ছে না? দাদামশায়ের মুখে একটা আজব গল্প শুনে পুপে জিজ্ঞাসা করেছিল : সত্যি কি, দাদামশাই!

দাদামশাই উত্তর দিয়েছিলেন, সত্যের চেয়েও অনেক বেশি—গল্প।

ঋণস্বীকার : যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধির 'গল্প' লেখাটি আছে তাঁর 'কি লিখি' প্রবন্ধ সংকলনে (ওরিয়েন্ট বুক কোং, ১৩৬৩ব)। প্রমথ চৌধুরী 'কথা-সাহিত্য' প্রবন্ধটি লিখেছিলেন সবুজ পত্র (পৌষ ১৩৩৩ব) পত্রিকায়। আমরা পড়েছি বিজিতকুমার দত্ত সম্পাদিত 'সেরা সবুজ পত্র' সংকলনের শেষ খণ্ড থেকে; মিত্র ও ঘোষ, ২০০১। রণজিৎ গুহর বক্তব্যটি পাওয়া যাবে তাঁর 'হিস্টরি অ্যাট দ্য লিমিট অফ হিস্টরি' গ্রন্থে (পৃ. ৫০-৫১); অক্সফোর্ড, ২০০২। আই.এম লিউয়িসের উদ্ধৃতিটি নিয়েছি তাঁর 'সোশ্যাল অ্যানথ্রপলজি ইন পারস্পেকটিভ্স' গ্রন্থ (পৃ. ১২১) থেকে। দুলালচন্দ্র বাউরির সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিয়েছেন কার্তিক বাউরি এবং শৈলেন দাস।

হারানো বইয়ের আশ্চর্য জগৎ

দেবাশিস গুপ্ত

এখনো মায়া রহিয়া গেল।

পুরোনো বই নিয়ে কত রসসিক্ত লেখাই তো আছে। একদম ইদানীংকালের রাধাপ্রসাদ গুপ্ত বা কল্যাণী দত্তর পরম উপাদেয় রচনাগুলির কথা আমাদের স্মৃতিতে এখনো ঝলমলে। প্রাতঃস্মরণীয় বিনয় ঘোষ 'ফুটপাথের বই' লেখায় পুরোনো বইয়ের বাজারকে একদম এফোঁড়-ওফোঁড় করে দেখেছেন। সেই বিনয় ঘোষই অন্যত্র বঙ্গীয় গ্রন্থ সংগ্রাহকদের উপদেশ দিয়েছিলেন তাঁদের সংগ্রহের একটি নির্দিষ্ট চরিত্র বজায় রাখতে। অর্থাৎ সংগ্রহ যদি করতেই হয় বই, তবে ধরা যাক আপনি কেবল সারাজীবন ধরে প্রথম সংস্করণটি সংগ্রহ করে গেলেন অথবা সংগ্রহ করলেন বিশেষ বিশেষ বইয়ের প্রতিটি সংস্করণ অথবা কোনও বিশেষ শতকের প্রতি বছরে মুদ্রিত অন্তত একটি করে বই, এতে ভবিষৎ গবেষকদের অসীম সুবিধে হবে। উপদেশটি অতি সাধু এবং যথার্থ তাতে কোনও সন্দেহ নেই। গবেষণার নিরিখে এই ধরনের সংগ্রহ কতখানি অমূল্য হতে পারে তার একটা আঁচও পাওয়া যাচ্ছে। তবে এই সত্যই বা অস্বীকার করা যায় কিভাবে যে পুরোনো বইয়ের বিচিত্র জগৎ একই সঙ্গে অনন্ত সম্ভাবনা এবং চূড়ান্ত অনিশ্চয়তায় ভরপুর। এই সব সম্ভাবনা আর অনিশ্চয়তাই আপনাকে হতাশ করে আশান্বিত করে। অর্থাৎ সারাজীবন খুঁজেও আপনার উদ্দিষ্ট বইটি নাও পেতে পারেন। আর যদি বা পেয়েই যান গ্রহ-তারার কোনও আশ্চর্য সমাহারে, যদি আপনি গড়েই তোলেন এমন কোনও সংগ্রহ, তাহলেই বা কী হবে? শেষমেশ তো তাদের আশ্রয় হবে কোনও গ্রন্থাগারের নিস্পৃহ এবং শীতল সঙ্ঘারামে 'অমুক-চন্দ্র-তমুক স্মৃতি সংগ্রহ হিসাবে এবং নারকেল দড়ির না-ছোড় বাঁধনে চিরকালের মতো বাঁধা পড়ে থাকবে আপনার সেই 'অমূল্য' সব বই। যদি বা, আপনার উর্ধ্বতন কোনও চতুর্দশ পুরুষের সৌভাগ্যে কোনও সুগম্ভীর গবেষক তা থেকে পেয়েও যান নবতম গবেষণা গ্রন্থের ফুটনোট হবার মতো কোনও টুকরো তথ্য, কিন্তু তখন তো আপনি লোকান্তরিত বা আপনার কি-ই বা যাবে-আসবে যে সেকথা মাথায় রেখে আপনার জীবনের মহার্ঘতম বছরগুলিতে বিস্তর ধুলো ঘেঁটে আপনি আপনার আলমারি ভরে তুলবেন!

অর্থাৎ উদ্দেশ্য এলেই আনন্দ মাটি অথচ আপনি যদি সেই নগণ্যতম জনসমষ্টির একজন হয়ে পড়েন কোনও এক অজ্ঞাত কারনে, যাঁরা পুরোনো বইয়ের রসে আগাগোড়া নিমজ্জিত এবং আধুনিক সাহিত্যতত্ত্ব, নানা বিলিতি পণ্ডিত রচিত রোমহর্ষক জ্ঞানগর্ভ সন্দর্ভ (সময়-অসময়ে আপনার নিজস্ব জমায়েতে যে-সব নাম না আওড়ালে জল-অচল) স্থূলকায় চকচকে পূজাবার্ষিকী কী-যেন-কী পুরস্কার ঘোষণার দড়ি-কলসি গলায় ঝুলিয়ে প্রকাশিত বইয়ের নবতম সংস্করণ এবং বাজার-কাঁপানো প্রচারধন্য সাহিত্যিকদের মুখে তুড়ি মেরে গোটা জীবন ধরে নিজের অজান্তেই একটু একটু করে হয়ে উঠেছেন পুরোনো বাংলা বইয়ের জীবন্ত কোষগ্রন্থ বিশেষ—তাহলেও আপনার জীবনব্যাপী পরিশ্রম যেন নিতান্তই ব্যক্তিগত আনন্দনির্ভর হয়। আপনার এই আনন্দের ফসল যেন অধুনা বহুপ্রশংশিত শীতল, 'পেশাদারি', বিশেষজ্ঞতার পথে অন্তর্নিহিত না হয়। নিজস্ব তথ্য থেকে তত্ত্বে উপনীত হবার জন্য মস্তিষ্কের থেকে হৃদয় যেহেতু অনেক বেশি কার্যকরী, ঠিক কেমন ধরনের বই আপনি পছন্দ করে, দরদস্তুর করে খরিদ করে বাড়িতে নিয়ে যাবেন তা নির্ভর করবে আপনার আকৈশর লালিত কোনও তত্ত্বের ধার-না-ধারা জীবনবোধের ওপর। সোজা কথায় আপনারই নিজস্ব ভালবাসা বা ভাললাগাই আপনাকে পথ দেখাবে। আপনি হয়ত ছেলেবেলা থেকেই নানাবিধ 'অপাঠ্য' বইয়ের পোকা, কিন্তু ছাত্রজীবনে বা আরও সহজ করে বলতে গেলে, রোজগার করে লায়েক হবার আগে পর্যন্ত, নানা আধিভৌতিক এবং আধিদৈবিক কারণে আপনার পছন্দসই বইগুলো যতটা সম্ভব পড়ে না উঠতে পেরে আপনার মনের মধ্যে সেই কবে থেকে একটা জিঘাংসু প্রবৃত্তি কাজ করছে, আপনি তাই এখন দেব সাহিত্য কুটীরের পূজাবার্ষিকীগুলো, কাঞ্চনজঙ্ঘা বা প্রহেলিকা সিরিজের গা-ছমছমে গ্রন্থরাজি, বা নিদেনপক্ষে স্বপনকুমারের গোয়েন্দা দীপক চ্যাটার্জি রতনলালের কীর্তিকাহিনী বর্ণনা করা সেই শীর্ণকায় বইগুলো পেলেই বগলদাবা করে ফেলছেন। এক রাত্তিরবেলা বাড়ি নিঝঝুম হয়ে গেলে সেগুলোকে এক নিঃশ্বাসে গলাধঃকরণ করে কেবল বিপুল আমোদই পাচ্ছেন তা নয়, সেই সঙ্গে নাগাড়ে ফিরিয়ে আনছেন আপনার হারিয়ে যাওয়া ছেলেবেলাকে। পোস্টমডার্ন খোকাখুকুরা আপনার এই আপাত বালখিল্যতা দেখে গোপনে বা প্রকাশ্যেই হাসাহাসি করছে, কারণ তাদের খোঁজ অন্য দিকে কিন্তু তাতে আপনার কী! অথবা, ধরুন আপনি বাংলা পত্র-পত্রিকার দিশাহারা অরণ্যে হাতড়ে হাতড়ে ঘুরে বেড়াতেই পছন্দ করেন। না, আপনার উদ্দেশ্য কেবল মহান লেখকদের পুনরাবিষ্কার নয়, আপনি চান বা না-চান, নানাবিধ আকার ও আকৃতির রচনাবলীতে বা অমনিবাসে তাঁদের অনেকেই ইদানীং সহজলভ্য। তবে এই গ্রন্থাবলী-বিলাসে কিছু অস্বস্তি লুকিয়ে আছে। স্বীকৃত ক্লাসিকরচয়িতাদের বিক্রি গত পঞ্চাশ-ষাট সত্তর-আশি বছর ধরেই ক্রমবর্ধমান। তাঁদের বাদ দিয়ে কিছু অধুনা বিস্মৃত লেখিকার অন্যতর উদ্দেশ্যে পুনরুদ্ধার ছাড়া, কেবল উপভোগের খাতিরে ভুলে যাওয়া রচনাবলী তেমন আর প্রকাশিত হচ্ছে কই? তাহলে তো বনবিহারী মুখোপাধ্যায় থেকে নরেন্দ্র দেব, সৌরীন্দ্রমোহন থেকে শৈলবালা ঘোষজায়া—একদা সাড়া জাগানো সব নাম ফের ফিরে আসত আমাদের হাতে ভিন্নতর মুদ্রণে। থাক্ সে কথা, আপনি, কি আশ্চর্য, আস্তে আস্তে একটু একটু করে ভালবাসতে শিখছেন অতীতের পত্রিকাগুলোর নানা কিসিমের

মাপ, হরেকরকম ছাপা, ধূসর হয়ে যাওয়া ছবি বা এমনকি বিজ্ঞাপনগুলোকেও আপনি দেখে তাজ্জব হয়ে যাচ্ছেন, আপনার চোখের সামনে পরতে পরতে খুলে যাচ্ছে গত একশো-দেড়শো বছরের বাংলা বিজ্ঞাপন, সাহিত্য-সমালোচনা, চলচ্চিত্র বা পাঠকের আলোচনার বিবর্তন। বিস্মিত হচ্ছেন একদা-অকস্মাৎ চমকে-দেওয়া কবেই বিস্মৃত কিছু লেখকের প্রতিভার আশ্চর্য স্ফুরণ দেখে—যেমন মনে করুন, অমূল্যকুমার দাশগুপ্ত ওরফে সম্বুদ্ধ একদা শনিবারের চিঠি, গল্পভারতী, আনন্দবাজার পত্রিকায় যাঁর বেশ কিছু লেখা প্রকাশিত হয়েছিল, যদিও খুব নিয়মিত নয়। আশ্চর্য রুপ-রস-গন্ধে মাখামাখি তাঁর রচনাগুলো, এখন মাথা খুঁড়লেও তাঁর একটা বইও পাবার উপায় নেই। যেসব লেখককে সম্পূর্ণ ভিন্ন ধারার স্রষ্টা বলে আপনি এতদিন মনে করে আসছিলেন, পুরোনো পত্রিকা ঘেঁটে দেখুন কত বিচিত্র পথে তাঁদের বিচরণ। 'মৌচাক' পত্রিকায় গ্রন্থ সমালোচনা করছেন বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, কবিতা লিখছেন মনোবিদ গিরীন্দ্রশেখর বসু, অথবা চতুরঙ্গ পত্রিকায় নাট্য সমালোচনা করছেন গত শতকের পাঁচ না ছয়ের দশকে শম্ভু মিত্র বা রেডিও অনুষ্ঠান সম্বন্ধে লিখছেন অশোক মিত্র—তাঁদের এসব ছোটখাটো রচনা পরবর্তীকালে আলাদা গ্রন্থভুক্ত হবার সৌভাগ্য লাভ করেনি ঠিকই কিন্তু ক্রমপরিবর্তমান সাহিত্যধারার রাজপথের থেকে গলিঘুঁজিতেই তো রোমাঞ্চের আসল রসদ লুকিয়ে থাকে।

আপনি ধরুন রবীন্দ্রনাথের লেখা আর পাঁচজন গড় বাঙালির মতোই টুকরো টুকরো এদিক-ওদিক থেকে এক-আধখানা পড়ে ফেলেছেন, এবং সেজন্য মনের মধ্যে সময়োচিত তৃপ্তিও অনুভব করেন। সেই ছাত্রাবস্থায় 'নদী', 'বন্দীবীর', 'দুই বিঘা জমি' বা 'পুরাতন ভৃত্য' থেকে শুরু করে ভাব-সম্প্রসারণ করার খাতিরে বাধ্যত 'বোলতা কহিল এ যে ক্ষুদ্র মউচাক' এসবই আপনাকে পড়তে হয়েছিল। তারপর গোঁফ গোজানোর পর তাঁর যে খানকয়েক বই চলচ্চিত্রায়িত হবার সৌভাগ্য পেয়েছে সে-সবও আপনার পড়া, কিন্তু সেই বছর ষোলো বয়স থেকে তিনি যে তিন শতাধিক বই লিখে ফেললেন আজীবন প্রাণপাত করে, অধুনাপ্রাপ্তব্য নিরাবরণ রচনাবলীর মধ্যে তার প্রকাশকালীন উত্তেজনা আপনি অনুভব করবেন কী করে, যদি না দিনের পর দিন নানা জায়গার পুরোনো বইয়ের দোকান উথাল-পাথাল করে হাতে তুলে নিতে নিতে জেনে ফেলেন বিশ্বভারতী স্থাপনের আগে পর্যন্ত কতবার কত রকম প্রকাশকের অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে যেতে হয়েছিল তাঁকে? কী চমৎকার সব রেশম কাপড়ে চামড়ায় বাঁধানো বই এক সময় তাঁর প্রকাশিত হয়েছিল যত্ন করে এবং কী আশ্চর্যভাবে চিত্রায়িত করে, তা দেখলে আপনাকে রুদ্ধশ্বাস হয়ে পড়তে হবে। এরপর থেকে আপনি ক্রমশ রবীন্দ্রনাথের বই হাতে পেলেই উল্টে দেখে নেবেন প্রকাশকের নাম, প্রকাশকাল, অথবা দীর্ঘ দিন ধরে একটু একটু করে আপনি সিগনেট প্রেস প্রকাশিত বেশ কিছু বই জোগাড় করতে পারছেন, সেই গত শতকের চারের দশকের মাঝামাঝি থেকে যাদের প্রকাশ, তাদের কিছু যদি হয় গোটা এবং আস্ত, তবে অবধারিতভাবে অনেকগুলো প্রচ্ছদ ছাড়াই। কিন্তু এখনও আপনি তাদের ছাড়া, বাঁধাই, টাইপের এবং

লেখার চারিদিকে ফাঁকা জায়গার সযত্ন সংস্থাপন ইত্যাদি খেয়াল করে বিস্ময়ে হতবাক হয়ে পড়েন, ইদানীংকার বহুপ্রজ ছাপাখানার যুগের ভয়াবহ বিস্ফোরণের পরে তো বটেই। আপনি তরুণ সত্যজিৎ রায়ের করা মলাট দেখে, মাত্র চব্বিশ-পঁচিশ বছর বয়স বা তারও আগে থেকে তাঁর কল্পনাশক্তি এবং মাধ্যমের উপর দখল দেখে বিস্ফারিত-চক্ষু হতবাক তাজ্জব হয়ে পড়বেন।

মনে করুন আপনি উপরোক্ত ধারাগুলোর একটি অথবা সবগুলোই অথবা যখন-যেমন ইচ্ছে বই সংগ্রহ করতে অভ্যস্থ। আর সংগ্রহ করেন মানে কিনে বাড়ি নিয়ে রোদ খাইয়ে, ভেতরে নিমপাতা আর কালোজিরে দিয়ে আলমারিতে সেগুলোকে শিরদাঁড়া দাঁড় করিয়ে রেখেই অহমিকায় যথেষ্ট সুড়সুড়ি দেওয়া হল মনে করে আপনার কর্তব্য শেষ করেন না, নিত্য তাদের সঙ্গে আপনার সহবাস। চায়ের দোকানে বা অন্যত্র বন্ধুদের আড্ডায় যখন-তখন তাদের নামাবলী উচ্চারণ করে বন্ধুবর্গকে আপনার প্রতি নিয়ত শ্রদ্ধাশীল করে তোলার বাসনা আপনার নেই, আপনি চান আপনার ভালবাসা আপনারই একান্ত হয়ে থাকুক, কেউ যেন তাতে ভাগ না বসায়, আপনি মানেন সমমনস্ক বান্ধব আপনি হয়ত আজীবন না-ও পেতে পারেন। বাংলাভাষা, আরও বড় করে বলতে গেলে বাংলা সাহিত্যের প্রতি আপনি অহেতুকী প্রীতিপরায়ণ। এজন্য আপনি বিস্তর কষ্ট সহ্য করেছেন এবং এখনও করে চলেছেন। ধুলো ঘেঁটে ঘেঁটে আপনার বারোমাস সর্দি, কাঁধের ব্যাগ বইয়ের ভারে জীর্ণ এবং উপরন্তু ক্রমান্বয়ে উক্ত বোঝা বহন করে আপনি শিরদাঁড়ার ব্যামোতেও ভুগছেন। এজন্য আপনাকে অনেক ত্যাগও করতে হয়েছে এবং হতেই থাকবে যেহেতু আপনার পিতৃদেবের তেলকল নেই, এক বাধা রোজগারের মধ্যে আপনাকে সংসার চালাতে হয়। আপনার টিফিন খরচে টান পড়েছে কারণ ইদানীংকার পুরোনো বই বিক্রেতারাও, স্বাভাবিকভাবে এবং অত্যন্ত ন্যায্যত, আর আগের মতো শস্তায় আপনি আপনার পছন্দসই বইটি গস্ত করেন না। আর আপনি তো জানেনই সেখানকার বাজারে বিনিময়মূল্যের ধরনটাই একেবারে আলাদা, প্রকৃত কাব্যের মতো আপনাকে তা সংবেদী মন নিয়ে অনুভব করতে হয়, খরচাপাতির পরিচিত অস্ত্র সেখানে সচল। বাড়িতে আপনি যে দিনের পর দিন ধরে এইসব 'জঞ্জাল' জড়ো করছেন তার জন্য আপনাকে স্মরণাতীত কাল থেকে অকথ্য গঞ্জনা সহ্য করতে হয়েছে এবং এখনও হয়। আপনার পোশাক জীর্ণপ্রায়, আপনি সপরিবারে বছরে দুবার সমুদ্রতীরে সাপ্তাহান্তিক অবকাশ যাপন বা পাহাড়ে 'ট্রেকিং' করতে পারেন না, আপনার ভাল লাগে না এবং এতদ্দ্বারা আপনি সংসারের প্রতি আপনার কর্তব্যপরায়ণতা থেকে চ্যুত হচ্ছেন। আপনার ইহজীবনের একমাত্র অভিভাবকের সঙ্গে পথে ঘুরে বেড়াবার সময় একটি পছন্দসই বই চোখে পড়ার পর আপনি হৃদিমাঝে একটি ক্ষুদ্র বাঁদরশিশুর লাফঝাঁপ অনুভব করতে করতেও দেখতে-আমি-পাইনি-তোমায় ভাব করে স্থানান্তরে গমন করেন কেবলমাত্র। পরের দিন দ্বিধাদ্বন্দ্বের ক্রমান্বয় নাগরদোলায় দুলতে দুলতে আবার সেখানে রুদ্ধশ্বাস উপস্থিত হতে হয়। কারণ সময় বিশেষে চেনা পুস্তকবিক্রেতাকে চোখের ঈশারা করে বইটি রেখে দিতে

না ইঙ্গিত করলে সেটি বেহাত হবার আশু সম্ভাবনা, কারণ আপনি না চাইলেই বা কী, আপনার মতো কিছু উন্মাদ তো এখনও এই দুর্দিনেও, ইতিউতি ঘুরে বেড়াচ্ছেন।

এতসব জীবনব্যাপী অ্যাডভেঞ্চার সামলে আপনি সারাজীবন ধরে যে কখানি বইপত্তর জোগাড় করেছেন সে কি কেবল এই বাসনা চরিতার্থ করার জন্য যে এতে ভবিষ্যতের হাঁড়িমুখো গবেষকদের কাজের সুবিধে হবে! আপনি এমন উদারহৃদয় হতেই পারেন কিন্তু আমায় যদি প্রশ্ন করেন, আমি কদাপি আপনার মতে সময় দিয়ে মাথা নাড়াব না।

আজ থেকে বছর বিশেক আগে চার্চ লেনের গির্জের দেওয়ালে সারি সারি বইয়ের মাঝে রবীন্দ্রনাথের 'জীবনস্মৃতি' বইটি দেখতে পাই। এ বইয়ের চেহারা ঠিক চিরপরিচিত সংস্করণগুলির মতো নয় এবং দেখলেই বোঝা যায় বইটি বেশ প্রাচীন। যদিও মলাট খসা, পাতা দোমড়ানো, শিরদাঁড়া মচকে যাওয়া ইত্যাদি 'পুরোনো বইয়ের পরিচিত সমস্যাগুলোর কোনওটাই ছিল না। হাতে তুলে নিয়ে উল্টেপাল্টে দেখে, 'বাড়িতে রবীন্দ্ররচনাবলীর মধ্যে জীবনস্মৃতি তো আছেই, তবে আর কেন?' জাতীয় বেপরোয়া মনোভাব নিয়ে বইটিকে নামিয়ে রেখে চলে আসি। কিছুটা পথ চলে আসার পর মনের মধ্যে অহেতুক খুঁতখুঁত অনুভব করি বইয়ের মধ্যে সাদা-কালোয় কয়েকটি আঁকা ছবির কথা মনে করে। দোলাচলে পীড়িত হতে হতে আরও বেশ কিছুদূর এসে পড়ার কারণে ফিরে যাবার উপায় থাকে না, মন কিন্তু খুঁতখুঁত করতেই থাকে। তখন কি আর হৃদয়ঙ্গম করেছিলাম যে সে বই আদি ব্রাহ্মসমাজের প্রেসে ছাপা 'জীবনস্মৃতি'র ১৩১৯ সনের প্রথম সংস্করণ! আর ছবিগুলো, সাদা-কালো-কালি তুলিতে আঁকা ছবিগুলো স্বয়ং গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুরের। এই বইতে তাঁর আঁকা খানকুড়ি ছবি আছে যার অনেকগুলোই সম্ভবত পরবর্তীকালে আর কোনও বইতে ছাপা হয়নি। পরে সে বই আবার দৈবাৎ সংগ্রহ করা গেছে বটে কিন্তু তখন তার প্রচ্ছদ নেই, পেছনের কয়েকটি পৃষ্ঠা উধাও এবং প্রতি ছবির ওপর, তখনকার রেওয়াজ অনুযায়ী পাতলা কাগজের যে আস্তরণ থাকত সেগুলি নির্দয়ভাবে ছেঁড়া সম্ভবত প্রাক্তন অধিকারীর গৃহের শিশুটির মানচিত্র অঙ্কন প্রচেষ্টার দায় মেটাতে গিয়েই।

বস্তুত বারে বারে এবং হাড়ে হাড়ে নানারকম শিক্ষা পেতে পেতেই আমরা পুরোনো বইয়ের পাওনা মর্যাদা দিতে কিছুটা হলেও শিখেছি। কীভাবে সংস্করণ থেকে সংস্করণে বইয়ের রূপ পাল্টে যায়, কোথায়, কেমন করে কি কি পরিবর্তন করেছেন লেখক, আপস করেছেন প্রকাশক, জিনিসপত্রের দাম বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে এবং কাগজের ক্রমবর্ধমান দুর্মূল্যতার কারণে কীভাবে একই বই তার প্রাক্তন দৃশ্যগৌরব হারিয়ে নিতান্ত ম্যাড়ম্যেড়ে বা সস্তা চাকচিক্যময় হয়ে হাড় জ্বালিয়ে দিয়েছে তা বুঝে মৃদু অনুরণনের স্বাদ পাওয়া একটা সময়ের পর ভয়ংকর জরুরি মনে হয়। পুরোনো বইয়ের বাজারে নিয়মিত ঘোরাঘুরি করলে সাপ-লুডোর সিঁড়ি দিয়ে অকস্মাৎ উত্তরণের মতো, লাফিয়ে লাফিয়ে বেড়ে ওঠা এক ধরনের সমান্তরাল তথ্যভাণ্ডার আপনিই

তৈরি হয়ে যেতে থাকে, যার অনেকটাই জন্তুর মতো অনুভূতিনির্ভর। তার জন্য সময়ে সময়ে স্বাভাবিকভাবে ব্যর্থও হতে হয়। চোখের সামনে, আক্ষরিক অর্থেই মাত্র দশ সেকেন্ড আগে এসে একই ব্যক্তিকে বেশ কয়েকবার পছন্দসই বই হাতিয়ে নিয়ে যেতে দেখার অভিজ্ঞতা হলে সেই ব্যক্তিটিকে নিজেরই প্রতিস্ব বলে ভেবে নিয়ে সান্ত্বনা পাবার বৃথা চেষ্টা করতে হয়। তবে সত্যজিৎ রায়ের 'রতনবাবু ও সেই লোকটা' গল্পের রতনবাবুর মতো মনের অবস্থাও যে থেকে থেকে হয়নি এমন নয়। অর্থাৎ সিঁড়ি দিয়ে উঠে খামোকা সাতানব্বইয়ের ঘরে পৌঁছবার পর সাপের মুখে পড়ে আটাশে নেমে আসার সম্ভাবনা থেকেই যায়।

তবে সুখস্মৃতিও কি নেই? নিশ্চয়ই আছে, সকলেরই থাকে। তার দু-একটি উল্লেখ করলে সেম-কৌমের লোকেরা আনন্দ পেতে পারেন। কলেজ স্ট্রিটের এক চেনা দোকানদার ইঙ্গিতে ফুটপাথে দাঁড় করানো নারকেল দড়ি দিয়ে বাঁধা বেশ এক লম্বাচওড়া বইয়ের বান্ডিল দেখালে তৎক্ষণাৎ কাঁধের ঝোলাটিকে নামিয়ে রেখে দড়ি খুলতে ব্যস্ত হয়ে পড়ি। অন্তত শ'পাঁচেক ছোট বা মাঝারি আকারের বই, তিনের দশকের উঠতি লেখকদের সংখ্যাই বেশি। গা ঘেঁষাঘেঁষি করে পাশাপাশি বুদ্ধদেব বসু, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, প্রেমেন্দ্র মিত্র, প্রবোধকুমার সান্যাল, সুবোধ ঘোষ, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় এবং মানিক বন্দোপাধ্যায়ের সব প্রথম সংস্করণ, বেশ কিছু গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এবং কবিতা ভবনের ছাপা বই। খানকয় বার্ষিকী যার মধ্যে কবিতাভবন প্রকাশিত 'বৈশাখী'ও ছিল। এবং সেই সঙ্গে অজস্র হেমেন্দ্রকুমার রায় এবং শিবরাম চক্রবর্তীর প্রথম দিকের বই। একসঙ্গে এত বিপুল সংগ্রহ এর আগে কখনও চোখে পড়েনি, পরেও নয়। এবং কী আশ্চর্য, এই সব বইয়েরই প্রাক্তন মালিক জনৈক ভদ্রলোক, যিনি ১৯৪৮ থেকে ১৯৫০ সালের মধ্যে এই সবগুলো বই-ই কিনেছেন। এর মধ্যে ছিল শিবরামের দ্বিতীয় কবিতার বই, ১৩৩৬ সনে ছাপা 'মানুষ', এর মধ্যেই ছিল হেমেন রায় এবং শিবরামের কিশোরপাঠ্য বেশকিছু বই যার অধিকাংশই আগে পড়া ছিল না, এমনকি নামও জানার সুযোগ হয়নি। এহ বাহ্য, আরও অনেক বিস্ময় যে আমার জন্য অপেক্ষা করে আছে তা দিন কয়েক পরে বোঝা গেল যখন 'মানুষ' বইখানির পাতা উল্টোতে গিয়ে ভিতরের দিকে সূচনাপত্রের পরের সাদা পাতাটিতে দেখলাম গোটা গোটা চমৎকার হস্তাক্ষরে একটি আস্ত কবিতা :

কবি নজরুল ইসলাম
সুহৃদবরেষু—
আধুনিক সাহিত্যের উদয় শিখরে
হে বন্ধু তোমার আবির্ভাব!
তোমারে যা দিই হয়তো তাহার কিছু
তোমারি নিকটে মোর লাভ।
শিবরাম
১/১২/২৯

এক্ষেত্রে অকস্মাৎ বজ্রাহত হয়ে যাওয়া ছাড়া উপায় নেই। আমিও বলা বাহুল্য তাই হয়েছিলাম।

'আবহ' পত্রিকার ১৩৮০ সনের শারদ সংখ্যাটি হস্তগত হয়েছিল কয়েক বছর আগে। 'সৌজন্য সংখ্যা' ছাপ মারা পত্রিকার সেই কপিটিতে প্রথম গল্প 'অজ্ঞাতনামার নিবাস'—লেখক কমলকুমার মজুমদার। ছাপা গল্পে সরু কলমে লাল কালির নিটোল হস্তাক্ষরে অজস্র ছাপার ভুল সংশোধন করে দেওয়া, মাঝে মাঝে মুদ্রিত শব্দের বদলে অন্য শব্দ সংযোজন, কখনও প্রুফ সংশোধন করার আদলে গোটা গোটা ছত্র বাদ দেওয়া হয়েছে বা আস্ত বাক্য সংযোজিত হয়েছে। ভাবতে ইচ্ছে হয় যে এই সংযোজন-বিয়োজনের কর্তা স্বয়ং কমলকুমার মজুমদার। তাঁকে এবং তাঁর হাতের লেখাকে চিনতেন এমন কাউকে বইটি দেখিয়ে সন্দেহ নিরসন করার ইচ্ছে বহুবার হয়েছে। কিন্তু নিজেকে সামলে রেখেছি—কিছুটা রহস্যের আবরণ থাকা ভালই, এমন মনে করে।

কলকাতা শহরে বেশ কয়েকটি জায়গায় বাঁধাধরা পুরোনো বইয়ের বাজার আছে। রসিকরা তার খবর রাখেন এবং সময়ে-অসময়ে নিত্য হানা দিয়ে থাকেন। এরকমই একটি আখড়া থেকে হলুদ পাতলা কাগজে বাঁধানো একটি ছোটমাপের বই একসময় হাতে আসে। ১৩০৪ সনে গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় প্রকাশিত এবং সাহিত্য প্রেস মুদ্রিত বইটির নাম 'আলিবাবা রঙ্গনাট্য'—লেখক ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ। এই নাটক এবং তার গানগুলোর এককালীন জনপ্রিয়তা সম্বন্ধে কিছু বলার নেই। বইটির তৃতীয় পাতার মাথার দিকে কালো কালিতে পরিষ্কার হাতের লেখায়, 'শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র ঘোষ মহোদয়কে ভক্তির নিদর্শন স্বরূপ অর্পিত হইল—গ্রন্থকার' বাক্যটি দেখে আশ্চর্য লেগেছে—সেই বিস্ময়বোধ মনের মধ্যে এখনও কাজ করে।

এখানেও কিন্তু একটু, যাকে বলে, 'সাসপেনশন অব ডিসবিলিফ' থেকেই যায়। পরবর্তীকালের হাবা গ্রন্থপ্রেমিকটিকে ল্যাজে খেলানোর জন্য কেউ মর্মান্তিক রসিকতা করেনি তো! কমলকুমার বা অমৃতলাল—কারুরই হস্তলিপির সঙ্গে পরিচয় না থাকার কারণেই, বলা বাহুল্য, এমত ধাঁধা লেগে যাওয়া। এরকম আরও হয়েছে—কখনও প্রসিদ্ধ গীতিকার অজয় ভট্টাচার্যর দু-তিনখানি বইতে, কখনও তস্য অনুজ কবি সঞ্জয় ভট্টাচার্যর 'পূর্বাশা' পত্রিকার উৎসর্গলিপিতে।

বিখ্যাত ব্যক্তিদের কথা থাক। আপনার-আমার সবার কাছেই, যাঁরা পুরোনো বইয়ের দোকানে নৈমিত্তিক হানাদার, এরকম এক-আধখানা বই থেকে যেতেই পারে। আমার নিজস্ব অভিমত, নিতান্ত সাধারণ মানুষজনের লেখা উৎসর্গপত্র অনেক বেশি আকর্ষণীয়, অনেক নিবিড় স্মৃতিমেদুর। আশুতোষ ধরের সম্পাদনায় (পরে অবিশ্যি আরও অনেকে সম্পাদনা করেছিলেন) আশুতোষ লাইব্রেরি কলকাতা এবং ঢাকা থেকে একযোগে ছাপতেন 'শিশুসাথী' পত্রিকা ১৩৪৯, ইংরেজি ১৯৪২ সালের 'বার্ষিক শিশুসাথী'-র যে কপিটি আমার কাছে আছে তার মধ্যে হাতে লেখা উৎসর্গলিপিটি আমাকে অনেক সময়ই সেইসব হারিয়ে-যাওয়া দিনের স্বাদ তারিয়ে তারিয়ে নিতে

প্রলুব্ধ করেছে। কলমে লেখা হত বলে তখনকার দিনের অনেক মানুষের হাতের লেখাতেই একটি চমৎকার ক্যালিগ্রাফিক ছাঁদ থাকত, বইতে ঠিক তেমন টানা হস্তাক্ষরে এই কথা ক'টি লেখা আছে:

বেণু,

তোমার প্রথম হাতের লেখা পত্র পেয়েছি। বেশ সুন্দর লেখা হয়েছে। মন দিয়ে লেখাপড়া করো। বড়ো হয়ে যখন বড় বড় লেখা লিখ্‌বে—তখন সকলে দাদুর মত আনন্দে তোমার লেখা পড়বে।

আমরা ভাল আছি—তুমি, রেবা, অনু, মিনু ও ছোটকী, মা, বাবা এবং বাড়ির সকলে আশা করি ভাল আছো।

গোচারণ ইতি

২৩শে মাঘ, ১৩৪৯ 'দাদু'

১৩৫৬ সনে বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রকাশ করেছিল বনফুলের ব্যঙ্গ কবিতা সংকলন 'করকমলেষু'। মোক্ষম সব ছড়া এবং কবিতা আছে এই বইতে। সে রসের রসিক যাঁরা তাঁরা জানেন সেসব কবিতার আবেদন কতদূর। ভূমিকায় বনফুল জানাচ্ছেন, 'বনফুলের কবিতা' বইটি নিঃশেষিত হওয়ায় এই পরিবর্দ্ধিত সংস্করণ তিনি প্রকাশ করছেন। উল্লেখ্য, 'বনফুলের কবিতা' বইটি সজনীকান্ত দাসের 'রঞ্জন পাবলিশিং হাউস' ছেপেছিল এরও বিশ বছর আগে, ১৩৩৬ সনে। আমি অবশ্য এই দুটি সংস্করণের কোনও তুলনামূলক আলোচনা করছি না। স্পষ্টত কোনও বিবাহের উপহার হিসেবে ব্যবহৃত বইয়ের প্রথম পাতায় রাবীন্দ্রিক ছাঁদে কালো কালিতে লেখা

"এ শুভ লগনে জাগুক গগনে অমৃতবায়ু
আনুক জীবনে নবজনমের অমল আয়ু।"

সাবিত্রী, শান্তিদি, রমা ও সতী,

১৩১৯ সালে অমৃতলাল বসুর সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়েছিল 'বীণার ঝংকার'—এ বইয়ের সম্বন্ধে পরে বলছি, আপাতত শুধু হাতে লেখা উৎসর্গলিপিটুকু

'শ্রীমতী কালীদাসী'র করকমলে
প্রদত্ত হইল,
'শ্রীহতভাগ্য'

৫/১১/২০

এর থেকে নিজের মতো করে গল্প ভেবে নেওয়া আশাকরি খুব একটা কঠিন হবে না।

কিছু পুরোনো বই যা গত সিকি শতাব্দীর চেষ্টায় জোগাড় করা গেছে তাতে উনিশ শতক-আদি বিশ শতক ঘুরে বেড়ালে প্রথমেই চমক লাগে মুদ্রণযন্ত্রের নাম

শুনে। সূর্য্যোদয় যন্ত্র, বুধোদয় যন্ত্র, নূতন সংস্কৃত যন্ত্র, ভিক্টোরিয়া প্রেস, আদি ভিক্টোরিয়া প্রেস, আদি ব্রাহ্মসমাজ যন্ত্র, ব্রাহ্মমিশন যন্ত্র—কত রকমারি তাদের নাম! রবীন্দ্রনাথের লেখকজীবনের গোড়ার দিকের বইগুলো ছাপা হচ্ছে আদি ব্রাহ্মসমাজ যন্ত্রে এবং তারও আগে বাল্মীকি যন্ত্রে। যেমন 'ভগ্নহৃদয়' (১৮৮১) এবং 'রুদ্রচন্দ্র' (১৮৮১)। যে-কোনও প্রথম শ্রেণীর প্রাচীন পাঠাগারে গিয়ে উৎসাহী পাঠক এ বিষয়ে গভীরতর জ্ঞান লাভ করতে পারেন। ফুটপাথে লাট করে বাঁধা প্রাচীন বইয়ের সারির মধ্যে থেকে হঠাৎই যখন হাতে উঠে আসে ১৮৬৯ সালে হুগলির বুধোদয় যন্ত্রে ছাপা রামগতি ন্যায়রত্নের 'রোমাবতী' নামক আখ্যায়িকা, বা 'সেকালের দারোগার কাহিনী'-খ্যাত গিরিশচন্দ্র বসুর ১২৯২ সনে মুদ্রিত 'ইংরেজ চরিত্র বা জন বুল', যেখানে তিনি সকৌতুক মন্তব্য করেছেন, "ইংরেজ রমণী বর্ণ ও স্থিরগম্ভীর মূর্তির জন্য জগৎবিখ্যাত। কিন্তু তাহাদের সুদীর্ঘ শ্রীচরণ (ফুট) দুখানি দেখিলে মনে হয়—ইংল্যান্ডে ১২ ইঞ্চিতে যে এক ফুট তাহা যথার্থ। সুন্দরী ইংরেজ রমণীর তুলনা জগতে নাই, তাহারা এক-একটি পরী বিশেষ। কিন্তু বিধির কি বিড়ম্বনা, কুসুমেও কণ্টক, চন্দ্রেও কলঙ্ক—তাহাদের মুখাবয়ব ভাবশূন্য, চক্ষু জ্যোতিহীন, দন্ত উচ্চ—এত উচ্চ যে হাসিলে গন্ডারের ন্যায় মাড়ি বাহির হইয়া পড়ে। তাহাদের কেবল যৌবনের জারি।' অথবা সেকালের ঘোরতর বুদ্ধিজীবী অক্ষয়কুমার দত্তের ১৭৮২ শকাব্দে (ইং ১৮৬০) ছাপা 'বাহ্য বস্তুর সহিত মানব প্রকৃতির সম্বন্ধ বিচার' বইয়ের দুটি ভাগ বা কখনো ১২৯৭ সনে ১২৭ নং মসজিদবাড়ি স্ট্রিটের 'সমুন্নত সাহিত্য প্রচারী কোং-এ ছাপা শ্রী প্রাণনাথ প্রেমিকরতন প্রণীত 'ভালোবাসা' নামক সবুজ পাতলা কাগজে ছাপা উন্মার্গামিতার সমস্ত লক্ষণ প্রকাশ পাওয়া বইটি—তখন সেই কীটদষ্ট পৃষ্ঠা, বইয়ের পাতায় লুকিয়ে থাকা সূক্ষ্ম ধুলোয় নাকের মধ্যে বিচিত্র অনুভূতি, কলকাতার রাস্তার ঊর্ধ্বশ্বাস কোলাহল—এ সমস্তই উধাও হয়ে যেতে বাধ্য।

সে কথা থাক। গল্প-কবিতা-প্রবন্ধ-উপন্যাস চিরকাল লেখা হয়ে এসেছে, ভবিষ্যতেও হতে থাকবে। আকর্ষণ অনেক বেশি প্রবল হয় যখন মাঝে মাঝে হাতে এসে যায় অন্যরকম কিছু বই। ইন্দুমাধব মল্লিকের ইক্‌মিক্ কুকার, সবাই জানেন, একসময় খুব কাজের যন্ত্র ছিল। গত শতাব্দীর তিন-চার শতকের গল্প উপন্যাসে তার অনেক উল্লেখ আছে। সেই ইকমিক কুকার বাজারে আসার পর তাকে পরিচিত করার জন্য 'বৈজ্ঞানিক পাক্‌প্রণালী' নামক একটি ক্ষুদ্রাকৃতি বই লিখেছিলেন ইন্দুমাধব নিজেই এবং বইয়ের ভূমিকা লিখেছিলেন প্রজ্ঞাসুন্দরী দেবী, রন্ধনবিশারদ হিসেবে যাঁর খ্যাতি একাল পর্যন্ত চালু।

কুন্তলীন পুরস্কারের কথা আপনি বার বার শুনেছেন। ১লা বৈশাখ ১৩২৭ (ইংরেজি ১৯১০) এইচ্ বসু, পারফিউমার কলকাতার দেলখোস হাউস্ থেকে প্রকাশ করেছিলেন কুন্তলীন পুরস্কারের 'দ্বাদশ প্রথম'—অর্থাৎ ১৩০৩ থেকে ১৩১৫ পর্যন্ত প্রতি বছরের কুন্তলীন প্রথম পুরস্কারগুলি জিতে নেওয়া সমস্ত গল্প সাজিয়ে এই বই।

দাম বারো আনা। টুকটুকে লাল কাপড়ে বাঁধাই ক্ষুদ্রাকৃতি বইটি দেখলেই মন ভাল হয়ে যায়। সাত্যি কথা বলতে কি এত নয়ন-সুশোভন বই কদাচিৎ নজরে পড়ে—এমনই অনাড়ম্বর কিন্তু উজ্জ্বল তাঁর রূপ। হালকা লাল রঙের কাগজে ছাপা এ বইয়ের প্রথম গল্প 'নিরুদ্দেশের কাহিনী', লেখকের নাম নেই। গল্পের শেষে সম্পাদকীয় মন্তব্য—'এই উৎকৃষ্ট গল্পের লেখক নাম প্রকাশ করেন নাই, কিন্তু তাঁহার ইচ্ছানুসারে পুরস্কার (৫০ টাকা) সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের অন্তর্গত রবিবাসরিক নীতি-বিদ্যালয়ে দেওয়া হইয়াছিল। সেই বৎসরের নিয়মাবলীতে রচনাকারীর নামোল্লেখ সম্বন্ধে বিশেষ কোনও নিয়ম না থাকায় আমরা বাধ্য হইয়া এই পুরস্কার দিয়াছিলাম।' আমরা জানি উক্ত গল্পলেখক জগদীশচন্দ্র বসু। তৃতীয় বছরের পুরস্কার পাচ্ছেন পরবর্তীকালে রবার্ট ব্লেক খ্যাত দীনেন্দ্রকুমার রায়—যদিও এখানে তাঁর গল্পটি, যাকে বলে, সামাজিক। গল্পের নাম 'বিধবা'। অষ্টম বছর অর্থাৎ ১৩১০-এর প্রথম পুরস্কার পেয়েছেন ভাগলপুরের বাঙালিটোলার বাসিন্দা সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, গল্পের নাম 'মন্দির'। মাতুলের বকলমে ছাপা শারৎচন্দ্রের এই প্রথম খ্যাত গল্পটির কথাও আমরা কালক্রমে জেনে গেছি। এর ঠিক পরের বছরের পুরস্কার পাওয়া গল্পটির নাম 'শাস্তি'—লেখক সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়। পরে এই গল্পটির নামে তাঁর একটি বইও বেরিয়েছিল। এই চারজন ছাড়া বাকি লেখকরা সকলেই এখন বিস্মৃত।

এরকম সুসজ্জিত আরেকখানি বইয়ের কথা বলি। গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় অ্যান্ড সন্স অপরাজিতা দেবী এবং রাধারানী, দুজনের লেখাই ছেপেছেন যত্নের সঙ্গে। অপরাজিতা দেবীর 'বুকের ব্যথা', 'পুরবাসিনী' (এ বইয়ের উৎসর্গলিপিটি এরকম—'কবি-দম্পতী রাধারানী দেবী ও নরেন্দ্র দেবের করকমলে), 'বিচিত্ররূপিণী' বা রাধারাণনী দেবীর 'লীলাকমল'—সবকটি বই-ই সৌষ্ঠবময়। কিন্তু জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩৯-এ ছাপা রাধারানী দেবীর 'সিঁথিমৌর' তার বাহ্যিক সৌন্দর্যে সবাইকে ছাপিয়ে গেছে। লাল কাপড়ের ওপর ধাতু দিয়ে খোদাই করা নকশা এবং নাম আঁকা বইটিকে দেখতে অবিকল একটি ছোট গয়নার বাক্সর মতো।

একসময় বারোয়ারি উপন্যাস লেখার চল হয়েছিল তার ঢলও নেমেছিল খুব। বিভিন্ন সময়ে এ বিষয়ে তথ্যনিষ্ঠ কিছু লেখাও হয়েছে। এর মধ্যে প্রথম যেটি—তার নামই ছিল 'বারোয়ারি উপন্যাস'। তার উত্তরসূরিদের টেক্কা দিয়েছে বারোজন লেখকেরই একটা করে আলোকচিত্র ছেপে। ইন্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস প্রকাশিত এই বইয়ের ১৯২৪ সালে ছাপা দ্বিতীয় সংস্করণটি আমার হাতে আছে। বইয়ের প্রকাশক নিবেদন করছেন, 'বারোজন সাহিত্যিক মিলিয়া এই উপন্যাস রচনা করিয়াছেন বলিয়া ইহার নাম হইয়াছে "বারোয়ারি উপন্যাস", আসল গল্পের সহিত এই নামের কোনও সংস্রব নাই। এই ধরনের উপন্যাসগ্রন্থ বঙ্গসাহিত্যে এই বোধ হয় প্রথম। "ভারতী" মাসিক পত্রিকার উদ্যোগে ইহার সৃষ্টি।

এই উপন্যাস যাঁহারা লিখিয়াছেন তাঁহাদের প্রত্যেকের লিখনভঙ্গির স্বাতন্ত্র্য যথাসম্ভব বজায় রাখা হইয়াছে।'

বারোজন লেখকের মধ্যে শরৎচন্দ্র, অবনীন্দ্রনাথ, প্রমথ চৌধুরী, প্রেমাংকুর আতর্থী সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত (এনার গদ্যরচনার কথা জানতেন?), হেমেন্দ্রকুমার রায়, নরেন্দ্র দেব, মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায় রয়েছেন—অর্থাৎ 'ভারতী' গোষ্ঠীর মাথাদের মধ্যে প্রায় সকলেই। আলোকচিত্রগুলোর কথা বলি। শরৎচন্দ্রের শ্মশ্রুবহুল, প্রমথ চৌধুরীর নির্ভুল গুম্ফশোভিত, সত্যেন দত্তর ফরাসি দাড়িসহ এবং হেমেন রায় বা সৌরীন্দ্রমোহনের যৌবনের সপ্রতিভ ছবি তেমন পরিচিত নয়।

১-২ চৌরঙ্গি, কলকাতার কার অ্যান্ড মহলানবিশ কোম্পানি ছেপেছিল প্রায় চারশো পাতার ছোট মাপের বই 'কলের গান'। অমৃতলাল বসুর সম্পাদনায় 'বীণার ঝংকার' ছেপেছিল বসুমতী (১৩১৯)। এই দুখানি বইতে গত শতকের প্রথম দু'দশকের বাছা বাছা গান বাঁধা পড়ে রয়েছে, সঙ্গে দু-একখানি কমিক্ও। অতিরিক্তর মধ্যে প্রথমটিতে আছে বিভিন্ন গায়ক-গায়িকার গাওয়া রবীন্দ্রনাথের কয়েকখানি গান এবং দ্বিতীয়টিতে সে-সময়কার গায়ক-গায়িকা-অভিনেতা-অভিনেত্রীদের অজস্র ছবি।

১৩২১ সনে গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় ছেপেছিলেন 'সৌন্দর্য্য'—যার ইংরেজি শিরোনাম Art of Beauty। উপহারপত্রের লেখাটি এইরকম :

'সৌন্দর্য্য বুঝিতে পার সৌন্দর্য্য পূজিতে পার
পার তুমি করিবারে Beauty admire
তাই এ সৌন্দর্য্য-হার পাঠালেম উপহার
Approval-মাত্র আমি করি Aspire।'

এতে বঙ্কিমচন্দ্র, অমৃতলাল, সুরেশ সমাজপতি, গিরিশ ঘোষ মায় বিপিন পাল মশাইয়ের পর্যন্ত সৌন্দর্য বিষয়ক লেখা ছাপা হয়েছে এবং সেই সঙ্গে ভবানীচরণ লাহা ইত্যাদির বিস্তর ছবি।

লাহা বলতে মনে পড়ে গেল সত্যচরণ লাহার কথা। পক্ষীতত্ত্ববিদ সত্যচরণের বই ছাপাতেন সেই গুরুদাস চাটুজ্যে, গত শতাব্দীর প্রথম চার দশকে প্রকাশক হিসেবে যাঁরা বোধহয় সবথেকে যত্নবান। ইতিমধ্যে একটু একটু করে এসে যাচ্ছে সিগনেট প্রেস, বিশ্বভারতী, কবিতাভবন, ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং ইত্যাদি। সেকথায় পরে আসছি। বিনয়-বাদল-দীনেশ বাগের মোড়ে মস্ত বাড়ির দেওয়াল বরাবর সারি দিয়ে বই সাজিয়ে বসে থাকেন বেশ কয়েক ভাই এবং ইদানীং ভাইপোরাও। তাঁদেরই কোনও একজনের কাছ থেকে পাওয়া গিয়েছিল ১৯৩৪-এ প্রকাশিত সত্যচরণ লাহার 'কালিদাসের পাখী'। কালিদাসের কাব্যে যে পাখিদের উল্লেখ আছে, সে-সবের ২৯১ পৃষ্ঠাব্যাপী আশ্চর্য আলোচনা। চক্রবাক, শিখী, সারিকা, কাদম্ব, ক্রৌইড কারণ্ডব, শুক, গৃধ্র, শ্যেন, কুরুবী ইত্যাদি হরেক পাখির পরিচয় আর তাদের আলোকচিত্র সমেত এই বইটি দেখে নেওয়া একান্ত জরুরি। এছাড়া বইয়ের গোড়ায় মানস সরোবরের রঙিন ছবি এঁকেছেন 'তন্ত্রাভিলাষার সাধুসঙ্গ' যাঁর লেখা সেই প্রমোদকুমার চট্টোপাধ্যায়। দাম ছিল ছ'টাকা। পুরোনো বই বিক্রেতারা, খুবই সহজবোধ্য কারণে, বইয়ের দাম জল

দিয়ে ঘষে উঠিয়ে দেন। এই বইটিতে কী করে রয়ে গেছে কে জানে। ডক্টর সত্যচরণ লাহার দ্বিতীয় বইও পাওয়া গিয়েছিল ঐ একই জায়গায় (কার ঘর থেকে বার হয়ে এসেছিল তা জানার উপায় নেই)—গুরুদাস চাটুজ্যেরই ছাপা ১৯৩৫ সালের 'জলচারী'। এই বইতে বিভিন্ন জলজ পক্ষীর সাহিত্যরসগন্ধী অসামান্য বিবরণ এবং সেই সঙ্গে অজস্র ছবি।

অপরাধ নেবেন না, আপনাদের মহামূল্যবান সময়ে ভাগ বসিয়ে এমন আরও দু-একখানা বিচিত্র বইয়ের বিবরণ দিচ্ছি। কলকাতার থ্যাকার স্মিথ ১৯১৬ সালে ছেপেছিল তৎকালীন দেশীয় রাজ্য কোচবিহারের মহারানী সুনীতি দেবী, সি. আই. এর লেখা বই Bengal Dacoits & Tigers। রয়্যাল সাইজের অজস্র রঙিন ছবি সমৃদ্ধ বইটিতে সে সময়কার গ্রামবাংলার নিবিড় ছবি পাওয়া যায়। ৪৩-এর দুর্ভিক্ষ বা দেশভাগ তখনও চিন্তার মধ্যেই আসেনি। এ বইয়ের দাম ছিল তখনকার দিনের তিন টাকা' একটি নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবার সে-সময় চল্লিশ থেকে পঞ্চাশ টাকার মধ্যে সংসার চালিয়ে দিত বলে শোনা যায়, মহামূল্যবানই বলতে হবে।

এমনকি রেল কোম্পানিও কত আশ্চর্য বই ছেপেছে। যেমন ১৯১৩ সালে ইস্টার্ন বেঙ্গল স্টেট রেলওয়েজ ছেপেছে From the Hooghly to the Himala-yas'—টাইম্‌স্ প্রেসে ছাপা এ বইতে বিভিন্ন জায়গার নিবিড় তথ্যনিষ্ঠ বিবরণ। ছাপা ধবধবে সাদা কাগজে। সে সঙ্গে প্রচুর আলোকচিত্র। হুগলি নদীর ওপর পণ্টুন সেতু, হাইকোর্টের অসাধারণ সৌধের সামনে জনশূন্য পথে একক অশ্বযান, লালদিঘির অপর পাশ থেকে বড় ডাকঘর, প্রাক্-স্বাধীনতা সাহিত্যে ইলিশমাছের ঝোল-ভাত খ্যাত বুদ্ধদেব বসু থেকে শিবরামের গল্পে যার ঢের উল্লেখ পাওয়া গেছে, গোয়ালন্দের স্টিমারঘাট, কোচবিহারের রাজবাড়ি, ঢাকার সেক্রেটারিয়েট ইত্যাদির সব পাতা জোড়া ছবি। আবার ১৯৪০ সালে পূর্ববঙ্গ রেলওয়ের প্রচারবিভাগ ছাপছে দু'খণ্ডে 'বাংলার ভ্রমণ', দাম একত্রে দেড় টাকা। বইয়ের আকার-আয়তন-ছাপা-বাঁধাই বিবেচনা করলে তখনকার হিসেবেও যথেষ্ট সস্তা বলে বিবেচিত হবে। প্রথম খণ্ড ঝকঝকে সাদা আর্ট পেপারে ছাপা, যদিও যুদ্ধের জন্য দ্বিতীয় খণ্ডের কাগজ কিঞ্চিৎ নিরেস। সারা বাংলার প্রায় সমস্ত দর্শনীয় জায়গার ছবি রয়েছে এই অবিশ্বাস্য সংগ্রহে কিন্তু এখন যা দেখলে আমার অন্তত বুকের বাঁদিকে ধক্ করে ওঠে—সেই অখণ্ড বাংলার নিটোল মানচিত্র এ বইয়ের সবথেকে বড় আকর্ষণ।

রবীন্দ্রনাথের বই, বিভিন্ন সংস্করণে প্রকাশক নির্বিশেষে, সবসময় এক নিরাভরণ সৌন্দর্যের ছাপ ফেলে। বিশ্বভারতীর পরিচিত অনাড়ম্বর কিন্তু মর্যাদাবান বইগুলো অথবা তারও আগে আদি ব্রাহ্মসমাজের ছাপা 'জীবনস্মৃতি', যার কথা আগেই বলেছি বা এলাহাবাদের ইন্ডিয়ান প্রেস থেকে ১৯১৫-১৯১৬ সালে ছাপা ঘাস রঙের সবুজ রেশমে বাঁধাই দশ খণ্ডের কাব্যগ্রন্থের কথা মাথায় রেখেও বলি, 'বিচিত্রা' পত্রিকার প্রথম সংখ্যায় (আষাঢ় ১৩৩৪) মুদ্রিত নন্দলাল বসুর চিত্রসম্বলিত নটরাজ

ঋতুরঙ্গশালার দুধের মতো সাদা কাগজে ছাপা অফপ্রিন্ট যা আলাদাভাবে সাদা রেশমে বাঁধাই হয়ে পুস্তকাকারে বিক্রি হয়েছিল বা ১৩৪০-এ বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়ের রবীন্দ্রনাথ, অবনীন্দ্রনাথ, গগনেন্দ্রনাথ, নন্দলাল এবং আরো অনেকের আঁকা ছবি সহ অবিকল মূল্যবান হাতব্যাগের মতো দেখতে চামড়ায় বাঁধানো 'বিচিত্রিতা'র মতো সুন্দর বই বাংলায় খুব কমই ছাপা হয়েছে।

তবে মুদ্রণসৌকর্যের কথা যদি বলতেই হয়, অবধারিতভাবে যে প্রকাশনা সংস্থার কথা মনে আসে তা, বলা বাহুল্য দিলীপকুমার গুপ্তর সিগনেট প্রেস। সিগনেট বিষয়ে বহু আলোচনা ইতিমধ্যেই ছাপার অক্ষরে হয়েছে। সিগনেটের বইগুলোর সৌন্দর্যবধনের ক্ষেত্রে যাঁর প্রধানতম ভূমিকা সেই সত্যজিৎ রায় ডি. কে-র স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে সিগনেটের কথা বলেছেন, 'বিভাব' পত্রিকার মহামূল্যবান 'ডি. কে' সংখ্যা বা 'টুকরো কথা' সংখ্যা তো আছেই। শতমুখে একথা স্বীকার করার, পুরোনো বইয়ের বাজারে ঘোরাঘুরি করতে গিয়ে ছাপার পর অর্ধশতাব্দীরও বেশি সময় পার হয়ে যাওয়ার পরও, এবং সময়োচিত ধূলিমালিন্য সত্ত্বেও কেবলমাত্র আকারবৈচিত্র্য এবং অঙ্গসৌষ্ঠবের জন্যই প্রথমেই সে-সব বইয়ের দিকে নজর যাবেই। এমনকি প্রচ্ছদটি খোয়া গেলেও—পুরোনো বইয়ের ক্ষেত্রে যা নিতান্তই স্বাভাবিক। এবং কেবলমাত্র অবনীন্দ্রনাথ, উপেন্দ্রকিশোর, সুকুমার রায়ের বইগুলির পুনর্মুদ্রণেই তার গুরুত্ব সীমাবদ্ধ নয়, সাহিত্যমান এবং সৌন্দর্যের এমন অভাবিত মিল বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে নিতান্তই বিরল। অবশ্য ১৯৪৪ সালে ছাপা 'ক্ষীরের পুতুল' বইয়ের বৃহদাকার নবসংস্করণে (পরবর্তীকালে সিগনেট আয়তাকার যে ছোট মাপের বইটি প্রকাশ করেছিলেন সেটি নয়) সত্যজিৎ রায়ের প্রচ্ছদ এবং ছবি, ১৯৪৫ সালের 'হ-য-ব-র-ল'র ছোটমাপের নতুন সংস্করণ সত্যজিৎ রায়ের প্রচ্ছদ এবং ছবি বা ১৯৫০ সালের 'খাই খাই'-এ সত্যজিৎ রায়ের প্রচ্ছদ ছাড়াও সমকৌণিক দুই সারিতে বসা পঙ্ক্তিভোজরত নানা ধাঁচের মানুষের ছবি এখনও যতবার দেখি চমক লাগে। সেই সঙ্গে সত্যজিৎ রায়ের প্রচ্ছদে রবি রায়ের 'পাশ্চাত্য দর্শনের ধারা ও মার্ক্সীয় দর্শন' (১৩৬৫), শম্ভু সাহার প্রচ্ছদে প্রেমেন্দ্র মিত্রের 'কুয়াশা' (১৩৬০), সত্যজিৎ রায়ের প্রচ্ছদে আবু সয়ীদ আইয়ুব সম্পাদিত 'পঁচিশ বছরের প্রেমের কবিতা' (১৩৬৩), সুকুমার রায়ের অগ্রন্থিত প্রবন্ধ সংগ্রহ 'বর্ণমালাতত্ত্ব ও বিবিধ প্রবন্ধ' (১৩৬৩), সুধীন্দ্রনাথ দত্তের 'স্বগত' (১৩৬৪), 'প্রতিধ্বনি' (১৩৬১), মাখন দত্তগুপ্তের প্রচ্ছদে বিজন ভট্টাচার্যের 'জনপদ' (১৩৫২), সূর্য রায়ের প্রচ্ছদে বুদ্ধদেব বসুর 'হাউই', সত্যজিৎ রায়ের প্রচ্ছদ এবং অনিলকৃষ্ণ ভট্টাচার্যের চিত্রায়ণে মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়ের 'কায়াহীনের কাহিনী', নবসংস্করণ (১৩৫২)—যেখানে আছে সেই উদ্ভট ভুতুড়ে গল্প, 'কঙ্কালের টঙ্কার', সত্যজিৎ রায়ের প্রচ্ছদে বীণা দাসের 'শৃঙ্খল ঝঙ্কার' (১৩৫৫) বা দিলীপকুমার গুপ্তর সম্পাদনায় দু'খণ্ডে 'The Best Stories of Modern Bengal' বইগুলির মত সুদৃশ্য, শোভন, সুমুদ্রিত এবং দৃঢ়বাঁধাই বই এখনও অবিশ্বাস্য রকমের আধুনিক। ১৯৪৯ সালে ছাপা

সুনীল জানার আলোকচিত্রের সংকলন 'The Second Creature' হাতে পাবার সময়কার শিহরন এখনও মনে আছে। অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তর 'পরমপুরুষ শ্রীরামকৃষ্ণ' তর্কযোগ্যভাবে সিগনেটের সবথেকে বাণিজ্যসফল প্রকাশনা। কিন্তু তিন দশক ধরে সিগনেট বাংলা সাহিত্যকে যেভাবে, কেবলমাত্র ভালবেসে এবং বাণিজ্যের কথা চিন্তা না করে, সমৃদ্ধ করে গেছে তা এখনও ভাবতে ভাল লাগে। সিগনেটের প্রচ্ছদ সৌন্দর্যের প্রাপ্য প্রশংসা অনেকাংশেই সত্যজিৎ রায়ের। কিন্তু মাঝে মাঝে তাঁকে যাঁরা সহায়তা করেছেন যেমন পীযূষ মিত্র (বর্ণমালাতত্ত্ব', 'পঁচিশ বছরের প্রেমের কবিতা' বা প্রমদারঞ্জন রায়ের 'বনের খবর' ১৩৬০) অথবা শিবরাম দাস ('খাই খাই', চলচ্চিত্র প্রথম পর্যায় ১৩৫৭) এঁরা আর কি কি কাজ করেছেন? প্রচ্ছদ নির্মাণে সহায়তা করার মাত্রাই বা কতখানি?

সিগনেটের বইগুলো পুরোনো বইয়ের বাজারে নিতান্ত দুর্লভ, বিশেষ করে সপ্রচ্ছদ একটি আস্ত সংস্করণ হাতে পাওয়া রীতিমতো সৌভাগ্যের ব্যাপার। ইদানীংকার প্রচার-বিস্ফোরণের দিনে বিক্রেতাদের অনেকেই সিগনেটের বইয়ের জন্য অতিরিক্ত দাম ধরে থাকেন। ২০২, রাসবিহারী এভেনিউয়ের 'কবিতা ভবন'-এর ছাপা বইগুলোও বাজারে বড় একটা মেলে না। বই কেবল প্রচ্ছদের কাগজ এবং প্রচ্ছদলিপির জন্য কত মোহময় হতে পারে কবিতা ভবনের বইগুলি না দেখলে তা ভাবা যেত না। 'কবিতা' পত্রিকার কথা বাদই দিচ্ছি—কিন্তু অজিত দত্তর 'পাতালকন্যা' (১৯৩৮), বিশ্ব বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'অবতামসী আবার রাত্রি', আবু সয়ীদ আইয়ুব এবং হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত 'আধুনিক বাংলা কবিতা' (১৯৪০), চঞ্চলকুমার চট্টোপাধ্যায়ের 'বসুন্ধরা' (১৩৪৯), বিমলাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের 'সঞ্চারী', যামিনী রায়ের প্রচ্ছদে বিষ্ণু দে-র 'পূর্বলেখ', বুদ্ধদেব বসুর 'গল্পসংগ্রহ' বইগুলি কোথায়-কিসে-কেন আলাদা, তা চোখ বোলালেই বোঝা যায়। ট্রামরাস্তা পার হতে হতে সতৃষ্ণ নয়নে এসব বইয়ের দিকে তাকাতে তাকাতে, তর-না-সইলেও-কষ্ট-করে-ধৈর্য-ধরে অন্যমনস্ক অবস্থায় গাড়িচাপা পড়ার সম্ভাবনা থেকে যাচ্ছে।

সংকলনগ্রন্থের বরাবরই বেশ কদর আছে। ইদানীংকালে লক্ষ্য করা যেতে পারে গণ্ডায় গণ্ডায় এমন সব বই ছাপা হচ্ছে, সংকলন-ধর্মিতা ছাড়িয়ে সেগুলো কিছুতেই সুসম্পাদিত বইয়ের যে ধারণা আমাদের আছে তার ধারে কাছে পৌঁছচ্ছে না। একশো বছরের সেরা অমুক, শতাব্দীর সেরা তমুক ইত্যাদি নামে ছাপা এসব বইয়ের সম্পাদকদের অস্তিত্ব পাঠকদের ধরাছোঁয়ার বাইরেই থেকে যাচ্ছে। পুরোনো বইয়ের দোকানে এই সময় ঘোরাঘুরি করলে ক্রমে ক্রমে হাতে চলে আসতে পারে সুধীরচন্দ্র সরকার সম্পাদিত 'কথাগুচ্ছ', বিমলাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত 'অন্য ভুবন', সুকুমার সেন সম্পাদিত 'উপছায়া', প্রেমেন্দ্র মিত্র-জয়ন্তী সেন সম্পাদিত 'শঙ্কাশিহর', পরিমল গোস্বামী সম্পাদিত 'ব্যঙ্গমা-ব্যঙ্গমী' বা ১৩৫০-এ বাংলার দুর্ভিক্ষের গল্পগুলোর সংকলন 'মহামন্বন্তর'। তখন বোঝা যায় যথার্থ ভালবাসা এবং প্রকৃত দায়বদ্ধতা নিয়ে সম্পাদনা

করলে অর্ধশতাব্দীরও পরে এক-একটি বই কিভাবে আক্ষরিক অর্থেই চিরকালীন হয়ে উঠতে পারে। আরো উপভোগ করতে গেলে প্রয়াত শিশিরকুমার দাশের 'ফুলের ফসল' বইয়ের বক্তব্যের সঙ্গে নিজের ধারণা মিলিয়ে নেওয়া যায়।

বরাবরই লক্ষ্য করেছি কলকাতা শহরের এদিক-ওদিক ছড়িয়ে থাকা অজস্র পুরোনো বইয়ের দোকান, এমনকী মফস্বল শহরগুলির পুরোনো খবরের কাগজের গুদামে খোঁজ করে গত শতাব্দীর দুই-তিন-চারের দশকের 'প্রবাসী', 'ভারতবর্ষ', 'মডার্ন রিভিউ', বসুমতী ইত্যাদি পত্রিকা মোটামুটি নিয়মিত পাওয়া গেলেও 'কবিতা', সুধীন্দ্রনাথ দত্তর আমলের 'পরিচয়', 'এক্ষণ', 'অনুষ্টুপ' প্রথম দিকের 'চতুরঙ্গ', 'কলকাতা', 'কৃত্তিবাস' জাতীয় পত্রিকা পাওয়া যায় বড়ই কম। নিষ্ঠাবান মৎস্যশিকারির ধৈর্য নিয়ে চার ফেলে বসে থাকতে হবে, এসব পত্রিকা পাবার আগ্রহ থাকলে আর এক্ষেত্রে চার হচ্ছে অধ্যবসায়। কখনও কখনও পাওয়া গেলে সেই উজ্জ্বল আগমনকে রীতিমতো আবির্ভাব বলেই ধরে নিতে হয়। এর মানে কি এই যে, যে-সব পাঠক একদা ভালবেসে পত্রিকাগুলো টাটকা কিনেছিলেন তাঁরা এখনও সশরীরে ধরাধামে বর্তমান, ফলে উত্তর-পুরুষদের পুরোনো কাগজওয়ালা ডেকে সের দরে সে-সব জঞ্জাল বিদেয় করার সুযোগ এখনও হয়নি? 'পরিচয়' পত্রিকার প্রথম দিকের সংখ্যাগুলোতে অসামান্য সব গ্রন্থ সমালোচনা—সমালোচকদের মধ্যে আছেন রবীন্দ্রনাথ থেকে সুধীন্দ্রনাথ দত্ত হয়ে শ্যামলকৃষ্ণ ঘোষ পর্যন্ত—চোখ ঝলসে দেয়। 'কবিতা' পত্রিকায় বছরের পর বছর বুদ্ধদেব বসুর অসীম ভালবাসার বাংলা কবিতার মূল্যায়নের সঙ্গে সমর সেন, বিষ্ণু দে, প্রেমেন্দ্র মিত্র থেকে অরুণকুমার সরকার, নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী হয়ে শক্তি চট্টোপাধ্যায়, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় পর্যন্ত বাংলা কবিতার তিন দশকের রূপরেখা মসৃণভাবে ফুটে ওঠে। এরকমই নজর করার 'চতুরঙ্গ' পত্রিকা, হুমায়ুন কবীরের সম্পাদনার সময় থেকে তা বাংলা সাহিত্যে উজ্জ্বল দিকচিহ্ন হয়ে আছে। বিশেষণগুলো কিছুটা একঘেয়ে অতিরঞ্জিত শোনালেও পুরোনো বইয়ের বাজারে তাকে যাচাই করে নেবার সুযোগ তো রয়েইছে।

'চতুরঙ্গ'তে বিভিন্ন সময়ে গ্রন্থ সমালোচনা করেছেন জীবনানন্দ দাশ, নাটক বিষয়ে নিয়মিত লিখেছেন শম্ভু মিত্র, রেডিও নিয়ে অশোক মিত্র এবং চলচ্চিত্র নিয়ে চিদানন্দ দাশগুপ্ত সেই চার-পাঁচের দশকে। আর মনে করে দেখতে বলি দিলীপকুমার গুপ্ত, অমরেন্দ্র চক্রবর্তী সম্পাদিত সেই অল্পস্থায়ী 'সারস্বত' পত্রিকার কথা, যার মাত্র আটটি সংখ্যা প্রকাশিত হয়েছিল (১৩৭৫)। অন্য ধারার এই পত্রিকা এত সুমুদ্রিত এবং নিখুঁত যে দেখে কেমন যেন অস্বস্তি লাগে। আরেকটু পিছিয়ে যাই। গত শতাব্দীর দুই-তিনের দশক, 'নাচঘর' পত্রিকা সম্পাদনা করতেন হেমেন্দ্রকুমার রায়—পরবর্তীকালে ছোটদের রহস্য-রোমাঞ্চ-ভৌতিক গল্পের সম্রাট হয়েছিলেন যিনি। 'নাচঘর' পত্রিকায় সে যুগের চলচ্চিত্র-নাটকের অজস্র চিহ্ন ছড়িয়ে আছে। এ পত্রিকাও আদৌ মেলে না।

সেগুলো যে কোথায় গেল কে জানে? 'নাচঘর' যখন বেরোচ্ছে হেমেন্দ্রকুমার তখন প্রধানত কবি। ইতিমধ্যে 'যৌবনের গান' (১৯২৩), 'সুরলেখা' (১৯৩১) ইত্যাদি বই তাঁর বেরিয়ে গেছে। হেমেন্দ্রকুমারের কবিসত্তা তাঁকে কখনও ছেড়ে যায়নি। পরবর্তীকালে যখন তিনি 'মানুষ পিশাচ', 'সুলুসাগরের ভুতুড়ে দেশ', 'অসম্ভবের দেশে', 'যক্ষপতির রত্নপুরী' ইত্যাদি জনপ্রিয় বই লিখছেন, বিমল-কুমার-জয়ন্ত-মানিক-সুভঙ্করবাবু-চৈনিক দস্যু, মালয়ের জঙ্গল ইত্যাদি তাঁর লেখায় রহস্য-রোমাঞ্চ-ভয়ের নিবিড় আবহ তৈরি করছে, তখনও তাঁর লেখায় সেই চিরজীবী কবিটি থেকে থেকেই উঁকি মারছে। অন্তত আমার তো তাই মনে হয়েছে। 'নাচঘর' পত্রিকার মাপ ছিল মস্ত বড়। ইদানীং অমন বড় মাপের পত্রিকা দেখা যায় না। সাবিত্রীপসন্ন চট্টোপাধ্যায়ের 'বিজলী'র আকারও ছিল ওইরকম। নাচঘরে বাংলা ছায়াচিত্রের বা নাটকের সেই আদি যুগের ধারাবিবরণী রক্ষিত হয়েছে নির্ভুলভাবে। বিভিন্ন সংখ্যার পাতা উল্টে গেলে হঠাৎই চমক লেগে যায়। সে যুগের বিখ্যাত ইম্‌প্রেসারিও এবং পরবর্তীকালে দাঙ্গায় নিহত হরেন ঘোষের পরিচালিত ছবি 'বুকের বোঝা'র সম্বন্ধে বিশদ লেখা হয়ত চোখে পড়ল, বা বিজ্ঞাপনে দেখা গেল মনমোহন থিয়েটারে 'জাহাঙ্গীর' নাটকে নামভূমিকায় অভিনয় করছেন স্বয়ং দানীবাবু সঙ্গে নির্মলেন্দু লাহিড়ী এবং সরযূবালা। 'সচিত্র ভারত' পত্রিকা প্রথম বেরিয়েছিল ১৯৩৬ সালে এবং প্রথম দু'বছর অন্তত এই রয়্যাল সাইজের পত্রিকা ছাপা হয়েছিল সম্পূর্ণ আর্ট পেপারে। পরবর্তীকালে যদিও বাজারের সঙ্গে সঙ্গতি রাখার জন্যই সম্ভবত এর মাপও ছোট হয়ে যায়, কাগজও হয়ে যায় সাধারণ। এ পত্রিকা যদি মিলে যায় কখনও, দেখুন পাতায় পাতায় ছড়িয়ে আছে সজনীকান্ত দাস, শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়, বনফুলের প্রথম দিকের সব লেখা, চিত্রতারকাদের ছবির ছড়াছড়ি, থেকে থেকে উঁকি মারবেন মার্লিন ডিয়েট্রিশ থেকে রেণুকা রায়। সেই সঙ্গে অজস্র সংবাদচিত্র। শ্রদ্ধানন্দ পার্কে বক্তৃতা দিচ্ছেন সুভাষচন্দ্র বসু, শেষযাত্রায় শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, অল্পবয়সী ছায়াদেবী, বাগবাজারের সার্বজনীন দুর্গাপূজা, বর্ষায় ভিজে কলকাতা। আর বিজ্ঞাপন—ভারতীয় চায়ের বিজ্ঞাপন—চা প্রস্তুত প্রণালী শেখানো হচ্ছে, নিউ থিয়েটার্স-এর নতুন ছবির বিজ্ঞাপন—দেশের মাটি ছবিতে সাইগল আর উমা।

ঐ একই সময়ে প্রকাশিত হচ্ছে সঞ্জয় ভট্টাচার্যের সাপ্তাহিক পূর্বাশা (১৯৩৬)। 'পূর্বাশা' পত্রিকার কথা ভাবলে ঠিক যেমন ধারণা মনে আসে, সাহিত্য-সংস্কৃতির যে সংযত কিন্তু আধুনিক রূপ 'পরিচয়' 'কবিতা' 'চতুরঙ্গ' সর্বত্র প্রচারিত হয়েছে—সাপ্তাহিক 'পূর্বাশা' আদৌ তেমন নয়। প্রায় সচিত্র ভারতেরই ধাঁচে সংবাদ সাহিত্য চলচ্চিত্র সব পাশাপাশি এসেছে ঐ একই রকম শ্বেতশুভ্র আর্ট পেপারে, সাত দশক পেরিয়ে যাবার পরেও যার শুভ্রতা অনাবিল। বিজ্ঞাপনদাতাদের প্ররোচিত করতে এখনও যেমন, কত মানুষকে যে চরিত্রবিরোধী কাজ করতে হয়েছে তার ইয়ত্তা নেই। বিজ্ঞাপনের কথায় মনে পড়ল ১৩৩৮ সালের 'প্রবাসী' পত্রিকার শারদীয় নয়, একটি সাধারণ সংখ্যাতেই একটানা ছেচল্লিশ পাতার বিজ্ঞাপন দেখেছি। প্রসাধনী সামগ্রী

থেকে 'কাজলকালি' লেখার কালির বিজ্ঞাপন। কালির বিজ্ঞাপনটি তৈরি হয়েছে রবীন্দ্রনাথের হাতে লেখা প্রশংসাপত্রর ব্লক করা অনুলিপি ছাপিয়ে। 'বিজলী' পত্রিকার অতিকায় মাপের এই সংবাদপত্রিকা প্রকাশ সম্ভবত ১৩২৭-এ। খবর-টবর সব যেমন থাকার তো আছেই, সেই সঙ্গে রয়েছে বেশ কিছু গল্প-কবিতা-প্রবন্ধও। রবীন্দ্রনাথ তো সর্বত্রগামী সে সময়, কিন্তু তিনি ছাড়াও অবনীন্দ্রনাথ, হেমেন্দ্রকুমার, বুদ্ধদেব বসু, প্রেমেন্দ্র মিত্র ('পাঁক' উপন্যাস ধারাবাহিকভাবে বেরিয়েছিল এখানে), অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, নরেন্দ্র দেব, নজরুল ইসলাম ('আমার কৈফিয়ৎ' কবিতাটি এখানেই ছাপা) এঁরা সব আছেন। 'কল্লোল' পত্রিকার দীনেশরঞ্জন দাশ নিয়মিত ব্যঙ্গচিত্র আঁকতেন। কিন্তু যে কয়েকখানি স্বভাবতই অতিপ্রাচীন প্রায় কীটদষ্ট সংখ্যা আমি জোগাড় করতে পেরেছি, তাতে আকর্ষণীয় লেগেছে বিজ্ঞাপনগুলিই। কলকাতা কর্পোরেশন কুলপি বরফ সম্বন্ধে শতর্কীকরণ বিজ্ঞাপন দিচ্ছে—তা প্রকাশিত হচ্ছে চিফ এক্সিকিউটিভ অফিসার সুভাষচন্দ্র বসুর নামে। পাঠকদের জানানো হচ্ছে, উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর প্রতিষ্ঠিত 'ছেলেদের সর্বোৎকৃষ্ট মাসিক' সন্দেশ পত্রিকার কথা। ইলেকট্রিক আলোর সুবন্দোবস্তর লোভ দেখিয়ে দু' নম্বর হরেন সেন স্কোয়ারের 'সেন্ট্রাল কলকাতা বোর্ডি'-এ থাকতে প্ররোচিত করা হচ্ছে—খরচের হার মাত্র মাসিক উনিশ টাকা থেকে আঠাশ টাকা। ২৯ নং কলুটোলা স্ট্রিটের সি. কে. সেন অ্যান্ড কোম্পানি কুইনাইনের 'অমৃতাদি বটিকা'র প্রয়োজনীয়তা মনে করিয়ে দিচ্ছে, কারণ 'ম্যালেরিয়া রাক্ষসী প্রত্যহ ১০০ বাঙালি গ্রাস করিতেছে।' দীনেশরঞ্জন দাশের সম্পাদনায় এবং গোকুলচন্দ্র নাগের সহসম্পাদনায় 'কল্লোল' পত্রিকা যে ১০/২ পটুয়াটোলা লেন থেকে নিয়মিত প্রকাশিত হচ্ছে তাও জানা যাচ্ছে বিজ্ঞাপন থেকে। আবার পাঠককে অবগত করা হল যে স্টার থিয়েটারে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের নতুন নাটক 'চিরকুমারসভা'র প্রথম অভিনয় মহাসমারোহে অভিনীত হতে চলেছে আর্ট থিয়েটার লিমিটেডের পরিচালনায়।

পুরোনো বইয়ের বাজারে নিয়মিত যাতায়াত যাঁদের আছে তাঁরা মাসে মাসেই খর্বকায় 'শনিবারের চিঠি' পত্রিকার বাঁধানো সংখ্যা দেখতে পাবেন। আকার দেখে হেলাফেলা করলে ঠকতে হবে, কারণ ঐ বামনাকৃতি সংখ্যাগুলো প্রকৃতপক্ষে এক-একটি অ্যাটম বোমা। কারণ সম্পাদক যে একটি পত্রিকার কতখানি হতে পারেন, এই পত্রিকার বেশ কয়েক বছরের সংখ্যা খতিয়ে না দেখলে তা বোঝা মুশকিল। 'শনিবারের চিঠি'র গোড়ার দিকে সজনীকান্ত দাস বেশ কিছু সমমনস্ক এবং সমানভাবে সক্ষম লেখক সঙ্গে পেয়েছিলেন। যেমন নীরদচন্দ্র চৌধুরী, গোপাল হালদার বা পরিমল গোস্বামী অথবা কিছু পর্বে সম্বুদ্ধ। কিন্তু কেবল প্রকৃত সাহিত্যরসের রসিকরাই কি শনিবারের চিঠি কিনতেন? সন্দেহ দূর করতে প্রতি সংখ্যায় মাসের পর মাস, বছরের পর বছর ধরে প্রকাশিত 'সংবাদ সাহিত্য' বিভাগটি লক্ষ্য করতে হবে। চার দশকের বেশি সময় ধরে সজনীকান্ত এর-ওর-তার পেছনে লাগছেন। রবীন্দ্রনাথকেও তিনি রেয়াত করেননি, (বিস্তৃত বিবরণের জন্য সজনীকান্তের 'আত্মস্মৃতি' পড়ে ফেলা দরকার—অতি উপাদেয়

গ্রন্থ।) জীবনানন্দ দাশ, বুদ্ধদেব বসু কেউ তাঁর আঘাতের গণ্ডির বাইরে যেতে পারছেন না। সবসময় তা ঠিক সাহিত্যিক ন্যায়বোধের সীমানার মধ্যে হচ্ছে এমনও নয়, কিন্তু কি আশ্চর্য দক্ষতার সঙ্গে তাঁর এই অকারণ লড়াই। সংখ্যার পর সংখ্যায় তাঁর ক্ষমতার তুঙ্গতম স্তর স্পর্শ করছেন অনায়াস দক্ষতায়। ব্যক্তিগত পছন্দ-অপছন্দ থেকে থেকে বড় বেশি রকমের প্রকট হয়ে পড়েছে। তবুও তাঁর আবেগ, আজ এতগুলো বছর পেরিয়ে যাবার পরও, পাঠক হিসেবে আপনাকে ছুঁয়ে যেতে বাধ্য। 'অতি-আধুনিক' লেখকদের বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশিত বাছা বাছা রসালো পঙ্‌ক্তিগুলো 'মণি-মুক্তা' শিরোনামে ছাপা হচ্ছে। শুনেছি সেই বিশেষ পাতাটির ধারে সারিবদ্ধ ছেঁদা করে দেওয়া হত যাতে রসিক পাঠক সেটিকে ছিঁড়ে এদিক-ওদিক চালাচালি করতে পারেন। এখনও পর্যন্ত এমন কোনও 'শনিবারের চিঠি'র সংখ্যা আমার হস্তগত হয়নি যেখানে ঐ পৃষ্ঠাটির অস্তিত্ব আছে। উৎসাহী পাঠকদের হাতে ঘুরতে ঘুরতে তারা সম্ভবত অন্তর্হিত হয়েছে সেই পর্বেই।

১৯৩৩ সালে প্রথম প্রকাশিত হয় ষান্মাসিক জার্নাল অব দি ইন্ডিয়ান সোসাইটি অফ ওরিয়েন্টাল আর্ট—যার প্রথম সম্পাদক ছিলেন অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং স্টেলা ক্রামরিশ, গুরুসদয় দত্ত থেকে সরসীকুমার সরস্বতী—অজস্র উল্লেখযোগ্য লেখা। হেমেন্দ্রনাথ মজুমদার সম্পাদিত ইংরেজি 'শিল্পী' পত্রিকাতে লিখেছেন রবীন্দ্রনাথ, ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় প্রমুখ। এবং বিভিন্ন সংখ্যায় হেমেন মজুমদারের বিখ্যাত সিক্তবসনা সুন্দরীদের সঙ্গে ছাপা হচ্ছে এম্. ভি. ধুরন্ধর, পূর্ণ চক্রবর্তী, ফণী গুপ্তর পাতাজোড়া রঙিন ছবি। তবে সবই ছাপিয়ে গেছে শুভঠাকুরের 'সুন্দরম' পত্রিকা, শুভঠাকুরের সঙ্গে অশোক মিত্র আই. সি. এস বা সুভাষ মুখোপাধ্যায় অনেকেই লিখছেন প্রতি সংখ্যায়। কার্তিক-অগ্রহায়ণ ১৩৬৩ (প্রথম বর্ষ চতুর্থ-পঞ্চম সংখ্যা)-র সংখ্যায় রঘুনাথ গোস্বামীর প্রয়োগশিল্পী মাখন দত্তগুপ্তর ওপর লেখাটি সেই সময়কার বিজ্ঞাপন জগতের একটি ধারাবিবরণী যখন আলোকচিত্র বিজ্ঞাপনকে এখনকার মতো দখল করে নেয়নি।

প্রাচীন গ্রন্থের জগৎ একটি অনন্ত অভিজ্ঞতা। উনিশ শতকী উপন্যাসের সঙ্গে একেবারে হালের গল্প-কবিতা-প্রবন্ধ যেখানে বন্ধুভাবে পাশাপাশি আশ্রয় নেয়। ভাওয়াল সন্ন্যাসীর মামলা চলাকালীন যে অজস্র টুকরো পুস্তিকা বাংলাদেশের এখানে-ওখানে ছাপা হয়েছিল এবং অবশ্যই প্রচুর বিকোত—তারই অনেকগুলোর একটি সযত্নে বাঁধানো সংকলন হাতে এসে গিয়েছিল। জোগাড় যিনি করেছিলেন সেই ভদ্রলোকের উৎসাহটা ভেবে দেখার মতো। পুরোনো সিনেমার বুকলেটের দেখাও মাঝে মধ্যে পাওয়া যায়—নিউ থিয়েটার্সের আমল থেকে বাংলা ছবির তন্নিষ্ঠ গবেষকদের কাজে লেগে যেতে পারে এসব, এখন যদিও বিদেশের নিলামে এগুলি বিস্তর পাউন্ডে বিক্রি হচ্ছে শোনা যায়। সারা জীবন ধরে এসবও সঞ্চয় করেন কেউ কেউ—মৃত্যুর পর ঘুরে ফিরে আবার সেই অগতির গতি কলেজ স্ট্রিট।

ছেলেবেলায় যেসব বই হাতের নাগালে আসব আসব করেও ফসকে গিয়েছিল কিন্তু পরে আর পড়ার সুযোগ না পেয়ে দীর্ঘদিন আফসোস করা ছাড়া উপায় ছিল না—একটু নজর রাখলে এই বাজারে সে সবও পেয়ে যাওয়া যাবে কোনদিন-না-কোনদিন। দেব সাহিত্য কুটীর অথবা হেমেন্দ্রকুমার রায় সম্পাদিত শরৎ সাহিত্য মন্দিরের পূজাবার্ষিকীগুলিতে কয়েক দশক ধরে নির্মিত হয়েছে জয়ন্ত-মানিক-বিমল-কুমার-ঘনাদা-টেনিদা-অমরেশ-বগলামামা নামক কিংবদন্তি। দেব সাহিত্য কুটীরের কাঞ্চনজঙ্ঘা সিরিজে এমনকি বুদ্ধদেব বসু বা বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে দিয়েও লিখিয়ে নেওয়া হয়েছে রহস্য-রোমাঞ্চ গোয়েন্দা কাহিনী। প্রহেলিকা গিরিজ বা পিরামিড সিরিজ দুই প্রজন্মের বাঙালিকে রহস্য কাহিনীর ক্ষেত্রে প্রাপ্যের কিছু বেশিই জোগান দিয়েছে দীর্ঘদিন ধরে। কলেজ স্ট্রিট, বি বা দী বাগ থেকে শুরু করে প্রত্যন্ত মফস্বলের পুরোনো খবরের কাগজওয়ালার কাছে চেষ্টা করতে করতে সবগুলিকেই জোগাড় করে ফেলা যায় এক সময়। অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের রাজকাহিনী, নামক, বুড়ো আলোর প্রথম দিকের সংস্করণগুলো বহু বাসনায় প্রাণপণে চাইলে মিলে যেতে পারে। সিগনেটের পরিচিত সংস্করণগুলির থেকে কতটাই না আলাদা সেগুলো। এক-আধখানা বই লিখে বাঙালি শিশুপাঠককে শিহরিত করে বেমালুম উধাও হয়েছেন যেসব লেখক, যেমন সম্বুদ্ধ (শিকার কাহিনী, বাঘ-সাপ-ভূত), বুদ্ধুভুতুম (বুদ্ধুভুতুমের গল্প) বা প্রশান্ত চৌধুরী-জয়ন্ত চৌধুরী (ছুট)—তাঁদের ফিরে পেতে গেলে এমন জায়গা আর কোথায়। বিশ শতকের দুই-তিন-চারের দশকের মৌচাক, রংমশাল, মাসপয়লা, পাঠশালা পত্রিকা ছাড়া। পুরোনো 'শুকতারা'তে সুধীন্দ্রনাথ রাহার গল্প পড়লে বোঝা যায় কেবল অনুবাদই নয়, কত শক্তিশালী লেখকই না ছিলেন তিনি, অথবা ধীরেন্দ্রলাল ধর। অভ্যুদয় প্রকাশ মন্দির কত সযত্নে কি অপূর্ব সব সংকলন প্রকাশ করেছেন ছোটদের জন্য—'খেয়াল খুশী অসম্ভব', 'হালকা হাসির গল্প', বা 'ইতিহাসের গল্প গুচ্ছ'। অথবা তখনকার সেরা লেখকদের লেখা নিয়ে 'ছোটদের শ্রেষ্ঠ গল্প' বা 'কিশোর সঞ্চয়ন' সিরিজগুলি। সুকুমার দে সরকার কেবল জীবজন্তুর গল্পই লেখেননি, 'হানাবাড়ি' বা 'মনটা হুহু করে'র মতো প্রথম সারির গোয়েন্দা কাহিনীও যে তাঁরই লেখা, তা এখন আর কে-ই বা মনে রেখেছে। দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়ের বিজ্ঞান বিচিত্রা, জানবার কথা, জীবনী বিচিত্রা বা যে গল্পের শেষ নেই সিরিজগুলো প্রকাশ হয়েছিল ঈগল পাবলিশিং হাউস বা স্বাক্ষর প্রকাশন থেকে অল্পাধিক অর্ধশতাব্দী আগে, সে-সবের প্রয়োজনও কি একেবারেই ফুরিয়েছে? অথবা আরো আগে ইন্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস থেকে বেরোনো জগদীন্দ্রনাথ রায়ের আলো, শব্দ, তাপ, বিদ্যুৎ, বাংলার পাখি ইত্যাদি বইয়ের (প্রচ্ছদ এবং ভেতরের ছবি অনেক সময়ই নন্দলাল বসুর) কথা আমরা যদি ভুলে যাই তো ক্ষতি আমাদেরই।

এ লেখা বাড়ালে আরো বেড়েই যাবে। কথা হচ্ছে পুরোনো বইয়ের নেশায়, সকলেই না হলেও, কেউ কেউ মজে কেন? গড়পড়তা সাহিত্যের মান কি আগে উঁচু ছিল এখনকার থেকে? নিশ্চয়ই নয়, প্রচুর পরিমাণে লেখা বরাবরই হয়ে আসছে,

ছাপাও হচ্ছে তাদের অনেকটাই এবং তার একটা মস্ত বড় অংশই যত তাড়াতাড়ি ভুলে যাওয়া যায় ততই মঙ্গল। অল্প কিছুটা অংশ মনে রাখার মতো—আগে যেমন ছিল, এখনও তাই। ছাপা বাঁধাই এখন যেমন সত্তর-আশি বছর আগেও তাই, কিছু উল্লেখযোগ্য অনেকটাই জঘন্য। তবে তর্কাতীতভাবে অবলুপ্ত হয়েছে বাঙালির বাঙালিত্ব। আত্মবিস্মরণের এই ভয়াবহ সময়ে তাই কি বার বার সেই ভুলে যাওয়া যুগে উঁকি মারা?

শেষ করার আগে একটি ছোট্ট কাহিনী বলি। গত শতকের আটের দশকের মাঝামাঝি সময় নীরদ চৌধুরীর আত্মজীবনীর দ্বিতীয় খণ্ড 'দাই হ্যান্ড গ্রেট অ্যানার্ক' প্রকাশিত হয়েছিল *chatto & windns* থেকে। খুবই অল্প সময়ের জন্য এ বই সম্ভবত কলকাতার বাজারে এসেছিল, তারপর উধাও হয়ে যায়। পরবর্তী বিশ বছর ক্রমান্বয়ে খুঁজেও এ বইয়ের হদিশ করতে না পেরে অবশেষে মাস কয়েক আগে বইটি পড়ার সুযোগ পাই এক পরমশ্রদ্ধেয় বয়োজ্যেষ্ঠের বদান্যতায়। বইটি তাঁকে ফেরত দেবার সময় মনটা খুঁতখুঁত করছিল স্বাভাবিকভাবেই কারণ নীরদবাবুর লেখার মধ্যে বাংলাদেশের ইতিহাসের উত্তালতম এবং সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ সময় এই বইয়ের মতো এত জীবন্তভাবে আর কোনও বইতেই ফোটেনি। বই ফেরত দিতে গিয়ে কলেজ স্ট্রিটের চেনা পুরোনো বইয়ের দোকানদারকে আরেকবার বইটির নাম লিখে দিয়ে পাওয়া গেলে আমাকে খবর দিতে অনুরোধ করি। এরকম সাহায্য তিনি আমাকে আগেও করেছেন। এবার ভদ্রলোক আমাকে একটু দাঁড়াতে বলে তাঁর আগের দিন কেনা বইয়ের গাঁট খুলে সহাস্যে বার করে দিলেন গাঢ় নীল রঙের 'দাই হ্যান্ড গ্রেট অ্যানার্ক', গত বিশ বছর ধরে যে বইয়ের কথা তাঁকে আমি অন্তত পঞ্চাশ বার বলেছি যে, ঘটনার অবিশ্বাস্য পরম্পরায় সেই যে বিমূঢ় হলাম সে ঘোর কাটতে আমার বিস্তর সময় লেগেছিল।

এই হল পুরোনো বইয়ের বাজার।

*My heart loos drunken with all its joy, আর কি? পেছনোর তো কোনও উপায়ই নেই। কিন্তু এগোনোর? বিশেষ করে এই রুগ্ন উত্তর-আধুনিক জ্ঞানচর্চার বাজারে...

* নীচের লাইনগুলো বলাইবাহুল্য এলোমেলো করে ব্যবহৃত, নিৎসে ও হ্যেল্ডার্লিনের কবিতা থেকে।

শক্তির প্রকাশে সভ্যতার বিকাশ
স্বার্থাশ্রিত শক্তির নগ্ন প্রয়োগই সভ্যতার ভিত্তি

মহম্মদ আমীর হোসেন

'সভ্যতা'র ইতিহাসে প্রত্যেক জাতি-রাষ্ট্র, নৃতাত্ত্বিক জাতি-গোষ্ঠী অথবা সম্প্রদায়ই তাদের স্থানিক অথবা কালিক পর্যায়ে অতীতের নিজস্ব অর্জন অথবা বর্তমানের কৃষ্টি-সংস্কৃতি সমন্বিত সভ্যতার স্তর সম্পর্কে প্রায়শই অতি উচ্চ মত পোষণ করে থাকে, গর্ব করে, কখনও বা এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট বেশির ভাগ মানুষই উন্নাসিক হয়েও থাকে বটে। লোক পরম্পরায় অথবা ইতিহাসের পাতায় প্রাচীন মিশরের সভ্যতা, মেসোপটেমিয়া, ব্যাবিলনীয়, গ্রিস, আসীরীয়, ভারতীয়, চৈনিক কত না সভ্যতার কথা আমরা শুনি অথবা পড়ি। সভ্যতার নিজস্ব উত্তরাধিকার নিয়ে প্রত্যেক জাতিই গর্বিত। উত্তরাধিকার ও সে সম্পর্কে গর্ববোধ না থাকলে মানুষ নিঃস্ব হয়ে পড়ে। আবার দেশ ও কালে অর্জিত ভিন্ন ভিন্ন সভ্যতার অবদান সমগ্র মানুষেরই সাধারণ উত্তরাধিকারও বটে। আগুন আবিষ্কার ও তার ব্যবহার, বন্য পশুকে বশীভূত করে পশুপালন, কৃষির সূত্রপাত ও প্রসার, বিনিময় ও বাণিজ্য, চাকা আবিষ্কার, লিপি ও লিখন পদ্ধতির সূত্রপাত ও তার ক্রমবিকাশ, বাষ্পশক্তির আবিষ্কার ও তার ব্যবহার, বিদ্যুৎ ইত্যাদি ইত্যাদি মানুষের সভ্যতার অগ্রগতির ইতিহাসে দিগন্তপ্রসারী দিক-চিহ্নগুলির সূত্রপাত পৃথিবীর যে প্রান্তে যে মানব গোষ্ঠির মধ্যেই হয়ে থাকুক না কেন বা যিনি যেখানেই এ সবের যা কিছু আবিষ্কার করে থাকুন না কেন, তা আজ সবই সমগ্র মানব সমাজের সাধারণ উত্তরাধিকার। কিন্তু 'সভ্যতা' শব্দটার সর্বজনসম্মত সংজ্ঞা খুঁজে পাওয়া মুশকিল। সর্বসম্মত সংজ্ঞা না থাকলেও বর্তমানের প্রেক্ষিতে মোটামুটিভাবে বলা যেতে পারে যে আইনের শাসনে সুপ্রতিষ্ঠিত শৃঙ্খলাবদ্ধ সমাজ-জীবনে জ্ঞান-বিজ্ঞান, শিল্প সাহিত্য সঙ্গীত কলা কৃষ্টি-সংস্কৃতি চর্চার উন্মুক্ত পরিবেশে ও মননে ঋদ্ধ চলিষ্ণু সমাজের সর্বাঙ্গীন উৎকর্ষময় অবদানই সভ্যতা বলে বিবেচিত হওয়ার যোগ্য। কিন্তু এমনতর সংজ্ঞার সাথে বর্তমানের প্রবন্ধ শিরোনামের সম্পর্ক কোথায়? বিশেষত এমন সভ্যতার সূত্রপাত, ভিত্তি স্থাপনে ও তার বিকাশের সাথে স্বার্থাশ্রিত শক্তির নগ্ন প্রয়োগেরও বা অবকাশ কোথায়? সে প্রসঙ্গে আসার আগে বিশ্ব প্রকৃতির সাধারণ

বৈশিষ্ট্যের সাথে মানুষের মানস-প্রকৃতির (Psyche) গঠন ও সমাজ বিকাশের ধারা সম্পর্কে কিঞ্চিৎ আলোচনা অত্যাবশ্যকীয় বলে মনে করি।

প্রথমেই বলি মনুষ্য সমাজ বিশ্ব প্রকৃতিরই অঙ্গীভূত। আমাদের ইন্দ্রিয় চেতনায় অনুভূত, অবগত সেই বিশ্ব কিন্তু সমরূপিতায় প্রকাশিত নয়। বৈচিত্র্য (Plurality), বৈপরীত্য (Binary of opposites) ও পরিবর্তনশীলতা (Changeability) প্রকাশের (Manifestation) ধর্ম। মানুষের সমাজ গঠন ও তার বিকাশে তার নিত্য অনুরণন। সমগ্র মানব সমাজ সমরূপিতায় প্রকাশিত হয়নি। ভিন্ন ভিন্ন নৃতাত্ত্বিক জাতি, গোষ্ঠী, সম্প্রদায়, শ্বেত পীত কালো, হ্রস্বকায় দীর্ঘকায়, উন্নতনাসা অথবা হ্রস্বনাসা, দীর্ঘ কেশ অথবা কুঞ্চিত কেশ বিশিষ্ট ইত্যাদি কিংবা নানা ভাষাভাষীর নানা সংস্কৃতির নানা ধর্মের নানা বৈচিত্র্যে ভরা পৃথিবীর সমগ্র মনুষ্য সমাজ।

এত বৈচিত্র্য সত্ত্বেও মানব প্রকৃতিতে কতগুলি সাধারণ বৈশিষ্ট্যও কিন্তু লক্ষণীয়। প্রকৃতিগতভাবেই মানুষ সমাজবদ্ধ যূথচারী (Gregarious) জীব। ব্যাঘ্র ইত্যাদি প্রাণীর মতো সে একক জীবনে অভ্যস্ত নয়, অভ্যস্ত হতেও পারে না। একাকীত্ব (Solitariness) মানুষের স্বভাববিরোধী। আদিতে মানুষ ব্যাঘ্র ইত্যাদির মতো একাকী জীবন যাপনে অভ্যস্ত ছিল, পরে পরিবর্তনের সাথে সাথে সহবাসের প্রয়োজনে স্ত্রী-পুরুষ যৌথভাবে বসবাস করতে শুর করে বলে জ্যাক রুশো সাহেব (১৭১২-১৭৭৮) যে অভিমতই প্রকাশ করে থাকুন না কেন, মনুষ্য প্রকৃতি অন্তত তা প্রমাণ করে না। সংসারত্যাগী অনিকেত সন্ন্যাসী অথবা বানপ্রস্থী মানুষ মনুষ্য সমাজের প্রান্ত-নিবাসী হলেও তাঁরা কিন্তু নিজেদের ভরণ-পোষণের জন্য এবং আত্মিক সম্পর্কের বিষয়ে সেই মনুষ্য সমাজের উপরেই নির্ভরশীল এবং তাঁরা শিষ্যবর্গ দ্বারাই পরিবৃত থাকেন। মানুষের লিখিত ইতিহাসে, মানুষের সৃষ্ট গুহাচিত্রে, প্রাপ্ত প্রাচীন শিলালিপি অথবা তার শিল্পকর্মে তেমন একাকীত্বময় জীবনের কোনো চিহ্ন অথবা নিদর্শনই মেলে না। তাছাড়া মনুষ্যশিশু স্বাবলম্বী হতে দীর্ঘকালীন সময়ের প্রয়োজন হয়। রুশো কথিত তথাকথিত নিঃসঙ্গ একাকী আদিম সমাজ ব্যবস্থায় শারীরিকভাবে অপেক্ষাকৃত দুর্বল শুধুমাত্র একা নারীর পক্ষে অসহায় ও মায়ের ওপর নির্ভরশীল শিশুকে নিয়ে বনজঙ্গলে শ্বাপদসঙ্কুল প্রতিকূল প্রাকৃতিক পরিবেশে বিচ্ছিন্ন একাকীত্বের জীবন নির্বাহ করা সম্ভব ছিল না। তাছাড়া কিংবদন্তি, পুরাণকথায় বা লোকস্মৃতিতেও এমন প্রসঙ্গের হদিস মেলে না। সুতরাং রুশো সাহেবের অভিমত বিনাবাক্যে পরিহার করা যেতে পারে। তেমনটি তাঁর ব্যক্তিগত মানস-কল্পন (Mental Speculation) বলে ধরে নেওয়া যেতে পারে। যূথচারী হলেও তাই বলে সমগ্র মনুষ্য সমাজ এক-জাতি বা এক-গোষ্ঠীভুক্ত এমন মনে করার কারণ নেই। প্রকৃতির বৈচিত্র্যময়তার স্বাভাবিক ক্রিয়াশীলতার কারণেই মনুষ্য সমাজ ভিন্ন ভিন্ন জাতির (নৃতাত্ত্বিক জাতিত্ব), ভিন্ন ভিন্ন গোষ্ঠী বা গোত্র (Clan) ব্যবস্থার সূত্রপাত হয়েছিল একথা আজ সর্বজনসম্মত, অন্তত পণ্ডিত ও বিশেষজ্ঞকুল কর্তৃক স্বীকৃত। একই গোষ্ঠী বা গোত্রের মানুষের মধ্যে আর একটি

গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হল তার স্বজনপ্রিয়তা তথা গোষ্ঠীপ্রিয়তা (Commensality)। একত্রে পানাহার অথবা কেবলমাত্র স্বগোত্রের মধ্যে পানাহার, ওঠা-বসা এবং স্বগোত্রের বংশ বৃদ্ধিতে আগ্রহ, বৈবাহিক বিষয়েও সেই একই কথা, তাছাড়া আপন সংস্কৃতির প্রতি পূর্ণ আস্থা এবং পক্ষপাত এবং এসব বিষয়ে অন্য গোষ্ঠীর প্রতি বৈরী মনোভাব পোষণ, এমন গোষ্ঠীপ্রিয়তার প্রধান বৈশিষ্ট্য। আধুনিক যন্ত্র সভ্যতার যুগে পৃথিবীর ব্যাপকতা সঙ্কোচিত হয়ে এলেও এই স্বজনপ্রিয়তা ও গোষ্ঠীপ্রিয়তার বৈশিষ্ট্য আজও মানুষের সমাজে বিদ্যমান এবং প্রবলভাবে তা ক্রিয়াশীল। খুব অস্বাভাবিক অবস্থা না হলে এক জাতির (নৃতাত্ত্বিক জাতি), এক ভাষাভুক্ত, এক সম্প্রদায়ের অধীন, অথবা এক ধর্মাধীন বা এক জাত-পাতের (Caste) মানুষ সহজে অন্য জাতি, অন্য ভাষাভাষী, অন্য সম্প্রদায় অথবা অন্য ধর্মাধীন ইত্যাদি মানুষের সাথে পারস্পরিক বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন করে না। স্বাভাবিক অবস্থায় শ্বেত মানুষ অশ্বেতকায় মানুষের সাথে, মুসলমান হিন্দুর সাথে বা হিন্দু মুসলমানের সাথে, বাঙালি হিন্দু তামিল হিন্দুর সঙ্গে, ব্রাহ্মণ অব্রাহ্মণের সাথে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপনে আগ্রহী নয় বরং এ বিষয়ে প্রত্যেকে প্রায়শই ঘোর বিরোধী। এই ভারতবর্ষেই কিছুদিন আগেও এমনকি আজও বহু ক্ষেত্রে একই ব্রাহ্মণ্য ধর্মের অনুসারী হয়েও এবং সম ভাষাভাষী হয়েও এক জাতির (Caste) মানুষ অন্য জাতির গৃহে পানাহার করতেও আপত্তি করে। এসবই হল গোষ্ঠীপ্রিয়তা তথা স্বজনপ্রিয়তার লক্ষণ বা বৈশিষ্ট্য।

যূথচারিতা ও গোষ্ঠীপ্রিয়তার ঠিক বিপরীতে মনুষ্য প্রকৃতির তৃতীয় বৈশিষ্ট্য হল স্বগোত্র বা স্বজাতি বহির্ভূত অন্য জাতি বা অন্য গোত্রের মানুষের প্রতি লড়াই বা কলহপ্রিয়তার মনোভাব (Pugnacity) তথা বৈরী মনোভাব; যে বৈশিষ্ট্য কুকুর জাতীয় প্রাণীর মধ্যে সর্বাধিকভাবে তীব্র। মনুষ্য জাতির এমন আচরণের পিছনে প্রধান কারণ হল তার ঐ মানস প্রকৃতিতে নিহিত গোষ্ঠীপ্রিয়তা ও তার বিপরীতে গোষ্ঠী-বৈরিতার মনোভাব আর তার সাথে স্বগোত্রের বংশবৃদ্ধির জৈবিক তাগিদ এবং প্রকৃতির সহায়-সম্পদের ওপর আধিপত্য বিস্তার ও শক্তির আরোপে অপর গোষ্ঠী বা গোত্র ইত্যাদিকে তার ব্যবহার আর ভোগদখল থেকে অপসারিত করা তথা সহগামী অর্থনৈতিক কারণের ক্রিয়াশীলতা এবং প্রতিযোগিতা। এ বিষয়ে আমরা পরে আলোচনায় ফিরে আসব। মানুষের ইতিহাস হল মূলত অর্থনৈতিক কারণে এইরূপ গোত্রে গোত্রে, জাতিতে জাতিতে, সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে, ভিন্ন ভিন্ন ধর্মাধীন মানুষের মধ্যে, ভিন্ন ভিন্ন জাতি-রাষ্ট্রের মাধ্যে আবহমান কালের সংঘাত সংঘর্ষ আর রক্তাক্ত সংগ্রামের ইতিহাস। অর্থনৈতিক শ্রেণীস্বার্থজনিত দ্বন্দ্ব একই দেশের অভ্যন্তরেও কখনো কখনো আন্তঃশ্রেণী সংঘাত ও সংঘর্ষের রূপ নিয়ে থাকে বৈকি।

ব্যক্তিস্তরে মনুষ্যপ্রকৃতি হল কাম (যৌনক্ষুধা), বিষয়ের (বেঁচে থাকা ও বংশবৃদ্ধির জন্য পার্থিব সহায়-সম্পদ উপায়-উপকরণ ইত্যাদির) প্রতি আসক্তি, অপরের ওপরে প্রভুত্ব করা তথা ক্ষমতালিপ্সা এবং অপরের দৃষ্টিতে আত্মস্বীকৃতি ও প্রতিষ্ঠা অর্জনের

তাগিদ (Recognition in the eyes of others) ইত্যাদিই প্রধান। মনুষ্য তথা জীবপ্রকৃতিই হল অহমকেন্দ্রিক (Ego-centric)। যিনি মানুষ ও জীবের সেবায় আত্মোৎসর্গ করেছেন বলে মনে করেন তিনিও সেই সেবাকাজে আত্মতৃপ্তি বোধ করেন এবং স্বীয় অহংবোধের মধ্যে সুপ্তভাবে হলেও এমন কাজ অন্যান্য কাজ অপেক্ষা মহান, এমন অবস্থান তার চেতনাকে আচ্ছন্ন করে থাকে, ফলত তিনিও অন্যের দৃষ্টিতে এমন কাজের জন্য স্বীকৃতির প্রত্যাশী। আর মানুষের মানস-প্রকৃতিতেও (Psyche) বিশ্বপ্রকৃতির নিহিত 'বৈপরীত্য' (Binary of opposites)-এর মতই বিপরীতমুখী ইতিবাচক ও নেতিবাচক দ্বৈত গুণাবলীর সমাবেশ সহজাত ও চিরন্তন। মনুষ্য-প্রকৃতিতে একদিকে যেমন দয়া, মায়া, ভক্তি, প্রেম, ভালবাসা, বদান্যতা ইত্যাদি ইতিবাচক বলে বিবেচিত গুণের উপস্থিতি, অন্যদিকে তেমনই পার্থিব জীবন সংগ্রামে টিকে থাকা ও ইহজগতে বেঁচে থাকার প্রবল আকাঙ্ক্ষা তথা জিজীবিষা এবং তন্নিমিত্ত হিংসা, দ্বেষ, ঈর্ষা, বিজিগীষা ও জিঘাংসার মতো নেতিবাচক বলে বিবেচিত গুণও বর্তমান। জীব জগতের ক্ষেত্রে আত্মসংরক্ষণ প্রচেষ্টা প্রকৃতির প্রথম নিয়ম বলেই স্বীকৃত। স্বভাবতই আত্মসংরক্ষণের ও আত্মসম্প্রসারণের তাগিদে তার অন্তরায় স্বরূপ সব রকম প্রতিবন্ধকতা ও প্রতিকূলতাকে প্রয়োজনে শক্তি প্রয়োগে অপসারিত করতেই এই নেতিবাচক গুণাবলীর উপযোগিতা। রুশো মনে করতেন মানুষ জন্মসূত্রেই স্বভাবতই সৎ প্রকৃতির কিন্তু বর্ধিত হওয়ার কালে সমাজ ও সভ্যতার সংস্পর্শে এসে ভ্রষ্ট ও অসৎ প্রকৃতির হয়ে ওঠে। এটাও রুশোর মানস-কল্পন মাত্র। মানুষের প্রকৃতিতে যে বৈপরীত্যভাব (বা বিরোধাভাস) বা বিপরীতমুখী গুণাবলীর সহাবস্থান তা জন্মসূত্রেই শিশুপ্রকৃতির মধ্যে সুপ্ত থাকে। মায়ের প্রতি নিবিষ্টচিত্ত শিশু মাকে একান্ত নিজের বলেই মনে করে। মা অন্য শিশুকে আদর করলে সে কিছুতেই তা বরদাস্ত করতে পারে না। শিশু নিজের বলে চিহ্নিত খেলনা ইত্যাদিকে অন্য শিশুকে স্পর্শ করতে দেয় না। শৈশব থেকেই এসব বিষয়ে শিশুরা পরস্পর পরস্পরের প্রতি বৈরী মনোভাব পোষণ করে। আর সিগমুন্ড ফ্রয়েড (১৮৫৬-১৯৩৯) তো বলেই গেছেন যে, মায়ের প্রতি তীব্র আসক্তিহেতু শিশুর মগ্ন চৈতন্যে মায়ের শরীরের প্রতি কামজ এক আকর্ষণ তার মানস-প্রকৃতিতে সুপ্ত হয়ে যায়। আর তা থেকেই মায়ের শরীরের প্রসঙ্গে পিতার প্রতি অচেতনভাবে এক যৌন বৈরিতার জন্ম নেয়। পিতা শিশুকে আদর করলে তার কোনো আপত্তি থাকে না। কিন্তু পিতা মায়ের কাছাকাছি এলে সে তা সহ্য করে না। আর যে-কোনও সংবেদনশীল পিতা-মাতা এসব বিষয়ে সচেতন। তাই যৌন সম্পর্কের ব্যাপারে শিশুর সম্মুখে পিতা মাতার সচেতন দূরত্ব বজায় রাখার চেষ্টা। যে-কোনও বুদ্ধি ও ধী-শক্তি সম্পন্ন পর্যবেক্ষক এসব বিষয়ে ওয়াকিবহাল। সুতরাং মানব-প্রকৃতিতে নেতিবাচক গুণ-সহ বৈপরীত্যভাব তার সহজাত। ব্যক্তিপ্রকৃতির স্বজনপ্রিয়তা, গোষ্ঠীপ্রিয়তা ও গোষ্ঠী বৈরিতার স্বাভাবিক কারণে এসব বৈশিষ্ট্য গোষ্ঠীপ্রকৃতিতেও রূপান্তরিত হয়। ফলে এক গোষ্ঠী, এক গোত্র বা এক জাতি অপর গোষ্ঠী গোত্র বা অপর জাতির সাথে দ্বন্দ্বে

লিপ্ত হয়। এর প্রধান কারণ সেই মনুষ্যপ্রকৃতির কাম ও বিষয়ের প্রতি আসক্তি, প্রতিষ্ঠা অর্জন, প্রভুত্ব তথা ক্ষমতালিপ্সা এবং অন্যের দৃষ্টিতে স্বীকৃতি আদায়ের বাসনা সংবলিত ভোগবৃত্তি ও আপন বংশবৃদ্ধির জৈবিক প্রেরণা। আর এ সবেরই বহিঃপ্রকাশ ঘটে শক্তি-সহ তার অর্থনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতায়। এরূপ বৃত্তি-প্রবৃত্তি ও প্রবণতা সমন্বিত মানস-প্রকৃতিই হল সমাজ বিকাশের স্বাভাবিক, প্রাকৃতিক নিয়ম ও তার চালিকাশক্তি।

আমরা আগের আলোচনা থেকে কিঞ্চিৎ লক্ষ্য করেছি যে সমাজ বিকাশের মূল চালিকাশক্তি হল প্রকৃতির সহায়সম্পদ উপায়-উপকরণ সমূহকে কুক্ষিগত করে বংশবৃদ্ধির জৈবিক তাগিদে পরস্পরের সঙ্গে সংগ্রামে লিপ্ত হওয়া এবং প্রায়শই যে সংগ্রাম তথা সংঘর্ষ রক্তাক্ত সংগ্রামে পরিণত হয়। অর্থাৎ মূলে মানুষের বেঁচে থাকা, আপন বংশবৃদ্ধির জৈবিক তাগিদ ও উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি কামনার অর্থনৈতিক প্রতিযোগিতা। অথচ সব ধর্মপুরুষ অথবা ধার্মিক বলে পরিচিত ব্যক্তিরা বলে থাকেন বা মনে করে থাকেন যে সব মানুষই ঈশ্বরের কাছে সমান, অথবা জন্মসূত্রে সবাই সমান। রুশোও মনে করতেন যে শারীরিক শক্তির ক্ষেত্রে এবং বুদ্ধির জগতে বৈষম্য সত্ত্বেও মানুষ জন্মসূত্রে সৎ প্রকৃতির এবং সবাই সমান। বিষয়টি তাই গুরুত্ব সহকারে বিবেচনার দাবি রাখে।

বিভিন্ন ধর্মপুরুষ কিংবা এ ধরনের সমাজবিজ্ঞানীদের এমত উক্তি হল আসলে তাঁদের বিষয়ীগত, মানস-কল্পনপ্রসূত, অবস্থানযুক্ত অথবা ব্যক্তিগত নৈতিক ভাবনার ফলশ্রুতি। তা সমাজ বিবর্তনের ধারা সমূহের সাথে সংশ্লিষ্ট ও নিহিত প্রবণতাগুলির বস্তুনিষ্ঠ নিরীক্ষণের ফসল নয়। (জ্ঞাতা, জ্ঞেয়ের বিভাজন বা ভেদকে অন্তত সরলার্থে বাস্তব, স্বাভাবিক (Perse) বলে মান্যতা প্রদান করে)। জর্জ অরওয়েলের (১৯০৩-১৯৫০—আসল নাম এরিক আর্থার মিলার) বিখ্যাত 'পশুদের খামার' (অ্যানিমেল ফার্ম)-এর সাথে সুর মিলিয়ে বলতে হয়, 'সব পশুই সমান, কিন্তু কিছু কিছু পশু অন্যদের তুলনায় বেশি সমান।' মানুষের ক্ষেত্রেও সেই একই কথা। অর্থাৎ সব মানুষ সমান হলেও কোনো কোনো মানুষ অন্য মানুষ অপেক্ষা বেশি সমান। আসলে বৈষম্যের মূল কারণ ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে বুদ্ধি-শক্তির তারতম্য ও শারীরিক শক্তিতে পার্থক্য আর তার সাথে মানুষের পূর্বোক্ত প্রকৃতিগত কাম ও বিষয়ের প্রতি আসক্তি, আপনপ্রতিষ্ঠা এবং উত্তরোত্তর আপন অবস্থার শ্রীবৃদ্ধির কামনা, অপরের ওপর প্রভুত্ব করা তথা ক্ষমতালিপ্সা এবং অপরের দৃষ্টিতে স্বীকৃতি আদায়ের বাসনা ইত্যাদি যুক্ত হয়ে অপেক্ষাকৃত বুদ্ধিমান ও শক্তিশালী ব্যক্তিদের পক্ষে অবশিষ্টের ওপর কর্তৃত্ব স্থাপন করা সম্ভব হয়। কেউ কেউ জন্মায় আদেশ করার জন্য আর কারও জন্ম হয় সেই আদেশ পালন করতে। এখানেই সূত্রপাত ঘটে বৈষম্যের প্রথম সোপান। যে বা যারা কর্তৃত্ব মানতে না আদেশ পালনে বিরোধিতা করে তার বা তাদের সাথে প্রথমোক্ত বুদ্ধিমান ও শক্তিশালীর সঙ্গে ঘটে সংঘাত। এখানে প্রাণীরাজ্যের সেই আদিমতম নিয়ম 'যোগ্যতমের উদ্বর্তন' বা (Survival of the fittest) স্বাভাবিক প্রাকৃতিক নিয়ম হিসাবে কাজ করে.

যোগ্যতমকে নির্ধারিত করে। আর বুদ্ধিমান ও শক্তিশালীর শক্তি প্রয়োগই পরিবর্তনের নির্ণায়ক বিধি হিসাবে কার্যকরী হতে শুরু করে।

সব রাষ্ট্রবিজ্ঞানী, ইতিহাসকার ও পণ্ডিতেরা এক বাক্যে স্বীকার করেন যে মানব সমাজের যাত্রা শুরু হয়েছিল গোত্রভিত্তিক খাদ্য আহরণের অর্থনীতি দিয়ে। গোত্রভুক্ত সবার যৌথ শ্রমে প্রকৃতি থেকে খাদ্য আহরণ করা, তা যৌথভাবে ভোগ করা এবং হিংস্র বন্য জন্তুর আক্রমণ-সহ প্রকৃতির প্রতিকূল শক্তির হাত থেকে যৌথভাবে আত্মরক্ষা করাই ছিল এ সমাজের সাধারণ বৈশিষ্ট্য। আগেই যেমন বলেছি জগৎ প্রপঞ্চের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল পরিবর্তনশীলতা। প্রপঞ্চ জগতে চলেছে নিত্য পরিবর্তনের স্রোত। তাই সমাজব্যবস্থাও আদিম গোত্রভিত্তিক খাদ্য আহরণের অর্থনীতিতে স্থায়ী হয়ে থাকেনি। ইতিহাসের স্বাভাবিক ও অমোঘ নিয়মেই উপযুক্ত ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়েই পরিবর্তনের সূত্রপাত ঘটে। এই পরিবর্তনের প্রথম অনুঘটক উপাদান ছিল ব্যক্তিগত সম্পত্তি বোধের আবির্ভাব। খাদ্য আহরণ, জলের উৎসের ওপর কর্তৃত্ব, পশুচারণের ক্ষেত্র ইত্যাদির রক্ষণ ও সম্প্রসারণের প্রশ্নে গোত্রে গোত্রে সংঘর্ষ ছিল গোত্রভিত্তিক খাদ্য আহরণমূলক অর্থনীতির সাধারণ বৈশিষ্ট্য। সম্প্রসারণের প্রশ্নটি ছিল প্রধানত বংশবৃদ্ধির জৈবিক তাগিদে। কিন্তু তখনও পর্যন্ত গোত্রের অধিকারে প্রকৃতির সব সহায়সম্পদ ছিল গোত্রের যৌথ মালিকানাধীনে। কিন্তু যেদিন থেকে বুদ্ধিমান ও শক্তিশালী কোনো ব্যক্তি বা গোষ্ঠী শক্তির আরোপ করে প্রকৃতির সহায়সম্পদ উপায় ও উপকরণ ইত্যাদিকে আমার বা আমাদের বলে স্ব-কুক্ষিগত করছে এবং অপরকে তার ব্যবহার থেকে বহিষ্কার করতে সক্ষম হয়েছে, তখন থেকেই উদ্ভূত হয়েছে ব্যক্তিগত সম্পত্তি ও মালিকানাত্বের প্রশ্ন আর তার সাথে সাথে অনুভূত হয়েছে ব্যক্তিগত অধিকারকে সুপ্রতিষ্ঠিত রাখা তথা সংরক্ষিত করার প্রশ্ন। কিন্তু নিরন্তর শক্তির প্রয়োগে তেমনটি করা খুবই শ্রমসাধ্য, কষ্টসাধ্য ও ব্যয়সাপেক্ষও বটে। তাই যদি সর্বজনীনভাবে এমন কোনো মূল্যসংস্কৃতি (Value System) প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হয় যাতে সেই বহিষ্কৃত অপর স্বতঃপ্রণোদিতভাবে শক্তিশালীর ব্যক্তিগত অধিকার ও মালিকানাত্বকে মান্য করবে, শ্রদ্ধা করবে এবং ঐ বস্তু বা বিষয়ের ব্যবহার থেকে নিজেকে বিরত রাখবে, তাহলে শক্তিশালী ও বুদ্ধিমানের পক্ষে তেমন ব্যক্তিগত অধিকার সংরক্ষিত রাখা অপেক্ষাকৃত সহজ হয়ে যায়। শুরু হল বুদ্ধিমান ও শক্তিশালী বিজেতার ঐহিক স্বার্থ সুরক্ষিত রাখার প্রয়োজনে ঐশী কর্তৃত্বের দাবি এবং সেই দাবির প্রেক্ষিতে বিজিত অপরের ওপর ঐশী রোষের ভীতির সঞ্চারকরণ ও সেই ধারায় ঈশ্বর ও তার ঐহিক প্রতিনিধি তথা প্রশাসক রাজা ইত্যাদির প্রতি আনুগত্য প্রতিষ্ঠার তাগিদ। এখানে উল্লেখ্য, গোত্রভিত্তিক খাদ্য আহরণের আদিম অর্থনীতিতে গোত্রাধীন মানুষ সাধারণভাবে একদিকে প্রকৃতির ভয়ঙ্কর প্রতিকূল শক্তি সমূহকে ভীতি ও শ্রদ্ধার চোখে দেখেছে, অন্যদিকে অনুকূল শক্তি অথবা মনোরম দৃশ্যাবলীকে প্রীতির দৃষ্টিতে গ্রহণ করেছে। অথচ সে সমস্ত শক্তি ইত্যাদির ওপরে তার নিজস্ব কোনো নিয়ন্ত্রণ নেই। আর এর

থেকেই আদিম মানুষের মনে ধারণা হয় যে ঐ সমস্ত শক্তি ইত্যাদির ওপর কর্তৃত্বকারী ব্যক্তিরূপী দেবতা মহা শক্তিশালী (Anthropomorphic Personal God)। তাই তার রোষ ও প্রকোপের হাত থেকে পরিত্রাণ পেতে তাকে স্তুতি করা আর খাদ্য অথবা পানীয় হিসাবে মানুষ যা কিছু ভালবাসে সেই সমস্ত খাদ্য অথবা পানীয় (যেমন সোমরস) ইত্যাদি দেবতাকে নৈবেদ্য দেওয়া। পৃথিবীর অন্যতম সর্বাধিক প্রাচীন গ্রন্থ ঋগ্বেদ হল কার্যত এমন সব স্তুতি ও তার সাথে দেবতার কাছে ধন প্রার্থনা আর সেই প্রাপ্তির উদ্দেশ্যে দেবতার কাছে স্তুতি জানানো যাতে অন্যান্য প্রতিদ্বন্দ্বী জাতি বা গোত্র ইত্যাদিকে ধংস করে তাদের ধন তিনি স্তুতিকারীদের হাতে অর্পণ করেন ইত্যাদি প্রার্থনার সংকলন। ধন প্রার্থনার মধ্যে অন্য গোত্র বা অন্য জাতিকে তথা অনার্য দস্যু বা দাস ইত্যাদি মানুষদের ধ্বংস করে তাদের ধন আর্য বংশোদ্ভূত লোকেদের হাতে তুলে দেওয়ার প্রার্থনাও সেখানে প্রবলভাবে বর্তমান। উদাহরণ—'তিনি (ইন্দ্র) বজ্ররূপ অস্ত্র নিয়ে বীরকার্যে উৎসাহপূর্ণ হয়ে, দস্যুদের নগরসমূহ বিনাশ করে বিচরণ করেছিলেন। হে বজ্রধারিন্! আমাদের স্তুতি অবগত হয়ে দস্যুর প্রতি অস্ত্র নিক্ষেপ কর; হে ইন্দ্র! আর্যগণের বল ও যশ বর্ধন কর।'[১] 'ভূরিকর্মা, দেবশ্রেষ্ঠ, অভীষ্ট দাতা, সত্যবল, ইন্দ্রের উদ্দেশ্যে আমরা সোম অভিষব করি; পথ নিরোধক চোর যেরূপ পথিকের নিকট হতে ধন কেড়ে নেয়, শূর ইন্দ্র সেরূপ ধনের আদর করে যজ্ঞবিহীন লোকের নিকট হতে সে ধন ভাগ করে নিয়ে যজ্ঞপরায়ণদের নিকট তা দান করতে গমন করেন।'[২] 'হে ইন্দ্র! তুমি শুষ্ণ, পিপ্রু, কুথর ও বৃত্রকে বধ করেছ এবং শম্বরের নগর সমুদয় বিনাশ করেছ অতএব মিত্র, বরুণ অদিতি সিন্ধু পৃথিবী ও দ্যৌঃ আমাদের রক্ষা করুন।'[৩] 'হে ইন্দ্র! কারা আর্য এবং কারা দস্যু তা অবগত হও। কুশযুক্ত যজ্ঞের বিরোধীদের শাসন করে বশীভূত কর।'[৪] ইন্দ্র অশ্বদান করেছেন, সূর্যদান করেছেন, বহু লোকের উপভোগ্য গোধন দান করেছেন, সুবর্ণময় ধন দান করেছেন, দস্যুদের বধ করে আর্যগণকে রক্ষা করেছেন।'[৫] ইত্যাদি ইত্যাদি। সুতরাং দেবতা বা ঈশ্বরের ধারণার ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়েই ছিল। এই প্রেক্ষিতেই গোত্র সমাজের শক্তিশালী ও বুদ্ধিমানেরা শক্তি ও বুদ্ধির প্রয়োগে এবং নিরন্তর ভীতি প্রদর্শনে আর তার সাথে হাতসাফাই ভেল্কি ভোজবাজি ইন্দ্রজাল ইত্যাদির আশ্রয়ে যখন ঐশী কর্তৃত্বের অথবা তার প্রতিনিধিত্বের দাবি করতে শুরু করল তখন পূর্বে প্রস্তুত থাকা ক্ষেত্রানুযায়ী বহিষ্কৃত অপরের বা ঊনজনের ওপর ক্রমে তা কার্যকরী হতে শুরু করল। পরবর্তীতে ঊনজন দের মধ্যে সুবিধাভোগী ও ক্ষমতাশালী স্বল্পের উপস্থিতিজনিত কারণে তা বিপরীতমুখী ভাবে অচিরেই ঈশ্বরবিশ্বাস ও ঈশ্বরভীতি প্রায় সর্বজনীন হয়ে গেল। কিন্তু সুবিধাভোগী গোষ্ঠী ঐ ঈশ্বরতত্ত্ব ও ভীতির সূত্রে তার সুবিধা কর্তৃত্ব বজায় রাখতে সক্ষম হল আর সেই সাথে ব্যক্তিগত সম্পত্তির অধিকারবোধ সুপ্রতিষ্ঠিত হল। এর আগে গোত্রভুক্ত সমাজের যা কিছু সহায়সম্পদ যেমন গৃহপালিত পশুসম্পদ, বন্য জন্তু-জানোয়ারের হাত থেকে রক্ষা পাওয়া অথবা অন্য গোত্রের বিরুদ্ধে লড়াই করার হাতিয়ার সমূহ

তা পাথর লাঠি বা তীর ধনুক ইত্যাদি যাই হোক না কেন সবই গোত্র বা গোষ্ঠীর যৌথ সম্পদ ছিল। সে সব গোত্রভুক্ত কোনো সদস্যের ব্যক্তিগত সম্পদ ছিল না। কিন্তু পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে তা আর যৌথ সম্পত্তি বলে বিবেচিত হওয়া বন্ধ হল। এখন থেকে তার নিয়ন্ত্রণভার কর্তৃত্বে অধিষ্ঠিত ক্ষমতাশালী গোষ্ঠীর এক্তিয়ারে চলে গেল। এখন থেকে হাতিয়ার ব্যবহার করার ক্ষমতা বিশেষ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ও কর্তৃত্ব কর্তৃক নিযুক্ত ভাড়াটিয়া তথা বেতনভুক লড়াকুদের হাতে চলে গেল। যে সমস্ত ভাড়াটিয়া লড়াকুরা ধর্মীয় নৈতিকতার অধীনে সুবিধার অংশ পাওয়ার অধিকারে (যেমন বিজিত গোত্রের নিকট হতে লুণ্ঠিত সম্পদ ইত্যাদির অংশবিশেষের অধিকার পাওয়া ইত্যাদির শর্তে) কর্তৃত্বের আদেশ পালনে দায়বদ্ধ থাকবে। একদিকে ব্যক্তিগত ও গোষ্ঠীগত সম্পত্তিবোধের প্রতিষ্ঠা এবং শক্তি ও ভীতি প্রয়োগে ধর্মাশ্রয়ী সহায়ক নৈতিকতা প্রতিষ্ঠা এবং তার সাথে কর্তৃত্বকারী সুবিধাভোগী কৃর্তৃক ভাড়াটিয়া সৈন্য নিয়োগ, অন্যদিকে নিযুক্ত হতে থাকল বৃত্তিভোগী পুরোহিতকুল। শেষোক্তদের ভূমিকা হল সুবিধাভিত্তিক নতুন বিধি-ব্যবস্থাকে নতুন নৈতিকতায় প্রতিষ্ঠিত করে প্রচার চালানো। শক্তির প্রয়োগে এবং নবপ্রতিষ্ঠিত ধর্মীয় নৈতিকতার অধীনে রচিত হতে থাকল ব্যক্তিগত সম্পত্তি রক্ষার, বিজিত গোত্র হতে লুণ্ঠিত প্রজননক্ষম সুন্দরী নারীদের ওপর অধিকার, একইভাবে লুণ্ঠিত সম্পদের ভাগ-বাটোয়ারা ইত্যাদি বিষয়ে নতুন নতুন বিধি ইত্যাদির। শুরু হল রাষ্ট্র-ব্যবস্থার আদিমতম সংস্করণ। এ সব বিষয়ে এবার মানুষের ইতিহাসে নথিভুক্ত বিভিন্ন দলিলের পৃষ্ঠায় কিঞ্চিৎ দৃষ্টিপাত করা যাক।

ঐশী কর্তৃত্ব অথবা প্রতিনিধিত্বের দাবি ও তৎসহ ঐশী অলৌকিক ক্ষমতার প্রসঙ্গের উল্লেখ বাইবেলের ওল্ড টেস্টামেন্টের (তোরা) যুগ থেকেই সেমিটিক জাতির বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থে পাওয়া যাবে। আর সেই সাথে শক্তিশালী বিশেষত সেমীয় গোত্রকে সম্পদ বা ভূমিখণ্ড বা দেশ প্রদানের ঐশ্বরীয় প্রতিজ্ঞা ও প্রতিশ্রুতির উল্লেখও পাওয়া যাবে সেখানে। পূর্বপুরুষ ইব্রাহিমের (আব্রাহাম) কাছে দেশখণ্ড দানের ঐশ্বরীয় প্রতিজ্ঞা ও প্রতিশ্রুতির উল্লেখ ওল্ড টেস্টামেন্টের বহু স্থানে দেখতে পাওয়া যাবে এবং এমন প্রতিশ্রুতির দাবিতে অন্য জাতি অথবা গোত্রের ভূমিখণ্ড জবরদখল করতে ঐশ্বরীয় উৎসাহদানের ইঙ্গিতও সেখানে প্রবলভাবে উপস্থিত (যেমন মুসা বা মোজেজের নেতৃত্বে ইহুদিরা মিশর হতে নিষ্ক্রান্ত হওয়ার পর সিনাই উপত্যকায় দিশাহীন ঘুরে বেড়ানোর সময় প্রথমে তারা অ্যামোরাইটদের রাজা শিহনকে হত্যা করে। তার পরে মুসা তার অনুসারীদের কাছে ঈশ্বরের আদেশ শোনালেন এই বলে, 'তোমরা ঘুরে দাঁড়াও আর যাত্রা শুরু কর, আমোরীয়দের পাহাড়ে যাও, যাও আশপাশের সব সমতলভূমিতে, পাহাড়ে আর সমতলে, দক্ষিণে আর সমুদ্রতীরে, ক্যাননীয়দের দেশে আর লেবাননে, এমনকি দূরের ইউফ্রেটিস নদী পর্যন্ত।' 'দেখ, তোমাদের সম্মুখে বিশাল ভূমি বিস্তীর্ণ করেছি, যাও তা দখল কর। কেননা প্রভু তোমাদের পূর্বপুরুষ—ইব্রাহিম, ইসহাক এবং ইয়াকুব-এর কাছে প্রতিজ্ঞা করেছিলেন যে তাঁদের পরে তাঁদের বংশধরদের এ ভূমি

দেওয়া হবে।'—ডিউট্যারোনমি : ১:৭-৮। কিংবা 'দেখ, তোমাদের ঈশ্বর প্রভু তোমাদের সামনে এই ভূমি বিস্তীর্ণ করেছেন, যাও তা দখল কর, কেননা তোমাদের পূর্বপুরুষদের প্রভু ঈশ্বর তোমাদের এ কথা বলছেন যে তোমরা ভয় পেয় না মুষড়ে পড় না।' ডিউ. ১:২১। এই একই দাবিতে আমরা দেখতে পাব শক্তিশালী ইজরায়েলি গোত্র কীভাবে প্রতিপক্ষকে যুদ্ধে পরাভূত করে, হত্যা করে, তাদের সহায়সম্পদ জবর-দখল করছে, লুণ্ঠন করছে, শিশুসহ সব পুরুষকে হত্যা করে শুধু মাত্র সুন্দরী কুমারীদের নিজ গোত্রের অন্তর্ভুক্ত করে নিচ্ছে অথবা অগ্নি সংযোগে তাদের নগর ধ্বংস করছে; আর সবই তো ঐশ্বরীয় নির্দেশ বলে উল্লেখিত হয়েছে। কোথাও কোথাও সে বর্ণনা অতি বীভৎস আর হৃদয়বিদারকও বলে মনে হবে। যেমন—"আর ঈশ্বর মুসাকে বললেন : 'ইহুদিদের পক্ষে মিদীয়দের বিরুদ্ধে প্রতিশোধ গ্রহণ কর। তার পরে তোমাদের নিজেদের লোকেদের সাথে মিলিত করা হবে।' ...'আর তারা মুসার প্রতি ঈশ্বরের আদেশমতো মিদীয়দের বিরুদ্ধে লড়াই করল এবং সব পুরুষকে হত্যা করল। 'তারা অবশিষ্ট লোকেদের সাথে মিদীয়দের রাজাদের হত্যা করল—এভি, রেকিম, জুর, হুর এবং রেবা, পাঁচজন মিদীয়দের রাজা। বিওরের পুত্র বালামকে তারা তরবারি দিয়ে হত্যা করল। 'আর ইজরায়েলের সন্তানেরা মিদীয়দের নারীকুলকে তাদের শিশুদের-সহ বন্দী হিসাবে গ্রহণ করল, আর তাদের সবরকম গরুবাছুর ও ধনসম্পদ লুটের মাল হিসাবে আত্মসাৎ করল। 'তারা আরও তাদের সব নগর ও দুর্গ সমূহকে আগুন দিয়ে ভস্মীভূত করল।" ...'"সুতরাং তোমরা এখন সমস্ত পুরুষ শিশুকে হত্যা কর, আর বিয়ে হওয়া অথবা কোনো পুরুষের সাথে দৈহিক সম্পর্ক হওয়া স্ত্রীলোকেদের প্রত্যেককে হত্যা কর' 'পরন্তু যে সমস্ত যুবতী মেয়ের সাথে কোনো পুরুষের দৈহিক সম্পর্ক হয়নি তাদের সকলকে তোমাদের নিজেদের জন্য জীবিত রাখ"...."এখন প্রভু মুসার সাথে এই বলে কথা বললেন : 'তোমরা আর প্রধান পুরোহিত ও সমাবেশের প্রধান পিতৃব্যক্তিরা—মানুষ আর পশু সব রকম লুঠ করে সংগৃহীত জিনিসকে গণনা কর;' 'আর লুঠের মালকে দুই ভাগে ভাগ কর, এক ভাগ যারা যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিল, যুদ্ধের জন্য বেরিয়েছিল; আর অন্য ভাগ সমাবেশের সমস্ত লোকজনদের জন্য।"—নাম্বারস : ৩১:১-২, ৭-১০, ১৭-১৮, ২৬-২৭; কিংবা "এখন জেরিকোর উল্টোদিকে জর্দানের পাশে মোয়ারের সমভূমিতে প্রভু ঈশ্বর মুসার সাথে এই বলে কথা কইলেন : 'ইজরায়েলের সন্তানদের সাথে কথা কও, এবং তাদের বল: 'যখন তোমরা জর্দানকে পেরিয়ে ক্যাননীয়দের ভূমিতে উপস্থিত হবে, তখন তোমরা তোমাদের সম্মুখের সব অঞ্চলের অধিবাসীদের সেখান থেকে বিতাড়িত করবে, তাদের সব খোদাই করা পাথরকে ধ্বংস করবে, তাদের সব ঢালাই করা মূর্তিকে ধ্বংস করবে, আর ধ্বংস করবে তাদের সবরকম উঁচু নির্মাণকে; তোমরা এই ভূমির সব অধিবাসীদের কাছ থেকে সব জমিজমা কেড়ে নেবে আর তোমরা সেখানে বসবাস শুরু করবে, কেননা আমিই ঐ দেশভূমিকে তোমাদের অধিকারের জন্য প্রদান করেছি।" নাম্বারস : ৩৩:৫০-

৫৩; একই ভাবে নগরের পর নগর জয় সম্পর্কে ইজরায়েলিদের প্রতি ধ্বংস, হত্যা ও লুণ্ঠন চালিয়ে যেতে উৎসাহিত করতে প্রভু ঈশ্বরের নির্দেশ বলে একই রকম আহ্বান লক্ষ্য করা যাবে ওল্ড টেস্টামেণ্ট বা তোরা গ্রন্থের অন্যত্রও। যেমন—'আর তোমাদের প্রভু ঈশ্বর যখন এই শহরকে তোমাদের হস্তে অর্পণ করবেন, তোমরা শহরের প্রত্যেক পুরুষকে তরবারির প্রান্ত দিয়ে আঘাত করবে। 'কিন্তু নারীকুল, শিশুরা, প্রাণীসম্পদ এবং শহরে যা কিছু আছে, তার সবকিছু সম্পদ, তোমরা তোমাদের জন্য লুণ্ঠন করবে; এবং তোমরা শত্রুর কাছ থেকে কেড়ে নেওয়া সবকিছুই ভোগ করবে কেননা প্রভু তোমাদের ঈশ্বরই তা তোমাদের দিয়েছেন। 'এইভাবে প্রত্যন্ত অঞ্চলে যে সব শহর আছে যা আসলে তাদের নয়, এরূপ প্রত্যেকটির সম্পর্কে তোমরা একই আচরণ করবে। 'পরন্তু প্রভু ঈশ্বর এইসব লোকেদের যে সব শহরকে তোমাদের উত্তরাধিকার হিসাবে তোমাদের কাছে অর্পণ করেছেন, তাদের কোনটিরই শ্বাস-প্রশ্বাস নেওয়া কোনো প্রাণীকেই জীবন্ত রাখবে না; 'পরন্তু তাদের সবকেই তোমরা সমূলে ধ্বংস করবে: হিত্তীয়দের আর আমোরীয়দের আর ক্যাননীয়দের আর পেরিজীয়দের আর হিভিতীয়দের আর জেবুসীয়দের, যেমনটি তোমাদের ঈশ্বর তোমাদের আদিষ্ট করেছেন,'—ডিউট্যারোনমি : ২০:১৩-১৭; ডিউ. ২১:১১-১৩ ইত্যাদি ইত্যাদি)। ভাবখানা যেন এই যে ঈশ্বর শুধু ইজরায়েলি গোত্রেরই জন্য আর অন্যদের ব্যাপারে ঈশ্বরের কোনো মাথাব্যথা নেই। ভারতের সর্বপ্রাচীন গ্রন্থ বলে বিবেচিত ঋক-বেদেও ধনের প্রত্যাশায় অন্যদের ধন কেড়ে আর্য সম্প্রদায়ভুক্ত যজ্ঞকারীদের হস্তে ন্যস্ত করতে ইন্দ্রের কাছে স্তুতি জানানো হচ্ছে অথবা যজ্ঞকারী আর্যরা এমন সংগ্রামে লিপ্ত হচ্ছে তার উল্লেখ বহু স্থানে মিলবে। যেমন—৩। 'হে প্রজ্ঞাবান (ইন্দ্র), প্রভূতকর্মা ও অতিশয় দীপ্তিমান ইন্দ্র! সকল দিকে যে ধন আছে তা তোমারই তা আমরা জানি। হে শত্রুদের পরাভবকারী ইন্দ্র! সে ধন গ্রহণ করে আমাদের দান কর; যে স্তোতৃগণ তোমাকে কামনা করে, তাদের অভিলাষ ব্যর্থ করো না। ৪। হে ইন্দ্র! দীপ্ত হব্যসমূহ ও এ সোমরস সমূহে তুষ্ট হয়ে গো এবং অশ্বযুক্ত ধন দান করে আমাদের দারিদ্র্য দূর করে প্রসন্নমনা হও। এ সোমরসে তুষ্ট ইন্দ্রের সাহায্যে আমরা দস্যুকে ধ্বংস করে এবং শত্রু হতে মুক্তি লাভ করে সম্যক রূপে অন্ন ভোগ করব (ঋক-১:৫৩:৩-৪)।' ৩। 'তিনি (ইন্দ্র) বজ্ররূপ অস্ত্র নিয়ে বীরকার্যে উৎসাহপূর্ণ হয়ে, দস্যুদের নগর সমূহ বিনাশ করে বিচরণ করেছিলেন। হে বজ্রধারিণ! আমাদের স্তুতি অবগত হয়ে দস্যুর প্রতি অস্ত্র নিক্ষেপ কর; হে ইন্দ্র! আর্যগণের বল ও যশ বর্ধন কর। ৪। বজ্রবান এবং শত্রুবিনাশী ইন্দ্র, দস্যু বিনাশের জন্য নির্গত হয়ে যে বল যশের নিমিত্ত ধারণ করেছিলেন, কীর্তনযোগ্য সে বল ধারণ করে মঘবান ইন্দ্র, স্তুতিকারী যজমানের নিমিত্ত মনুষ্যগণের যুগ সকল সূর্যরূপে সম্পাদন অর্থাৎ পরিমাপ করেন (ঋক-১:১০৩:৩-৪)।' ...'ভূরিকর্মা, দেবশ্রেষ্ঠ, অভীষ্টদাতা, সত্যবল, ইন্দ্রের উদ্দেশ্যে আমরা সোম অভিষব করি; পথনিরোধক চোর যেরূপ পথিকের নিকট হতে সে ধন কেড়ে নেয়, শূর ইন্দ্র সেরূপ ধনের আদান

করে যজ্ঞবিহীন লোকদের নিকট হতে সে ধন ভাগ করে নিয়ে যজ্ঞপরায়ণদের নিকট তা দান করেন (ঋক :১:১০৩:৬)।' শক্তির প্রয়োগে প্রকৃতির সহায়সম্পদ ভূমি ইত্যাদি দখল করে বংশবৃদ্ধির পরোক্ষ উল্লেখও ঋগ্বেদে পাওয়া যাবে, অবশ্য তা ব্যক্তিরূপী দেবতার কাছে প্রার্থনার আকারে—'হে ইন্দ্র ও বরুণ! তোমরা রাতে রক্ষাযুক্ত হয়ে শত্রুগণকে হিংসা করে অবস্থান কর। যেন আমরা পুত্র, পৌত্র ও উর্বরা ভূমি লাভ করতে পারি এবং বহুকাল সূর্য দেখতে পাই' (অর্থাৎ দীর্ঘজীবী হই)—ঋক—৪:৪১:৬। উল্লেখ্য আর্যরা ভারতবর্ষে এসে রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক নেতৃত্ব স্থাপন করার পর নিজেদের মনুর অপত্য অর্থে 'মানব', 'মনুষ্য' বা 'মানুষ' বলে অভিহিত করেছে। কিন্তু আগে থেকেই স্থানীয় অধিবাসীদের সেই একই অর্থে মানুষ বলে অভিহিত করেনি। কেননা সম্ভবত আর্য আগমনের পূর্ব থেকেই স্থানীয় ভাষায় মানুষ অর্থে 'দাস' শব্দ ব্যবহৃত হত। আর্যরা তাই স্থানীয় অধিবাসী সদস্যদের 'মানুষ' অর্থে 'দাস' শব্দই ব্যবহার করেছে। ঋক বেদেও বক্তব্যের স্পষ্ট ইঙ্গিত আছে। 'ইন্দ্র : পূর্ভিদাতিরদ্দাসমর্কৈর্বিদদ্বসুর্দয়মানো বিশত্রূন্। বহ্মজুতস্তন্বা বাবৃধানো ভূরিদাত্র আপৃণদ্রোদসী উভে।।১। মঘস্য তে তবিষস্য প্র জুতিমিয়র্মি বাচমমৃতায় ভূষন্। ইন্দ্র ক্ষিতীনামসি মানুষীণাং বিশ্বাং দৈবীনামুত পূর্বাষাবা।।২। অর্থ—১। 'পুরভেদী, মহিমাসূচক ধনযুক্ত ইন্দ্র, শত্রুদের হিংসা করে তেজ দ্বারা দাসকে জয় করেছেন! স্তোত্র দ্বারা আকৃষ্ট, বর্ধিত শরীর ও বহু অস্ত্রধারী ইন্দ্র দ্যাবাপৃথিবীকে পরিপূর্ণ করেছেন। ২। হে ইন্দ্র! তুমি পূজনীয় ও বলবান, তোমাকে অলঙ্কৃত করে অন্নের জন্য তোমার প্রেরিত স্তুতি উচ্চারণ করছি। তুমি মানুষ এবং দেবগণের অগ্রগামী।'' ঋক-বেদের ৩য় মণ্ডলের এগার অক্ষরযুক্ত চতুষ্পাদী ত্রিষ্টুপ ছন্দে রচিত ৩৪ নং সুক্তের ১ম ও ২য় এই ঋকদ্বয়ে লক্ষ্যণীয় যে মানুষ অর্থে যথাক্রমে ১ম ঋকের প্রথম পাদে অনার্য মানুষদের মানুষ বলতে 'দাস' শব্দ ও ২য় ঋকের প্রথম পাদে ঐ মানুষ অর্থে স্তুতিকারী 'মানুষ' শব্দ প্রযুক্ত হয়েছে। শব্দ দুটি এখানে 'দাস' জাতি ও 'আর্য' জাতি অর্থে প্রযুক্ত হয়নি। কেননা ১ম ঋকে বহুবচন 'দাসদের' কথা বলা হয়নি, অন্যদিকে ২য় ঋকেও 'মানুষের' কথা বলা হয়নি, যদিও পরক্ষণেই 'এবং দেবগণের' কথা বলা হয়েছে। আর স্তোত্রপাঠকারী ও স্তুতিকারীরা আর্য সম্প্রদায়ভুক্ত, অনার্যরা স্তোত্রপাঠকারী ছিল না। আরও উল্লেখ্য, পৃথিবীর অন্যান্য ভাষাতেও মানুষ অর্থে এরকম পৃথকাত্মক দুই শব্দের প্রসঙ্গ বিদ্যমান আছে। সে প্রসঙ্গের বিস্তার এখানে অপ্রয়োজনীয়। সে যাই হোক সেমিটিক ধর্ম সমূহের মধ্যে নবীনতম সদস্য ইসলামের উৎপত্তি কালেও নব ধর্মে দীক্ষিত মুসলমান ও অন্যান্য সম্প্রদায়ের মধ্যে যুদ্ধের সময় লুণ্ঠিত দ্রব্য সামগ্রীর একাংশ সাধারণত যুদ্ধে অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে বিতরণ করা হত এবং অপর অংশ নব প্রসারমান সম্প্রদায়ের পরিচালন ব্যবস্থা ও পরে রাষ্ট্রীয় কোষাগার বা ধনভাণ্ডারে জমা করা হত। এরূপ কোষাগার বা ধনভাণ্ডারে সঞ্চয়কৃত সম্পদকে পরে 'গানিমাত আল খয়ের' বা মঙ্গলের নিমিত্ত সঞ্চয়কৃত ধন বলে পরিচিত হয়। এমন সম্পদের

বৈধতার জন্য নানা সময়ে মানবীয় বৃত্তি সম্পন্ন ব্যক্তি-রূপী ঈশ্বরের (Anthropomorphic Personal God) ইচ্ছার প্রসঙ্গ টানা হয়েছে। এরূপ করুণা, দয়া, ক্ষমাশীলতা, ক্রোধ, পছন্দ ও অপছন্দ এবং ইচ্ছাশক্তি ইত্যাদি মানবীয় বৃত্তি ও গুণের অধিকারী ব্যক্তি-রূপী আল্লাহর বাণী বলে গৃহীত কোরানের সমজাতীয় কিছু আয়াত বা বাক্যের প্রসঙ্গ টানা হয় এসব বিষয়ে। আর যেহেতু সেমিটিক ধর্ম সমূহের মধ্যে বয়সে নবীন ও সর্বকনিষ্ঠ তাই কিছুটা পরিশীলিত ভাষায় ব্যক্ত হয়েছে এমনতর বাক্য সমূহ। সমকালীন সময়ে যুদ্ধ-কালে বা তৎপরবর্তী সময়ে লুণ্ঠনকে বৈধ বলেই গ্রহণ করা হত বিভিন্ন সেমীয় ও আরব গোত্রের মধ্যে। এমন লুণ্ঠন অনৈতিক বলে তখন মনে করা হত না; যা বর্তমানের নৈতিকতায় অগ্রহণযোগ্য বলেই মনে হবে। এ প্রসঙ্গের প্রতিফলনও ঘটেছে আল-কোরানের সুরা (পরিচ্ছেদ) কিংবা বিভিন্ন আয়াতে (বাক্যে)। 'আনফাল' বা 'যুদ্ধে লব্ধ ধন' নামাধীন একটি সুরার প্রথম বাক্যটি এ প্রসঙ্গে লক্ষণীয়—'লোকে তোমাকে যুদ্ধলব্ধ সম্পদ সম্বন্ধে প্রশ্ন করে, বল, "যুদ্ধলব্ধ সম্পদ আল্লাহ ও রসুলের, সুতরাং আল্লাহকে ভয় কর এবং নিজেদের মধ্যে সদ্‌ভাব স্থাপন কর, যদি তোমরা বিশ্বাসী হও তবে আল্লাহ্ ও তাঁর রসুলের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ কর" (আল-কোরান—৮:১:১)। কিংবা ভিন্নতর প্রসঙ্গে উক্ত হলেও এই আয়াতটিও লক্ষণীয়— "জালেকা ফাজ্‌লুল্লাহে ইউতিহে মাইয়াশাআউ, ওয়া'ল্লাহু জুল ফাজ্‌লে'ল আজিম।" অর্থাৎ 'ইহা আল্লাহর অনুগ্রহ। তিনি যাহাকে চাহেন, ইহা দান করেন এবং তিনি বড়ই অনুগ্রহকারী।' (আল কোরান—৬২:১:৪)। উল্লেখনীয় এ পর্যন্ত বিভিন্ন নথিভুক্ত ধর্মগ্রন্থ হতে যে সব উদ্ধৃতির আশ্রয় নেওয়া হয়েছে তার মূলে কিন্তু সেই স্বার্থাশ্রিত শক্তির প্রয়োগে পৃথিবীর সহায়-সম্পদ উপায়-উপকরণ কুক্ষিগত করে বংশবৃদ্ধির জৈবিক তাগিদে সহিংস প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হওয়া; যে প্রতিযোগীয় শক্তির প্রয়োগে প্রতিপক্ষকে তেমন সহায়সম্পদ থেকে উচ্ছেদ করে, অপসারিত করে তার ব্যবহার থেকে প্রতিপক্ষকে বহিষ্কৃত রাখার নিরন্তর প্রয়াশ। আর তার বৈধতার প্রয়োজনে সব ক্ষেত্রেই এরূপ ঐশী কর্তৃত্বের দাবি।

ক্ষমতায় আসীন ব্যক্তি অথবা গোষ্ঠী কর্তৃক শুধু ঐশী কর্তৃত্বের দাবিই নয়, একইভাবে এ সমস্ত ব্যক্তি হয় নিজেরা ঐশী অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী বলেও প্রচার করেছেন অথবা তাঁদের নামে পরবর্তীতে এমন অলৌকিক ক্রিয়াকর্মের কাহিনী যুক্ত হয়েছে। অন্যতম প্রাচীন গ্রন্থ ওল্ড টেস্টামেন্ট বা তোরা'য় বুদ্ধির কাছে অগ্রহণযোগ্য বহু অলৌকিক ঘটনারও উল্লেখ পাওয়া যাবে। যেমন বাইবেলের ওল্ড টেস্টামেন্টের 'এক্সডাস' বা 'নিষ্ক্রমণ' পরিচ্ছেদে মুসা বা মোজেসের নেতৃত্বে মিশর থেকে ইহুদিদের প্যালেস্টাইনের উদ্দেশে নিষ্ক্রমণ পর্বে মিশরীয় রাজা ফাঁরাও বা ফেরাউন সে প্রচেষ্টায় বাধা দিলে মুসা অলৌকিক ক্ষমতা প্রদর্শন করে তাঁকে ভীতসন্ত্রস্ত করে নিষ্ক্রমণ কাজে তাঁকে বাধ্য করা ও এ বিষয়ে ঐশ্বরীয় সহায়তা লাভের প্রসঙ্গের সবিস্তার বর্ণনা আছে সেখানে। মুসার হস্তস্থিত যষ্টি মৃত্তিকায় নিক্ষিপ্ত হলে তার অতি বৃহৎ অজগর সর্পে

রূপান্তরিত হওয়া বা তা জলে নিক্ষিপ্ত হলে সারা মিশরের জলরাশি রক্তে রূপান্তরিত হওয়া এবং ফলশ্রুতিতে সমগ্র মৎস্যকুলের প্রাণনাশ, ইহুদিদের প্যালেস্টাইনে নিষ্ক্রমণ কালে ঐশ্বরীয় কৃপায় নীল নদের জলরাশি বিভক্ত হয়ে সুগম্য নিষ্ক্রমণ পথের আবির্ভাব হওয়া অথচ অনুসরণকারী মিশরীয় সৈন্যদের একই পথে সলিল সমাধি লাভ ইত্যাদি বহু অলৌকিক ঘটনার উল্লেখ পাওয়া যাবে (এক্সডাস : ৪:৩-৪, ৪:৯: এক্স. :৭:৯-১০; এক্স. :৭:১২,৭:১৭-১৯ ইত্যাদি ইত্যাদি)। কিংবা নিউ টেস্টামেন্টের বহু স্থানে যীশু কর্তৃক শুধুমাত্র হাতের স্পর্শে বহু মারাত্মক পীড়িত, কুষ্ঠ রোগগ্রস্ত, খঞ্জ ইত্যাদি ব্যক্তিকে সম্পূর্ণ নিরাময় ও সুস্থ করা; মৃতকে হস্ত স্পর্শ দ্বারা জীবনে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করা অথবা সাগরের জলের ওপর দিয়ে হেঁটে যাওয়ার মতো বহু অলৌকিক ঘটনারও উল্লেখ মিলবে (ম্যাথিউ:৪:২৩-২৪, ম্যাথিউ:৮:৩, ম্যাথিউ:২০-২২, ম্যাথিউ:১৮-২৫, ম্যাথিউ:১৪:২৫ ইত্যাদি ইত্যাদি)। ঋক-বেদেও এমন কিছু কিছু অলৌকিক ঘটনার উল্লেখ পাওয়া যাবে—যেমন দেবতা অশ্বিদ্বয় দ্বারা তিন ভাগে বিচ্ছিন্ন শ্যাব ঋষিকে জীবিত করার উল্লেখ (ঋক-১:১১৭:২৫) ইত্যাদি। বর্তমানেও ঐশী কর্তৃত্বের দাবি করে আমাদের দেশেও কোনও এক আলখেল্লাধারী সাধুবাবা জনসমক্ষে আকাশের শূন্যগর্ভে হাত দুলিয়ে মহাকাশ থেকে বড়লোক শিষ্যদের অথবা রাষ্ট্রীয় কর্ণধার স্থানীয় ব্যক্তিদের হীরের আংটি কিংবা সোনার হার উপহার দিচ্ছেন এমন ঘটনাও খবরের কাগজে ফলাও করে ছাপা হয়। (যদিও যুক্তিবাদীরা এমন ঘটনার ভেল্কিবাজি উদ্‌ঘাটিত করেছেন। আর যদিও বাবা ভালই জানেন যে শূন্যগর্ভ হতে কোনো সৎ বস্তুর উৎপাদন সম্ভব নয়; যে তত্ত্বের সরব অনুরণন শ্রীগীতাতে—গীতা-২:১৬, এবং সাংখ্যসূত্রে দেখতে পাওয়া যাবে। অথবা ইউরোপীয় তত্ত্বে পাওয়া যাবে Ex Nihilo Nihil Fit), এইভাবে বুদ্ধিমান ও শক্তিশালী কর্তৃক শক্তির আরোপে সংখ্যাগুরু অপরকে প্রকৃতির সহায়সম্পদের যৌথ ব্যবহার থেকে বহিষ্কারকরণ এবং ঈশ্বরদত্ত বলে দাবি করা ব্যক্তিগত সম্পত্তি-বোধের প্রতিষ্ঠা, এতদিনের গোত্রভিত্তিক হাতিয়ারের ওপরে গোত্রের যৌথ মালিকানাত্ব ও যৌথ ব্যবহারের পরিবর্তে ক্ষমতায় আসীন শক্তিশালী কর্তৃক বেতনভুক পেশাদারি যোদ্ধা নিযুক্তির প্রথা প্রবর্তন, শক্তির আরোপে ও ঐশী অলৌকিক ক্ষমতার দাবিতে ক্রমে শক্তিশালী বুদ্ধিমানেরা বহিষ্কৃত এবং সেই হেতু হতোদ্যম ও অসহায় সংখ্যাগুরুর ওপর ঐশী ভীতির প্রতিষ্ঠা করা আর তার সাথে সাধারণভাবে ধর্মভিত্তিক এক সাধারণ মূল্য-সংস্কৃতির প্রায় সর্বজনীন এবং সুনিশ্চিত প্রতিষ্ঠা সম্ভব হল। প্রচারিত হল ঈশ্বর প্রদত্ত ব্যক্তিগত সম্পত্তির মালিকের বিনানুমতিতে ভোগদখল করা হবে মহা পাপ, যার ফলশ্রুতি পরকালে কঠিন শাস্তির অধীন হতে হবে অথবা মনুষ্যেতর যোনিতে জন্মগ্রহণ করে অসীম ক্লেশ ভোগ করতে হবে। এই সূত্রেই সাধারণের বিশ্বাস উৎপাদন এবং একই ধারাবাহিকতায় আপন স্বার্থ সংবলিত নতুন বিধি-বিধানের প্রবর্তন। এই সংস্কৃতির অধীনে ব্যক্তিগত অধিকারভুক্ত সম্পত্তির ভোগদখল হতে বহিষ্কৃত অপর স্ব-প্রণোদিত হয়ে নিজেকে বিরত রাখতে শুরু করল।

এই পর্যায়েই সম্ভবত ঐ শক্তির আরোপে নারী-পুরুষের সম্পর্ক ব্যক্তিগত বলে স্বীকৃতি পেল (স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক)। ক্রমে আধিপত্যকারীর সুবিধা ও অগ্রাধিকার সুনিশ্চিত করতে আইন, ধর্মীয় মূল্য-সংস্কৃতি আর তার সাথে শ্রেণীভিত্তিক রাষ্ট্র কাঠামোর প্রতিষ্ঠা বৈধতা অর্জন করল। এই মূল্য-সংস্কৃতির ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে আবির্ভূত হল বৃত্তিধারী পুরোহিতকুল। সমাজ ব্যবস্থার বহমানতার প্রশ্নেই শুরু হল রাজা ও শাস্ত্র হাতে পুরোহিতকুলের পারস্পারিক মিথোজীবিতা। প্রসঙ্গান্তরে রবীন্দ্রনাথ যাকে 'বেদ ব্রাহ্মণ রাজা ছাড়া আর, ভবে নাই কেউ পূজা করিবার, এই কটি কথা যেন মনে সার, ভুলিলে বিপদ হবে।' বলে অভিহিত করেছেন।

যাই হোক গোত্রভিত্তিক আদিম সমাজের কলেবর বৃদ্ধিতে এবং পশুচারণের সাথে কৃষি ব্যবস্থার সূত্রপাতে প্রয়োজন হয়েছিল অতিরিক্ত শ্রমশক্তির। এতদিন নিয়ম ছিল পরাজিত গোত্রের পুরুষ সদস্যদের হত্যাসাধন। পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে শুরু হল বিজিত গোত্রের নেতৃস্থানীয় বুদ্ধিমান ব্যক্তিদের হত্যা করে অবশিষ্ট সক্ষম পুরুষদের দাসে পরিণত করার প্রথা। পরাজিত দাসেরা শুধু বেঁচে থাকার অধিকারের বিনিময়ে বিজেতা শক্তিশালী গোষ্ঠীর সুবিধার্থে প্রয়োজনীয় শ্রম ও সেবা দিতে বাধ্য থাকবে। অন্যথায় তাদের হত্যা করা হবে, এই-ই বিধি-ব্যবস্থা এবং বিজেতার দৃষ্টিতে তা বৈধ। স্মর্তব্য গ্রিসের গণতান্ত্রিক নগর সভ্যতার যুগেও কিন্তু শ্রমিক কৃষক ও দাসদের নাগরিক অধিকার স্বীকৃত ছিল না। এমনকি সমাজে আত্মার ধারণা থাকলেও শ্রমজীবী মানুষদের আত্মার স্বীকৃতি ছিল না। যাই হোক গোত্র প্রথায় সমাজ ব্যবস্থা বদ্ধ হয়ে থাকলে বিস্তীর্ণ অঞ্চলব্যাপী বৃহৎ সমাজ স্থাপনের অমোঘ ঐতিহাসিক দাবি ব্যাহত হয়। ফলে পুরনো গোষ্ঠীভিত্তিক ব্যক্তিরূপী ঈশ্বর (Personal God) ও ধর্ম ব্যবস্থা তথা মূল্য-সংস্কৃতির পরিবর্তে সর্বজনীন আবেদনকারী, ঐক্যসাধনী ও সমন্বয়কারী নতুনতর ধর্ম-সংস্কৃতির প্রয়োজন অনুভূত হল এবং অবশ্যই তা ঈশ্বরতত্ত্ব ও ব্যক্তিগত সম্পত্তির পবিত্রতা ও ধারাবাহিকতার পরিপূরক সহায়ক মূল্য-সংস্কৃতি হিসাবে। আর সবই অবশ্য সমাজে ন্যায়, সুবিচার ও নিয়ম প্রতিষ্ঠার নামে। এই পরিবর্তিত ধর্ম-ব্যবস্থায় ব্যক্তিরূপী ঈশ্বর হলেন গুণান্বিত। তিনি সর্বশক্তির আধার, বহু গুণের অধিকারী, করুণাময়, আর্তের ডাকে তিনি সাড়া দেন, তিনি দয়াময়, ক্ষমাশীল, আবার প্রয়োজনে কোপ-প্রবণ অর্থাৎ ন্যায়বিচারী হলেও তিনি অন্যায়কারীকে শাস্তি দেন, পক্ষান্তরে তাঁর নির্দেশিত পথে চললে পরকালে তিনি পারিতোষিকের ব্যবস্থা করেন এবং তাঁর পছন্দ-অপছন্দও বর্তমান ইত্যাদি ইত্যাদি। তিনি সমগ্র মানব জাতি তথা সমগ্র জীবকুল ও ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টিকর্তা। তাই সব গোত্রের বা সব জাতির মানুষই তাঁর কাছে সমান, শর্ত শুধু তাঁর নির্দেশিত পথে চলা এবং তাঁর পছন্দ করা ধর্মের অধীন হওয়া। এমন নৈতিকতাপূর্ণ খৃষ্টান ও ইসলাম ইত্যাদি ধর্ম তাই বিস্তীর্ণ অঞ্চলব্যাপী বৃহৎ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার বনিয়াদ রচনা করতে সক্ষম হল। আর আগে থেকেই সমাজ-প্রতিরক্ষার হাতিয়ারে যৌথ মালিকানাত্বের অবসান হওয়ায় এবং তার সাথে ক্ষমতায় আসীন আধিপত্যকারী ব্যক্তি

বা গোষ্ঠী কর্তৃক যোদ্ধা নির্বাচন ও নিযুক্তির প্রথা স্বীকৃত হওয়ায় বহিষ্কৃত অপরের মধ্য থেকে শক্তিশালী ও বুদ্ধিমানের ক্ষমতায় আসীন হওয়ার পথ কার্যত রুদ্ধই ছিল। আর সুবিধাভোগীদের প্রশাসনের সাথে যুক্ত হওয়ার প্রাথমিক শর্ত হল প্রচলিত বিধি-ব্যবস্থার প্রতি ও প্রশাসনে অধিষ্ঠিত ব্যক্তির (রাজার) ঐহিক ও পারত্রিক (ঐশ্বরত্বের অথবা ঐশী কর্তৃত্বের প্রতিনিধিত্বের) প্রতি শর্তহীন আনুগত্য ও সেই প্রশাসন কর্তৃক মনোনীত ও নির্বাচিত হওয়া। রুশো রাষ্ট্র ব্যবস্থার উৎপত্তির বিষয়ে যুগের প্রয়োজনের তাগিদে আদিম সমাজের সদস্যদের মধ্যে এক "সামাজিক চুক্তি" (Social Contract) সম্পর্কে যাই বলে থাকুন না কেন, আসলে রাষ্ট্র ব্যবস্থার উৎপত্তিতে বুদ্ধিমান ও শক্তিশালীদের ঐহিক স্বার্থ, প্রতিষ্ঠা ও বংশবৃদ্ধির জৈবিক তাগিদেই শক্তির আরোপে প্রকৃতির সহায়সম্পদকে আপন কুক্ষিগত করা ও অপরকে তার ব্যবহার থেকে বহিষ্কার করার প্রক্রিয়ায় ঐশী কর্তৃত্বের দাবি প্রতিষ্ঠা, এবং এমন সহায়সম্পদ উপায়-উপকরণকে বংশপরম্পরায় পরবর্তী প্রজন্মের হাতে নির্বিঘ্নে হস্তান্তরকরণ ও তেমন ব্যবস্থার সংরক্ষণের প্রশ্নে যে নতুন বিধি-ব্যবস্থার প্রচলন করা ও সেই সূত্রে যে সমস্ত প্রাতিষ্ঠানিকতারূপ নতুন উপাদানের সূত্রপাত হয় তাই হল রাষ্ট্র ব্যবস্থার আদিমতম সংস্করণ। যে ব্যবস্থার মূলে বুদ্ধিমান ও শক্তিশালীর ঐহিক স্বার্থে দৈহিক ও বুদ্ধিশক্তির নগ্ন প্রয়োগই ছিল মৌল উপাদান। রাষ্ট্রের উৎপত্তি তাই সামাজিক চুক্তিপ্রসূত নয় তা সহজেই বোধগম্য হয়।

কোনো বিশেষ গোষ্ঠী বা গোত্রের আধিপত্যে অতি প্রাচীনকালেও বৃহৎ বৃহৎ সাম্রাজ্য সম্ভব হয়েছিল বৈকি। যেমন প্রাচীন মিশরে কিংবা প্রাচীন চীনে। কিন্তু তেমন সাম্রাজ্য সমূহকে দেশ ও কালে বিস্তীর্ণ ও দীর্ঘস্থায়ী করা সম্ভব হয়নি। কেননা কোনো বিশেষ গোত্রভুক্ত সমাজ অপর কোনো গোত্র বা গোত্র সমূহকে শক্তি প্রয়োগে অধীন করতে সক্ষম হলেও প্রত্যেক গোত্রের ছিল আলাদা আলাদা নিজস্ব দেবতা বা দেবী (Deity) ও সংশ্লিষ্ট পৃথক পৃথক আচার সংবলিত নিজস্ব সংস্কৃতি। ফলে শক্তি প্রয়োগে অধীন করতে পারলেও দ্বিতীয়োক্ত বিজিত গোত্র সমূহকে সম্পূর্ণরূপে নিজেদের সঙ্গে অঙ্গীভূত বা আত্তীকরণ করা সম্ভব হত না। ফারাঁও (আরবি উচ্চারণে ফেরাউন) শাসিত প্রাচীন মিশরে মিশরীয়দের মধ্যে তাই ইজরায়েলিদেরকে স্বাঙ্গীকৃত করা সম্ভব হয়নি। উপযুক্ত সময়ে মুছার (মোশে বা মোজেজ—আনুমানিক খ্রিস্টপূর্ব ১৩০০-১২০০ শতাব্দীতে) নেতৃত্বে ইজরায়েলিদের মিশর পরিত্যাগ করে নীল নদ অতিক্রম করে মহানিষ্ক্রমণের তথ্য বাইবেলের ওল্ড টেস্টামেন্টেই সংরক্ষিত হয়েছে। তাই ইতিহাসের অমোঘ নিয়মে বিস্তীর্ণ অঞ্চলব্যাপী বৃহৎ সামন্ততান্ত্রিক সাম্রাজ্য স্থাপনের জন্য প্রয়োজন হয়েছিল পূর্বোল্লিখিত ঐ সর্বজনীন আবেদনের এক ধর্ম-ব্যবস্থার; যে ধর্ম-ব্যবস্থায় ঈশ্বর কোনো বিশেষ ব্যক্তি বা গোত্রের নিজস্ব ঈশ্বর নয় এবং যে ঈশ্বর সবারই সৃষ্টিকর্তা ও যাঁর কাছে সব মানুষই সন্তানসম সমান। ইতিহাসের প্রয়োজনেই তাই পত্তন হতে শুরু করেছিল সর্বশক্তিমান ও সর্বগুণান্বিত দ্বৈতার্থের ব্যক্তিরূপী ঈশ্বরের (Anthro-

pomorphic Personal God) ধারণা। যে ঈশ্বর সমগ্র বিশ্ব-সহ জীবজগৎ ও মনুষ্য জাতির সৃষ্টিকর্তা; যাঁর কাছে সব মানুষই সমান এবং যিনি ইহজগতে মানুষের কৃত কর্মানুযায়ী তার মৃত্যুর পরে তাকে বিচার করে স্বর্গসুখ প্রদান করবেন অথবা নরকাগ্নিতে নিক্ষিপ্ত করবেন (Eschatology) ইত্যাদি ধারণা সংবলিত দ্বৈতবাদী অথবা অর্ধ দ্বৈতবাদী বিশ্বদৃষ্টির ও একেশ্বরবাদী খ্রিস্ট ধর্ম, ইসলাম, যরথুষ্ট্র (আনুমানিক খ্রিস্টপূর্ব ৬২৮-৫৫১) প্রচারিত ধর্ম (Zoroasterianism) এবং মানি প্রচারিত ধর্ম (Manichaeism) (Mani 216–274AC?) প্রভৃতি ধর্ম সমূহ। পরবর্তী কালের ইতিহাসে আমরা লক্ষ্য করব এ সমস্ত ধর্ম-ব্যবস্থাকে আশ্রয় করে সামন্ততান্ত্রিক অর্থনীতির ভিত্তিতে পৃথিবীতে বৃহৎ বৃহৎ এবং দীর্ঘস্থায়ী সাম্রাজ্য স্থাপন সম্ভব হয়েছে। যদিও উৎপত্তিকালে মননের ক্ষেত্রে সামাজিক জাড্যতা হেতু (Due to social inertia) এসব ধর্মের উদ্‌গাতারা হয় সমাজে গুরুত্ব পাননি অথবা সমকালীন মানুষদের হাতে নিগৃহীত হয়েছিলেন; প্রাথমিক পর্বে যাকে বলে 'গেঁয়ো যোগী ভিখ পায় না।' তবুও পরবর্তীতে এসব ধর্ম ইতিহাসের অমোঘ প্রয়োজনে আপন স্বীকৃতি ও প্রতিষ্ঠা অর্জনে সক্ষম হয়। লক্ষণীয়, এসব ধর্মের প্রচারকরা সবাই ঈশ্বরত্ব অথবা নবী-পয়গম্বরত্বের তথা ঈশ্বরের প্রতিনিধি বা প্রেরিত পুরুষত্বের দাবি করেছেন অথবা সংশ্লিষ্ট ধর্মীয় নৈতিকতার অধীনে উদ্ভূত কায়েমী স্বার্থ আপন প্রয়োজনে কিংবা পরবর্তী অনুসারীদের ভক্তির আতিশয্যে এ সমস্ত ধর্মপ্রচারকদের ঈশ্বরের প্রতিনিধি, তাঁর সুসংবাদ বহনকারী নবী পয়গম্বর অথবা ঈশ্বরপুত্র বলে স্বীকৃতি দিয়েছে। এখানে একটি বিষয় উল্লেখ্য এই যে এ সমস্ত নবী পয়গম্বরেরা তাঁদের ব্যক্তিগত জীবনে তাঁদের সমকালীন সমাজে অতি উচ্চ আদর্শ স্থাপনে সক্ষম এবং আপন আদর্শে অতি আন্তরিক ও নিষ্ঠাবান, উচ্চ প্রতিভাসম্পন্ন ব্যক্তি ছিলেন।

প্রকৃতির পরিবর্তনশীলতার স্বাভাবিক ক্রিয়াশীলতায় ইতিহাসে গোত্রভিত্তিক সমাজ যখন তার প্রাসঙ্গিকতা হারিয়েছে, গোত্রভিত্তিক সমাজপতিদের স্থূল শক্তি প্রয়োগ ও ঐশী কর্তৃত্বের নামে অবশিষ্টের ওপর স্থূল শঠতা এবং তঞ্চকতার আশ্রয় নিয়ে যখন শোষণ ও নিপীড়নকে সমাজের স্বাভাবিক নিয়ম বলে প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়েছে তখন তার পুঞ্জিভূত ক্লেদ ও গ্লানি আর ভিন্ন ভিন্ন গোত্রের পারস্পরিক সংঘর্ষজনিত কারণে আঞ্চলিক সমাজ সমূহে সক্ষম সাধারণ জীবন যখন অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে তখনকার সেই সামগ্রিক বিশৃঙ্খল অবস্থা, অবক্ষয় ও নিষ্পেষণ থেকে পরিত্রাণের কারণে এবং এরূপ পরিস্থিতির হাত থেকে নিষ্ক্রমণের ঐতিহাসিক কারণে আর বৃহত্তর সমাজ গঠনের অমোঘ প্রয়োজনেই ভিন্ন ভিন্ন গোত্রভিত্তিক সমাজের নতুন প্রজন্মের মধ্যে সঞ্চারিত হতে থাকে নতুন মূল্য-সংস্কৃতির। ঠিক এই ঐতিহাসিক ক্রান্তিলগ্নেই এইসব নবী পয়গম্বরদের আবির্ভাব। উল্লেখ্য, যেহেতু এই ক্রান্তিলগ্নের বহুকাল আগে থেকেই গোত্রভিত্তিক সমাজে ঐশী ধারণা সর্বজনীন হয়ে গিয়েছিল সেইহেতু এসব নবী পয়গম্বরদের আর শঠতার আশ্রয় নিয়ে ঈশ্বরের ধারণাকে নতুন করে প্রতিষ্ঠা

করতে হয়নি। তাঁরা শুধু পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে এবং যুগের প্রেক্ষিতে সে ধারণাকে এবং সংশ্লিষ্ট নৈতিকতাকে সংহত পরিশীলিত ও মানবিক করে তুলেছেন। সমাজে বঞ্চিত ও বহিষ্কৃত অধিকাংশ মানুষই এই সব নতুন ধর্মের অধীনে আশ্রয় গ্রহণ করে। কিন্তু মনুষ্য প্রকৃতির মৌল ও জৈবিক উপাদান তথা প্রকৃতির সহায়সম্পদ উপায়-উপকরণ আপন কুক্ষিগত করে ঐহিক প্রতিষ্ঠা ও তা পরবর্তী বংশধরদের কাছে রেখে যাওয়ার আকাঙ্ক্ষা ও অপরের ওপর প্রভুত্ব করা তথা ক্ষমতালিপ্সা অটুট থেকে যায়। যারা শারীরিক শক্তিতে ও বুদ্ধিতে অপরের থেকে বেশি সমান তারা শীঘ্রই জ্ঞাতসারে অথবা অজ্ঞাতসারে নতুন ধর্মীয় নৈতিকতার সাথে নিজেদের সেই আদিম ও প্রকৃতিজ বৃত্তিকে যুক্ত করে ফেলে এবং প্রয়োজনবোধে শক্তির সাহায্যে নতুন ধর্মীয় নৈতিকতাকে নিজেদের অনুকূলে ভ্রংশিত করতে শুরু করে। ফলত নতুন ধর্ম জায়মান নতুন কায়েমী স্বার্থগোষ্ঠীর সহায়ক হয়ে পড়ে। এই প্রক্রিয়ার ক্রিয়াশীলতায় প্রকৃতির সহায়সম্পদ উপায়-উপকরণ যথা জমিজমা বৃক্ষাদি, মানুষের খাদ্য উৎপাদনকারী অথবা সেবা উৎপাদনের উপযোগী নদী অথবা অন্যান্য জলরাশি, পশুসম্পদ ইত্যাদি সবই কতিপয় ব্যক্তির অধীনে কুক্ষিগত হয়। কম সমান অপরেরা পূর্বোক্ত ব্যক্তিদের অধীনে শুধু বেঁচে থাকার জৈবিক তাগিদে বিনা পারিশ্রমিকে অথবা নামমাত্র পারিশ্রমিকে শ্রম দিতে বাধ্য হয়। এ ব্যবস্থা স্থায়ী করতে শক্তিশালী ব্যক্তিরা নতুন ধর্মীয় নৈতিকতার অধীনে সমাজের বৃহত্তর কল্যাণের নামে একই প্রক্রিয়ায় নির্বাচিত ও নিযুক্ত করতে থাকে যোদ্ধৃ-বাহিনী। আর সমগ্র দেশ বা রাজ্য জুড়ে এ ব্যবস্থা রক্ষা করার দায়িত্ব অর্পিত হয় রাজার উপর যার নিকট পূর্বোক্ত সুবিধাভোগীরা রাজাকে তার রাজ্য রক্ষার জন্য নির্দিষ্ট পরিমাণে ভাড়াটিয়া সৈন্য জোগাতে বাধ্য থাকে। জন্ম নেয় সামন্ততান্ত্রিক অর্থনীতির বনিয়াদ যার প্রধান সংস্কৃতি হল ধর্ম।

মানুষের আদিম অথবা গোত্রভিত্তিক সমাজ ব্যবস্থায় নারী-পুরুষের সম্পর্ক কেমন ছিল এ নিয়ে বিষয়টি বিতর্কের ঊর্ধ্বে নয়। স্বামী-স্ত্রীর যুগল ধারণা ও প্রথা তখন স্বীকৃত প্রথা ছিল কি না, তা নিয়েও সন্দেহের অবকাশ আছে, আর সমাজ পিতৃতান্ত্রিক না মাতৃতান্ত্রিক ছিল সে বিষয়েও বিতর্ক আছে। তবে মাতৃতান্ত্রিক সমাজের অবশেষ এখনও যে পৃথিবীর বহু সমাজের সংস্কৃতিতে বর্তমান তা পণ্ডিত মাত্রেই অবগত। আর প্রান্তিক হলেও বহুভর্তৃক সমাজ (যে সমাজে একজন স্ত্রীর সমাজ কর্তৃক স্বীকৃত একাধিক স্বামী থাকে) এখনও পৃথিবীতে বর্তমান। ভারতের সর্ব প্রাচীন গ্রন্থ ঋক-বেদেও নারীর বহুভর্তৃক প্রথার উল্লেখ আছে। 'দুজন অশ্বীদ্বয় এক স্ত্রীর সহিত নিবাসী পুরুষদ্বয়ের ন্যায় বাস করেন ও অশ্বদ্বারা সঞ্চরণ করেন।' ঋক—৮:২৯:৮। আর মহাভারতের দ্রৌপদী উপাখ্যান তো আছেই। গোত্রভিত্তিক সমাজে নারীর অবস্থান সম্পর্কে লেভি-স্ট্রৌস এর অভিমত হল গোত্রে গোত্রে প্রজননক্ষম নারীর বিনিময় করা হত। তবে তা সম্ভবত মানসকল্পন মাত্র। মানুষের সব রকম প্রাচীন শাস্ত্রগ্রন্থে বরং তার বিপরীত ঘটনাই আমরা লক্ষ্য করি অর্থাৎ শক্তির আরোপে বলপূর্বক অপহরণের

দৃষ্টান্ত অথবা গোত্রে গোত্রে লড়াইয়ে পরাজিত প্রতিপক্ষ গোত্রের পুরুষ সদস্যদের হত্যা এমনকি শিশুদের পর্যন্ত হত্যা করে প্রজননক্ষম নারীকুলকে বন্দী করে বিজেতার পক্ষে আপন গোত্রভুক্ত করে নেওয়া। এটাই সাধারণ নিয়মে পরিণত হয়। প্রাচীন শাস্ত্রগ্রন্থে যেসব উল্লেখ আমরা পাচ্ছি তা ঐ পরাজিত গোত্রের পুরুষ সে বৃদ্ধ থেকে শিশু হোক, সবাইকে হত্যা করে, তাদের সহায়সম্পদকে আত্মস্থ করে অনূঢ়া যুবতী বা কুমারীদের জোরপূর্বক অপহরণ করে বিজেতা গোত্রভুক্ত করে নেওয়ার ঘটনা। বাইবেলের ওল্ড টেস্টামেন্টে এ রকম ঘটনার অনেক উল্লেখ আছে। আর সবই তা ঐশী কর্তৃত্ব ও নির্দেশ বলে ঘোষিত বা বিবেচিত্ হয়েছে। প্রাচীন কালে ইজরায়েলি কর্তৃত্ব না মানা 'জাবেশ গিলিয়াড' গোত্রের সমস্ত পুরুষ, শিশু ও বিবাহিত নারীদের হত্যা করে অনূঢ়া নারীদের অপহরণ করার ঘটনা উল্লেখ করা হয়েছে এভাবে—'10..."Go and strike the inhabitants of Jabesh Gilead with the edge of the sword, including the women and children. 11. And this is thing that you shall utterly destroy every male, and every woman who has known a man intimately. 12. So they found among the inhabitants of Jabesh Gilead four hundred young virgings who had not known a man intimately; and brought them to the camp at Shiloh, which is in the land of Canaan."[৬] আমাদের দেশে বহিরাগত আর্যদের এইভাবে অনার্য নারীদের অপহরণ করে 'বিশেষ রূপে বহন করে আনা'র প্রথা থেকেই 'বিবাহ' শব্দের উৎপত্তি হয়েছে তা প্রায় সর্বজনবিদিত (বি+বহ+ঘঞ্ ভাব)। আর নারী-পুরুষের স্বামী-স্ত্রীরূপ যুগল ধারণা বা একই পুরুষের একাধিক স্ত্রী গ্রহণের বৈধতা সম্ভবত অনেক পরের ঘটনা, অর্থাৎ ব্যক্তিগত সম্পত্তিবোধের সাথেই শক্তিশালী পুরুষের পক্ষে নারী বা স্ত্রী ব্যক্তিগত সম্পত্তিতে পরিণত হওয়ার সম্পর্ক জড়িত। তবে এমন ব্যবস্থার লিখিত কোনো দলিল না থাকলেও মাতৃতান্ত্রিক সমাজের অবশেষ এবং প্রান্তিক হলেও বহুভর্তৃক সমাজের অস্তিত্ব যে আজও বর্তমান তা আগেই উল্লেখ করেছি। পূর্বাবস্থা থেকে সমাজে নারীর অবস্থানে অধঃপতন ও দমনযুক্ত বা দমিত হওয়ার কিঞ্চিৎ চিহ্ন ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষায় এমনকি সেমীয় ভাষা সমূহেও এখনো খুঁজে পাওয়া যাবে। যেমন দমন করা বা দমিত হওয়া বিবাহিত নারী বা স্ত্রী হয় 'দম'=জায়া বা স্ত্রীর সঙ্গী পুরুষ স্বভাবতই তার সঙ্গী সম্পর্কে 'পতিত' হয়ে 'পতি'তে রূপান্তরিত হয়ে 'দম+পতি'='দম্পতি' বলে যায়। আর অদমিত পুরুষ হয় আদিপুরুষ 'অদম' বা 'আদম' (Adam); আর দমিত মা হয় 'মাদম' বা (Madam), অবিবাহিত মেয়ে শুধু Dame হয়ে পড়ে থাকে। ইত্যাদি ইত্যাদি। সবই সম্ভবত ব্যক্তিগত সম্পত্তিবোধ আবির্ভাবের সূত্রে নারীও ব্যক্তিগত সম্পত্তির মতো অবস্থায় রূপান্তরিত হওয়ার প্রক্রিয়ায়।

মানুষের নথিভুক্ত ইতিহাস ও সাহিত্য সমূহ পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে বিজিত অপরকে বহিষ্কৃত রাখতে, শাসিতকে স্বস্থানে আটকে রাখতে একদিকে শক্তি প্রয়োগ অন্যদিকে ঐশী কর্তৃত্বের দাবির অধীনে উপযুক্ত ধর্মীয় নৈতিকতা স্থাপন এবং

তার সাথে উপযুক্ত বিধিনিষেধ সংবলিত আইন প্রতিষ্ঠা মানব প্রকৃতি ও সমাজ বিকাশের স্বাভাবিক প্রক্রিয়া। শাসিতের মনে ঐশীভীতি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে শাসক হয় নিজেই সাধারণ মানুষের ঐহিক এবং তথাকথিত পারত্রিক উভয়বিধ মঙ্গল বিধানের কর্তৃত্ব নিজ হস্তে অধিগ্রহণ করেছে অথবা ক্ষেত্রান্তরে অধিক সুবিধার জন্য কোথাও কোথাও নিযুক্ত হয়েছে পেশাদারি ও বৃত্তিধারী পুরোহিত সম্প্রদায়। শাসক শাস্ত্র ও পুরোহিতের পারস্পরিক মিথোজীবিতা ও নির্ভরশীলতা সামন্ততান্ত্রিক অর্থনৈতিক সমাজ ব্যবস্থার সাধারণ বৈশিষ্ট্য। পুরোহিত রাজাকে আশীর্বাদপুষ্ট করে তার হাতে ন্যস্ত করে ঐশী কর্তৃত্ব এবং শাসনদণ্ড আর পরিবর্তে রাজা পুরোহিতকে সহায়সম্পদ বিতরণ করে এমনকি ক্ষেত্রবিশেষে কন্যাদানে তুষ্ট করে। মূল উদ্দেশ্য শ্রেণীগত সুবিধা ও সামাজিক বিন্যাসের স্থিতাবস্থা সুনিশ্চিত করা। পুরোহিতেরা নিরন্তর প্রচার চালাল ব্যক্তি মালিকানাধীন বস্তু বা বিষয় সম্পত্তিতে বহিষ্কৃত অপরের পক্ষে শক্তি আরোপে অথবা ছলে বলে কৌশলে ভোগ বা দখল করতে চাইলে অথবা তেমনটি করলে তা হবে চরম পাপ। তার জন্য সেই অপরকে মৃত্যু-পরবর্তী পর্যায়ে অনন্তর ঐশী বিচারে কঠিন শাস্তিভোগ করতে হবে অথবা মনুষ্যেতর যোনিতে জন্ম নিয়ে অশেষ যন্ত্রণার অধীন হতে হবে। শক্তির প্রয়োগে এবং নিরন্তর প্রচারে শাসকের ও সহায়ক সুবিধাভোগী গোষ্ঠীর স্বার্থসিদ্ধিমূলক মূল্য-সংস্কৃতি (Value System) ধর্মীয় নৈতিকতায় রূপান্তরিত হল। লক্ষণীয় কী, গোত্রতান্ত্রিক কিংবা সামন্ততান্ত্রিক সমাজ যাই হোক না কেন গোত্রতন্ত্রের গোত্র-প্রধান অথবা সামন্ততন্ত্রের রাজা সবাই বংশপরম্পরাগত হওয়াই নিয়ম। সাথে সাথে পৌরোহিত্য অথবা নবী পয়গম্বরত্বও প্রধানত বংশপরম্পরায় পরবর্তী প্রজন্মের হাতে অর্পিত হওয়ার নিয়মই প্রতিষ্ঠিত হয় যাতে ক্ষমতা ও সুবিধা হস্তান্তরিত হওয়ার অবকাশ না ঘটে। এ ব্যবস্থার প্রতিফলন বাইবেলের ওল্ড টেস্টামেন্টে সংরক্ষিত হয়েছে। সেখানে দেখা যাবে মেষপালক সব প্রশাসক পুরোহিতেরাই তথা নবী পয়গম্বরেরা সব বংশপরম্পরাগতভাবে নির্ধারিত হয়েছেন। ঈশ্বর ইজরায়েলিদের কাছে যে প্রতিজ্ঞা করছেন তা সবই বংশপরম্পরাগতভাবে নবী পয়গম্বর বলে বিবেচিত তাঁদের সাথে—ইব্রাহিম (Abraham), ইসহাক (Isaac), ইয়াকুব (Jacob)..... কিংবা মুসা (Muses) ও তৎভ্রাতা হারুন (Aaron) তার পরে হারুনের পুত্রেরাই পরবর্তীতে ইজরায়েলি সম্প্রদায়ের পুরোহিত হচ্ছেন ইত্যাদি ইত্যাদি। এমনকি দাবি করা হয় এই পারম্পর্যিকতা ইসলাম প্রবর্তক হজরত মহম্মদ পর্যন্ত অক্ষুণ্ণ ছিল। আমাদের দেশেও সেই প্রাচীন কাল থেকেই ব্রাহ্মণ্যতন্ত্রও বংশপরম্পরাগত এবং শাস্ত্রেও তার প্রতিফলন ঘটেছে। ঐশী বিধি বলেই গীতাশাস্ত্রে বাণী উৎকীর্ণ হয়েছে কর্মানুসারে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র এরূপ চতুবর্ণ ঐশী বিধানেই সৃষ্ট—"চাতুর্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং গুণকর্ম বিভাগশঃ/।" আরো বলা হল বর্ণ প্রথায় বিভাজিত কর্ম বা বৃত্তি সমূহকে ইচ্ছাধীন নির্বাচিত করার প্রয়াস অনৈতিক, অবৈধ এবং তেমন প্রচেষ্টা ভয়াবহ। স্বধর্ম অর্থাৎ বর্ণানুযায়ী নিজ বর্ণগত কর্ম বা পেশা দোষযুক্ত হলেও উত্তমরূপে অনুষ্ঠিত অন্য বর্ণের জন্য নির্দিষ্ট

কর্ম অপেক্ষা শ্রেয়। ফলত স্ববর্ণের জন্য নির্দিষ্ট কর্মে নিয়োজিত থেকে নিহত হলে হলেও অন্য বর্ণের কর্ম গ্রহণ করা বিপজ্জনক। 'শ্রেয়ান্ স্বধর্মো বিগুণঃ পরধর্মাৎ স্বনুষ্ঠিতাং। স্বধর্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্মো ভয়াবহঃ।।'[৮] মনুসংহিতাতেও এ বক্তব্যের সরব উপস্থিতি লক্ষণীয়—"যদি কোনো অধম জাতীয় ব্যক্তি, উৎকৃষ্ট জাতির বৃত্তি অবলম্বন পূর্বক জীবিকা নির্ব্বাহ করে, তাহার সর্ব্বস্ব গ্রহণপূর্বক শীঘ্র তাহাকে স্বদেশ হইতে নিষ্কাশিত করা রাজার কর্ত্তব্য।।[৯] শূদ্রের কর্ম ব্রাহ্মণাদি অন্য ত্রিবর্ণের মানুষের সেবা করা এবং এই জন্য ইতর জন্ম হয়েছে এ তত্ত্ব ও তথ্যও মনুসংহিতায় অতি উচ্চকণ্ঠে ঘোষিত হয়েছে। "বিপ্র সেবাই শূদ্রের পক্ষে বিশিষ্ট কার্য্য বলিয়া কীর্ত্তিত হয় এবং এতদ্ভিন্ন যে যাহা কিছু করে, তৎসমস্তই তাহার পক্ষে নিষ্ফল।।"[১০] শূদ্রের সম্পত্তির অধিকারও স্বীকৃত হয়নি সেখানে। "...পরন্তু ক্রীত হউক বা অক্রীত হউক, শূদ্র দ্বারা তিনি (ব্রাহ্মণ) দাস্য কর্ম্ম করাইয়া লইবেন। যেহেতু বিধাতা দাস্যকর্ম্ম-নির্বাহার্থ উহাকে সৃষ্টি করিয়াছেন।[১১] "শূদ্র স্বামী কর্তৃক বিমুক্ত হইলেও দাসত্ব হইতে বিমুক্ত হয় না। দাসত্ব কর্ম্ম তাহার স্বাভাবিক, অতএব কে তাহাকে উহা হইতে মুক্ত করিতে পারে?"[১২] "ব্রাহ্মণ বিশ্রদ্ধচিত্তে দাস-শূদ্রের ধন আত্মসাৎ করিতে পারেন; যেহেতু তাহার নিজস্ব কিছু নহে, উহার সমুদয় ধনই ভর্ত্তৃহার্য্য।"[১৩] মধ্যযুগে ক্যাথলিক খ্রিস্টান ধর্মের অধীনে চার্চ, সামন্ত প্রভু ও তাদের প্রতিভু রাজতন্ত্রের মেলবন্ধনে প্রকৃতির সমস্ত সহায়সম্পদ সামন্ত প্রভু সম্প্রদায় ও চার্চের করায়ত্ত হয়। অবশিষ্ট সমাজ চার্চ ও সামন্ত প্রভুদের খামারে শ্রমদাসের ভূমিকা পালনে বাধ্য থাকত। সাধারণের জন্য প্রচারিত হত যে ইহজীবনের দারিদ্র্য বঞ্চনা ঈশ্বরের পরীক্ষাস্বরূপ। প্রত্যেকে তার সামাজিক দায়িত্ব যথাযথভাবে এবং নীরবে পালন করে ঈশ্বরোপাসনায় রত থাকলে পরকালে ঈশ্বর প্রতিশ্রুত স্বর্গসুখ অবধারিত। এটাই চার্চের মূল বক্তব্য। প্রতিবাদের অর্থ ঈশ্বর অবমাননা, যার পরিণাম মৃত্যু-পরবর্তীকালে নরকপ্রাপ্তি সুনিশ্চিত; আর সাথে সাথে নেমে আসত রাজতন্ত্রের অধীনে চার্চ নির্ধারিত শাস্তির দণ্ড বিধান। সামন্ততান্ত্রিক অর্থনীতির রক্ষায় ধর্মীয় শাস্ত্র, পুরোহিতবর্গ ও রাজশক্তির এ মেলবন্ধনকে ক্ষেত্রান্তরে রবীন্দ্রনাথ অতি সুন্দরভাবে ব্যক্ত করেছেন এই ভাবে—'বেদ ব্রাহ্মণ রাজা ছাড়া আর, কিছু নাই ভবে পূজা করিবার, এই কটি কথা জেনো মনে সার—ভুলিলে বিপদ হবে'। একদিকে চার্চের অধীনে সাধারণ শাসিতকে শোষণ নিপীড়ন ও তার বঞ্চনার ইতিহাস, অন্যদিকে পুরোহিত, জাজক সম্প্রদায় ও সামন্ত প্রভুদের অবাধ প্রাচুর্য, বৈভব ও ভোগবিলাসের জীবন যেভাবে সমগ্র সমাজ জীবনকে কলুষিত করেছিল তার ইতিহাস ইউরোপে ধনতন্ত্র উদ্ভূত হওয়ার কালে প্রচলিত ধর্মতন্ত্রকে খানিকটা মানবিক রূপ দিতে প্রতিবাদী যে প্রটেস্ট্যান্ট ধর্ম আন্দোলনের সূত্রপাত ঘটেছিল তার মধ্যে বিধৃত হয়ে আছে। অনেক পরে বার্ট্রান্ড রাশেল তিনি কেন খ্রিস্টান নন "Why I am not a Christian" এই নামের বই লিখে তার স্বরূপ উদ্ঘাটিত করলেন। বিখ্যাত "The History of the Decline and Fall of the Roman Empire" গ্রন্থের লেখক এডওয়ার্ড গিবন

(১৭১৭-১৭৯৪) রোমান সাম্রাজ্যের অবনতি ও ধ্বংসের প্রধান কারণ হিসাবে সমকালীন নেতৃস্থানীয় মানুষের বিচারবুদ্ধি ও যুক্তির পরিবর্তে চার্চ ও সামন্তপ্রভুদের অধীনে বর্বরতা ও ধর্মের জয় (The triumph of barbarism and religion) বলে মন্তব্য করেছেন। এ গ্রন্থ রচনাকালে তাই তিনি ক্রমান্বয়ে প্রটেস্ট্যান্ট ধর্ম থেকে ক্যাথলিক ধর্মে আনুগত্য পরিবর্তন করতে করতে শেষ পর্যন্ত অজ্ঞেয়বাদীতে রূপান্তরিত হলেন। পরবর্তীতে আরব নেতৃত্বে ইসলামীয় বিধানেও সমাজ ব্যবস্থাপনার চিত্র ভিন্ন প্রকৃতির ছিল না। সত্য ধর্ম ও ন্যায় প্রতিষ্ঠার নামে ক্রমাগত সাম্রাজ্য বিস্তার পূর্বোক্ত একই প্রক্রিয়ার পুনরাবৃত্তি মাত্র। আরব দেশে ইসলাম প্রসারের সময় সেখানে ব্যাপক দাস প্রথার প্রচলন ছিল। টাকার বিনিময়ে দাসদের কেনাবেচা করা যেত। ভূস্বামীদের অধীনে দাসদের জীবন কীরকম দুর্বিষহ ছিল তা আর বর্ণনার অপেক্ষা রাখে না। এই পরিমণ্ডলেও কিছু কিছু সহানুভূতিশীল আরব নেতাদের নেতৃত্বে দাসেরা কখনো কখনো বিদ্রোহও করেছে বৈকি। ঠিক এই প্রেক্ষিতেই হজরত মহম্মদের বাণী বা হাদিস বলে পরিচিত এক উক্তির সন্ধান পাওয়া গেল—আর তোমরা তোমাদের ঐহিক প্রভুর (দাস মালিকের) হক পালন কর এবং একই সঙ্গে তোমার প্রতিপালক প্রভু আল্লাহরও হক পালন কর আর এতেই তোমাদের ইহলৌকিক ও পারলৌকিক মঙ্গল নিহিত আছে (ভারতে সংগৃহীত মেশকাত শরীপের প্রথম খণ্ড দ্রষ্টব্য)। বিদ্রোহীদের বিদ্রোহী মন ধর্মের ভয়ে বিদ্রোহ থেকে নিরস্ত হল। বোঝা যায় দাসমালিকদের স্বার্থেই সম্ভবত এমন বিধান হজরত মহম্মদের নামে কায়েমী স্বার্থ কর্তৃক প্রচারিত হয়েছে।

সামন্ততন্ত্র স্ব-ব্যবস্থাপনার কারণে শুধু যে ধর্মীয় নৈতিকতার আশ্রয় নিয়েছে তাই নয়; বৃহৎ সামন্ততান্ত্রিক রাষ্ট্র বা সাম্রাজ্য গঠন ও তার রক্ষণে সামন্ততন্ত্রের ইতিহাস কালে সহায়ক রাজনৈতিক দর্শনেরও আবির্ভাব ঘটেছে বিভিন্ন রাষ্ট্রনীতিবিদদের প্রচেষ্টা ও লেখনীতে। এ সমস্ত রাজনৈতিক দর্শনে রাষ্ট্রের উৎপাদন ও বণ্টন ব্যবস্থার ওপর আলোচনা বা আলোকপাত না করে কিংবা প্রকৃতির সহায়সম্পদের অধিকার ও উত্তরাধিকার বিষয়ে আলোকপাত না করে সামন্ত-শ্রেণী ভিত্তিক সমাজ ব্যবস্থা রাষ্ট্রীয় কর্ণধারের হাতে কিভাবে ক্ষমতাশালী হয়ে উঠবে এবং রাষ্ট্র ব্যবস্থার সুরক্ষা ও বিবর্ধনের প্রয়োজনে শক্তি ও ক্ষমতার কৌশলী প্রয়োগ কিভাবে সঙ্ঘঠিত হবে, ভিন্ন ভিন্ন শক্তির সাথে সফল আঁতাত, গুপ্তচর বাহিনীর সংগঠন ও প্রয়োজনে ষড়যন্ত্রের আশ্রয় নেওয়া এমনকি শত্রুকে অপসারণের কৌশল হিসাবে গুপ্তহত্যার আশ্রয়ও কিভাবে নেওয়া হবে ইত্যাদি বিষয়ই সেসব রাজনৈতিক দর্শনে গুরুত্ব সহকারে আলোচিত হয়েছে। সামন্ততন্ত্রের অধীনে সাধারণের শোষণ নিপীড়নের প্রসঙ্গ অথবা তার নিরসনের প্রশ্ন ছিল এখানে অপ্রাসঙ্গিক। চীনে কনফুসিয়াস (কা'ঙ-ফু-জু বা শিক্ষক গুরু জু : খ্রি. পূ. ৫৫১-৪৭৯)-এর প্রয়াসে যে রাজনৈতিক মতাদর্শ প্রতিষ্ঠিত করলেন তার সার হল আদর্শ রাষ্ট্র পরিচালক এবং রাজপুরুষদের উপযুক্ত শিক্ষা প্রদান এবং তাদের উপযুক্ত প্রশিক্ষণের বিষয় নির্বাচন। তাঁর চিন্তা অনুযায়ী আদর্শ প্রশাসক ও সুনাগরিককে অবশ্যই

প্রধানত চারটি বিষয়ে সুশিক্ষিত হতে হবে; সেগুলো হল : তীরন্দাজি, রথচালনা, আচার এবং সঙ্গীত আর সাধারণ শিক্ষার মধ্যে অবশ্যই অক্ষরলিখন শিল্প (Calligraphy) এবং অঙ্কশাস্ত্র ইত্যাদি। তবে তিনি শিক্ষার মধ্যে সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করলেন ঐতিহ্য ও আচারের প্রতি নিষ্ঠা এবং গুরুজন ও সম্মানীয় ব্যক্তিদের প্রতি প্রশ্নহীন শ্রদ্ধা ও আনুগত্য প্রদর্শনে। যুগের দাবিতে আচার পরিবর্তন প্রসঙ্গে তিনি অনড়। তাঁর মতে তেমন প্রয়োজনে আচারকে আরও সংস্কৃত করে সমৃদ্ধ করে তুলতে হবে, কোনো ক্ষেত্রেই তাকে বর্জন নয়। আর তাঁর মতাদর্শে সমগ্র শিক্ষা অবশ্যই নিয়োজিত হবে রাজপুত্র ও সমাজের অভিজাত সম্প্রদায়ের সন্তানদের প্রতি, কেননা কেবল মাত্র তারাই রাজ্য বা রাষ্ট্র পরিচালনায় সক্ষম। ফলে পরবর্তীতে রাজতান্ত্রিক তথা সামন্ততান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় শক্তিশালী কেন্দ্রিকতা ও দৃঢ় প্রশাসনের অধীনে বিশাল চৈনিক সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা ও তার সুরক্ষা সুনিশ্চিত হয়। প্রাচীন ভারতবর্ষে নন্দ বংশের অবসান ঘটিয়ে মৌর্য বংশের প্রতিষ্ঠাতা কৌটিল্য তথা চাণক্য তথা বিষ্ণু গুপ্ত (খ্রি.পূ.৩য় শতাব্দীর) তাঁর রাষ্ট্রবিজ্ঞানমূলক গ্রন্থ অর্থশাস্ত্রতে যে রাষ্ট্রনীতির প্রতিষ্ঠা করলেন তা মোটামুটি অনুরূপ। রাজপুত্রের লালনপালন থেকে তার শিক্ষার ব্যবস্থা ও পদ্ধতি কেমন হবে ইত্যাদি বিধি-বিধান থেকে শুরু করে রাজা কর্তৃক মন্ত্রিসভার নিয়োগ, রাষ্ট্রীয় বিভিন্ন দপ্তরের গঠনতন্ত্র থেকে সে সমস্ত দপ্তর পরিচালনার বিধি-বিধান, গুপ্তচর বাহিনী পোষণ ও গুপ্তচরদের কার্য নিয়ন্ত্রণ, পররাষ্ট্র নীতি, শত্রুপক্ষীয় ও মিত্রপক্ষীয় রাজ্যের সঙ্গে ব্যবহার, উপযুক্ত আঁতাত করা, দেওয়ানি ও ফৌজদারি আইন ও দণ্ডবিধি, মুদ্রা ব্যবস্থা, ওজন ও ওজন সংক্রান্ত বিধি, সমাজে লোকবসতি বিন্যাস—সব বিষয়ই এখানে আলোচিত হয়েছে। বিশেষ করে লক্ষ্য অনুযায়ী বিভিন্ন পরিস্থিতিতে রাজার কী করণীয় সে বিষয়ে নির্দেশও লিপিবদ্ধ হয়েছে অর্থশাস্ত্রে। আর রাজার সর্বাধিক বড় লক্ষ্য হবে রাজ্যের সীমা সর্বাধিক বৃদ্ধি করা এবং কৌটিল্যের মতাদর্শানুযায়ী রাজাকে হতে হবে 'বিজিগীষু' (জয় করবার ইচ্ছাসম্পন্ন দিগ্বিজয়ী) সম্রাট। উল্লেখ্য, মৌর্যবংশের সম্রাট অশোকের রাজত্বকালে (খ্রি.পূ. ২৭৩-২৩২) প্রাচীন ভারতের ইতিহাসে এই সর্বপ্রথম সর্ববৃহৎ সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা সম্ভব হয়েছিল। উল্লেখ্য, ইউরোপের রোমান সাম্রাজ্যর ভূম্যাধিকারী-ভূমিদাস সম্পর্কের মতোই ভারতবর্ষে আর্য আধিপত্যে বর্ণ প্রথার অধীনে সেই সময়ের মধ্যেই স্থানীয় অনার্য মানুষেরা কার্যত দাস-শ্রমিকে রূপান্তরিত হয়েছে। অর্থশাস্ত্রে প্রথমের দিকেই তার স্পষ্ট আলোচনা আছে। আর চার বর্ণের জন্য চার রকম কাজের বিধানও সেখানে দেওয়া হয়েছে। বর্ণানুযায়ী নির্দিষ্ট কর্মরেখা যাতে লঙ্ঘিত না হয় তার দিকে কঠোর দৃষ্টি রাখতে রাজাকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। ব্রাহ্মণদের কার্য সম্পর্কে বলা হয়েছে—"ব্রাহ্মণদের বিশেষ কার্য হল—অধ্যয়ন, অধ্যাপনা, নিজের জন্য বলি-আচার সম্পন্ন করা, অন্যের পক্ষে তাদের বলি আচার সমরূপে সম্পাদন করা, দান করা এবং অপর থেকে দান গ্রহণ করা।"[১৪] অন্যক্ষেত্রে শূদ্রের নির্দিষ্ট কার্য বলে উল্লেখ করা হয়েছে—"দ্বিজের সেবা করা, অর্থনৈতিক

কর্মতৎপরতায় লিপ্ত হওয়া, যেমন কৃষিকাজ, পশুচারণ এবং বাণিজ্য ও শিল্প ও অভিনেতার বৃত্তি''[১৫]। এখানে উল্লেখ্য, শূদ্রের সম্পত্তির অধিকার ছিল না তা মনুসংহিতাতেই উল্লেখ করা হয়েছে। আর এসব বিষয়ে রাজার প্রতি নির্দেশ—''সুতরাং বিভিন্ন ব্যক্তির প্রতি নির্দিষ্ট বিশেষ কর্মবিধি অন্য কর্তৃক লঙ্ঘন যেন রাজা অনুমোদন না করে; কেননা প্রত্যেকে প্রত্যেকের প্রতি নির্দিষ্ট বিশেষ কার্য সমূহের প্রতি নিষ্ঠা সহকারে রত থাকলেই মৃত্যুর পরে এবং ইহজগতেও সুখ পায়।''[১৬] শত্রুপক্ষীয় অনার্য রাজার বিরোধী পক্ষকে প্রলুব্ধ করে নিজের পক্ষে জয় করার পদ্ধতি হিসাবে চন্দ্রগুপ্তের প্রতি চাণক্যের নির্দেশ—''যেমন চণ্ডালদের কুঁয়া চণ্ডালদেরই ব্যবহার্য, তা অন্যের জন্য নয়, তেমনই এই নীচ জাতির রাজা শুধু নীচ জাতির লোকেদেরই মঙ্গল বিধান করতে পারে, আপনার মত আর্যকে নয়; সুতরাং (অপর) রাজা জানে মর্যাদাপূর্ণ ব্যক্তিকে (কি করে মর্যাদা দেখাতে হয়); তাঁর নিকট যান;' —এইভাবে তাঁর পক্ষে উচিত হবে গর্বিত দল বা গোষ্ঠীকে উত্তেজিত করতে।''[১৭] বোঝাই যায় ধর্ম ও শক্তির যথাযথ ব্যবহার করে কিভাবে রাজার ও রাষ্ট্রের লক্ষ্য অর্জন সম্ভব হয়। রাষ্ট্রের লক্ষ্য অর্জনে স্বভাবতই ন্যায় ও নৈতিকতার প্রশ্ন অপ্রাসঙ্গিক। সুবিধাবাদই রাষ্ট্রীয় লক্ষ্য অর্জনে পরম নীতি। অনেক পরে ইউরোপে ম্যকিয়াভেলির রাষ্ট্রনীতিক মতাদর্শে এই সুবিধাবাদিতার চরম প্রতিফলন লক্ষণীয়। ইউরোপে রেনেসাঁ সময়কালে ইতালির নিকোলো ম্যাকিয়াভেলি প্রায় চাণক্যের মতোই "II Principe" (The Prince 1513) গ্রন্থে রাজপুত্রকে দেওয়া উপদেশাবলীর ঢঙে তাঁর রাষ্ট্রনৈতিক মতাদর্শ ব্যক্ত করলেন। ক্ষমতার রক্ষণে ও প্রতিপত্তি বর্ধনে চরম সুবিধাবাদের আশ্রয় গ্রহণ করতে রাজপুত্রকে পরামর্শ দিয়েছেন তিনি। তাঁর বক্তব্যে প্রচলিত নৈতিকতার প্রশ্ন অপ্রাসঙ্গিক। রাষ্ট্রীয় প্রয়োজনে এবং ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকতে নৈতিকতার অধীনে কাঙ্ক্ষিত সুআচরণ না করাই, তাঁর শিক্ষা। সমকালে ইউরোপীয় সুধী মহলে এমন রাষ্ট্রীয় মতাদর্শ নিন্দিত হলেও প্রায়োগিক ক্ষেত্রে কার্যত তা ইউরোপীয় রাষ্ট্র পরিচালনার সাধারণ বিধি বলেই গৃহীত হয়। পরবর্তীতে ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্র ব্যবস্থার ব্যবস্থাপনায় এবং স্বদেশের স্বার্থের নামে এমনতর রাষ্ট্রনীতি অলিখিত সাধারণ নীতি বলেই গৃহীত হয়েছে তা বোঝা যায়।

প্রকৃতির পরিবর্তনশীলতার স্বাভাবিক নিয়মে সামন্ততন্ত্রও চিরস্থায়ী হয়নি। সে অর্থনীতির সমাজ ব্যাপস্থাপনা ভেঙে পঞ্চদশ শতাব্দীতে ইউরোপে শুরু হয় ধনতন্ত্রের পত্তন। রোমান সাম্রাজ্যের অধীন খ্রিস্টান দুনিয়ায় সাধারণ মানুষের ওপর সামন্তপ্রভু ও চার্চের সম্মিলিত শোষণ অত্যাচার নিপীড়ন এবং এর বিপরীতে সামন্তপ্রভুদের বৈভবময় বিলাসবহুল জীবনযাত্রা, অন্য দিকে চার্চে পাদ্রিদের নানারূপ যৌন যথেচ্ছাচার ও কদাচার সমাজ জীবনকে কলুষিত ও ক্লেদযুক্ত করে তোলে। সমাজ স্রোতবদ্ধ হয়ে ওঠে। কোনো সমাজ সামগ্রিকভাবে যখন স্রোতবদ্ধ, গ্লানিময় হয়ে ওঠে তখন সমাজের সেই স্রোতবদ্ধতা, পুঞ্জিভূত ক্লেদ ও গ্লানির নিষ্পেষণ থেকে পরিত্রাণের পথ হিসাবে সমাজের নতুন প্রজন্মের মধ্যে উন্মেষ ঘটে নতুন মূল্যবোধের আর ঐতিহাসিক প্রেক্ষিত

অনুযায়ী এর সাথে যুক্ত হয় নতুন অর্থনৈতিক বনিয়াদ রচনা তথা সামাজিক উৎপাদন ও বণ্টন ব্যবস্থার নতুন ভিত্তি রচনার পটভূমি। প্রেক্ষাপট ও ক্ষেত্র অনুযায়ী ইতিহাসের অমোঘ নিয়মে প্রতিবাদ, প্রতিরোধ ও সংগ্রামের মধ্য দিয়ে নতুন প্রতিষ্ঠা পায়। নতুন প্রতিষ্ঠা পেয়ে বেগবান হয় এবং দেশ ও কালে হয় তা সম্প্রসারিত। কিছুকাল তা স্থায়ী হয়। আর এরই মধ্যে বিভিন্ন স্বার্থগোষ্ঠী ও নেতৃত্বের সংঘাতে শুরু হয় তার বিভাজন। ক্রমে সমগ্র সমাজ ব্যবস্থায় ধরে বৈষম্যের গ্লানি ও পচনের সূত্রপাত। এই ধারাতেই আবার নতুন আবির্ভাবের পথ সুগম করে দেয়। ইতিহাসে সমাজ বিবর্তনে এটাই এ পর্যন্ত জানা সাধারণ নিয়ম।

ষোড়শ শতাব্দীতে পশ্চিম ইউরোপে ধনতন্ত্রবাদের সূত্রপাত ঘটে। কিন্তু ধনতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা ও অগ্রগতি শান্তিপূর্ণভাবে সম্ভব হয়েছে, এমনটি মনে করার কারণ নেই। ইউরোপে রোমান সাম্রাজ্য ছিল সামন্ততান্ত্রিক। অভিজাত জমিদার শ্রেণী (Landed Gentry) ও যাজক সম্প্রদায় তথা পোপতন্ত্রের যৌথ হাতেই রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা, সমস্ত সহায়সম্পদ উপায়-উপকরণ (ভূমি বন খনি ইত্যাদি) কুক্ষিগত থাকত। রাজশক্তি এই দুই কায়েমী স্বার্থের প্রতিভূ। একদিকে রাজশক্তি ও সামন্তশ্রেণী অন্যদিকে পোপতন্ত্রের পারস্পরিক মিথোজীবিতায় (Symbiosis) রাষ্ট্রশক্তি কার্যকরী ছিল। পোপতন্ত্র-নির্দিষ্ট ধর্মই ছিল নিম্ন বর্গের সাধারণ মানুষের সাংস্কৃতিক তৃষ্ণা নিবারণের একমাত্র উপায় ও আশ্রয়স্থল। উৎপাদনের উপাদান প্রধানত ভূমি ইত্যাদি। সেই সামন্ত শ্রেণীও পোপতন্ত্রের হাতেই কুক্ষিগত থাকত। সাধারণ মানুষের ভূমিকা সেখানে ভূমিদাস মাত্র। উৎপাদন ব্যবস্থা ও সম্পত্তির অধিকারের পুনর্বিন্যাসের প্রশ্ন অধার্মিকতা বলেই বিবেচিত হত। আর এই সূত্রেই সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থা বলবৎ রাখা হত। এই পটভূমিতে পশ্চিম ইউরোপে যখন বাণিজ্যিক ধন শক্তিশালী হয়ে শিল্পীয় ধনে রূপান্তরিত হওয়ার প্রশ্ন অনুভূত হল তখন শুরু হল সামন্ততন্ত্রের স্বার্থের সঙ্গে নতুন পুঁজিবাদী ধনিকদের স্বার্থের সংঘাত। এই সংঘাতের মূল কারণ ঐ ধনতান্ত্রিক ও সামন্ততান্ত্রিক উৎপাদন ব্যবস্থার মধ্যেই নিহিত। প্রথম সামন্ততান্ত্রিক উৎপাদন ব্যবস্থায় উৎপাদনের প্রধান হাতিয়ার কৃষক-শ্রমিক ভূমির সাথে ভূমিদাস হিসাবে অচ্ছেদ্য। অন্যদিকে ধনতান্ত্রিক উৎপাদন প্রক্রিয়ায় ভূমি, শ্রম, মূলধন বা পুঁজি এবং সংগঠন—এই চার উপাদানের অন্যতম প্রধান উপাদান হল শ্রমিক। সেই শ্রমিককে ভূমি থেকে মুক্ত করে শহরে কারখানায় আনলে সামন্ততান্ত্রিক উৎপাদন ব্যবস্থাই বিপর্যস্ত হয়। দ্বিতীয়ত ধনতান্ত্রিক উৎপাদনে উৎপন্ন দ্রব্যসামগ্রী বিক্রয় এবং বাজারীকরণের জন্য সামাজিক মননশীলতাকে পণ্যসামগ্রী ভিত্তিক ভোগবাদী করে তোলা প্রয়োজন। প্রয়োজন জীবনের আদর্শ ও মঙ্গলবোধকে ইহলৌকিক করে তোলা। আর এর জন্যই দরকার গণচেতনাকে বিজ্ঞানমনস্ক করে তোলা। এর সাথে আর একটা দিকও জড়িত ছিল, তা হল বিজ্ঞানমনস্কতাকে প্রতিষ্ঠিত করে, বিজ্ঞানের অনুসন্ধানী ও উদ্ভাবনী শক্তিকে কাজে লাগিয়ে নতুন নতুন প্রকৌশলগত কারিগরিবিদ্যা তথা প্রযুক্তি আবিষ্কার করা এবং তাকে পণ্য উৎপাদনকারী শিল্পের

সহায়ক করে তোলা। এক কথায় সামাজিক মননশীলতাকে ধর্মীয় সংস্কার ও মূল্যবোধ থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন করে ধর্মের সাথে সম্পূর্ণ সম্পর্কবিহীন এক 'ইহবাদী' (Secular) ঐহিক মূল্যবোধের জন্ম দেওয়া। সমকালীন প্রেক্ষিতে এটা ছিল ইতিহাসের অমোঘ দাবি। আর সর্বোপরি প্রয়োজন হল নিজেদের প্রভাবাধীন ও সহায়ক এক সরকার প্রতিষ্ঠা। অন্যদিকে সামন্ততান্ত্রিক অর্থনীতিতে শাসিত সংখ্যাগুরু শ্রমজীবী উনজনদের ধর্মীয় নৈতিকতার অধীনে ভোগবিরোধী পার্থিবীকতায় বিবাগী পারলৌকিক মোক্ষকামী চেতনায় আচ্ছন্ন করে রাখা হত। যাতে সামন্ততান্ত্রিক উৎপাদন ব্যবস্থা অক্ষুণ্ণ থাকে। ফলে জায়মান ধনতন্ত্রপন্থীদের সাথে সামন্ত প্রভুদের স্বার্থের সংঘাত অনিবার্য হয়ে ওঠে।

সুতরাং ধনতন্ত্রপন্থীদের সহায়ক এক নতুন মূল্য-সংস্কৃতি প্রতিষ্ঠার নিমিত্ত প্রয়োজন হল সামাজিক ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে এক নতুন সামাজিক দর্শনের। শুরু হল 'গণতন্ত্র' 'ব্যক্তি-স্বাধীনতা' তথা 'ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবাদ' ও সামাজিক সর্বাঙ্গীণ মঙ্গল ও কল্যাণের জন্য প্রতিযোগিতামূলক 'ইহবাদী' সমাজ দর্শনের জয়গান। যা মূর্ত হল Freedom equality & fraternity-এর মতো স্লোগানে। ধনতান্ত্রিক উৎপাদনে কৃষি শ্রমিককে সে ভূমিদাসই হোক আর কৃতদাসই হোক, জমিদারের ভূমি থেকে মুক্ত করে এনে ধনতান্ত্রিক উৎপাদন ব্যবস্থায় কারখানায় নিয়োগের প্রশ্ন জড়িত ছিল। তাই 'ব্যক্তি'র স্বাধীনতার জয়গান করা হল এই দর্শনে। শ্রম (তা সে বুদ্ধি ও মেধাগত শ্রম হোক আর কায়িক শ্রমই হোক) বিক্রি করে অথবা শ্রম বিনিয়োগ করেই যখন ব্যক্তির জীবিকা অর্জন ও পার্থিব প্রতিষ্ঠা, তখন সেই শ্রমের ওপর তার ব্যক্তিগত স্বাধিকার একান্ত কাম্য। ব্যক্তি তার শ্রমকে কোথায় বিক্রি করবে অথবা কোথায় বিনিয়োগ করবে তার স্বাধীনতা তার থাকা দরকার। আর ব্যক্তিই যখন উৎপাদিকাশক্তির কেন্দ্রবিন্দু তখন সেই ব্যক্তির পার্থিব সর্বাঙ্গীণ কল্যাণ ও সাথে সাথে সমাজের সমগ্র ব্যক্তির কল্যাণই সমাজের সামগ্রিক কল্যাণ। আর তারই জন্য চাই বৈধ প্রতিযোগিতার পরিবেশ। ফলে বাণিজ্যিক পুঁজি জায়মান শিল্পীয় পুঁজিতে পরিণত হওয়ার প্রক্রিয়ায় নয়া উদ্যোগপতিরা একদিকে প্রয়োজন অনুভব করল নিজেদের প্রভাবাধীন সরকার প্রতিষ্ঠা তথা সামন্ত্রতন্ত্রের প্রতিভূ রাজতন্ত্রের পরিবর্তে তাদের দর্শনানুযায়ী গণতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠা। তাই তাদের নেতৃত্বে শুরু হল রাজতন্ত্রের ক্ষমতা সীমিত করে তাদের প্রতিনিধিদের হাতে প্রকৃত ক্ষমতার কেন্দ্রীকরণের সংগ্রাম। অন্যদিকে ভাড়াটিয়া গুণ্ডাবাহিনী নিয়োগ করে রাতের অন্ধকারে সামন্তপ্রভুদের খামারে অগ্নিসংযোগ করে, লুটপাট করে কৃষি শ্রমিককে সন্ত্রস্ত করে তাদের উদ্বাস্তু করে শহরে আনার প্রক্রিয়া। এই উদ্দেশ্যে তারা শহরে শহরে লঙ্গরখানা খুলে সেইসব শ্রমিককে খাবার দিল, দিল কারখানায় নিয়োগ করে জীবন ধারণের নতুন আশ্বাস। কার্ল মার্ক্স তাঁর Das Kapital গ্রন্থে এ কাহিনীর আনুপূর্বিক বর্ণনা দিয়েছেন। সমকালে সামন্ততন্ত্রের সহায়ক চার্চতন্ত্রকে মানবিক রূপ দিতে তাদেরই নেতৃত্বে সংঘটিত হল প্রতিবাদী প্রটেস্ট্যান্ট ধর্মের আন্দোলন এবং ক্রমে

তা প্রতিষ্ঠা পেল। এর সাথে ব্যক্তি-স্বাধীনতার জয়গানের আড়ালে বাণিজ্যিক বিনিময় প্রক্রিয়ায় অথবা ধনতান্ত্রিক উৎপাদন ব্যবস্থায় 'লাভ' বা (Profit)-এর উপাদানকে নৈতিকতা ও বৈধতার উপর প্রতিষ্ঠা করা হল। লাভ যে আসলে মূল্যের পরিবর্তে মূল্য পরিশোধ না করা, শ্রমিককে বঞ্চিত করা তারই উৎপাদিত মূল্যের একটা অংশকে প্রতিষ্ঠিত শক্তি-সমীকরণের অধীনে মালিকের হাতে হস্তান্তরিত 'উদ্বৃত্ত মূল্য' মাত্র, তা স্বাভাবিক বৈধতা অর্জন করল। অন্যপক্ষে মালিকের মূলধন আসলে যে শ্রমিককে বঞ্চিত করা পুঞ্জিভূত উদ্বৃত্ত মূল্য মাত্র, এই নতুন উৎপাদন ব্যবস্থা বা সমীকরণে তা আর কারও মনে থাকে না। আদিম প্রাকৃতিক সমাজ ব্যবস্থার 'মূল্যের বিনিময়ে মূল্যের পরিশোধ' হওয়ার পবিত্র ও মৌলিক বিধি লঙ্ঘিত করে শঠতা ও বঞ্চনার আশ্রয় নিয়ে 'লাভ'-এর ধারণাকে নতুন নৈতিকতায় প্রতিষ্ঠা করা হল এবং তা ক্রমে আইনসম্মত করে তোলা হল। এটা সেই বুদ্ধি ও শক্তির আরোপে, প্রকৃতির মুক্ত সহায়সম্পদকে (ভূমি ইত্যাদি) ঈশ্বর প্রদত্ত তাই পবিত্র বলে ঘোষণা করে ব্যক্তিগত সম্পত্তির ধারণাকে নৈতিকতা, বৈধতা ও আইনি করে তোলার মতো ঘটনা। আইনের নামে যত সব বেআইনি কাজ।

নতুন রাজনীতির ক্ষেত্রে ধনতন্ত্রের নতুন শ্লোগান বা জিগির হল 'গণতন্ত্র' যার রূপরেখায় বলা হয় 'জনগণের নিমিত্ত জনগণের দ্বারা জনগণের সরকার প্রতিষ্ঠা'। এই শ্লোগানকে গৌরাবান্বিত মহিমান্বিত করে রাষ্ট্রীয় প্রচারযন্ত্র অতি তৎপর হয়ে ওঠে। আর সাথে প্রচারযন্ত্রের সাহায্যে দেশের এক ভাবমূর্তি বা দেবীপ্রতিমা গড়ে তোলা হয়। তা শাসিতের মনকে সদর্থকভাবে প্রভাবিত করে আবিষ্ট করে রাখে। বলা হয় সুশাসক যত্নবান আর মানবিক মুখ সম্পন্ন সরকার নির্বাচন করতে ভোটাধিকার জনগণের এক পবিত্র অধিকার। কোনো সরকার দেশের কল্যাণে নিয়োজিত না থাকলে বা তা অত্যাচারী হলে নির্বাচনে জনগণ তার পরিবর্তন করতে পারে। দেশের ভাবমূর্তি নিয়ে এ ব্যবস্থা চিৎকার করতে থাকলেও উৎপাদন পদ্ধতি ও তার সাথে যুক্ত বণ্টন ব্যবস্থা সম্পর্কে এমন প্রচারযন্ত্র কোনো কথা বলে না। তত্ত্বগতভাবে একজন ঝুপড়িবাসী তার ভোটাধিকার প্রয়োগ করলেও নির্বাচিত সংসদে তার অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠা অথবা তার পুনর্বাসনের প্রশ্ন সেখানে আলোচিত হয় না। কিংবা আমাদের দেশে ভারতীয় সংস্কৃতির নামে, ভারতীয় সংস্কৃতির গৌরবের নামে গণতন্ত্রের ধ্বজাধারীদের প্রচারিত মন্দির নির্মাণের প্রসঙ্গে বলতে হয় তেমন মন্দির বিপুল সংখ্যায় প্রতিষ্ঠিত হলেও আমাদের উল্লেখিত ঝুপড়িবাসীদের অথবা সমগ্রভাবে উনজন শাসিতের অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠা অথবা পুনর্বাসিত হওয়ার বিষয় সেখানে অপ্রাসঙ্গিকই থেকে যায়। শাসিতের স্বার্থের সেখানে ইতরবিশেষ ঘটে না। ধনতন্ত্রের রাজনৈতিক শ্লোগান 'গণতন্ত্র'-এর আড়ালে আসলে তা 'ব্যবসায়ী-শিল্পপতি মহলের স্বার্থে ব্যবসায়ী-শিল্পপতি কর্তৃক নির্বাচিত ব্যবসায়ী-শিল্পপতিদেরই সরকার'। কেননা এমত শাসন ব্যবস্থায় এই ব্যবসায়ী-শিল্পপতিদের দেয় অর্থেই সব রকম রাজনৈতিক দল পরিচালিত হয় আর প্রচারযন্ত্রও তাদেরই

নিয়ন্ত্রণে থাকে। তাছাড়া পশ্চাৎ থেকে বিজ্ঞাপনের সূত্রে ঐ প্রচারমাধ্যমকে তাদের ওপরই নির্ভরশীল করে রাখে। নির্বাচনে রাজনৈতিক দলের পরিবর্তন ঘটলেও ধনতান্ত্রিক অর্থনীতির ব্যবস্থাপনার পরিবর্তন ঘটে না। শেষ পর্যন্ত শোষণভিত্তিক ধনতন্ত্রই জয়ী হয়। ধনতান্ত্রিক অর্থনীতি অব্যাহত থাকে। আর এমন ব্যবস্থাপনার ভাবমূর্তিকে সমুজ্জ্বল রাখতে যত রকম 'কু-তথ্য, বানাওয়াট তথ্য ও প্রকৃত তথ্যকে আড়াল করা' নীতির (Misinformation, disinformation, and withdrawal of information) আশ্রয় নিয়ে শাসিতকে বিভ্রান্ত করে চলে। উত্তরোত্তর লাভের পাহাড় বানাতে আর ব্যবস্থাপনাকে অক্ষুণ্ণ রাখতে অন্যান্য অনুন্নত দেশের খনিজ ও কাঁচামালের ওপর নিয়ন্ত্রণ সুদৃঢ় রাখতে, আর ঐ সমস্ত দেশকে নিজেদের উৎপন্ন দ্রব্যের বাজার হিসাবে ধরে রাখতে নিরন্তু যুদ্ধবিগ্রহ করে চলে। আর তা সবই দেশের স্বার্থে বলে প্রচার করতে থাকে। সংস্কৃতির জগতে শাসিতকে ভুলিয়ে রাখতে তার একমাত্র সম্বল হল 'যৌনতা, ভোগবাদ আর জীবনের গতিশীলতা'। আর তাকেই তারা গণতন্ত্র, স্বাধীনতা ও মানবাধিকার বলে প্রচার করতে থাকে। এ সবই চলতে থাকে সুবিধাভোগী আধিপত্যকারী শ্রেণীর ক্ষমতায় সুপ্রতিষ্ঠিত থাকার সুবাদে আর নিজেদের অধিকারে থাকা সুনিয়ন্ত্রিত সাংস্কৃতিক আবহমণ্ডলের আর ধর্মীয় বাতাবরণের মধ্য দিয়ে এবং উপযুক্ত সহায়ক রাষ্ট্র কাঠামোর মধ্য দিয়ে।

আজ নিরপেক্ষ অর্থনীতিবিদ থেকে নব্যধারার ইতিহাসবেত্তা সকলেই এক বাক্যে স্বীকার করেন যে স্থানভিত্তিক ধনতান্ত্রিক অর্থনীতির বিকাশের সাথে লুকিয়ে থাকে সাম্রাজ্যবাদের বীজ। ধনতন্ত্রে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত আধিপত্যকারী সুবিধাভোগী শ্রেণী যারা সমগ্র উৎপাদন ও বণ্টন ব্যবস্থাকে নিয়ন্ত্রিত করে তারা উৎপাদনে নিযুক্ত শ্রমিকের ও উৎপাদনে সংযোজিত প্রকৃত মূল্যের পরিবর্তে উপযুক্ত মূল্য পরিশোধ না করে সংখ্যাগুরু ঊনজন শ্রমিক-কৃষককে বঞ্চিত করে উৎপাদনে তাদের দ্বারা সংযোজিত মূল্যের সিংহভাগই সরিয়ে রেখে খুব সামান্য অংশই বেতন অথবা উৎপাদনের মূল্য হিসাবে প্রদান করে। বাকি সিংহভাগ অংশই ধন নিয়োগকারী মালিকেরা লাভ বা লভ্যাংশ হিসাবে আত্মসাৎ করে। শীঘ্রই পরিমিত সময়কালের মধ্যেই সংখ্যাগুরুর ক্রয়ক্ষমতা কমে তলানিতে ঠেকে। ফলে বেশির ভাগ উৎপাদিত দ্রব্যই দেশের বাজারে অবিক্রীত থেকে যায়। তখন ধনপতি ও ব্যবসায়ীরা অন্য অঞ্চল বা দেশের বাজারে সেই উদ্বৃত্ত পণ্য বিক্রির উদ্দেশ্যে বাণিজ্যে বেরিয়ে পড়ে আর সেই সাথে সেই সব দেশের বাজারের ওপর যেমন নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠায় সচেষ্ট হয় তেমনই উত্তরোত্তর নিজেদের লাভের পাহাড়ের আয়তনকে বাড়াতে স্বদেশে নিজেদের নিয়ন্ত্রণাধীন ধনতান্ত্রিক উৎপাদনকে সুদৃঢ় সম্প্রসারিত করতে ঐ সব নতুন দেশের কাঁচামালের ওপরও নিয়ন্ত্রণ সুপ্রতিষ্ঠিত করতে স্থানীয় প্রশাসনকে উৎখাত করে নিজেদের প্রশাসন কায়েম করতে তৎপর হয়ে ওঠে। বিশেষত দ্বিতীয়োক্ত দেশগুলিতে যদি কালের নিয়মে অপেক্ষাকৃত দুর্বল সামন্ততান্ত্রিক সরকার কায়েম থাকে তবে গুণগত ভাবে শক্তিশালী ধনতান্ত্রিক অর্থনীতির দেশের

পক্ষে এমন নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা ও নিজেদের সরকার প্রতিষ্ঠা সহজতর হয়। এই প্রক্রিয়ার অবশ্যম্ভাবী পরিণতি হল সাম্রাজ্যবাদ আর তার সাথে সহগামী ফলশ্রুতি হিসাবে দ্বিতীয় অবশ্যম্ভাবী পরিণতি হল ভিন্ন ভিন্ন ধনতান্ত্রিক দেশের মধ্যে বাজার দখল ও দখলীকৃত দেশের কাঁচামালের ওপর নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে পারস্পরিক সংঘর্ষ লড়াই আর যুদ্ধ। সাম্প্রতিক আধুনিক কালের ইতিহাসে আমরা লক্ষ্য করেছি পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতাব্দীতে পশ্চিম ইউরোপে ধনতন্ত্র প্রতিষ্ঠার পর কিভাবে ঐ অঞ্চলের হল্যান্ড, গ্রেট ব্রিটেন, ফ্রান্স, জার্মানি, ইতালি, পর্তুগাল ও স্পেন ইত্যাদি দেশ পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে, এশিয়া আফ্রিকা ও নব আবিষ্কৃত উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকা কিংবা অস্ট্রেলিয়া মহাদেশকে তাদের কব্জায় এনে সাম্রাজ্য বিস্তার করেছে আর তার পর নিজেদের মধ্যে পারস্পরিক দ্বন্দ্বে প্রথম ও দ্বিত্রীয় বিশ্বযুদ্ধে লিপ্ত হয়েছে। এ সবেরই মূলে সেই ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত সুবিধাভোগী শ্রেণী-স্বার্থ সম্প্রসারণের প্রক্রিয়ায় দেশের স্বার্থের নামে, স্বাধীনতা রক্ষার নামে, মানবাধিকার ইত্যাদি লঙ্ঘনের নামে শক্তির নির্লজ্জ প্রয়োগ। বর্তমানের ইতিহাসে ধনতন্ত্রবাদের নবতর ও অগ্রবর্তী সংস্করণে আমরা দেখতে পাচ্ছি একমেরু-কেন্দ্রিক মহাশক্তিধর মার্কিনি দাপট ও তার ছত্রচ্ছায়ায় কিভাবে বহুজাতিক বাণিজ্যিক সংস্থা সমূহ তৃতীয় বিশ্বের মানুষকে নগ্নভাবে শোষণের কাজে লিপ্ত। তারা স্ব স্ব দেশের সরকারি সহায়তায় তৃতীয় বিশ্বের প্রচারমাধ্যমকে নিয়ন্ত্রণ করে, ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়, পুতুল সরকার প্রতিষ্ঠা ও তাদের রক্ষণে তৎপর হয় অথবা ভিন্ন মনোভাবের সরকারকে উৎখাত করতে তৎপর হয়। আর তৃতীয় বিশ্বের সহায়সম্পদের নিয়ন্ত্রণ কায়েম করতে এবং ঐ সব দেশে পুতুল সরকার কায়েম করতে নির্লজ্জ ও নগ্ন আগ্রাসন চালায়, ধ্বংসলীলায় মত্ত হয় আর সবই স্বাধীনতা গণতন্ত্র মানবাধিকার প্রতিষ্ঠা ও পুনর্গঠন এবং উন্নয়ন ইত্যাদির নামে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধোত্তর কালে ধনতন্ত্র ও নয়া সাম্রাজ্যবাদের সর্বাপেক্ষা শক্তিধর দেশ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বে ভিয়েতনাম, আফগানিস্তান, সোমালিয়া, যুগোশ্লাভিয়া কিংবা সর্বশেষ ইরাকে আগ্রাসনের কাহিনী ধনতন্ত্রের সহগামী এ সমস্ত প্রক্রিয়ারই নগ্ন প্রকাশ, তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। এখন এরূপ আধিপত্য সুপ্রতিষ্ঠিত করতে প্রচারমাধ্যমের সাহায্যে যে মূল্য-সংস্কৃতি গড়ে তোলা হয় তাই-ই পরবর্তীতে সভ্যতা বলে পরিচিত হয়। পৃথিবীতে দেশ ও কালে এক-এক অঞ্চলকে কেন্দ্র করে এক-এক গোত্র, গোষ্ঠী, জাতি অথবা শ্রেণীর হাতে শক্তির সঞ্চার ঘটে ও তার আধিপত্যের ক্ষেত্র সম্প্রসারিত হয় আর সাথে যুক্ত মূল্য-সংস্কৃতি ও তার অধীনে সৃষ্ট অবদান ক্রমে সভ্যতা বলে পরিচিতি পায়।

ইউরোপে ধনতন্ত্রের সূত্রপাত ও বিকাশের পরে স্বাভাবিক কারণেই স্বার্থের ক্ষেত্র সম্প্রসারণের তাগিদে, নতুন বাজারের সন্ধানে, ও নতুন কাঁচামালের উৎস চিহ্নিতকরণ ও তাদের ওপর নিয়ন্ত্রণ করতে যাওয়ার প্রক্রিয়ায় যে সাম্রাজ্যবাদ প্রক্রিয়ার সূত্রপাত ঘটে আর তার স্বাভাবিক অভিপ্রকাশের হাত ধরে ইউরোপের বিভিন্ন ধনতান্ত্রিক দেশ সাম্রাজ্য বিস্তারে বেরিয়ে পড়ে নাবিকেরা রাষ্ট্রশক্তির সহায়পুষ্ট হয়ে নতুন দেশ আবিষ্কারে

সমুদ্রের পথে পাড়ি দেয়। ব্যবসায়ও লাভের হাত ধরেই ঔপনিবেশিকতার সূত্রপাত ঘটে। তবে ঔপনিবেশিকতা সাধারণত দুটি প্রক্রিয়ায় সম্ভব হয়। প্রথমত যদি নবাবিষ্কৃত দেশের স্থানীয় মানুষদের সমাজ আর্থনীতিক স্তর যদি আদিম স্তরের হয় তবে প্রথমোক্ত অপেক্ষাকৃত জ্ঞানবিজ্ঞান ও প্রকৌশলে উন্নত ও উন্নত আর্থনীতিক বনিয়াদের ওপর প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তিরা শক্তির আরোপে দখলীকৃত নতুন দেশের আদি অধিবাসী সমূহকে সম্পূর্ণ উৎখাত করে, হত্যা করে, নির্মূল করে দেশটাকে নিজের মতো করে নেয়। এই প্রক্রিয়াতেই ইউরোপীয় জাতি সমূহ বিশেষত গ্রেট ব্রিটেনের অ্যাংলো-স্যাক্সন জাতি সমগ্র উত্তর আকেরিকা ও অস্ট্রেলিয়া ইত্যাদি দেশ বা মহাদেশ সমূহ নিজেদের করে নিতে পেরেছে, অথবা স্পেনীয়রা দক্ষিণ আমেরিকাকে মূলত নিজেদের দ্বিতীয় বাসভূমিতে পরিণত করতে সক্ষম হয়েছে। অন্যদিকে যে সমস্ত দেশে আগে থেকেই কোনো না কোনো বৃহৎ জনগোষ্ঠী বসবাস করত এবং অপেক্ষাকৃত দুর্বল হলেও সেখানে কোনোপ্রকার সভ্যতা কার্যকরী ছিল সেখানে নির্মূল করার প্রসঙ্গ ওঠেনি। সেখানে মূলত বাজারের সন্ধান ও সেখানকার কাঁচামালের উপর কর্তৃত্ব স্থাপনকল্পে শক্তির সংঘাতে ও ষড়যন্ত্রের আশ্রয়ে ঔপনিবেশিক সরকার স্থাপন করাই লক্ষ্য হয়ে ওঠে। এই প্রক্রিয়ায় তারা প্রতিষ্ঠিত শক্তিকে উৎখাত করতে গিয়ে স্থানীয় মানুষের মধ্য থেকে নানা প্রক্রিয়ায় এক সহায়ক শ্রেণী সৃষ্টি করে নিয়েছে। আর এরূপ সামগ্রিক প্রক্রিয়াতেই ইংরেজরা বণিকের বেশে এসে ক্রমে ভারতের রাজদণ্ড হাতে তুলে নিয়েছে এবং ভারতীয় ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়েছে। এই প্রক্রিয়ার অঙ্গ হিসাবেই প্রথমত তারা পরাজিত ও উৎখাতকৃত শক্তিকে জনমানসে হেয় করার লক্ষ্যে যত রকমের সম্ভব কুৎসা ও অপপ্রচারের আশ্রয় নেয়। অন্যদিকে সেই একই জনমানসে নিজেদেরকে গ্রহণযোগ্য করে তুলতে সম্ভাব্য সব রকম ইতিবাচক প্রচার চালায়। আর এ সবের সাথে সাম্রাজ্য দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত করতে এক সহায়ক শ্রেণী গড়ে তোলে। সেই উদ্দেশ্যেই শিক্ষা ব্যবস্থাকে নতুন ভাবে বিন্যাস করে। ব্রিটেন থেকে আগত ইংরেজ ব্যবসায়ীরা ধনতান্ত্রিক অর্থনীতির পটভূমি হতে জাত হলেও ভারতবর্ষে তারা ধনতন্ত্র বিকাশের বিরোধিতাই করেছে। কেননা ভারতে ধনতন্ত্রের বিকাশ ঘটলে স্থানীয় ধনপতিরা তাদের প্রতিপক্ষ হয়ে উঠত, তাই তারা এখানে নতুন ধারায় সহায়ক সামন্ত শ্রেণীর পত্তন করে তার সাথে সহায়ক এক কেরানিকুলের সৃষ্টিতে শিক্ষা ব্যবস্থাকে প্রয়োজনানুকূল করে প্রবর্তন করে। এভাবে ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যের পত্তন করতে যে সমস্ত শঠতা, ষড়যন্ত্র, নির্মমতা, নিষ্ঠুরতা প্রয়োজন তার কোনওটার আশ্রয় নেওয়া থেকে তারা পরাঙ্মুখ হয়নি। ১৮৫৮-এর ভারতের প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রামকে তারা বিদ্রোহ আখ্যা দিয়ে নির্মমভাবে তা দমন করে। তাদের স্থাপিত তথাকথিত সভ্য আইনি সরকারের অধীনে তথাকথিত নিরপেক্ষ বিচার ব্যবস্থায় প্রথমের দিকে কোনও দেশীয় মানুষ বিচারকের আসন গ্রহণের অধিকারী ছিল না, পরবর্তীতে দেশীয় বিচারপতি নিযুক্ত হলেও কোনও ইংরেজ অভিযুক্তের বিচার করার ক্ষমতা

কেবল ইংরেজ বিচারপতিদেরই হস্তে ন্যস্ত হত। বিশেষ বিশেষ রাস্তায় কেবল মাত্র ইউরোপীয়দের গমনাগমনের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়। ভারতীয়দের চলাচলের অধিকার সেখানে ছিল সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। কিন্তু বিজেতা তার মূল্য-সংস্কৃতিকে যদি বিজিতের নিজস্ব মূল্য-সংস্কৃতি বলে তাদেরকে গ্রহণ করাতে সক্ষম হয় তবেই পরাজিতের পরাজয় সম্পূর্ণ হয়। ভারতবর্ষেও তাই হয়েছিল। তাই এখনও তৃতীয় বিশ্বের আমরা সবাই বুদ্ধি ও শক্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত তথাকথিত ইউরোপীয় সভ্যতার বর্ণচ্ছটায় পঞ্চমুখ।

এখন সভ্যতার সঙ্গে স্বার্থভিত্তিক শক্তির নগ্ন প্রয়োগের প্রশ্নটি খতিয়ে দেখা যাক। আমরা প্রথমেই সভ্যতা সম্পর্কে একটি সংজ্ঞা নির্ধারণ করার চেষ্টা করেছি, যেখানে আমরা বলতে চেয়েছি যে আইনের শাসনে সুপ্রতিষ্ঠিত শৃঙ্খলাবদ্ধ সমাজ-জীবনে জ্ঞান-বিজ্ঞান, প্রযুক্তির ব্যবহার, শিল্প সাহিত্য সঙ্গীত কলা কৃষ্টি-সংস্কৃতি চর্চার উন্মুক্ত পরিবেশে ও মননে ঋদ্ধ চলিষ্ণু সমাজের সর্বাঙ্গীণ উৎকর্ষময় অবদানই সভ্যতা বলে বিবেচিত হওয়ার যোগ্য। কিন্তু এর সাথে স্বার্থাশ্রিত শক্তির নগ্ন আরোপের প্রশ্নটি কোথায়? আমরা আগেই লক্ষ্য করেছি যে গোষ্ঠী-তান্ত্রিক আদিম সাম্যবাদী অর্থনীতির সমাজ ব্যবস্থা থেকে ব্যক্তিগত সম্পত্তিবোধের ধারণাকে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে বুদ্ধিমান ও শক্তিশালীর পক্ষে শক্তির আরোপ কতখানি কার্যকরী ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। আর তার সাথে আমরা দেখেছি, এক গোষ্ঠী বা গোত্র কর্তৃক অপর গোষ্ঠী বা গোত্রকে শক্তি প্রয়োগে পরাভূত করে তাদের প্রজননক্ষম সুন্দরী নারীদের কীভাবে নিজেদের গোত্রভুক্ত করে নিয়েছে এবং পরবর্তীতে পরাভূত গোত্র ইত্যাদির সক্ষম ও বুদ্ধিমান নেতৃত্বকে নিধন করে, অপসারিত করে অবশিষ্ট সক্ষম পুরুষদের শুধুমাত্র শ্রমদাসে পরিণত করেছে। ইতিহাসে আমরা লক্ষ্য করেছি গ্রিসের নগর সভ্যতায় শ্রমিক কৃষক ও দাসদের নাগরিক অধিকার ছিল না। এর ফলে প্রথমোক্ত গোত্র. ইত্যাদিতে ক্ষমতায় আসীন সুবিধাভোগী ব্যক্তিবর্গ প্রকৃতির সাথে প্রত্যক্ষ সংগ্রামের কায়িক শ্রমের দায় থেকে অব্যাহতি পায়। তারা শুধু এ সমস্ত দাস এবং অন্য ঊনজনদের বুদ্ধি দ্বারা পরিচালনার দায়িত্ব হাতে তুলে নেয়। মানুষ কায়িক শ্রম থেকে অব্যাহতি পেলে এবং তার হাতে বৈভবের সূচনা ঘটলে মনুষ্য প্রকৃতি অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট মানুষদের মধ্যে দ্বিমুখী প্রবণতা প্রকাশ পায়। এদের মধ্যে একশ্রেণীর মানুষ বিলাসিতা ও ভোগবৃত্তিতে নিমজ্জিত হয়, অন্যদিকে তাদেরই মধ্যের একশ্রেণীর মানুষ আপন মানস প্রকৃতিতে (Psyche) নিহিত প্রবণতানুসারী জিজ্ঞাসু মনোবৃত্তি থেকে হয়ে ওঠে অনুসন্ধানী, রত হয় জ্ঞানচর্চায় অথবা শিল্পচর্চা ও সম্পর্কিত অনুশীলনে নিজেদের নিয়োজিত করে। এ ধরনের মানুষ আপন উদ্ভাবনী মানস-ক্ষমতার প্রয়োগ করে প্রকৃতিতে নিহিত শক্তি ও বৈশিষ্ট্য সমূহকে পর্যবেক্ষণ ও অধ্যয়ন করে একদিকে প্রকৃতির ইতিবাচক শক্তিসমূহকে মানব কল্যাণে নিয়োজিত করার প্রযুক্তি উদ্ভাবিত করতে শুরু করে অন্যদিকে তার নেতিবাচক বা প্রতিকূল শক্তি সমূহকে সংযত করার উপায় বা তাদের ক্রিয়াশীলতার হাত হতে পরিত্রাণের নিমিত্ত উপযুক্ত উপায় উদ্ভাবনে তৎপর হয়ে ওঠে। আর এর

সাথে সৃষ্টির আনন্দে সর্বতোমুখী জ্ঞানানুশীলনের আয়াস ও দায় নিজেদের কাঁধে তুলে নেয়। পরের পর্যায়ে এই শ্রেণীর মানুষ স্বকীয় প্রকৃতিজ সৌন্দর্যচেতনা তথা শিল্পবোধে উদ্বুদ্ধ হয়ে শিল্পীয় সৃজনকাজে নিজেদের নিয়োজিত করে। এমনটি করতে পারার প্রাথমিক শর্ত হল জীবনধারণের ও সংসারযাত্রা নির্বাহের জন্য কায়িক শ্রম হতে অব্যাহতি। স্বার্থাশ্রিত শক্তির প্রয়োগে যে অবস্থা বা উপযুক্ত পরিবেশ আগে থেকেই প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায় দাস-নির্ভর সামন্ততান্ত্রিক উৎপাদন ব্যবস্থায় কিংবা শ্রমিক-নির্ভর ধনতান্ত্রিক উৎপাদন ও বণ্টন ব্যবস্থায়। কিন্তু দ্বিতীয়োক্ত এই শ্রেণীর মানুষের কর্ম তৎপরতায় যে নতুন কারিগরি বিদ্যা বা প্রযুক্তির সূত্রপাত ঘটে কিংবা যে শিল্পকলার সৃজন সম্ভব হয় তার সুফল কিন্তু সবই শক্তির প্রয়োগে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত সুবিধাভোগী গোষ্ঠীর হাতেই কুক্ষিগত থাকে। সামগ্রিকভাবে দাস-শ্রমিক শ্রেণী ও প্রথমোক্ত শ্রেণীর অবশিষ্ট উনজন সে সুফলের ভাগ থেকে প্রায় সম্পূর্ণরূপে বঞ্চিতই থেকে যায়। আর নতুন সমাজ ব্যবস্থায় প্রকৃতির সহায়সম্পদ ব্যক্তিগত সম্পদ বলে বিবেচিত হওয়ার প্রক্রিয়ায় নারীও ব্যক্তিগত সম্পত্তিতে পরিণত হয়ে 'দম' অর্থাৎ দমিত নারী, তাই 'দম' বা জায়ায় (স্ত্রী) পরিণত হওয়ায় তেমন উদ্ভাবনী অথবা জ্ঞানানুশীলন ও শিল্পচর্চার প্রক্রিয়া থেকে তারা কার্যত অপসারিতই থেকে যায়। আর ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত সুবিধাভোগী এই নবজাত গোষ্ঠী ঐ স্বার্থভিত্তিক শক্তির প্রয়োগে যতই সম্প্রসারিত হতে থাকে ততই তার হাতে কুক্ষিগত হতে থাকে প্রকৃতির সহায়সম্পদ আর উপায়-উপকরনের। আর পূর্বোক্ত সামগ্রিক প্রক্রিয়ার ফলশ্রুতিতে এই নব প্রতিষ্ঠিত সুবিধাভোগী গোষ্ঠীর জীবনযাত্রার মানে সম্ভব হয় উৎকর্ষ সাধন। বৃক্ষ-শাখা অথবা পাহাড়-পর্বতের গুহা-কন্দরের পরিবর্তে এখন থেকে সুবিধাজনক স্থানে নির্মিত হতে থাকে পরিকল্পিত ও উৎকৃষ্ট বাসস্থান তথা চক মিলান ইটের বাড়ি, দেবস্থান, যাতায়াতের পরিকল্পিত সড়ক, পয়ঃপ্রণালী, স্নানাগার ইত্যাদি ইত্যাদি। শুরু হয় নগরায়ন বা পুর নির্মাণ; উচ্চমানের কৃষিকার্য, তার সাথে শেচ ব্যবস্থার পত্তন ইত্যাদি ইত্যাদি। এ সবের সাথে এমন সুবিধাভোগ সুনিশ্চিত করতে এই শ্রেণীরই নেতৃত্বে শুরু হয় সহায়ক নতুন ধর্মীয় নৈতিকতা স্থাপন ও সহকারী বিধি-ব্যবস্থার প্রচলন তথা আইন রচনা। শুরু হয় তথাকথিত সভ্যতা স্থাপনের আদিম সোপান রচনা। মূলে কিন্তু সেই শক্তি প্রয়োগে প্রকৃতির সহায়সম্পদ আত্মসাৎকরণ ও আত্ম-সম্প্রসারণের জৈবিক তাগিদের ক্রিয়াশীলতা। পরবর্তীতে এই ব্যবস্থারই সম্প্রসারণে শুরু হয় সুরম্য অট্টালিকা নির্মাণ, সুবিশাল ও দর্শনীয় ধর্মপ্রতিষ্ঠান ভবন, সুদৃশ্য স্মৃতিসৌধ, মিশরের পিরামিড, মেসোপটেমীয় জিগ্ গুরাট, বালবেকের মন্দির কিংবা গ্রিসের প্রাচীন মন্দির, নটে ড্যাম গীর্জা, খাজুরাহ কিংবা ব্লাক প্যাগোডা তথা কোনার্ক মন্দির অথবা তাজমহল ইত্যাদি ইত্যাদি। এ সবের সাথে নব সুবিধাভোগী সম্প্রদায়ের আপন সামাজিক প্রয়োজনে ব্যবসায়িক লেনদেনের নথি রাখতে অথবা শ্রমিকের মজুরির হিসাব রাখতে কিংবা ঐশী নির্দেশ অথবা বাণী বলে প্রচারিত শাস্ত্র ইত্যাদিকে সংরক্ষিত করতে অতি আদিম স্তরের হলেও শুরু হয়

লিপিমালার উৎপত্তি ও তার ক্রমবিকাশ, সংখ্যার ধারণা ও গণনা পদ্ধতি ও তার লিখনশৈলীর উৎপত্তি ও বিকাশ। এ সবই আজ সভ্যতার অবদান বলে স্বীকৃত। এরূপ গোষ্ঠী, জাতি অথবা শ্রেণীভিত্তিক শক্তি কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত তথাকথিত সভ্যতা-সংস্কৃতির অধীনে নির্মূল না হওয়া অপরাপর গোষ্ঠী জাতি অথবা শ্রেণী প্রথমোক্ত গোষ্ঠী ইত্যাদির অর্থনৈতিক স্বার্থের অনুপূরক স্বার্থযুক্ত মানুষ হয়ে অথবা প্রান্তিকীকৃত হয়ে আপন আপন অবস্থান গ্রহণ করতে বাধ্য হয়।

সমাজ বিকাশের এই স্বাভাবিক এবং প্রাকৃতিক কারণেই বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন কালে বিশেষ বিশেষ মানব গোষ্ঠীর মধ্যে সূত্রপাত ঘটে ক্ষমতা তথা শক্তির কেন্দ্রায়ন, এবং সেই শক্তিকে কেন্দ্র করে শুরু হয় নতুন অর্থনৈতিক শক্তির বনিয়াদ রচনা। এই অর্থনৈতিক কেন্দ্রকে ভিত্তি করে গড়ে ওঠে তথাকথিত নতুন সভ্যতার ভিত্তি। শুরু হয় নতুন সাম্রাজ্য বিস্তারের পর্ব। এরূপ সাম্রাজ্য ভৌগোলিক, আর্থ-রাজনীতিক অথবা আর্থ-সাংস্কৃতিক বিভিন্ন ধরনের হতে পারে। বর্তমানের প্রেক্ষিতে সাম্রাজ্যের সম্প্রসারণ প্রধানত আর্থ-রাজনীতিক-সামরিক ও সাংস্কৃতিক ধরনের। এই শক্তির কেন্দ্রকে ভিত্তি করে যে সাংস্কৃতিক আবহ রচিত হয় তা-ই পরবর্তীতে সভ্যতা বলে পরিচিতি পায়। পৃথিবীর যে-কোনো সভ্যতাকে বিশ্লেষণী দৃষ্টিতে বিচার করলে দেখা যাবে তাদের প্রত্যেকের মূলে আছে কোনো না কোনো নৃ-গোষ্ঠীর মধ্যে শক্তির কেন্দ্রায়ন, আর তার ওপর নির্ভর করে অপরের ওপর কতৃত্ব ও আধিপত্যের বিস্তার এবং সেই সূত্রে বিজিতের কর্মতৎপরতার ওপর, তাদের সহায়-সম্পদ উপায়-উপকরণের ওপর নিয়ন্ত্রণ, শাসন শোষণ নিপীড়ন ও বঞ্চনার ইতিহাস। এর সাথে ক্ষমতায় অধীন গোষ্ঠী শ্রেণী ইত্যাদির হাতে উত্তরোত্তর সহায়-সম্পদের কেন্দ্রীভূত হওয়ার ইতিহাস। যখন কোনো জাতি-গোষ্ঠী অপর কোনোও জাতি-গোষ্ঠীর নেতৃত্ব ও প্রশাসনকে শক্তি প্রয়োগে অপসারিত করতে সক্ষম হয় তখন থেকেই পরাজিত জাতিসত্তাকে সম্ভব হলে ক্রমে হয় সম্পূর্ণ রূপে নির্মূল করে ফেলে অথবা ক্ষেত্রান্তরে তাদের ওপর আধিপত্য বিস্তার করে তাদের মধ্য থেকে এক সহায়ক গোষ্ঠী তৈরি করে নিজেদের ব্যবস্থার সাথে সম্পৃক্ত করে নেয়। আর এই সূত্রেই পরাজিত জাতি-গোষ্ঠীর ওপর আধিপত্য দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত করে তোলে। আর নিজেদের স্বার্থভিত্তিক মূল্য-সংস্কৃতিকে যদি পরাজিতের নিজস্ব সংস্কৃতি বলে গ্রহণ করাতে সক্ষম হয় তবেই পরাজিতের পরাজয় সম্পূর্ণ হয়। আর এমন সমীকরণ সমন্বিত সংস্কৃতি ও অর্জন দীর্ঘস্থায়ী হলে পরে তা সাধারণের দৃষ্টিতে সভ্যতা বলে পরিচিতি পায়। তবে প্রকৃতির পরিবর্তনশীলতার কারণে কোনো ব্যবস্থাই চিরস্থায়ী হয় না। আর এই সূত্রেই শক্তির কেন্দ্র দেশ ও কালে ভ্রাম্যমাণ।

মানুষের ইতিহাসে বিশেষ বিশেষ সমাজে বিশেষ ঐতিহাসিক ক্ষণে এরকম শক্তি-আশ্রয়ী শাসন শোষণ বঞ্চনা নিপীড়ন অত্যাচার ও উনজনের ওপর নিগ্রহভিত্তিক বিধি-ব্যবস্থায় পুঞ্জিভূত গ্লানির জগদ্দল পাথরের পীড়ন হতে মুক্তি পেতে ঐ সুবিধাভোগী শ্রেণীর নতুন প্রজন্মের মধ্যে উপস্থিত হওয়া হঠাৎ নতুন নৈতিক দিক পরিবর্তনের

সাথে তাদেরই নেতৃত্বে নিপীড়িত ঊনজনের সহযোগিতায় কখনো কখনো যে নতুন বিপ্লবাত্মক নৈতিক পরিবর্তন সূচিত হয়নি এমনটি নয়। আমরা ইতিহাসে দেখেছি 'প্যারি কমিউন' (১৮৭১-মার্চ), রাশিয়ার সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব (১৯১৭) ইত্যাদি কিংবা চিন্তার ক্ষেত্রে এরকমই বিপ্লবাত্মক মোড় নিতে দেখেছি মহম্মদ (৫৭০-৬৩৩) থেকে মার্ক্স (১৮১৮-১৮৮৩) হয়ে মাও (১৮৯৩-১৯৭৬)-এর চিন্তা ও কর্মতৎপরতায়। কিন্তু সে সমস্ত চিন্তা কিংবা বিপ্লব মানুষকে চিরস্থায়ী মুক্তি দিতে পারেনি। কেননা প্রবন্ধের শুরুতেই উল্লেখ করা মনুষ্য প্রকৃতিতে নিহিত কাম ও বিষয়ের প্রতি আসক্তি, ক্ষমতালিপ্সা তথা অপরের ওপর প্রভুত্ব করার প্রবণতা, এবং অপরের দৃষ্টিতে নিজের আত্ম-স্বীকৃতির চিরন্তন বাসনা; আর এর সাথে যুক্ত থাকা প্রকৃতিগতভাবে মানুষে মানুষে বুদ্ধি ও শক্তির তারতম্য আর এসব উপাদানের নিরন্তর ক্রিয়াশীলতা; তার সাথে বুদ্ধি ও শক্তির আরোপে প্রকৃতির সহায়সম্পদ উপায়-উপকরণ কুক্ষিগত করে আমার বা আমাদের বলে দখল করা এবং সেই বুদ্ধি ও শক্তির আরোপে অপরকে সে সমস্ত সহায়সম্পদ থেকে বহিষ্কার করে বংশ বিস্তারের জৈবিক তাগিদে সংগ্রাম ও প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হওয়ার নিরন্তর ক্রিয়াশীলতা। মহম্মদ ধর্মীয় নৈতিকতার ওপর ভিত্তি করে যে সামাজিক ও অর্থনীতিক সাম্য স্থাপিত করতে চেয়েছিলেন, মানব প্রকৃতির এ সমস্ত উপাদানের স্বাভাবিক ক্রিয়াশীলতায় অচিরেই নতুন নৈতিকতাকে কেন্দ্র করে এক কায়েমী শক্তির জন্ম হয় আর সেই কায়েমী শক্তির সম্প্রসারণে সম্ভব হয় এক বিশাল আরব সাম্রাজ্যের। মার্ক্সের নৈতিকতাভিত্তিক প্যারি কমিউন (১৮৭১, মার্চ) বেঁচে ছিল মাত্র ৭২ দিন। কেননা পরাজিত সামন্ত শ্রেণী ও জায়মান বুর্জোয়া শ্রেণীর যৌথ তীব্র প্রত্যাঘাত সহ্য করার মতো ক্ষমতা তখনও প্যারি কমিউনের হয়নি। এই মিলিত প্রতি-বিপ্লবী আক্রমণে প্রায় ত্রিশ হাজার শ্রমিকের রক্তে সে দিনের প্যারি কমিউনের পতন হয়। অন্যদিকে সোভিয়েত প্রজাতন্ত্রে (১৯১৭-১৯৯১) সর্বহারার একনায়কতন্ত্র প্রতিষ্ঠার কথা বলা হলেও মূলত তা ছিল পূর্বতন সুবিধাভোগী ব্যবস্থাপনায় জড়িত থাকা অপেক্ষাকৃত কম সুবিধাভোগী মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মানুষেরাই নতুন ব্যস্থাপনায় সরকারি আমলাতন্ত্র, সামরিক বাহিনীতে ও সর্বপ্রধান কর্তৃত্বময় কমিউনিস্ট পার্টিতে আপন অবস্থান গ্রহণ করে। অচিরেই তারা মানুষের প্রকৃতিজ পূর্বোক্ত উপাদান সমূহের ক্রিয়াশীলতায় শাসিত সাধারণের মূল্যে স্ব-গোষ্ঠীরই শ্রীবৃদ্ধি রূপায়ণে পার্টির নীতিমালায় শোধনবাদের সংযুক্তি ঘটায়। ওদিকে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে ধনতান্ত্রিক বুর্জোয়া রাষ্ট্রগুলি মার্কিন নেতৃত্বে এই প্রক্রিয়াকে পিছন থেকে ও বহুক্ষেত্রে ষড়যন্ত্রের আশ্রয়ে সমর্থন ও সহযোগিতার হস্ত প্রসারিত করে। পরিণতিতে গরবাচভের গ্লাসনস্ত ইত্যাদি এবং ১৯৯১-এ সোভিয়েত প্রথার অবসান। এসব কাহিনী এখন ইতিহাস। আর এসব প্রক্রিয়ার পশ্চাতে থাকে স্বার্থাশ্রিত বুদ্ধি ও শক্তির সেই আদিম কূট অথবা নগ্ন প্রয়োগ। তাই বলি শক্তির প্রকাশে সভ্যতার প্রকাশ—স্বার্থাশ্রিত শক্তির নগ্ন প্রয়োগই সভ্যতার ভিত্তি। মানবেতিহাসে এই স্বার্থের ক্রিয়াশীলতাতেই ভাঙাগড়া আর সংঘাত

ও সহযোগিতায় ইতিহাসের বিবর্তন ঘটে। সমগ্র মানব সমাজে কোনো নৈতিকতা, আদর্শ অথবা দর্শনভিত্তিক আদর্শ সমাজ স্থাপিত করে তাকে স্থায়ী রূপ দেওয়া অথবা তাকে সর্বজনীন ও চিরন্তন করার প্রশ্ন মানুষের কাছে স্পর্ধা মাত্র। তবুও সমাজ, ইতিহাস থেমে থাকে না। বৈচিত্র্য, বৈপরীত্য আর পরিবর্তনশীলতায় তার ভাঙাগড়া চলেছে নিত্য। স্বার্থ আর শক্তির প্রয়োগই তার চালিকাশক্তি। অথ মুক্তি? ওরে, মুক্তি কোথায় পাবি, মুক্তি কোথায় আছে! ....তবে কেন এই বন্দীদশা? সে এক অন্য ভাষা।

তথ্যসূত্রপঞ্জি :

১. ঋগ্বেদ-১:১০৩:৩
২. ঋক-১:১০৩:৬
৩. ঋক-১:১০৩:৮
৪. ঋক-১:৫১:৮
৫. ঋক-১:৩৪:৯
৬. The Holy Bible–Placed By The Gideons, Judges : 21:10-12 & also see Deuteronomy 20:13-17
৭. গীতা : ৪:১৩
৮. গীতা : ৩:৩৫
৯. মনুসংহিতা : ১০:৯৬
১০. মনুসংহিতা : ১০:১২৩
১১. প্রাগুক্ত : ৮:৪১৩
১২. প্রাগুক্ত : ৮:৪১৪
১৩. প্রাগুক্ত : ৮:৪১৭
১৪. The Kautiliya Arthasastra, Part-II, R.P. Kangle, Motilal Banarasidas, Delhi, 1992, pp-7, Sloka 5
১৫. Ibid, pp-8, Sloka–8
১৬. Ibid, pp–9, Sloka 16
১৭. Ibid, pp–32, Sloka–10

লেখক : ভারতীয় কেন্দ্রীয় সরকারের অধিকারী (অবসরপ্রাপ্ত) ও প্রাবন্ধিক
Kendriya Vihar, Block: B-8, Fl.No.120
Nazrul Islam Sarani, Kolkata-700052
Tel: 91-33-0110

দুটি কবিতা

অভীক মজুমদার

নরকপর্ব

প্রেতের ভাষায় আজও কথা বলে আগামী বছর
পালংশাকের ক্ষেতে ছুরিবিদ্ধ হয়েছিল জগদীশ, সেদিন সকালে
পেয়ালা, কাটারি আর কাঁকড়ার ঝোল নিয়ে
তর্ক করেছিল। স্মৃতিকথা লেখে নাকি শুধু ময়ূরেরা,
তাদের 'জাতীয় পাখি' করা হয়েছিল তবে এইকথা ভেবে?
রাষ্ট্রজুড়ে স্মৃতিরক্ষা কমিটির তাই এত ভিড়?

হাজার টাকার নোটে গান্ধিজির মুখ, তাতে জগদীশ প্রসাদের
রক্ত লেগে আছে। মুছে যাবে। স্মৃতিও তো, যাকে বলে, একধরণের
নির্মাণকৌশল—কী বলেন?

প্রেতিনীর স্মৃতি নেই। ভারতের স্বাধীনতা, মন্ত্রীসভা,
গমের ফলন—এইসব তুচ্ছ দায় তার মাথার ভেতরে যাতে প্রবেশ
না-করে, সেইদিকে শ্যেনদৃষ্টি দিয়ে বসে আছে শত শত
সামরিক আধাসামরিক খোঁচড়বাহিনী।

আদিবাসী মেয়েটিকে ধর্ষণের সুযোগ্য কারণ
তৈরি করে পার্লামেন্ট
মৃদু হেসে ধুতি খোলে আদালত নামক শ্বাপদ
জগদীশ লাশ হয়ে সেইসব লক্ষ করে, হাসে
আমি প্রেতিনীকে বলি—ভবিষ্যৎ?
হৈ-হৈ করে দেখি সে-ও হেসে ওঠে
রাত্রির ভেতরে দুজনেই বেশ রসে-বশে ডুবি
জগদীশ দূর মাঠে
জি এন পি, দারিদ্র্যসীমা, খারিফমরশুম এইসব
শব্দ নিয়ে লোফালুফি করে...

দূর থেকে শোনা যায় : জাতির উন্নতিকল্পে
ভাষণে ফাটিয়ে দিচ্ছে, মহামান্য ভূস্বামীপ্রধান....

মহাপৃথিবী

মৃত মনীষীর চোখে, আমাকে দেখেছে সুলেমান
গন্ধকের স্তূপে বসে জ্বালানো দেশলাইকাঠি লুফে-ছুঁড়ে-লুফে আমাদের অবিরাম খেলা
জমে গেছে। শিল্প নয়। শিল্প, সে কি এত রক্ত, ঘাম
শুঁকেছে কখনো? ওতো লালুভুলু আটতলা ফ্ল্যাটের
মুখে ক্রিম-মাখা ছেলে। ও কী বোঝে পুলিশের ঝাড়?
হাত উড়ে গেছে, পায়ে দু-তিনটে আঙুল নেই, বাবার বডিটা
পাওয়া গেল খালের ওদিকে—ও.সি. শুধুমুধু ঝুনুকে ক্যালালো....

গন্ধকের স্তূপে বসে আমাদের এরকম খেলা, এসো, খেলো
খেলে দেখো, চাকু হাতে আয়নার মুখোমুখি। পৃথিবীর ছবি দেখে
মনে হবে ওটা হাতবোমা, অক্ষ বা দ্রাঘিমা নয়
ওপরে সুতুলি দিয়ে টানটান এদিক-ওদিক বাঁধা আছে—

গল্প

একটি গ্রামের গল্প

দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

ছেলেবেলায় এক জ্যোতিষী আমার হাত দেখে বলেছিল আমি রাজা হব। এক জ্যোতিষী বলেছিল আমি সন্ন্যাস নেব। বাবার বন্ধু বিজয় কাকা বই পড়ে ইংরিজি মতে বলেছিলেন আমার পরমায়ু মেয়েদের সিঁথির মতো দীর্ঘ আর বলেছিলেন আমার বউ হবে কালো।

কলকাতার আকাশে আগে রোজ ঝাঁক বেঁধে টিয়াপাখি আসত। জিতেদের মাঠে সন্ধেবেলা জোনাকি জ্বলত। পাড়ার অনেকগুলি বাড়িতে কোকিলের খাঁচা আর পায়রার ব্যোম ছিল। বসন্তকালে কেউ কেউ পেয়ারা কাঠের গুলতিতে বুলবুলি বেঁধে গুলতি হাতে ঘুরে বেড়াত। সুতোয় বাঁধা বুলবুলি কখনো কাঁধে উড়ে বসত, কখনো হাতের তেলোয়। আমি আর দাদা ঘর বন্ধ করে কাপড় ছুঁড়ে ছুঁড়ে চড়াই ধরতাম। কিন্তু চড়াই বুলবুলি নয়।

চাঁদিয়াল, চক্ষুয়াল, পেটকাটা, মুখপোড়া, সতরঞ্চি—এমনি সব নাম ছিল। ঘুড়ি ওড়াতে শেখার আগেই আমার ঘুড়িধরার নেশা হয়েছিল। আমাদের ছাদ ছিল না। ছাদ বাড়িঅলার। বাড়িঅলার ছোট দুটি ছেলে আমার বয়েসী। বড়রা অনেক বড়। ওরা সব ভাই-ই ঘুড়ি ওড়াত। প্রত্যেকের লাটাই ছিল। একটা মাঞ্জার লাটাই, একটা সাদা সুতোর। বিশ্বকর্মা পুজোর দিন বুড়ো বাড়িঅলাও ঘুড়ি ওড়াত। বাড়িঅলার লাটাই সারা বছর আলমারিতে তোলা থাকে। চকচকে পালিশ, হাতির দাঁতের কাজ। মন্টু কেষ্টর লাটাই বাজারে দু আনায় বিক্রি হয়। আমার লাটাই ছিল না, সুতো না। শুধু কটা ঘুড়ি ছিল। আমি মন্টু কেষ্টর লাটাই ধরতাম, ধরাই দিতাম। ওরা সুন্দর প্যাঁচ খেলত, অনেক সময় ঘুড়ি কেটে তা লুটে নিয়ে আসত। কখনো আবার নিজেরাই ভোকাটা হয়ে যেত। পাছে কেউ হাপ্তা ধরে তাই আমার হাত থেকে লাটাইটা টেনে নিয়ে দ্রুত সুতো গোটাত। তবু কোনো বাড়ি থেকে ঠিক সুতো ধরে ফেলত। আমি তখন ঢিল মারতুম। আমি কখনো হাপ্তা ধরলে মন্টু কেষ্ট কেড়ে নিত।

আমাদের পাড়ায় প্রায় ঘরে ঘরে বিশ্বকর্মা পুজো হত, আর কার্তিক পুজো। খুব ঘটা করে হল বারোয়ারি জগদ্ধাত্রী পুজো। আমাদের পাড়ার সং খুব বিখ্যাত ছিল।

আমাদের বাড়িতে প্রতি বিষ্যুদবার হত লক্ষ্মী পুজো। পেতলের ঘটে আমের পল্লব বসিয়ে গোলা সিঁদুরে লক্ষ্মীর মূর্তি এঁকে প্রদীপ জ্বালিয়ে একটা পেতলের থালায় আস্ত পান, কুচো সুপুরি, কটা বাতাসা আর মধুপর্কের বাটিতে তেল সিঁদুর সাজিয়ে হাতে লেখা একটা পুঁথি দেখে সুর করে পাঁচালি পড়ত পিসি, কখনো দাদা। শুনতে শুনতে আমি ঘুমিয়ে পড়তাম আর ঠিক সময়ে উঠে প্রসাদ খেতাম। বছরে একবার হত সরস্বতী পুজো, বই সাজিয়ে। রীতিমতো পুরুত আসত। মা শাঁখ বাজিয়ে জোড়া ইলিশের বিয়ে দিত। আমরা খুব করে তিলে কদমা আর কুল খেতাম। তবু মনটা খুঁতখুঁত করত। মা বুঝে বলত আমাদের বংশে প্রতিমা পুজো বারণ। আর ছিল হোলি। ফুলঝুরি কি হাউইয়ের মতো রঙ ছুটত। বাতাসে ফাগের গুঁড়ো জ্বলত। সন্ধেবেলা রাস্তার মাঝখানে অরগ্যান সাজিয়ে বেহালা বাজিয়ে দলবেঁধে গান হত। পশ্চিমা চাকররা কাঁধে ঝাড়-লণ্ঠন নিয়ে মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে থাকত। তারপর কবে যেন জেলেপাড়ার সং বন্ধ হয়ে গেল।

রাত্তিরে ঘুমোতে ঘুমোতে কথা বলা আমার স্বভাব ছিল। আমি নাকি প্রায়ই ঘুমের মধ্যে উঠে দাঁড়িয়ে হনহন করে বাইরে চলে যেতাম। জ্বর হলে বাবা ইংরিজিতে বকাবকি করত। পিসি খুব চিবিয়ে চিবিয়ে ইংরিজি পড়া তৈরি করত। আমার খুব গর্ব হত।

আমি কখনো গাঁ দেখিনি। মার কাছে দেশের গল্প শুনতাম। মা ভালো গল্প বলতে পারে না। আমার কোনো ঠাকুমা নেই, ঘুমচোখে রূপকথা শুনিনি। তবে ঘুড়ির নেশায় রেনপাইপ বেয়ে পাঁচিল টপকাতে শিখেছিলুম। আমাদের পাড়াটায় বাড়িগুলো খুব গায়ে গায়ে। আমাদের পুব আর দক্ষিণ লাগোয়া বাড়ি দুটোর সদর দরজা ছিল সম্পূর্ণ অন্য রাস্তায়। ফলে গোটা তল্লাটে কোনো বাড়িরই যেন আব্রু ছিল না। দুপুরবেলা মেয়ে-বউরা জানালায় দাঁড়িয়ে বা ছাদে রোদ পোয়াতে পোয়াতে দূরে অন্য বাড়ির সঙ্গে চেঁচিয়ে গল্প জুড়ত। আমার মা সারাদিন কাজ করে। তার গল্প করার সঙ্গী ছিল না।

ভালুকঅলা আসত ভালুক নিয়ে। বাঁদরঅলা আসত সাহেব-মেম নিয়ে। বেদে আসত সাপের ঝাঁপি নিয়ে। বাজিকর আসত ভেল্কি দেখাতে। আর আসত মাদুলি, জড়ি-বুটি নিয়ে সন্ন্যাসী, ফকির। একজন আমার হাত দেখে বলেছিল রাজা হব। আমি চাইতাম জাদুকর হতে! বেশ ঝুলিকাঁধে দেশে দেশে খেলা দেখিয়ে বেড়াব আর হঠাৎ হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠব, বাচ্চেলোগ আউর একদফে তালি।

আমাদের একতলা ভাড়া দেওয়া হবে। রাজু এসে একটা লোককে কী সব বোঝাল। ট্রেনের কামরার মতো সরু আর লম্বা একটা ঘর। সামনে একফালি উঠোন, কয়েক হাত জমি। শ্যাওলাধরা ইঁট আর মরচে পড়া লোহার টুকরোয় জমিটা বোঝাই। অজস্র শামুক দেয়াল বেয়ে বেয়ে উঠে আমাদের ঘরেও চলে আসে। আর ছিল বিছে। জমিটা ফালতু পড়ে ছিল। দেয়ালের ওপাশে জিতেদের বাড়ি। ওদেরও প্রায় বিঘেখানেক

জমি জঙ্গল হয়ে থাকত। একটা বড় শিউলিগাছ ছিল। শিউলিগাছের ডালপালা ঝুঁকে আমাদের একতলার সেই ইঁটের স্তূপের ওপর সমস্ত শরৎকাল ফুলের বৃষ্টি করত। আর দুল কটা কলাগাছ, কোনোদিন কলা হত না। একটা ঝুমকো জবা আর একটা রজনীগন্ধার গাছ ছিল। বাদবাকি জমিটা চীনে ঘাস ও লুচিগাছে বোঝাই। লুচিগাছ নাম আমার দেওয়া। আমি গাছপালার নাম খুব কম জানতাম। কিন্তু শেষপর্যন্ত ভাড়াটে আর এল না।

আমাদের পাড়াটায় এখানে-ওখানে কিছু কিছু জমি খালি পড়েছিল, কিছু কিছু বাড়িতে ভাড়াটে ছিল না। অথচ বস্তিগুলোর রকম দেখে অবাক হতুম। রাস্তার কলে জল ধরছে, চান করছে আর ঐটুকুটুকু ঘরে কত মানুষ। বস্তিটায় নাকি জেলেরা থাকত। বুঝলুম এইরকমই নিয়ম। ছোটলোকদের এই ভাবেই থাকতে হয়।

একদিন জোড়াশীতলার মন্দিরে মার সঙ্গে পুজো দিতে গিয়ে পাঁঠাবলি দেখলুম।

আমাদের পাড়ায় একটা ভুতুড়ে বাড়ি ছিল। জিতেদের বাড়ির পাঁচিল ছাড়িয়ে শুধু ভুতুড়ে বাড়ির ছাদটুকু দেখা যেত। একদিন একটা ঘুড়ি কেটে পড়ল। গ্রীষ্মকালের দুপুর। একটা কাক ঘাড় বেঁকিয়ে শুকনো ঠোঁট দিয়ে গঙ্গাজলের ট্যাঙ্কের ঢাকনাটা ঠুকরে ঠুকরে ফুটো করার বৃথা চেষ্টা করছিল। টিনের গায়ে নখের আঁচড়ের শব্দ ছাড়া চারিদিক নিস্তব্ধ। আমি চুপি চুপি জিতেদের মাঠে নেমে দোতলা ডিঙিয়ে ছাদের পাঁচিল টপকে সেই ভুতুড়ে বাড়িটার অসম্পূর্ণ দোতলায় এসে দাঁড়ালুম। আর সামনেই দেখলাম একটা সিঁড়ি, নিচে নেমে গেছে। হঠাৎ একটা সিঁড়ি দেখে আমার খুব ভয় করল। আমি পালিয়ে এলুম।

আমাদের একতলায় নতুন ভাড়াটে এল। একটা বিধবা বুড়ি, চোখে চশমা। এর আগে আমি কোনো চশমাঅলা মেয়েছেলে দেখিনি। কর্তা তার ছেলে—বেশ বড় একজোড়া গোঁফ আছে আর চোখদুটো ঘুমঘুম। তার একগলা ঘোমটা টানা বউ, দুটো ছোটছোট ছেলে। তাদের সঙ্গে এল বিশাল এক পালঙ্ক, মস্ত কাচের পাল্লা দেওয়া দেরাজ, সুন্দর সুন্দর কার্পেটের আসন, আরও টুকিটাকি হাজারো জিনিসপত্র। একটা ঘরে কিছুই ধরল না, উঠোনে ডাঁই করা রইল। এত দামিদামি জিনিস আমি বাড়িঅলাদের ঘরেও দেখিনি।

আমাদের বাড়িঅলার ছাদে প্রায়ই খানিকটা জটপাকানো সুতো পড়ে থাকত। সুতোয় জট পাকালে মণ্টু বা কেষ্ট তা খোলার চেষ্টা করত না। জটটা ছিঁড়ে গিঁট লাগিয়ে নিত। আমি একদিন বসে বসে অনেকক্ষণ ধরে সেই জট ছাড়িয়ে খানিকটা সুতো বের করলাম। সেই থেকে ফেলে দেওয়া জট দেখলেই সুতো ছাড়িয়ে নিতাম। তারপর একদিন আমার হাপ্তার মাঞ্জা কেড়ে নিতে গেলে মণ্টুর সঙ্গে মারামারি হয়ে গেল। জ্যাঠাইমা বললেন, যে ধরেছে তার হাপ্তা। মণ্টু বলল, আমাদের ছাদে কেন আসে? জ্যাঠাইমা বললেন, আহা আসুক না, বামুনের ছেলে—। মণ্টু বলল, ভিখিরি কোথাকার। আমি অনেকখানি সুতো পেয়ে গেছি বলে আর কথা কাটাকাটি করলাম না। মনে হল এইবার একটা লাটাই দরকার।

আমাদের বাড়িটা ছিল অনেকখানি ছড়ানো আর জটিল। সদরদরজা দিয়ে ঢুকলে প্যাসেজের ডাইনে-বাঁয়ে দুখানা ঘর—একটায় থাকত রাজু, অন্যটায় বিচিলি। বাঁ দিকের ঘরের সামনে যে প্যাসেজ তার শেষে একটা কাঠের সিঁড়ি—দোতলায় বাড়িঅলাদের চতুর্ভুজ আকারে ঘর ও বারান্দা, তিনতলায় ছাদ আর ঠাকুরঘর। সদরদরজা দিয়ে সোজা এগোলে খোলা আকাশের নিচে উঠোন। উঠোনের পুবদিকে উত্তর-দক্ষিণে টানা নাটমন্দির। উঠোন পেরিয়ে আবার একটা দরজা। অন্দরমহলের দরজা। তারপর সরু আর অন্ধকার গলি। আবার একটা ঘর। অন্ধকার। নাটমন্দির থেকে এ ঘরে ঢোকার চোরা দরজাটি সব সময় বন্ধ থাকে। ঘরটার সামনে আবার ছোট্ট উঠোন, আকাশ দেখা যায়। উঠোনে কল-চৌবাচ্চা। ঘরের গা ঘেঁষে সিঁড়ি। সিঁড়ি দিয়ে উঠে সামনে বারান্দা, দোতলায় দুটি ঘর। বাড়িঅলাদের অংশের সঙ্গে এই দোতলার বারান্দার যোগ রেখেছে একটি দরজা। সেটিও বন্ধ থাকে। ঘরদুটি দিয়েই সামনের সরু ছাদে যাওয়া যায়, সেই ছাদের সিঁড়ি দিয়ে উঠে ঝুলনো বারান্দা আর আমাদের দুটো ঘর। কিন্তু আমাদের ঘরে ওঠার রাস্তা ছিল অন্য। বাঁ দিকে অন্দরমহলের উঠোন আর ডান দিকে দুটি অন্ধকার ঘর রেখে মধ্যিখানে সরু প্যাসেজ দিয়ে আবার বাঁ দিকে ঘুরে পাশে আরও একটি বন্ধ আর অন্ধকার ঘর রেখে আবার ডানদিকে ঘুরে প্রায় সুড়ঙ্গের মতো সরু ও অপ্রশস্ত গলিপথ দিয়ে যেতে যেতে বাঁ দিকে একটা চোরা কুঠুরি রেখে সোজা গিয়ে ডান দিকে আমাদের ঘরের দরজা। সামনে একতলার ভাড়াটের জন্য নির্দিষ্ট উঠোন ও সেই একটি ঘরের দরজা, আমাদের যেটি ঘর, সেটিই আবার রাস্তা। দুটি বড় বড় জানলা ছিল। জানলার ওপাশে সেই ফালতু জমি ও ইঁটের স্তূপ তবু জানলা খোলা থাকত, কারণ কোনো জানলারই পাল্লা ছিল না। শুধু বৃষ্টি এলে চটের পর্দা টাঙানো হত। জানলার গায়ে বাবার চৌকি। সামনে অন্ধকার রান্নাঘর। দিনেরবেলাও আলো জ্বালতে হত আর ধোঁয়ায় ধোঁয়ায় বালবটিকে দেখাত যেন কুয়াশায় ঢাকা তারা। বাবার ঘরের কোণ দিয়ে ভাঙা একটি সিঁড়ি উঠে গেছে। সিঁড়িটার বাঁকের মাথায় একটা ছোট জানলা। এই জানলা দিয়ে রান্নাঘরে একটু বাতাস আসত। সিঁড়ি দিয়ে ছাদ। ছাদ নয়, যেন বারান্দা। বাঁ দিকে দেওয়ালে প্রথম জানলাটি বাড়িঅলাদের ঘরের। তারপর দুটি দরজা—সেই দুটি ঘরের—চৌবাচ্চার পাশের সিঁড়ি দিয়ে যে ঘরে আসা যায়। তারপর ডান দিকে দু'ধাপ সিঁড়ি দিয়ে একটি ঝুলনো বারান্দা, আমাদের ঘর। এই বারান্দায় দাঁড়ালে পশ্চিমে অনেকদূর ফাঁকা, দক্ষিণেও তাই। সেই আশ্চর্য অন্ধকার আর জটিল গলিপথ দিয়ে শেষ পর্যন্ত এমন একটা বারান্দায় পৌঁছনো যাবে—তা সত্যিই ভাবা যায় না। আমাদের বাড়িটা যেন লুকোচুরি খেলার জন্য তৈরি হয়েছিল।

এক নিতাইদা ছিল। কুচকুচে কালো, টানা টানা চোখ, ঝাঁকড়া চুল। গলায় সোনার মাদুলি। সকালে-বিকেলে পায়রা ওড়াত—আকাশের দিকে মুখ তুলে ভুরু কুঁচকে টেনে টেনে শিস দিত। কালেভদ্রে ঘুড়িও ওড়াত। নিতাইদা থাকত তিনতলার

একটা ঘরে, চাকর একতলায়। অন্য সব ঘর বন্ধ থাকত। মাঝে মাঝে গালে হাত দিয়ে নিতইদাকে বারান্দায় দাঁড়িয়ে থাকতে দেখতাম। নিতাইদা, সোনাবাবু, আরও অনেকেই দেখি চাকরি করে না। বড়লোকরা চাকরি করে না। কিন্তু আমাদের বাড়িঅলাও তো বড়লোক। তবে মণ্টু কেষ্টর দাদারা চাকরি করে কেন? বড়লোকরা ব্যবসা করে। কিন্তু সাধনদেরও তো ওষুধের ব্যবসা আছে, তবু ওরা এত গরিব কেন? জেলেরা ছোটলোক, বস্তিতে থাকে। কিন্তু কমলরাও তো জেলে। ওরা কেন এমন পাকা বাড়িতে থাকে? মা বলে সবই কপাল। নিতাইদার তো কপাল ভালো, তবে গালে হাত দিয়ে কী এত ভাবে? আমার একটা লাটাই দরকার। কী করে পাই? একদিন আয়না নিয়ে আমি অনেকক্ষণ নিজের কপাল দেখলাম।

বেলা দুটোয় জেলেবাড়ির উনুনে নতুন করে আঁচ পড়ত। বিক্রিবাটা সেরে কমলের বাবা ফিরত। সঙ্গে নিয়ে আসত বাড়তি মাছ। মাঝে মাঝে পচা মাছের গন্ধে আমাদের নাক জ্বলে যেত। খাওয়াদাওয়া সেরে কমলের বাবা বসত হিসেব কষতে। ঠনঠন করে পয়সার আওয়াজ হত। কমল আর তার ভাই-বোনেরা মিলে বাপকে ঘিরে খালি পয়সা চাইত—তখন তাদের মা এসে সকলকে দুমদুম করে পিটত। চিৎকার করে কাঁদত সকলে, তবু পয়সা চাইত। হিসেব শেষ করে কমলের বাবা সকলকেই কিছু কিছু দিত। কিন্তু তার আগে রোজই তাদের মার খেতে হত। কমলের বাবা কমলের মাকে তুই তুই করে কথা বলে। আর কমলের মা চব্বিশ ঘণ্টা চেঁচায়, গাল দেয়, নিজের ছেলেপুলেকেই অভিসম্পাত করে। শুনে শুনে আমিও কয়েকটা গাল শিখে গেলাম।

একদিন খুব মেঘ করেছিল। পিসি গুনগুন করে গান গাইছিল। সেই থেকে আকাশে মেঘ দেখলেই আমি একটা অস্ফুট গান শুনতে পাই।

আমাদের পাড়ায় মাত্র দু-তিনটে বাড়িতে রেডিও আছে। বাড়িঅলাদের ছাদে রেডিওর এরিয়েল ছিল, তাতে কখনো ঘুড়ি আটকে যেত। পুব দিকে হাওয়া থাকলে আমার ঘুড়ি ওড়াতে অসুবিধা হত। ছেলেবেলায় পিসি প্রথমবার গ্রামোফোন শুনে নাকি ভয়ে কেঁদে ফেলেছিল। মা নাকি প্রথম ট্রামে উঠে বমি করেছিল। আকাশে এরোপ্লেন দেখে আমার কিছুই হল না।

একতলার নতুন ভাড়াটেদের সেই বুড়ি বিধবা আমাকে বাবা বলে আবার বাবাকেও বাবা বলে। প্রায়ই মার কাছে এসে দু-আনা চারআনা ধার চায়—দামি দামি কাচের বাসন বিক্রি করতে চায়। মা পারলে পয়সা দেয় কিন্তু বাসন রাখে না। একটা কাচের জগ দেখে পিসির খুব লোভ হয়েছিল। মা বলল, ক্ষেপেছিস! সমস্ত জিনিসে অভিশাপ আছে। বাড়িঅলারাও যদি কোনোদিন এরকম গরিব হয়ে যায়, একে একে জিনিস বেচতে শুরু করে—তাহলে আমি ঠিক সেই লাটাইটা কিনে নেব। হে ভগবান, ওরা যেন গরিব হয়ে যায়, তাহলে আমিও মণ্টুকে ভিখিরি বলব।

একদিন পিসির ইস্কুল থেকে চিঠি এল। পিসি খেলার মাঠে একটা সোনার হার কুড়িয়ে পেয়ে হেডমিস্ট্রেসকে জমা দেয়। এদিকে হারটা আসলে শীলাদিরই, তিনি

জানতেও পারেননি কখন হারিয়েছে। চিঠি পেয়ে বাবা তো আহ্লাদে আটখানা। তক্ষুণি বেরিয়ে পড়লেন জনে জনে খবরটা দিতে। অফিসে নিয়ে গেলেন চিঠিটা। বাবার সঙ্গে যে-ই দেখা করতে আসত তাকেই গল্পটা বলতেন আর পিসিকে ডাকতেন। পিসিকে আবার সবটা বলতে হত। বাবার ভাবে মনে হত পিসি যেন দিগ্বিজয় করেছে, আমার খুব রাগ হত। কদিন খুব চোখ খুলে ঘুরতাম, কিন্তু কিছুই কুড়িয়ে পাই না। শেষে একদিন পিসির পাথরের ব্রোচটা চুরি করলাম। মা, পিসি সকলেই খুব খোঁজাখুঁজি করল। ভেবেছিলাম কয়েকদিন পরে হঠাৎ ফেরত দেব। কিন্তু ধৈর্য থাকে না। তাড়াতাড়ি ফিরিয়ে দিতেই পিসি ধরে ফেলল। তবু আদর করে আমার নাক টিপে দিয়েছিল।

একদিন আমাকে বাবা তার অফিসে নিয়ে গেল। শেয়ালদার কাছে একটা ময়লাবোঝাই লরি থামিয়ে আমাকে নিয়ে বাবা তার ড্রাইভারের পাশে উঠে বসল। আমার খুব ঘেন্না হচ্ছিল। আমরা ব্রাহ্মণ, মেথরদের ছুঁতে নেই জানতাম। একবার ছুঁয়ে ফেলেছিলাম বলে মা আমাকে দিয়ে চান করিয়েছিল। আর এখন বাবা এই ড্রাইভারটার পাশে বসে দিব্বি তার সঙ্গে অফিসের গল্প করছে। গাড়ির ডাঁই করা ময়লার ওপর হাত-পা ছড়িয়ে বসে কটা মেথর গান ধরেছিল। তাদের একজন আমার নাম জিজ্ঞেস করতে আমি মুখ ভেঙচে দিলাম।

একদিন সদরদরজায় একটা পয়সা খুঁজে পেলাম। মা বলেছে কুড়োনো পয়সা ভিখিরিকে দিতে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সে পয়সায় আমি শোনপাপড়ি খেলাম।

ক্যাম্পবেল হাসপাতালের সামনে ফুটপাতের ওপর উত্তর-দক্ষিণে টানা রেললাইন ছিল। এই লাইনের গাড়ি মৌলালির মোড়ে করপোরেশনের অফিসের ভেতর দিয়ে বেলেঘাটায় পড়ত, সেখান থেকে ধাপা। এই রেললাইন ছিল করপোরেশনের। সার্কুলার রোডে ট্রাম চলত, বাস চলত; মোষের গাড়ি, রিক্সা, সাইকেল চলত; ট্যাক্সি, মোটর, ট্রাক চলত। আবার ফুটপাতের ওপর দিয়ে ট্রেনও চলত। শেয়ালদার মোড় থেকে মৌলালি পর্যন্ত রাস্তাটা ছিল যেন আলাদা এক শহর!

আমাদের বাড়িটা একদিকে বসে যাওয়ায় মেঝেতে ফাট ধরেছিল। ম্যাপের মহানদীর মতো একটা চওড়া ফাটল ঘরের মধ্যে এঁকেবেঁকে গিয়েছিল। চুন-বালির বড় বড় চাবড়া খসে পড়ে দেয়ালগুলো মজার সব ছবিতে বোঝাই ছিল। একটা দিক খসতে খসতে হামাগুড়ি দেওয়া ছোট ছেলের আকার নিচ্ছিল। আমরা বলতুম পিসির ছেলে। একদিন পিসির ওপর রাগ করে তার ছেলের মুখে চড় মারতেই দেয়ালের অনেকখানি পলেস্তারা খসে পড়ল। পিসি বলল নদীর পাড় যেমন ভেতরে ভেতরে খেয়ে যায় তেমনই দেয়ালের ভাঙা পলেস্তারা ধার থেকে ভেতরে ভেতরে আলগা হতে থাকে। আর ইঁটের ফাঁকগুলো ছারপোকার বাসা। একতলায় বাবার ঘর আর রান্নাঘরের দেওয়ালগুলি নোনায় ধরে ফুলে ফেঁপে থাকে—মা বলে যেন সর্বাঙ্গে বসন্তের গুটি শুকিয়ে চামড়া উঠতে আরম্ভ করেছে। খাওয়ার সময় রোজ বালি ঝরে পড়ে। আমি আর দাদা লোহার খুন্তি দিয়ে মাঝে মাঝে দেয়াল চাঁছতাম, ফলে ইঁট বেরিয়ে গেছিল। মা বলত, এই ঘরে থেকে থেকে আমার টিবি হবে।

যে লোকটা রানাঘাটের পান্তুয়া হেঁকে যেত, সোনাবাবুদের বুড়িমা তাকে বলত, দে বাবা, একটু কমিয়ে দে, আমারও তো দেশ রানাঘাট। কৃষ্ণনগরের সরপুরিয়াঅলাকে বলত, দেশ কৃষ্ণনগর, বাখরখানিঅলাকে বলত, ঢাকা। দেশের লোক শুনে ফিরিঅলারা দাম কমাত। বাবা বাজারে কেনাকাটার সময় বলত, আমি ব্রাহ্মণ। শুনে দোকানি দাম কমিয়ে দিত।

কবিরাজমশাইয়ের ওষুধের দোকানটা উঠে গেল। মা বাবার কাছে দুঃখ করছিল—এবার লোকটা না পাগল হয়ে যায়। বাবা খাটে চিৎ হয়ে শুয়ে, মা রান্না ঘরে—কেউ কারোর মুখ দেখতে পেত না, কিন্তু গল্প হত। সিঁড়ির বাঁকের সেই জানালাটার কাছে বসে আমি শুনতাম।

আমার দাদা আর আমি পিঠোপিঠি ছিলাম। দাদার প্রায়ই অসুখ করত, কিন্তু পরীক্ষায় ফার্স্ট হত। দাদা রোজ আমার হোমটাস্ক করে দিত। আমি খালি হাতের লেখা লিখতুম। আমাদের ইস্কুলটা ছিল বাড়ি থেকে অনেক দূরে। হাঁটতে হাঁটতে পা ধরে যেত। তখন একদিন সাহস করে ঘোড়ার গাড়ির পেছনের পা-দানিতে পেটটা চেপে ঝুঁকে পড়লাম। অনেক পরে দাদা হাঁটতে হাঁটতে পৌঁছল।

পিসিদের কলেজে অফ্ আছে, স্কুলে সমস্ত প্রিয়েড করতে হয়। পিসিদের কলেজে স্ট্রাইক, স্কুলে সে-সব বালাই নেই। আমরা পরাধীন বলেই তো দেশের এত দুর্দশা। হেডস্যার ব্রিটিশের ধামাধরা। টিফিনের সময় চেঁচাতাম, বন্দেমাতরম পুলিশের মাথা গরম। ইনক্লাব জিন্দাবাদ। রাজবন্দীদের মুক্তি চাই।

আমাদের পাশের বাড়ির চিত্তাদি গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যা করল। চিত্তাদির ছোট্ট একটা ভাইঝি প্রথম দেখতে পেয়ে তার মাকে বলেছিল দ্যাখো দ্যাখো, পিসি কেমন দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ঘুমোচ্ছে। তার কিছুদিন পরে কবিরাজমশাইয়ের মেয়ে গায়ে কেরোসিন ঢেলে আত্মহত্যা করল। কেউ বলল, হবে না? ওরা যে খুব বন্ধু ছিল। কেউ বলল, বাবাকে মুক্তি দিয়ে গেল। মনিদির শ্রাদ্ধে আমার আর দাদার নেমন্তন্ন হল। বড় বড় পিঁড়ি পেতে বসে খেয়েছিলুম আর কবিরাজমশাই একটা করে পয়সা দক্ষিণা দিয়েছিল। তখন আমার দুঃখ হল চিত্তাদির শ্রাদ্ধে কেন আমাদের নেমতন্ন হল না?

কেউ আসত জুড়িগাড়ি চেপে, কাউকে বা চাকরে পৌঁছে দিয়ে যেত। কেউ টিফিন নিয়ে আসত, ঝি-চাকরে কারোর টিফিন দিয়ে যেত। সন্দেশ, লুচি, দুধ এই সব খেয়ে মুখ মুছে তারা খেলতে আসত। কেউ কেউ পয়সা দিয়ে আলুকাবলি, ট্যাপারি আমসত্ত্ব কিনে খেত। মা কৌটোয় করে শুকনো শুকনো চিঁড়েমাখা দিত। আমার লজ্জা করত নিতে। পয়সা চাইলে মা বলত কেনা খাবার বিষ, খেতে নেই। আমি বুঝতে পারতুম সকলে ভালো বললে কী হয়, আসলে মা-বাবাও যখন যেমন তখন তেমন বলে। বাড়ির মেথর ছুঁলে চান করতে হয়, অথচ বাসভাড়া বাঁচাবার জন্য দিব্যি তো করপোরেশনের লরিতে চেপে অফিস যাও। কেনা খাবার বিষ, তাই পয়সা দাও না;

লাটাই কেনা বিলাসিতা, তাই পয়সা দাও না; বেশ, কিন্তু স্কুলের বই? এই যে রোজ রোজ নরেন স্যারের কাছে মার খাই? আসলে মা, তুমি আর বাবা যতই ব্রাহ্মণ হও, মণ্টু ঠিকই বলেছে, আমরা ভিখিরি।

একদিন নিতাইদা বউ নিয়ে এল। কিন্তু তারপরও বাড়ির বন্ধ ঘরগুলো বন্ধই রইল। যথানিয়ম নিতাইদা সকালে-বিকেলে পায়রা ওড়ায়, মাঝে মাঝে বারান্দায় গালে হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। একদিন দেখি নিতাইদা ঘুড়ি ওড়াচ্ছে আর ছাদে পাঁচিলের আড়ালে লুকিয়ে লুকিয়ে লাটাই ধরেছে নিতাইদার বউ।

আমাদের সেই অন্ধকার চোরাকুঠুরিগুলো রাবিশ, পচা টিন আর বাঁশে বোঝাই ছিল। সেই ঘরগুলি যেন গুপ্তহত্যার জন্য তৈরি হয়েছিল। মানুষ ঢুকত না। ইঁদুর, ছুঁচো আর বিছে বোঝাই ছিল।

একদিন পুলিশ এসে সব তছনছ করে দেখে গেল। বাড়িঅলাদের মুখ শুকনো, বাবার মুখ কালো। পিসি আমাকে ওদের ঘরে রেখেছিল। সেই অদ্ভুত ঘরগুলোয় পুলিশ কী খুঁজে গেল তা কোনোদিন জানিনি।

আর তারপরেই এই বাড়িটাকে, তার আলো-অন্ধকার আর জটিল গলিগুলিকে আমি সন্দেহ করতে শিখলাম। আমাদের সেই শান্ত-স্তিমিত পাড়াটা সম্পর্কেও সন্দেহ এল। আমার শৈশবে সন্দেহ ঢুকল।

আমার বয়েসের হিসেব জটিল। ঠিকুজিতে যে জন্মতারিখ সেটি বাড়িয়ে ছেলেবেলায় আমাকে স্কুলে ভর্তি করা হয়েছিল। কারণ এত অল্প বয়সে স্কুলে ভর্তি করা হয় না। তারপর ম্যাট্রিক পরীক্ষার ফর্মে বয়েসটি যথেষ্ট কমিয়ে দেওয়া হল। কারণ ইতিমধ্যে যুদ্ধের জন্য আর অসুখে দুটি বছর আমি নষ্ট করেছি। ভবিষ্যতে সরকারি চাকরির যোগ্যতা যাতে বজায় থাকে সেই হিসেবে বেশ কয়েকটা বছর হাতে রেখে এবার আমার বয়েস নির্দিষ্ট করা হল। পরে জানলাম, এ দেশে প্রতিটি মানুষেরই দু রকম বয়েস—একটা সত্যিকারের, একটা সার্টিফিকেটের।

তিন বছর খোঁজাখুঁজির পর 'ফসল' সাময়িকপত্রে ১৩৬৮ বঙ্গাব্দের কার্তিক-পৌষ (জানুয়ারি ১৯৬১) সংখ্যায় প্রকাশিত এই গল্পটি যে গত ২৬ ফেব্রুয়ারি (২০০৫) উদ্ধার করতে পেরেছি তার যাবতীয় কৃতিত্ব ফসল-এর প্রয়াত সম্পাদক নন্দলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্ত্রী শ্রীমতী সুলতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও পুত্র অঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়ের। হুগলি জেলার খানাকুল ১নং গ্রাম পঞ্চায়েতের কৃষ্ণনগর গ্রামে নন্দলালবাবুর বাড়ি থেকে, 'একটি গ্রামের গল্প'।

অনিশ্চয় চক্রবর্তী

ভূতের ভবিষ্যৎ

হাসান আজিজুল হক

আধুনিক এই মেগাসিটির মাঝখানে একর তিনেক জায়গা জুড়ে উনিশ শতকের একটা টুকরো পড়ে আছে। তার চারদিকে জেলখানার মতো উঁচু পাঁচিল দেওয়া। যেমন হয়, লাল ইটের পাঁজর বের করা, জায়গায় জায়গায় ধস নামা। সেখানে ঘন কালো ছায়া, অতিশয় নির্জন শিরশিরে হাওয়া, রাশিকৃত শুকনো পাতা, গিরগিটি, খরিস, গোখরো আর গোখরোর ভক্ষ্য পালোয়ান মেটে ইঁদুর, গোখরো-দাঁড়াসদের প্রতিপক্ষ উপোসি পেঁচা। এইসবের মাঝখানে খুব বড়, খুব পুরনো, খুব বুড়ো হর্তুকি গাছটার নিচে একটি লাশ পড়ে আছে।

নীল মাছিগুলো এইমাত্র খবর পেয়েছে। ছোট মাছি, ঘরোয়া মাছি এরই মধ্যে লাশের দুই খোলা চোখে ঘন হয়ে জমায়েত হয়েছে। সূর্য কেবল উঠছিল।

এগারো ঘণ্টা পরে সূর্য কেবল ডুবছিল।

লাশটা সারাদিন এখানে ছায়ার মধ্যে পড়ে। ঠান্ডার দিন, তাই এখনো পচন ধরেনি। সন্ধের পর ভীষণ হিম নামবে বলে সারারাতেও মনে হয় ততটা পচে নষ্ট হবে না। খানিক পরে শীতের কুয়াশাভরা অন্ধকার গাছতলায় কেবল জমে উঠেছে, এই সময় বাতাসে হিসহিস, ফিসফিস শব্দ তুলে কেউ এসে হাজির হল আর বড় বড় শ্বাস ফেলতে লাগল। এখানে-সেখানে অন্ধকার কাঁপছিল, একটা মানুষের মতো চেহারা আঁকুপাঁকু করে তাড়াতাড়ি তৈরি হয়ে নিতে চাইছিল, যেন জানে তৈরি হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তা ভেঙে পড়বে। নিঃশ্বাসের বাতাসের মতো বাতাসেই মিলিয়ে যাবে। চেহারা একটা তৈরি হওয়ার পক্ষে সবচেয়ে খারাপ ছিল জোনাকিগুলো। অন্ধকারকে অন্ধকারের মূর্তি গড়ে তুলতেই দিচ্ছে না। একবার-দু'বার জ্বলে-নিভেই চেহারাটা ভেঙে দিচ্ছে। চকচকে কালো একটি গালভাঙা যুবকের মুখ, একখানা লম্বা কেঠো হাত, পাঁচ আঙুলওয়ালা একখানা বাঁ হাতের চেটো, একজোড়া লোমশ উরু....এইসব গড়ছে আর ভাঙছে, ভেসে বেড়াচ্ছে একজোড়া রক্তভরা চোখ। মূর্তি গড়ে ওঠার উপক্রম হলেই ঐ একজোড়া চোখ ছিটকে বেরিয়ে এসে গড়ে-ওঠা মূর্তির ভুরুর নিচে বসে যেতে চাইছে, চেহারা উবে যেতেই হতাশ হয়ে আবার বাতাসে ভেসে বেড়াচ্ছে। এখন একটু ইতিহাস জানতে হবে।

আমাকে মারা হয়েছিল একটা মাঠের মধ্যে। কনকনে ঠান্ডা রাতে, হাওয়ার ভীষণ ঝাপটের মধ্যে। মানুষ মারার জন্য জুতসই ছিল জায়গাটা। ধরে আনল গাঁয়ের বাড়ি থেকে। মা আর বোন থাকে বাড়িতে। আর কেউ নেই। বোনের বিয়ে হয়েছিল, তার স্বামী একটা ট্রাকে কাজ করত, সেই ট্রাকেই চাপা পড়ে পিষে গিয়েছিল, থ্যাঁতলানো দেহটা যে কার তা না জেনেই মাটি চাপা দেওয়া হয়েছিল। বোন বয়সে আমার চেয়ে বড়, দেহে মোটা মোটা হাড় শুধু, মেয়েমানুষ কিনা সন্দেহ হয়, হিজড়ে কিনা তাই বা কে জানে! ছেলে-মেয়ে হয়নি, গলার স্বর মোটা, ঠোঁটের উপরে কড়া কালো চুল। বাড়িতে আমাকে ডাকতে এসেছিল টিটন। সে একাই ছিল। আমি জানতাম অবশ্য যে একটু দূরে, অন্ধকারের মধ্যে বা গাছের ছায়ায় আরও পাঁচ-সাতজন আছে। রাত দশটায় টিটন কোনোদিন বাইরে একা থাকে না। যখন সে ঘরে ঢুকে আমাকে বলল, আয়, আমি জানতাম আমাকে যেতে হবেই। আমি জানতাম আমি বলব না, আর সে আবার বলবে একই রকম নিচু গলায়, আয়।

আয়।

না।

আয়।

কোথায়?

জানি না, আয়।

আমি উঠে দাঁড়িয়ে জামাটা আলনা থেকে টেনে নিয়ে গায়ে দিয়ে বললাম, না, যাব না।

একদম দেরি নয়, আয়। টিটন বলল।

টিটনকে আমি চিনি। ওকে চিনতে হয়েছে একটু একটু করে। তার গলার আওয়াজটা মেয়েলি, ফ্যাঁসফেঁসে। জিভটা একটু বেশি লম্বা বলে কথা খানিকটা আধো-আধো, শুনতে বেশ মোলায়েম লাগে। ও চেঁচিয়ে কথা বলতেই পারে না। গলা তুলতে গেলেই চিরে গিয়ে কথা নষ্ট হয়ে যায়। এটা সে জানে, সেজন্য বেশির ভাগ কথা বলে চোখ দিয়ে। অসম্ভব ঠান্ডা ওর চাউনি, চিকন আর...., হিমকালা ছুরির মতো বুকের ভেতরে ঢুকে কলজে আর বিসমিল্লাহ্ কচকচ করে কাটতে থাকে। আমরা এক স্কুলে পড়েছি। পাশাপাশি বসতাম আর একটু একটু করে চিনতাম। কথায় মনে হত খুব দয়া ওর মনে। একদিন ওদের বাড়িতে গিয়ে দেখি বাইরের ঘরের আলকাতরা মাখানো মোটা আম কাঠের দরজা ধরে সে দাঁড়িয়ে আছে। মিটিমিটি করে হাসছে। কাছে গিয়ে দেখলাম দরজার হাঁসকলের ফাঁকে চৌকাঠের সঙ্গে একটা ধবধবে সাদা বেড়াল আটকে গেছে। মাথাটা বাইরে শরীরটা ভেতরে। টিটন দরজাটা আস্তে আস্তে বন্ধ করছে, ফাঁকটা কমে আসছে। দরজাটা এঁটে বসছে বেড়ালটার গলায়। তার চোখে মৃত্যু।

টিটন কী করছিস? দরজা ছেড়ে দে, বেড়ালটা বেরুতে পারছে না। মৃদু নিঃশ্বাস

ফেলে নিচু মোলায়েম গলায় টিটন বলল, ওকে ছেড়ে দেব না বলেই তো আটকে রেখেছি।

কেন? কী করেছে ও?

কিছুই করেনি। সেই জন্যেই তো আটকে রেখেছি। ও খুব ভাল। কাছে গেলেই পায়ে মুখ ঘষে আর ঘড় ঘড় আওয়াজ করে।

তাহলে?

টিটন কিছু বলল না, একবার দরজার দিকে তাকাল। কলজে বিসমিল্লা কাটার কচকচ শব্দ শুনতে পেলাম। কাঁচা আমিষের সাঁশটে গন্ধ। রক্ত ফিন্‌কি দিয়ে বেরিয়ে আসতে না পেরে বুজবুজ করে ফেনা তুলে কিছু আবার ফিরে যাচ্ছে, উপছে পড়চে। বিড়ালটার গায়ে কোথাও এক ফোঁটা রক্ত নেই। ধবধবে সাদা বেড়ালের গোল মাথাটা শুধু বাইরে। ছোট্ট চাঁদের মতো গোলাপী মুখটা, দরজাটা তার গলায় আস্তে আস্তে কেটে বসছে। টিটনের মুখে মৃদু করুণ হাসি, মায়ায় ভরা। আমার গা শিউরে উঠল। বেড়ালে শব্দ করতে পারে না, তার মিউ-মিউ ডাক শোনাই যায় না, শোনা গেলে খুব খারাপ লাগে, কিছু হাড়-কাঁটা খেতে দিতে ইচ্ছে করে। হুলো বেড়াল যখন খিদেয় দেয়ালে দেয়ালে কেঁদে বেড়ায় বা শরীরে বিষের জ্বালায় বেড়ালীকে ডাকে বা দুই বেড়ালের ঝগড়ার সময় দু'জনের গায়েই যখন পানি ঢালা হয়, একমাত্র তখনই ওদের বিকট গলার আওয়াজ শোনা যায়। এই বেড়ালটা একদম নীরবে মরছিল, কিংবা হতে পারে যখন দরজার নিচের হাঁসকলের ঠিক ওপরটা ওর গলায় কেটে বসে যাচ্ছিল, ও ভীষণ চেঁচাচ্ছিল, কিন্তু আমি কিছু শুনতে পাইনি। শুধু দরজার ভিতরের দিকে খরর খরর শব্দে পেছনের পা দুটি দিয়ে মেঝে আঁচড়াচ্ছিল, আমি তা শুনতে পাচ্ছিলাম। দিনের বেলায় বেড়ালের চোখ কীরকম যেন নিস্তেজ থাকে, উনুন নিভিয়ে দেবার মতো। সেই চোখ অনেকটা বড় হয়ে বেরিয়ে এল মাথার বাইরে। তারপর আর একটু পরে, টিটন যেন বেড়ালের দুঃখে কেঁদে ফেলবে, আর একটু জোরে হ্যাঁচকা একটা টান দিয়ে দরজাটা চেপে ধরল, তখন ওর চোখ একেবারে নেতিয়ে নিভে গেল, উনুন পুরোপুরি নিভিয়ে পানি দিলে যেমন ভেজা কালো ছাই দেখা যায়, তেমনি।

বেড়ালটাকে মেরে ফেললি, কী দোষ করেছিল ও তোর কাছে?

সমস্ত নড়াচড়া বন্ধ হওয়া পর্যন্ত দরজাটা ঠেসে ধরে রইল টিটন। তারপর দরজা হাট করে খুলে ল্যাজ ধরে মরা বেড়ালটাকে এনে বাড়ির সামনের মাঠে আবর্জনা ফেলা জায়গাটায় ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে সে তার সেই রহস্য-রহস্য হাসি হেসে বলল, আগেই তো বললাম, দোষ কিছু করেনি বলেই তো ওকে মরতে হল।

আর একদিন হঠাৎ সে বলল, জানিস আমার বাঁ হাতের কড়ে আঙুলের অর্ধেকটা কোনো কাজে লাগবে না। তখন আমরা আর একটু বড় হয়েছি, হাতে-পায়ে কালো চুল গজিয়েছে, গোঁফের জায়গাটা কালি মাখানো, দু'জনেরই গলা বসে গেছে, টিটনের ফ্যাসফেঁসে গলায় মাঝে মাঝে একেবারে এড়িয়ে যায় দু'-একটা কথা। সেই গলায় সে বলল, বিকেল বেলায় ভাঙপুলের কাছে আসিস, আঙুলটা দু'খান্ডা করে ফেলে দিব।

কেটে ফেলবি? ওরে বাপরে—কাটবি কেন?

দরকার আছে। কুকুরের ল্যাজ কেটে দিলে তেজ বাড়ে জানিস না?

তুই কি কুকুর?

কোনো কথা না বলে টিটন তার সেই হিমকালা চাউনি দিয়ে আমার দিকে তাকাল। আমার বুকের ভিতর থেকে কচকচ শব্দ উঠে এল। বিকেলে যখন ভাঙাপুলের কাছে এলাম, ঠান্ডা ছুরি দিয়ে কলজে কাটার কচকচ শব্দ ফের শোনা গেল। দেখি আরও তিন-চারটা ছেলের সঙ্গে টিটন দাঁড়িয়ে আছে। তার এক হাতে ছোট একটা দা, আর অন্য হাতে সাদা খানিকটা ন্যাকড়া আর কাগজে জড়ানো লাল একটা মলম। আর একজনের হাতে এক টুকরো কাঠ। গরমের দিনে একেবারে সন্ধে বেলাতেও সূর্য দাউদাউ করে জ্বলছিল। একটু পরে ডুবে যাবে তবু তেজ কি! টিটন কাজ শুরু করল। কাঠের টুকরোটা নিয়ে পুলের উপর পাতল, কাটারি হাতে নিয়ে সূর্যের দিকে মুখ করে বসল। কী কারণে একবার মুখ তুলে আগুনমুখো বিকেলটা দেখল। তারপর ধীরেসুস্থে কাগজ মোড়ানো টকটকে লাল মলমটা একপাশে রেখে দিয়ে বাঁ হাতের চারটে আঙুল গুটিয়ে কড়ে আঙুলটা কাঠের উপর রেখে দিল। আমার আটকানো নিঃশ্বাসটা বুক ফাটিয়ে দিচ্ছে কিন্তু বেরিয়ে আসতে পারছে না, তখন ডান হাতে দা তুলে টিটন এক কোপে তার বাঁ হাতের কড়ে আঙুলের অর্ধেকটা আলাদা করে ফেলল। চোখ বন্ধ করে ফেলেছিলাম, চেয়ে দেখি আঙুলের অর্ধেকটা পুলের শানের উপরে পড়ে আছে। দাটা নামিয়ে নিয়ে টিটন আগুনরঙা মলমটা আগুনরঙা রক্তঝরা আঙুলের উপর পুরু করে লাগাচ্ছে। তখন মলমের রুখু গন্ধটা নাকে এসে লাগল। আর জিভে পানি এসে গেল। বগুড়ার লাল মরিচ বাটার গন্ধ। টিটন যখন ওটা লাগাচ্ছিল, তার মুখটা ককিয়ে কেঁদে ওঠার মতো বেঁকেচুরে গেল। কিন্তু কোনো শব্দ পাওয়া গেল না। মলম লাগানো হয়ে গেলে ন্যাকড়াটা দিয়ে সেটা ভাল করে বেঁধে টিটন তার আঙুলের টুকরো, মোড়ক-খোলা মরিচ বাটা আর কাটারিটা সেখানেই রেখে আমাদের কারো সঙ্গে কোনো কথা না বলে চলে গেল।

এইভাবেই ওকে আস্তে আস্তে চিনেছি। এভাবেই একদিন সে আমার কাছে এসে বলল, আয়।

কোথায়?

আয়—

আমি জানি একথা সে আর একবার বলবে না। এইভাবেই জামাটা টেনে নিয়ে গায়ে দিয়ে টিটনের সঙ্গে বেরিয়ে এলাম। কালো কাচে ঢাকা একটা গাড়ি দাঁড়িয়ে ছিল। কালো চশমাপরা একটি রোগা লোক চালাচ্ছিল গাড়িটি। ঘন্টা দুয়েক পরে শহরে গাড়ি ঢুকল। তখন সন্ধে হয়ে এসেছে। গাড়ির ভিতরটা গরম আর অন্ধকার। বাইরে এত আলো কিন্তু সে আলো ভিতরেও নেই, বাইরেও নেই। বাইরের আলো ভূতের চোখের মতো, এই এখন যেমন আমার চোখ তেমন। তখনকার ভাল চোখ

দিয়ে আমি শহরের রাস্তাঘাট মানুষজন দেখছিলাম। শব্দহীন ছায়াবাজির মতো। অনেক রাস্তা লম্বালাম্বি, অনেক রাস্তা আড়াআড়ি, অনেক রাস্তা কোনাকুনি পেরিয়ে, পেঁচিয়ে, গড়াতে গড়াতে, ঘুরতে ঘুরতে গাড়ি বড় গেট আর ফুলের বাগান পার হয়ে একটা বড় রাক্ষসের মতো কালো ধোঁয়া রঙের বাড়ির সামনে থামল। টিটন গাড়ি থেকে নেমে দরজা খুলে ধরে এতক্ষণ পরে একটি কথাই বলল, আয়।

আলো এত কম দিয়েছে কেন কে জানে। বারান্দা দিয়ে যাই, ...সুরঙের ভিতর দিয়ে যাই দোতলায় উঠি, নিলায় উঠি, কতগুলো ঘর পেরিয়ে গিয়ে একটা ভীষণ...বিরাট দরজার সামনে দাঁড়াই। দরজাটা নিজেই জানতে পারল আমরা এসে দাঁড়িয়েছি বা টিটন এসে দাঁড়িয়েছে। নিঃশব্দে সেটা খুলে গেল। মেঝেয় পুরু করে টাটকা ঘন রঙের ফুল পাতা, পায়ের পাতা ডুবে যাচ্ছে ফুলের গালচেয়, সিরসিরে, মিরমিরে একটা বাতাস আসছে কোথা থেকে বোঝা যায় না। ঘরের এক কোণে বিরাট একটা টেবিল সাজিয়ে পাজামা-পাঞ্জাবি পরা একটা লোক কাজ করছে। টেবিলের উপরে লাল কালো সাদা হলদে অনেক রকম টেলিফোন। সেই লোকটার কাছে যেতে পচা একটা গন্ধ এসে নাকে লাগল। হঠাৎ মনে হল এক ঝাঁক নীল মাছি এখনি উড়ে আসবে, দেয়ালের পাশ থেকে এখুনি উঠে আসবে একটা কুমির এক মাসের পচাগলা একটা মানুষের লাশ মুখে নিয়ে, তিনটে বুড়ো কুকুর একটা কুকুরীর জন্যে হলুদ দাঁত দিয়ে পরস্পরের টুটি কামড়ে ধরেছে। তারপরেই আবার ঠান্ডা ঝিরি-ঝিরি বাতাস, টাটকা ফুলের গন্ধ আর লোকটা মুখ তুলে হাসি-হাসি মুখে আমাদের দিকে তাকাল।

ও এসেছে—টিটন তার লম্বা জিভে আধো-আধো উচ্চারণে বলল।

লোকটা ঘাড় বাঁকিয়ে আমার দিকে চেয়ে রইল। খুব রোগা, কালো কুচকুচে। মোটা কাপড়ের সাদা পাঞ্জাবির হাতা কনুই পর্যন্ত গুটোনো সরু বাঁদুড়ে দুটি কালো হাত টেবিলের উপর নিশপিশ করছে। সরু সরু আঙুলগুলো ভারি অস্থির টেবিলে একবার তবলা বাজায়, একবার মুঠো করে, আবার খোলে। ঠিক গিরগিটির মতো লম্বা ঘাড় কাত করে আমার দিকে দেখে। চোখে যেন পড়ছে না। আস্তে আস্তে যেন রক্তচোষা গিরগিটির মতোই তার ঘাড়ের কালো পাতলা চামড়া টকটকে লাল বেগুনি হয়ে উঠল। সে দু'তিনবার তার সরু লম্বা সোনালি জিভ টপাৎ করে বের করে আনল, আবার মুখে ঢুকিয়ে নিল। কথা বলার আগে সে দু'তিনবার এরকম করল। তারপর যেন হঠাৎ কথা বলতে পেরে খুশি হয়ে গদগদ গলায় বলে, কাজকম্ম কিছু করতে পাব্বা? আরে লোকটার চোখের পাতা নড়ে না দেখি—চাউনিটা কেমন বুজে আসছে। তবু চোখের পাতা বন্ধ করতে পারছে না কেন?

কাজ তেমন কিছু না, এই সঙ্গে থাকা, যেটুকু বলা হবে সেটুকুই শুধু করা আর সবার আগে খোত্‌াদুতো আথা দিয়ে আত্‌কে দেব। কাজ হয়ে গেলে অপারেশন করে খুলে দেব নে। আমার কাছে ভাল বেদেশি আথা আছে।

কীরকম কাজ আমাকে করতে হবে? পেট থেকে গলা পর্যন্ত শুকিয়ে আসা নলটার মধ্য দিয়ে শুকনো বাতাস খসখস করে বেরিয়ে আসে।

কাজ যাই-ই হোক, আসল কাজ তা করতে কখনই সময় লাগবে না। দিক কপালে একটা গুলি কিম্বা বুকের বাঁ-দিকে সরু একটা ছুরির ফলা। সময় লাগবে না। সব সময় তো না, কখনো কখনো কব্বে। লোকটার জিভ কখনোই টাকরায় যায় না। ছুঁচলো জিভ শুধু ঠোকর মারে সামনের দাঁতের মাড়িতে। সেইজন্যই মাঝে মাঝে আবার বেরিয়েও আসে টপাৎ করে।

এখন খুব কাজ। নির্বাচন আসতেছে সেপতেম্বরে। তিতন একবার ওছুদঘরে নিয়ে যা—বড়ি, ক্যাপছুল, সিরিঞ্জ, পিচকিরি এইসব একতু দেখিয়ে দে, থাওছ বাড়বে, ভা কেটে যাবে। বড় বড় চিকিচ্ছে অপারেশন করতে হবে, ওরে শিখিয়ে-পড়িয়ে দিতে হবে। যা নিয়ে যা।

ঘরের কোণের দিকের দরজাটাকে মনে করেছিলাম বাথরুম। অন্ধকার একটা কুঠুরি সেটা, বাদুড় আর চামচিকের গুয়ের পুরনো গন্ধ। ওপাশে আর একটা দরজা দিয়ে কালো সুরঙ, চোখের সামনে হাতটা তুলে ধরেও দেখতে পেলাম না। টিটনকেও দেখা যাচ্ছে না, তার পায়ের হালকা শব্দ ধরে ধরে যাই, যেন কালো পানিতে নামি, কোমর পর্যন্ত হিমে অসাড় হয়ে আসে। একটু পরেই বুঝি সেটা খুব ঠান্ডা জমাট অন্ধকার, বহুদিন থেকে এখানে আছে, এমন ভয়ংকর কানা চোখে সূর্যের দিকে সে তাকায় যে হেমন্তের সকালের আলোসোনা নিয়েই সে ওখানে ঢুকতে পারেন না। টিটনের পায়ের শব্দ থেমে যাওয়ায় আমি বুঝতে পারি সে থেমে গেছে, কিন্তু তাকে আমি দেখতে পাই না। আমাকেও থেমে পড়তে হয়। অন্ধকারটা এই সময় ঘড়-ঘড় করে ঘষ্টামি আওয়াজ করতে থাকে। সদ্য ঘুম থেকে ওঠা একটা বাঘ যেন রাগে ঘরঘর করছে। শব্দটা থামল, টিটন আমার হাত ধরে আর একটা গরম তাতানো অন্ধকারের মধ্যে ঢুকল। আওয়াজটা ফেরত এল। তারপর দাঁড়িয়ে আছি। মিশমিশে কালো একটা সাপের মতো সময় গর্তে ঢুকছে। বোধটা পুরো চলে গেলে তখন আলো আসতে থাকে। খুব কম আলো, কমলা রঙের। প্রথমে ঘন কমলা, প্রায় লাল, তারপর আস্তে আস্তে সাদা। কোন্‌দিক দিয়ে আসে বুঝতে পারি না। নিজেকে দেখতে পাই, টিটনকে দেখতে পাই, পেল্লায় সিন্দুকের মতো একটা ঘর দেখতে পাই, তার দেয়ালে দেয়ালে সাজানো চকচকে রাইফেল, কাটা বন্দুক, কত রকমের পিস্তল, রিভলভার, চাইনিজ কুড়ুল, কতরকম হাতুড়ি, কতরকম কি কি নাম জানি না, বাক্সে বাক্সে থরে থরে সাজানো গোলাবারুদ—একটা গোটা যুদ্ধ জয় করা যায়। এত এত জিনিস দেখতে পাই। সময় আবার গর্ত থেকে বেরিয়ে আসে, আমার টনক নড়ে যায়, লেবেলের মতো সময় আবার সবকিছুতে লেপ্টে যায়।

ঠিক একইভাবে ফিরে আসি। লোকটা তখন দাঁড়িয়ে আছে। পোড়া কাঠের মতো কালো, এতক্ষণ জ্বলছিল, পানি দিয়ে নিভিয়ে দেওয়ায় এখন ফোঁস ফোঁস শব্দ করছে, হুস করে খানিকটা ধোঁয়া বেরিয়ে যাচ্ছে, এদিক-ওদিক ছাই উড়ে বেড়াচ্ছে। টিটনের সঙ্গে চলেই যাচ্ছিলাম, পিছন থেকে সে ডাকল, আগের মানুষটাই। ঘোড়ার কপালের বালামচির মতো একগোছা চুল তার কপালে, মুখটা ঘোড়ার নয়, নেকড়ের। বলল, এতা নিয়ে যাও।

বলে ডান হাতটা বাড়াল। একটা বান্ডিল তার হাতে। টিটন আমাকে সামনে ঠেলে তার দিকে পাঠিয়ে দিল। বান্ডিলটা নিতেই চোখ ঘোঁচ করে সে আমার দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে বলল, এতে দশ আছে। আমার সঙ্গে কেউ দেখা করতে এলে আমি তাকে কখনই খালি হাতে ফিরে যেতে দিই না। তিতন চোখ নামাও। এখন নিয়ে যাও একে।

দরজাটা বন্ধ না হওয়া পর্যন্ত সিঁড়ির মাথায় দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করতে হল। নামার জন্য পা বাড়াবার ঠিক আগে টিটন বলল, এই মালিকের হাত থেকে যা পাবি তা সবই তোর। এছাড়া যখন যা কিছু পাবি সব দিবি আমার হাতে। কিছুই কাছে রাখতে পারবি না। ঠিক আছে? এখন আয়।

অতএব আমি জানি টিটন দু'বার আয় বলে তিনবার বলে না। দু'বার বলা হয়ে গেছে। এখন আর আমি জানতে চাইতে পারি না কোথায় যেতে হবে। জামা গায়ে জড়িয়ে স্যান্ডেল পরে আমি তৈরি। বাড়ির বাইরে পা দিচ্ছি, শনের মতো সাদা চুল, গুছি ধরে ছিঁড়তে ছিঁড়তে উদম বুকে আমার মা কেঁদে উঠল। বোধহয় একবার, তার পর আর দম পেল না, আর সামনে এসে দাঁড়াল আমার পুরুষালি বড় বোনটা।

কোথা নিয়ে যাবি ওরে টিটন? মা আর আমারে মেরে তারপর ওরে নিয়ি যা। বেশি সময় লাগবে না তোর। দুটো মানুষ এক মিনিটেই মারতে পারবি। তুইও তো আমার আর একটা ভাই। কথা শোন। ওরে নিতে আমরা বারণ দিচ্ছি না—শুধু আমাদের মা-বিটিকে মেরে যা।

টিটন দাঁড়াল বটে, তবে তার তো মারণাস্ত্র আছেই। সে আমার বোনের দিকে তাকাল। একটু বেশি সময় ধরেই। কাঁচা কলজে কাটার কচকচ আওয়াজ আসে। আমি শুনি গলগল করে রক্ত পড়ে, আমি দেখি, এক টুকরো ময়লা কাপড়ে ছুরিটা মোছে, তা-ও দেখি। মনে হয় আমার বোনও। সে ফণা গুটিয়ে মুখটা লেজের কাছে নিয়ে যায়।

মাঠ খুব বড়। কোনো ফসল নেই, একেবারে ফাঁকা। আকাশে ফিকে চাঁদ, মাঠে ফিকে অন্ধকার। অনেক দূরে ইটের ভাটার চিমনি। মাঝে মাঝে আগুন দেখা যাচ্ছে বলেই ধোঁয়াও আন্দাজ করা যাচ্ছে। হাঁটতে হাঁটতে ইটভাটার কাছেই চলে আসি। এখন বোঝা যায় বিকেল কত বড়। আর মাঠ কত বড়। মাঠ আর আকাশ ঝেঁটিয়ে বেড়াচ্ছে ভুতুড়ে বাতাস।

একটা বড় জিপে উঠতে হয়েছিল। ঘণ্টা দুই জিপে এসে এই মাঠচেরা রাস্তায় আমাদের সবাইকে নামিয়ে দিয়ে জিপটা এখান থেকে সরে গেছে। টিটনের সঙ্গে সাত-আটজন। তার হাত খালি। তবে আমি জানি ছোট্ট খুব দামি একটা রিভলভার সব সময়েই ওর কাছে থাকে। আলাদিনের চেরাগের মতো হাত মুঠো করে দাঁড়াতেই ওর মুঠোয় এসে যায়। অন্যদের প্রত্যেকের হাতে কিছু না কিছু আছেই। খুব বড় একটা হাতুড়ি, আরও দু'তিনটি ছোট হাতুড়ি, চাইনিজ কুড়ুল, দু'তিনটি রিভলভার—সবই আছে। কিছু হাতবোমাও আছে একটা থলের মধ্যে।

চিমনির কাছে বাতাসটা গরম, আগুন আর ধোঁয়ার গন্ধ। কেউ বলেনি, আমরা সবাই দাঁড়িয়ে যাই।

কিছু বলবি? টিটন খুব নিচু গলায় আদর আর ভালবাসার সুরে বলল। আমি দেখলাম চারদিক থেকে ওরা আমাকে ঘিরে রয়েছে।

না।

কিছু বলবি? টিটন আর একবার বলল। আমি জানি ও আর একবার এই কথা জিজ্ঞেস করবে না। তখন আমি মরা চাঁদের দিকে চেয়েছিলাম। সমস্ত অন্ধকারের দিকে চেয়েছিলাম আর প্রচণ্ড হাওয়ার শব্দ শুনছিলাম। প্রত্যাশায় কৌতূহলে পেটের ভিতরটা গুরগুর করছিল। আর তিন-চার মিনিটের মধ্যে আমি মরে যাব। বেঁচে আছি, এইসব করে যাব, বেঁচে থাকাটা জানি, মরাটা জানি না। খুবই নিশপিশ করছে আমার ভিতরটা, ইস্ একটু পরেই জানতে পারব মরে যাওয়াটা কী ব্যাপার। জন্মের জন্য আমার কোনো চেষ্টা ছিল না। শালার উপরি পাওনা হচ্ছে জীবনটা—এখন মরার জন্যেও চেষ্টা করতে হচ্ছে না। মুফতে মরা। কতটাই বা কষ্ট পাব—দু'এক মিনিটের বেশি নিশ্চয় নয়। তারপরেই মরণের রাজ্যে ঢুকে পড়ব। তখন দেখা যাবে। আমার আর তর সইছে না। বেশ হয় যদি টিটন ওর ছোট্ট সুন্দর দামি রিভলভারটা বের করে কপালে একটা মাত্র গুলি করে। তা কি করবে? যা কিপটে! ক-এর কাছে ক'বার গিয়েছিলি? কত টাকা নিয়েছিলি?

তিনবার গিয়েছিলাম। পঁচিশ হাজার নিয়েছিলাম। পাঁচ হাজার খরচ হয়ে গিয়েছে। যদি ছেড়ে দিস বিশ হাজার টাকা ফেরত আর কখনো ক-এর কাছে যাব না।

না।

আমাকে এই কথা বলে টিটন অন্যদের বলল, একটু একটু করে মারবি, গুলি করা যাবে না। হাতুড়ি আর কুড়ুল চালা। আমি চোখ বন্ধ করে ফেললাম। পৃথিবী-মিথিবি আর দেখতে ইচ্ছে করল না। প্রথম ভারী হাতুড়িটা যখন আমার কাঁধে পড়ল, আমি হুড়মুড় করে পড়ে গেলাম ঠিকই; কিন্তু পুরো জ্ঞানটা গেল না। এই এক বিপদ। জ্ঞানটা চলে গেলে তো মরা হয়েই যায়, কিছুই আর টের পাওয়া যায় না। এখন বোবা ব্যথা আর যন্ত্রণা সইতে হবে। হাজারটা কুমিরের দাঁত আমার সমস্ত শরীরে কেটে বসে গেল, ঘন নীল একটা যন্ত্রণা আমার শিরায় শিরায় বইতে শুরু করল। শুধু একটুক্ষণ মাত্র, বোধটা খুব তলিয়ে গেল, তার কাছে আর তেমন কিছু পৌঁছুচ্ছিল না। হাঁটুর হাড় ভাঙার বিকট শব্দ পেলাম, একটা হাত ছিটকে পড়ল, আর একটা পা ভেঙে উল্টে গেল। হাতুড়ির থ্যাপ থ্যাপ আওয়াজ হতে লাগল—আমি বুঝতে পারছিলাম, তবে ব্যথা আর নেই। বোধ হয়, যা শালা ভাগ—বলে টিটন যখন আমাকে লাথি মারল তখনই ছোট্ট একটা হাওয়ার বুলেটের মতো আমি আমার ভিতর থেকে ছিটকে বাইরে এসে পড়লাম। আমার বাইরে আমার শরীর গাছের গুঁড়ি, না পাথরের চাঁই কী দরকার আমার জানার? কুড়ুল দিয়ে কুপিয়ে ওরা পা দুটোকে দেহ

থেকে আলাদা করে ফেলল—তারপর সে দুটোকে ফের টুকরো করল। দেহ থেকে হাত দুটো খুলে নিল আর মাথাটা আলাদা করল। এক-একজনের হাতে এক-এক খণ্ড।

ইটের ভাটার দিকে এগোতে এগোতে টিটন বলল, ভাটায় এখনো আগুন আছে। সব কুড়িয়ে এক জায়গায় করে ভিতরে ঢুকিয়ে দে। ওর চিহ্ন থাকবে না।

এই শেষ কাজটা খুব অন্যায় করল টিটন। দেহটা তো আমার বাড়ি—ওটা পুড়িয়ে দিলে আমি যাব কোথায়? ওকে আমি কোনো অনুরোধ করিনি, এটা করবে জানলে অন্তত এই অনুরোধটা আমি ওকে করতাম যে মেরে ফেলার পরে দেহটা অন্তত যেন ফেলে রাখে। এটা তো আল্লার কাজেও বাধা দেওয়া হল। ছোটবেলা থেকে শুনে আসছি কবর দেওয়া শেষ করে মোনাজাতের পরে মসুর ডাল-টাল ছিটিয়ে খেজুর কাঁটা পুঁতে লোকজন কবর থেকে চল্লিশ কদম চলে এলেই ফেরেশতারা নাকি জেরা করতে আসে। তার মানে মরা আবার জ্যান্ত হয়। এই হারামজাদা টিটন দেহটা সেই যে পুড়িয়ে সাবাড় করে ফেলল, এখন আমি ঢুকব কোথায়? যাদের কবর হতে পারে না, মানে যাদের লাশ পাওয়া যায় না, বাঘে বা কুমিরে খেয়ে দেহটাকে গু করে বার করে দেয়, কিংবা লঞ্চ ডুবে শত লাশ যখন হাঙর, কুমিরে, বোয়ালে উবু উবু গিলে ফেলে, যারা ভাসতে ভাসতে চরে উঠে বোকার মতো আকাশের দিকে মুখ করে থাকে, শেয়াল, কুকুর, কাক, চিল, শকুন ঠুকরে ঠুকরে সব খেয়ে নেয়, সাদা কঙ্কাল শুধু রোদে-বৃষ্টিতে পুড়তে ভিজতে থাকে, কামানের গোলার মুখে যারা ছাই হয়ে মিলিয়ে যায়—তাদের জেরার জন্যে কোথায় পাওয়া যাবে? এই যে আমি ভাটার চিমনির ভিতর দিয়ে ধোঁয়া হয়ে মিলিয়ে যাচ্ছি, আমি থাকছি কোথায়! মরার পরে বিচার-আচার কিছুই হবে না দেখছি। নিজের পুড়ে যাওয়া নিজে দেখতে পাচ্ছি না। শুধু ধোঁয়া দেখতে পাচ্ছি। ঐ যে কালো ধোঁয়া বেরুচ্ছে ওটা কিসের ধোঁয়া। ওটা কি আমার পায়ের হাড় পোড়ার? ফ্যাকাসে ধোঁয়াটা কি পায়ের তালু, হাতের চেটো, পাঁজর আর কোমরের হাড় পোড়ার? ভিজে ভিজে মেঘ রঙেরটা কি নাড়িভুঁড়ি, মলমূত্র এইসব পুড়ে বেরুচ্ছে। আগুন মেশানো লাল ধোঁয়াটা নিশ্চয়ই মগজ আর বুদ্ধি পোড়ার ধোঁয়া। খুব খারাপ লাগছিল আমার। নিজের ধ্বংস নিজে দেখছি, মরার পরে আমাকে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিল টিটন। এখন যেমন-তেমন একটা ঘরের জন্যে আমাকে পথে পথে হন্যে হয়ে ঘুরে বেড়াতে হবে। আমি এখন ভূত, আমার ভবিষ্যৎ কী?

সন্ধে থেকে তক্কে তক্কে আছি। লাশটা সকাল থেকে পড়ে আছে। আমি জানি যারা ওকে মেরে ভোরবেলায় ওখানে ফেলে দিয়ে গেছে। এ আর এক টিটন। টিটনের মালিকের মতো আর এক মালিকের টিটন। সে বড় জবরদস্ত মালিক। টিটনের মালিক আগে সংসদে জিতবে ধর-পাকড় করে নাকখত দিয়ে দু'হাতে ইট নিয়ে চেয়ারে বসে তারপর মন্ত্রী হয়ে আসল চেয়ারে পোঁদ ঠেকাবে। আর এর মালিক এখনই মন্ত্রী।

আমি জানি ঘরটা এখনো খালি আছে। যে মরেছে তাকে আমি একবারও দেখিনি। ব্যাটা কি হিন্দু নাকি? ঘর লাগবে না? ওদের তো পুড়িয়েই ফেলে। জানি না, ওদের ভগবান আবার কী ব্যবস্থা রাখে ওদের জন্যে?

সব আলাদা আলাদা ব্যবস্থা হয় বলেই তো জানি। শালা, মানুষ এমন জাত, মরেও এক হওয়ার উপায় নেই। এমনি মাহাত্ম্য!

আর দেরি করা ঠিক নয়। রাত বাড়ছে, দুটো প্যাঁচা বুড়ো হর্তুকি গাছের আঁধার ডালে বসে মরাটার দিকেই ড্যাব ড্যাব করে তাকিয়ে আছে। যেন...বাল্‌ব জ্বলছে। আশেপাশে দু-একটা শেয়াল উশখুশ করছে, শুকনো পাতা খরখর করে চলে বেড়াচ্ছে, সরসর শব্দে গোখরোটা এদিক-ওদিক ঘুরছে—আমি এই ফাঁকে সুড়ুৎ করে লাশটার মধ্যে ঢুকে পড়তে যাই। মাথা নেই, তবু কার সঙ্গে মাথায়...মাথা ঠুকে যায়। চেয়ে দেখি, দুটো আগুনের চোখ ভেসে বেড়াচ্ছে। চিনতে দেরি হয় না—টিটন। আমার দিকে সেই ঠান্ডা চাউনিতে চেয়ে আছে। আমার কিছু এসে যায় না। কলজে বিসমিল্লাহর বালাই নেই—কচকচ আওয়াজটা আসবে কোথা থেকে? আমি তার চোখ থেকে আমার চোখ নামাই না।

ইটভাটা থেকে এলি? ঘর নেই তো আমার মতো? আয়! আমি টিটনকে ডাকলাম। এই প্রথম। আয়। দু'জনেরই হাতে কিছু নেই। আয় লড়ি। হাড্ডাহাড্ডি। ভূতেরও ভবিষ্যৎ আছে।

ওঙ্গি জারোয়াদের জীবন

অমর মিত্র

সময়টা অদ্ভুত না? শীতটা কীরকম গেল! গোলাবাড়ি হাইইস্কুলের রিটায়ার্ড হেড স্যার মাইতিবাবু গত পরশু এসেছিলেন তাঁদের ব্যানার্জি বুক হাউস-এ। বলছিলেন, এই রকম হবে শ্যাম, আরো কত কী যে হবে!

তাই তো হচ্ছে। গত পরশু সন্ধের পর থেকে হিম-হিম ভাব এসে গিয়েছিল বাতাসে। তারপর মাঝরাত্তিরে সবার ঘুমের ভিতর শীত ঢুকে পড়ল শহরে, মফস্বলে। ভাগ্যিস কাঁথা ছিল বিছানায়। কিন্তু তারপর কী হচ্ছে? দুপুরে কোথায় গেল সেই শীত-শীত ভাব। রোদের কী তেজ। এই এখন! রাস্তা পার হওয়ার সময় রোদের তাতে মাথাটা ঝনঝন করে উঠল না!

ক'দিন আগে থেকেই তো এবার পাখা চলছিল রাতের বেলা। আবার পাখা ছাড়া দু'দিন বেশ গেল। আজও সন্ধের পর কী হয় কে জানে। হয়ত গায়ে সোয়েটার চাপাতে হবে। রাস্তা পার হয়ে শ্যামসুন্দর ছায়ায় দাঁড়াল। কদম গাছটির নীচে দাঁড়িয়ে বুক পকেট থেকে একটি সিগারেট বের করল। ঘামে নেতিয়ে গেছে। দুবারের চেষ্টায় লাইটারের আগুন নিয়ে সুখে ধোঁয়া ছাড়ল রোদের দিকে।

এখন তার হাতের ব্যাটারি-ঘড়িতে দুটো পঁয়ত্রিশ। আসলে কুড়ির মতো হবে। কাজ এগোতে তার ঘড়ি এগোনো থাকে। তাতে দত্তপুকুরের ট্রেন ধরতেও যেমন সুবিধে হয়, যার সঙ্গে যেমন কথা আছে ঠিক সময়ে দেখা করতেও অসুবিধে হয় না।

মাইতি স্যার বলছিলেন, দ্যাখো শ্যামসুন্দর, কাশ্মীরে এমন বরফ পড়েছে যে শ' অনেক তার ভিতরে চাপাই পড়ে গেল, টিভিতে দেখেছ?

হ্যাঁ স্যার।

কাশ্মীরে মাইনাস চলছে আর আমাদের এখানে চৌত্রিশ-পঁয়ত্রিশ, এই সময় তো পঁচিশ-ছাব্বিশ ডিগ্রির বেশি ওঠার কথা নয়।

কাশ্মীর তো স্যার শীতের দেশ।

হোক, কিন্তু এত তফাত হয়, এই কি বরফ পড়ার সময়?

ঠিক স্যার। মাথা দুলিয়ে সমর্থন জানিয়েছিল শ্যামসুন্দর, একটাই তো দেশ স্যার, কাশ্মীর ভারতের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ।

ভূগোল বই-এ এই কথাও লিখে দিয়েছে মাইতি স্যার। একটু অতিরিক্ত হল, সিলেবাসের বাইরে, কিন্তু অন্যায্য কথা তো নয়। ব্যানার্জি বুক হাউসের মালিক অতুলবাবু খুব মান্য করেন মাইতি স্যারকে। মাইতিবাবুর ফাইভ-সিক্সের ভূগোল ভাল পয়সা দেয় প্রতি বছর। সিলেবাস অনুযায়ী তার পরিবর্ধন পরিমার্জন করেন ভবশংকর মাইতি। সেই বই-এর স্পেসিমেন কপি এখন শ্যামসুন্দরের হাতের চামড়ার ব্যাগে। ভূগোল ছাড়াও ইংরেজি গ্রামার, অঙ্কও আছে। মাইতিবাবু ডবল এম.এ। ভূগোল এবং বাংলা। ব্যাকরণ রচনাও ভাল চলে। সব বই-এ শ্যামসুন্দরের হাতের ব্যাগের পেট ফুলে আছে। কলকাতায় ক্যানভাসিং শেষ করে সে যাবে পূর্ব মেদিনীপুর, তারপর পশ্চিম মেদিনীপুর দিয়ে বাঁকুড়া ঢুকবে, বাঁকুড়া ভেদ করে বর্ধমানে—ইস্কুলে বই ধরিয়ে কলকাতায় ফিরে আবার বেরোবে। ক'দিন জুনপুট থেকে চম্পা বুক সিন্ডিকেট-এর মালিক অজিত মিশ্র ফোন করেছিল ব্যানার্জিবাবুকে। লোকটার একটা ছোট হোটেল মতোও আছে। কবে যাবে শ্যামসুন্দর খোঁজ নিয়েছে ব্যানার্জিবাবুর কাছে। নতুন বই হল? গল্প-উপন্যাসেরও কয়েক কপি অর্ডার দিয়েছে। এখন ইস্কুলে ইস্কুলে বার্ষিক পরীক্ষা শেষ। সামনের সিজন-এর জন্য বই নির্বাচন চলছে। অজিত মিশ্রর হাতে কয়েকটা ইস্কুল আছে। এখন পৌঁছতে পারলে হয়। জুনপুট সমুদ্রতীর। এবার বছরের শেষে বছরের আরম্ভে হোটেল সব ফাঁকা পড়েছিল। যেন সুনামি বছর বছর, মাসে মাসে, দিনে দিনে আসে। কথাটা তার নয়, অজিত মিশ্রর। সে শুনেছে ব্যানার্জিবাবুর কাছ থেকে।

সিগারেট শেষ হয়ে গেল। এবার ছায়া থেকে বেরিয়ে ফুটপাথের গা ঘেঁষে যে লম্বা ছায়ার কার্পেট, তা ধরে শ্যামসুন্দরকে সোজা যেতে হবে চেতলা ব্রিজ, ব্রিজ পার হয়ে খালপাড় ধরে বাঁদিকে গিয়ে কুসুমকুমারী বালিকা বিদ্যালয়, কে কে গার্লস হাইস্কুল। হেডদিদিমণি আরতি কুণ্ডু। তাঁকে ছুঁয়ে যাবে সাহানগর বয়েজ স্কুল, তারপর চন্দ্রনাথ একাডেমি—এরিয়াটা আজ শেষ করতে হবে। এসব ইস্কুলে বনেদিয়ানা আছে। লম্বা বাড়ি, তার কোটরে কোটরে গোলা পায়রার বাস। ছেলে ইস্কুলে আবার গোলাপায়রা ধরাধরিও হয়। মেয়ে ইস্কুলে তারা ছুটির পর বকম বকম শুরু করে। ঘাড় ঘুরিয়ে শ্যামসুন্দর দেখল রাসবিহারী মোড় থেকে অনেকটা। অটো করলে হয়। কিন্তু পায়ে হাঁটলে তো চার টাকা বাঁচে। অতুল ব্যানার্জি বলে, সবে ক্যানভাসিং দিয়ে ঢুকলি বইপাড়ায়, লেগে থাক, বাবুয়ানা ছাড়, তোরও আমার মতো নিজের দোকান হবে, বই ছাপবি, টাকা দিয়ে লেখক পুষবি—

কী যে বলেন জেঠু!

কী বলি মানে, শুনবি তাহলে? বই-এর ব্যাগ মাথায় কলকাতায় হেঁটেছি, ভবানীপুর থেকে রাসবিহারী হয়ে গড়িয়াহাট—চক্রবর্তী ব্রাদার্স, জানা অ্যান্ড কোম্পানি, কুণ্ডু পুস্তকালয়, ভট্টাচার্য বুক হাউস, বাণী নিকেতন, জ্ঞানবিতান, মুখার্জী পুস্তকালয়, বাল্মীকি বুক হাউস—কত বই-এর দোকান, কলেজ স্ট্রিট থেকে বই কিনে ওখেনে বেচে কমিশন।

এখন কই?

অতুল ব্যানার্জি বলে, সব উঠে গেছে, জ্ঞানবিতান আছে আর বাল্মীকি আছে, কিন্তু বাংলার চেয়ে ইংরেজি বই বেশি বেচে।

শ্যামসুন্দর পুরোনো জিনস-এর ব্যাকপকেট থেকে চিরুনি বের করে মাথার চুল বিন্যস্ত করে। রুমালে মুখ মোছে। তখন ওপারে মেট্রো রেলের খোলামুখ থেকে পিচকিরি থেকে ছিটকে বেরিয়ে আসা খুনখারাবি রঙের মতো আচমকা ছড়িয়ে পড়ল লাল স্কার্ট, গোলাপি শার্ট, মেয়ে ইস্কুলের একদল মেয়ে। এরা সব ধর্মতলা, ময়দান, রবীন্দ্রসদন থেকে গাড়িতে উঠে কালীঘাট স্টেশনে নামল, তারপর পাতাল থেকে উঠে এল চৈত্র দুপুরের ভিতর। এদের সবার ইংরেজি ইস্কুল, ব্যানার্জিবাবু বলেন বিলাতি বিদ্যালয়। কী সুন্দর ইউনিফর্ম, স্কার্টের ঝুল বেশি নয়, রোদে পুড়ে যাচ্ছে মাখন রঙের পা আর উরুর কিয়দংশ। এই সব বালিকা, কিশোরী, প্রায়-যুবতীদের ইস্কুলের টাইমও অদ্ভুত। কোনো কিছুই বাংলা ইস্কুলের সঙ্গে মেলে না। সাড়ে আটটা থেকে দেড়টা, দুটো। শ্যামসুন্দর দেখল ওরা পার হয়ে আসছে। রোদের ভিতর গোলাপি আর লাল রং ঝলমল করতে করতে কদমতলির দিকে ভেসে আসছে যেন। মধুর মধুর বংশী বাজে...। শ্যামসুন্দর এখন তেত্রিশ। ব্যানার্জিবাবু বলে, বিয়ে করেছিস তো মরেছিস। মা বলে, আর কবে বউ আনবি শ্যাম? ব্যানার্জিবাবু বলে, কে তোকে নেবে রে শ্যাম, তোর কী দেখে জামাই করবে? মা বলে, রোজগার কম বলে জীবনটা ভোগ করবিনে শ্যাম? দু'জনে মিলে খাটবি...।

আহা রে, ওরা সব ফুটপাথে উঠে এল। কী হাসি! হাসি কখনো ফুরোয় না এই সব মেয়ে-ইস্কুলের মেয়েদের। হাসছে আর একে অন্যের গায়ে ঢলে পড়ছে।

শ্যামসুন্দর আবার ঘাড় ঘুরিয়ে দেখল ছায়ার কালো রং কার্পেট শরীর। মাঝে মধ্যে চটনা ওঠা মেঝের মতো এক-এক ফালি হিংস্র রোদ্দুর, আবার নরম ছায়া। এই ছায়ারেখা শেষ হচ্ছে কেওড়াতলা শ্মশানের মুখে। লাল গোলাপি মেয়েরা অতি ধীর চলনে ওইদিকে এগোচ্ছে। ওদের ইস্কুলও দেখেছে শ্যাম। কী বড় বড় বিল্ডিং, এশিয়ান পেইন্টস্-এর রং তার গায়ে। পাকা রং, মানুষ বুড়ো হয়ে গেলেও ইস্কুল থাকবে যেমন তেমন। টিভির বিজ্ঞাপন মনে পড়ল তার। ঠোঁটের কোণে হাসি জেগে উঠে মিলিয়ে গেল। এবার তো তাকেও যেতে হয়। হাঁটতে হয় চেতলার দিকে। কে কে গার্লস-এর হেড দিদিমণিকে দেখতেও কত সুন্দর। আধময়লা রং, কিন্তু মুখখানি কত সুন্দর। আর স্বাস্থ্য! শ্যামসুন্দর হাঁটছিল ধীরে ধীরে। তার কয়েক হাত দূরে লাল আর গোলাপি মেয়েরা যেন বাতাসে ভেসে ভেসে...। কোথা কোন কদমতলিতে...! তার যদি দেখতে ভাল লাগে দোষ কী? তার যদি কলকল হাসির শব্দ শুনতে ভাল লাগে, তার কী বলার আছে? ব্যানার্জিবাবু যতই বলুন, তিনি নিজে কি বিয়ে না করে কাটিয়ে দিলেন জীবন?

শ্যামসুন্দর শুনছিল, ওরা সব ইংরিজিতে বকবক করছে। পুরো ফুটপাথ দখল

করে নেওয়া সামনে থেকে আসা মানুষ রাস্তায় নেমে ওদের জায়গা করে দিচ্ছে। দেবেই তো, সবাই কত সুন্দর। বছর চোদ্দ-পনের থেকে দশ-এগারও আছে জনা দুই। মাথার লাল ব্যান্ড খুলে হাতে নিয়েছে কেউ, কেউ বা ঢুকিয়ে নিয়েছে পিঠের স্কুল ব্যাগে। চৈত্র বাতাসে সবার চুল উড়ছে। যেন কালো অগ্নিশিখা। লকলক করছে। এই রকম সিল্কি চুল টেলিভিশনে দেখা যায়। এরাও দেখেছে নিশ্চয়। সকলে দেখার জন্যই তো টেলিভিশন। এরাও দেখবে, সেও দেখবে, তার মাও দেখতে পাবে। শ্যামসুন্দর নিরীহমুখে দেখল আবছা হলুদ আভায় ভরা ফর্সা পায়ের গোছ, উরুর হলুদ বিভা! পায়ে স্পোর্টস শু্য। দুলে দুলে হাঁটছে সবাই। গুনগুন করছে। কী গাইছে জানে না শ্যাম। সে উদাসীন মুখে পিছু পিছু চলছিল। এক কিশোরী ঘাড় ঘুরিয়ে দেখল তাকে, তারপর চলছে, চলতে লাগল। কী যেন বলল পাশেরজনকে। সে প্রায় যুবতী। এক ঝলক তাকিয়েই খিলখিল করে হেসে উঠল। যে অমনভাবে হাসল সে-ই ওদের মধ্যমণি। যথেষ্ট স্বাস্থ্যবতী, নাইন-টেন হবে। তারও উঁচু ক্লাস ইলেভেন হতে পারে। কে কে গার্লস হলে শাড়ি আর সবুজ পাড়। বিলিতি ইস্কুলে তেমন ব্যবস্থা নেই। শ্যামসুন্দর ভাবল, থাক এসব। কে কে গার্লস-এ বই ধরাতে পারলে, কাজের কাজ হবে। এসব হল পথের দেখা। পথেই শেষ হবে তো! এরপর জুনপুট—অজিত মিশ্র—সমুদ্রতীরে একরাত্রি। ব্যানার্জিবাবু বারবার বলে দিয়েছে, বই ক্যানভাসিং-এ গিয়ে অন্য কোনো দিকে যেন মন না যায়। পথেঘাটে কতরকম হাওয়া, কতরকম ফাঁদ। মানুষ ওর ভিতরে গিয়ে মরে। সময়ে সব হবে।

সময় না হলে কিছুই হয় না, বলত গণেশ জেঠু। গণেশ সাউ, আদি বাড়ি হুগলি জেলার খানাকুল। দামোদরে জল এসে বছর বছর ভাসাত। এখনো ভাসায়, খবরের কাগজ পড়ে জেনেছে শ্যামসুন্দর। গণেশ সাউ তাকে নিয়ে ঘুরত সিউড়ি, মহম্মদ বাজার, সাঁইথিয়া, রামপুরহাট। আবার বাঁকুড়া, বিষ্ণুপর, কোতুলপুর, আরামবাগ দিয়ে মেদিনীপুরের রামজীবনপুর, ঘাটাল, চন্দ্রকোণা। কী ঘুরতে পারত লোকটা। মফস্বলে তার কাজ। কলকাতায় করত ব্যানার্জিবাবুর ভাই। সে এখন আলাদা। আলাদা দোকান, নোটবই ছাপে, সেক্সের বই ছাপে। ব্যানার্জিবাবু তার নামে মুখ কুঁচকোয়। ওই করব তো বই ঘাড়ে করে কলকাতা, মফস্বলে ঘুরেছি কেন মাইতিবাবু?

শ্যামসুন্দরের দিকে আর এক কিশোরী ঘুরে তাকায়। মুখখানি কচি, সুন্দর, জলে যেন ধোয়া হয়ে এল সবে, কিন্তু শরীরে যুবতী। ব্যানার্জিবাবুর দোকানের সেলসম্যান গৌর শাসমল বলে, খায়দায় ভাল, শ্যাম্পু-ক্রিম মাখে, পায়ে হাঁটে না গাড়িতে চেপে ঘুরে বেড়ায়, তাজা দুধ, তাজা কর্নফ্লেক এরকম করে, আমাদের ঘরে ছেলেমেয়ে কি এমন হবে?

ব্যানার্জিবাবু সাবধানে বলে, কিন্তু গৌরদা বলে, কাজে গিয়ে মেয়েছেলে থেকে দূরে থাকবি শ্যাম, তবে দেখবি কাজ হয়ে যাচ্ছে, গার্লস ইস্কুলে তো বেশি যাস তুই।

শ্যামসুন্দর দেখল পথের ওপারে মাদার গাছটি রক্তিমফুলে থরথর করছে ধারালো।

রোদে। এপারে ফুটপাথ, রাস্তার ধার লাল, হলুদ ফুলে ছেয়ে আছে। ফুল মাড়িয়েই যাচ্ছে তারা। আজ আচমকা যেন বসন্ত এসে গেছে এই শহরে। অথচ সকালে কীরকম ঠাণ্ডা ছিল। কালই হয়ত শীত পড়ে যাবে। এই রকম হবে। সিজন বদলে যাচ্ছে। এরপর বর্ষার সময় মেঘ হবে না, শীতের সময় শীত হবে না, গরমের সময় কী হবে তা কেউ বলতে পারে না। মাইতি স্যার বলছিলেন পৃথিবীর তাপমাত্রা বেড়ে যাচ্ছে। মেরুপ্রদেশে হিমবাহ গলে যাচ্ছে। সমুদ্রে জল বেড়ে যাবে। কোনো কিছুই ঠিকঠাক থাকবে না। শোনো শ্যামসুন্দর, সুনামির পর থেকে আন্দামান, শ্রীলঙ্কা, ইন্দোনেশিয়া কেঁপেই চলেছে, জাভা সুমাত্রা বালি সব কোন দিন চলে যাবে সমুদ্রের ভিতর। প্রকৃতি শোধ নিচ্ছে শ্যামসুন্দর। শুধু দেখে যেতে হবে। কী যে হবে এই পৃথিবীর!

কী হবে? কথাটা শুনেই ব্যানার্জিবাবু মাথা গলিয়েছিলেন সেই আলাপে, যা হয় তাই হবে, আমরা না হয় মরেই যাব, তার বেশি কী হতে পারে?

মাইতিবাবু বলেছিলেন, তা বললে কী হয়, মরব বললে মরা যায়?

খুব হয় স্যার, এত মানুষ, কিছু মরবে, বাকিরা তো বেঁচে থাকবে, কত কিছু দেখলাম, পৃথিবীর কী হল, কিছুই না। দুর্ভিক্ষ, মন্বন্তর, পার্টিশন, রায়ট, হিরোসিমায় অ্যাটম বোমা—হয়নি? বলুন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত কী দাঁড়াল?

মাইতিবাবু তখন চুপ। শ্যামসুন্দরও। কিন্তু এখন তার মনে হল সব যেমন তেমন কি আর থাকে? মনে কি দুঃখ জন্মায় না? এবারে ক্লাস ফাইভের ভূগোলে সুনামির লক্ষণ লিখে দিয়েছে মাইতিবাবু, সুনামি কেন হয় তাও লিখে দিয়েছে। ব্যাকরণ/রচনায় সুনামি নিয়ে রচনাও ঢুকিয়ে দিয়েছেন। সে পড়ে নিয়েছে। কেউ জিজ্ঞেস করলে বলে দিতে পারে। দুপুরে যখন ঝিমোয় কলেজ স্ট্রিট পাড়া, খদ্দের নেই তেমন, শ্যামসুন্দর পড়ে নেয় এ-বই ও-বই। বই সম্পর্কে না জানলে কী করে ক্যানভাস করবে?

পৃথিবীটাকে শ্যামসুন্দরও দেখছে। ব্যানার্জিবাবু দেখেছিলেন দুর্ভিক্ষ, মায়ের কোলে সন্তানের মরণ, মরা মায়ের পাশে বসে খলবল করছে বাচ্চা, শ্যামসুন্দর দেখছে দুধ দই খাওয়া, আইসক্রিম চকোলেট কর্নফ্লেক আঙ্কল চিপস খাওয়া, কোল্ডড্রিংস খাওয়া মেয়েদের। কী সুন্দর তারা রূপে আলো করে হাঁটছে ফুটপাথ জুড়ে। তাকে দেখেছে ওরা। নজরে রাখছে। সে তেত্রিশ হলে কী হবে, মুখখানিতে তেইশ-চব্বিশ। ঘুরে তার চোখে চোখ ফেলল বড় মেয়েটি। শাড়ি পরলে ও আঠারো-উনিশ হবেই, না হোক দেখাবেই। এদের সবাই-য়ের মা-বাবার অনেক টাকা, সবাই মা-বাবার একটি মেয়ে, যা চাইবে তাই পেতে বাধ্য। দরকার হলে বাবা-মায়েরা সাত রাজার ধন এনে দেবে। বিলেত থেকে ডেকে আনবে সায়েব। শ্যামসুন্দর তার শেভ করা গালে হাত বুলোয়। আজ গার্লস ইস্কুলে ভিজিট বলে সক্কালে উঠে দাড়ি সাফ করেছে। না হলে আর ক'দিন থাকত। ওই কারণে হাল্কা নীল শার্টটাও আয়রন করা। নাহলে এদের সঙ্গে সে যেতেই পারত না। গালে দাড়ি থাকলে, শার্ট ময়লা থাকলে বড় রুগ্ন রুগ্ন লাগে।

ব্যানার্জিবাবু বলেছে, ইস্কুল অনেক, ক্যানভাসার তো জনা পাঁচ, একবারের বেশি দু'বার গেলে আর একটা জায়গা বাদ পড়ে যাবে, যদি টাকাপয়সা দিতে হয়, তাও ঠিক করে আসবি শ্যাম, বাকিটা ফোনে ঠিক হবে।

আরতি কুণ্ডু দিদিমণিকে কি বলা যাবে?

খুব যাবে, টাকা না দিলে কেউ বই নিচ্ছে বুক লিস্টে?

উনি খুব ভাল।

ভালর ভাল, উনি কী করবেন, করবে তো ম্যানেজমেন্ট।

যদি উনি রাগ করেন?

শ্যামসুন্দর দেখল চকচকে চোখে হাসিভরা মুখে এক কিশোরী ফিরল তার দিকে। সাহস করে দেখল সে। বুক ভরে গেছে। আর কিছু বাকি নেই। প্রকৃতি যা দেওয়ার দিয়েছে, ব্যতিক্রম তো ঘটেনি। বসন্তের সময় বসন্তই এসেছে ঠিক।

চাপা ঠোঁটে হাসল লাল স্কার্ট, গোলাপি শার্টদের একজন, বলল, হাই সুইট!

বড় মেয়েটি এবার ফিরল সরাসরি। তার বুকের কাঁপন দেখতে পায় শ্যামসুন্দর, শুনল, কিউট!

সব অঙ্গ ঝমঝম করতে লাগল। এই আকাশী নীল শার্ট দিয়েছিল দত্তপুকুরের দিদি। ভাগ্যিস দিয়েছিল। দুটি শব্দেই যেন শার্টের গা থেকে নীল রং বিচ্ছুরিত হতে লাগল। এখন একটা সিগারেট ধরাতে পারলে বেশ হত। সুইট শ্যামসুন্দর একটি তাজা সিগারেটের ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে হাঁটবে খুকিদের পিছনে পিছনে। ওরা ধীরে ধীরে হাঁটছে। চৈত্রবাতাসে উড়িয়ে দিচ্ছে চকোলেটের রঙিন মোড়ক, লজেন্সের রঙিন রাংতা। খুকিরা সবাই মিলে কী যেন কথায় একসঙ্গে হেসে উঠল। কলকল করে উঠল হাসির শব্দ। ঠিক তাদের পুরোনো বাড়ির পুরোনো চৌবাচ্চার মুখ খুলে গেলে যেমন হয়।

দোকান দেখা গেছে। দাঁড়িয়েছে ওরা। কোল্ডড্রিংকস নেবে। দোকানে সিগারেটও আছে, ভাল হল। নাহলে সে দাঁড়াত কী করে? মেয়েরা দোকানটাকে ঘিরে ধরেছে। চকোলেট, চিপস, কোল্ডড্রিংকস সব এখন চাই ওদের। আর কী চাই শ্যাম্পু, সাবান, সেন্ট, হেয়ার রিমুভার, নেলপালিশ, লিপস্টিক, রুজ, আর কী? কপালের টিপ, চুলের গার্ডার, পায়ের আলতা! ইস্! আলতা পরে কে? হাতে তো মেহেন্দির কারুকাজ করে, তাও নিয়ে নেবে এই কল্পতরু স্টোর্স থেকে। ফুটপাথের গায়ের রেলিং-এ ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়েছে শ্যামসুন্দর। দেখছে খুকিরা যে যার মতো অর্ডার দিচ্ছে দোকানিকে আবার নিজেদের ভিতর ফিসফিসও করছে। ঘাড় ঘুরিয়ে দেখল তাকে। চকচকে চোখে হাসল।

হাসল শ্যামসুন্দরও। হেসে সে রাস্তার দিকে তাকিয়ে উদাসীন হল। ওই ওপারে গুরুদুয়ারার দিকে হাঁটছে মা ও শিশু। মা যেমন সুন্দর, মোটোসোটা বেড়ালের মতো তার বাচ্চাও। খুকিরা এবার কোল্ডড্রিংকস গলায় ঢালতে ঢালতে এদিকে ফিরেছে। হাসছে আবার। কার মুখ থেকে রঙিন পানীয় ঝরে পড়ল গোলাপি শার্টের গায়ে। তা দেখে আবার হাসল সবাই। সবার বড় যে সে কোল্ডড্রিংকস খাওয়া শেষ করে

দোকানির দিকে পাঁচশো টাকার নোট বাড়িয়ে ধরল। তারপর কেউ কুড়ি কেউ পঞ্চাশ কেউ একশো বাড়িয়ে ধরতে লাগল। দোকানি জানে এদের, এক-একটা নিয়ে চেঞ্জ দিতে লাগল। এদের কত টাকা! সবাই মিলে কেন, এক-একজনই যেন এই দোকানের সব কিনে নিতে পারে। কী কী? মাথার ভিতরে নানা ছবি নাড়াচাড়া করতে থাকে...হিরো হন্ডা, কোয়ালিশ, মারুতি, এল.জি টিভি, চিরঞ্জীবী রং, ক্যাডবেরি, চকোলেট, মাখন, চিজ, শ্যাম্পু, সাবান, হুইস্কি, মাসের কটা দিন—ছবি ফুটে উঠতে না উঠতে মাথায় উঠে আসে বিজ্ঞাপনের বিষ। পৃথিবীতে যা যা আছে, তাই যেন বিজ্ঞাপনে আছে, নাকি বিজ্ঞাপনে যা যা আছে পৃথিবীতে তার কোনোটাই নেই।

আছে কিনা বলতে পারবেন ব্যানার্জিবাবু। কথায় কথায় বলেন কত দেখেছেন, কত কী, তাতেও পৃথিবীর কিছু হল না।

কী দেখেছেন, হিরোসিমায় বোমা পড়া দেখেছেন?

দেখেছি, যে লেখকের বই ঠেলায় করে আসত, একদিনে একটা এডিশন শেষ, আজ তার বই কাটেই না, সবাই ভুলে গেছে তাকে।

এরকম হয়। মাইতি স্যার হাসেন শুনে, বলেন, হিটলারের ইহুদি নিধন তো দ্যাখোনি।

তা দেখিনি, আমি আমার মতো দেখেছি মশায়, রবিন গুহ, লেখক হতে এসেছিল, তার একটা বই ছেপেওছিলাম আমি, এমন হল অহংকার, কেউ লিখতে পারে না, সে পারে শুধু, শেষে তার লেখাই হল না, কোথায় চলে গেল!

শ্যামসুন্দর ভাবল, থাক মাইতিবাবু আর ব্যানার্জিবাবু। ওই যে মেয়েরা ঘুরছে। ঘুরে শ্যামসুন্দরকে দেখছে। শ্যামসুন্দর লজ্জিত হল। গালে যেন লাল ছোপ পড়ল। আহা এ কী বসন্ত! হাওয়ায় পাক খাচ্ছে রাস্তায় পড়ে থাকা ক্যারিব্যাগ, ধুলো-ময়লা। চৈত্রপবনে দিশাহারা দিশাহারা লাগছে শ্যামের। কোথায় যেন যাবে। মিসেস আরতি গুপ্ত। তিনি হাসলে যেন অপর্ণা সেন, চোখ তুলে তাকালে সুচিত্রা সেন। কথা বললে মাধবী। তাঁর জন্যই তো সেজেগুজে বেরিয়েছিল শ্যামসুন্দর। ব্যানার্জিবাবুর সেলসম্যান বলে, তুই খুব সাবধান শ্যাম, মনে রাখবি তুই ক্যানভাসার, কোথাও বেশি বসবি না, তোর এত সাজ কেন?

চারদিকে সবাই কত সাজছে, সে সাজলে দোষ? ভিখিরিও কি জলের আয়নায় মুখ দ্যাখে না? কলকাতা দিনদিন সুন্দর হয়ে উঠছে। ফ্লাইওভারে এপার থেকে ওপার পাঁচ-সাত মিনিট। রেসকোর্স থেকে পার্ক সার্কাস। কত রকম গাড়ি ছুটছে কলকাতার রাস্তায়! টাইট জিনস—টপে মেয়েরা কত সুন্দর! তারা যদি রূপসী হয়ে উঠতে পারে শ্যাম কেন হবে না? চিরবসন্তের দিন এসে গেল প্রায়। শ্যামসুন্দর দেখল খুকিরা দোকান ছাড়ছে।

ওরা দোকান ছাড়লে সে এক প্যাকেট সিগারেট কিনল। কোনোদিন এমন হয় না যে এক প্যাকেট কিনেছে। প্যাকেট ভেঙে সিগারেট ধরিয়ে সে নিজের উত্তেজনা

কমাতে চায়। খুকিরা কয়েক পা এগিয়েছে। সেও পা বাড়ায়। ওরা তো তার সঙ্গিনী। সমস্ত দুপুর সমস্ত পথ তার সঙ্গে রয়েছে ওরা। বৃন্দাবনের গোপিনী সব, সে কদমতলির শ্যাম। চৈত্রদুপুর দপদপ করছে। আগুন আগুন লাগছে ওই ওদের। চারপাশে যেন আগুনও ধরে গিয়েছে। অথচ সকালে কত ঠাণ্ডা। মনে হচ্ছিল অঘ্রাণের আরম্ভ। সুনামির পরে কি এই রকম হয়? কারা জানে? সেই আন্দামানের গভীর অরণ্যের আদিম মানুষরা? তারা কেউ মরেনি, টের পেয়ে গিয়েছিল সব। তারা জানে সুনামির আগে কী হয়। শ্যাম জানে না। কে জানত এদের সঙ্গে এইভাবে দেখা হয়ে যাবে? কোনো আগাম খবর ছিল না। আগাম খবর মিলছে না একটাও। পৃথিবীতে আবার আরো বড় কিছু হবে। ভূমিকম্প, জলোচ্ছ্বাস, অনাবৃষ্টি, অতিবৃষ্টি—এসব খবর কি পেয়েছে ওই সব মেয়েরা? স্কার্টের পকেট থেকে মোবাইল ফোন বের করল যুবতী-প্রায় মেয়েটি। খবর দেবে। আচমকা কার সঙ্গে দেখা হয়ে গেছে—! কী জোরে জোরে কথা বলছে, হাই নিশা...খিলখিল করে হাসছে সে। ভরা বুক হাসির দমকে দমকে চলকে পড়ছে।...কৌন? শাহরুখ? নো নো নো...সাচীন? নো নো নো...আমির খান?...ছোড় ইয়ার, হিরো কো ছোড়, আ সুইট আই ইজ ফলোয়িং মি, ব্রড শোল্ডার, হাইট? অ্যারাউন্ড সিক্স ফিট, ব্লু আইজ, হেববি ফিগার, হি হি হি দাউদ এব্রাহিম।

কিছু শোনে কিছু কানের পাশ দিয়ে উড়ে যায়। কেঁপে ওঠে শ্যামসুন্দর। সে কি ডেকে জিজ্ঞেস করবে? কী বলবে? ওরা কি তার কোনো কথা শুনবে? যদি ইংলিশে কথা বলতে শুরু করে, তখন?

...কী হলো, ক্যা, ধনেনজয়, এনজয় ধনেনজয়? আরে ইয়ার, অ্যাবসোলিউটলি রাইট, আরে চিনা চিনা লাগছিল, কোথায় দেকেচি, আরে ইয়ে তো ধনেনজয়, স্রিফ ধনেনজয় যেইসা থা, ধনেনজয় দ্য রেপিস্ট...খিলখিল করে হাসতে লাগল সেই মেয়ে, লাল আর গোলাপি কন্যা। হাসতে হাসতে পাশের জনকে বলল, দেখ, পুরা ধনেনজয়, এনজয় ধনেনজয়! তার কথায় পাশের জনও হাসতে লাগল। হাসতে হাসতে মোবাইল অফ করে আচমকা ঘুরে দাঁড়ায় সে, হাসির দমকে, শ্বাস-প্রশ্বাসে ভরা বুক শ্বাস নিচ্ছে। নিজেকে কঠিন করে তুলল সে মুহূর্তে, ধারালো গলায় বলে উঠল, ক্যা মাংতা?

তার মানে? শ্যামসুন্দর কেমন যেন গুটিয়ে যায় কেন্নোর মতো।

মানে তো ইয়ে হ্যায়, স্রিফ পন্দের সাল জেহেলে ঢুকে যাবে।

সবাই হেসে উঠেছে। হাসি যেন শ্মশান-ধোঁয়ার মতো চৈত্র বাতাসে ছড়িয়ে যেতে লাগল। হাসির দমকে দমকে তাদের বাচ্চা চাঁদের মতো শরীর কাঁপতে লাগল। লাল স্কার্ট, গোলাপি শার্ট যেন ঝরে পড়তে লাগল ঘোর চৈত্রে ফোটা মাদার কৃষ্ণচূড়ার মতো। এই নগরে এখনো তো ফুল ফোটে। আহা কী সুন্দর মুখেরা সব! টেলিভিশনে এরাই তো সবাই সিনেমার হিরোকে ঘিরে কলকল করে ওঠে। কতবার দেখেছে শ্যামসুন্দর।

ফোলো করছ কেন? একজন জিজ্ঞেস করল।

তার মানে?

এই মানে কী বলচিস, হোয়ায় আর য়্যু ফোলোয়িং মি? যুবতী হয়ে ওঠ। ইস্কুল বালিকা নিজের বুকে তর্জনী ছোঁয়ায়।

এই সব কী বলছেন? শামুক যেন তার খোলস হারিয়েছে—এমন। এদিক-ওদিক তাকায় শ্যামসুন্দর। রোদে পুড়ে গেছে সকল ছায়া, কার্পেট, মেঝে, দেওয়াল—সব।

কী বলচি? পিছে ছোড় উল্লু, ধনেনজয় বানিয়ে দেব সন অফ আ বিচ, একবার ফানসি হয়ে গেল, শ্মশান থেকে চলে এলি?

এই কথায় সবাই আবার হো হো করে হেসে ওঠে। একে যেন অন্যের উপর গড়িয়ে। জলে ঢেউ খেলিয়া যায়। ফুলের বনে বাতাস। ঠিক এমনই দেখায় যেন সেই ফ্রেনচি পরা চুম্বন-চিহ্ন ভরা পুরুষের সামনে এদের। সবাই হাসছে। দুই আঙুলে 'ভি' চিহ্ন। ভি ফর ভিকটরি, মর যা উল্লু।

দেখ দেখ, যেইসা ও ধনেনজয় থা...। এক কিশোরী আর একজনকে আঙুল তুলে দেখায়। তার মুখখানিতে নতুন ফোটা ফুলের সুষমা, টানা টানা চোখ, ভরা গাল, হাসলে টোল পড়ছে বারবার, শরীর ভরে উঠছে সবে, চোখের মণিতে শুধু চাপা কৌতুক ঝিকমিক করছে। তারা আবার হাসতে হাসতে এগোচ্ছে। একজন হাস্যমুখে হাতছানি দিল, আও। তারা সরে যাচ্ছে দূরে। মিলিয়ে যাচ্ছে।

রেলিং-য়ে ভর দিয়ে হাঁপাচ্ছে শ্যামসুন্দর। মাথা ঝুলে পড়েছে ঘাড় থেকে, যেন মটাস করে ভেঙে দিয়ে গেছে মেরুদণ্ড আর কাঁধের সংযোগস্থলটি। হাড়খানি, ফাঁসির দড়িতে যেমন হয়, হয়েছিল।

একটু বাদে সে আবার হাঁটতে থাকে। রোদে পুড়ে মুখ কালো, চোখ দুটি মরা মাছের মতো নিস্পন্দ। শ্মশান গেল বাঁদিকে সে সোজা ব্রিজে উঠে গেল। আদিগঙ্গার কালোজল পার হল, তারপর হাঁটতে হাঁটতে—এ পথে কোথাও কোনো ছায়া নেই—রোদে পুড়তে পুড়তে সে পৌঁছে যায় কুসুমকুমারী বালিকা বিদ্যালয়ে।

ধুঁকছিল শ্যামসুন্দর। নিস্তব্ধ ইস্কুলবাড়ি, প্রাঙ্গণ। ক্লাসে ক্লাসে তালা। বারান্দায় দুটি পথের কুকুর কুণ্ডলী পাকিয়ে ঘুম মারছে। তার সাড়া পেয়ে তারা চোখ খুলল, ভুকভুক করবে কি করবে না ঠিক না করতে পেরে আবার ঘুমিয়ে পড়ল। বারান্দার শেষ প্রান্তে একটু অন্ধকার মতো জায়গায় ইস্কুলের দপ্তরী বুড়ো বীরেশ্বর বসে ঝিমোচ্ছিল, তার পায়ের শব্দে উঠে দাঁড়ায়। মুখ চেনা আছে। উদ্দেশ্যও তার জানা আছে, ইঙ্গিতে হেড দিদিমণির ঘর দেখিয়ে দেয়। মানে তিনি আছেন।

কুণ্ঠিত শ্যামসুন্দর জিজ্ঞেস করে, যাব?

যান, এখন তো আপনারাই আসছেন।

ভিতরে ঢুকল শ্যামসুন্দর। কই তিনি নন তো। আরতি কুণ্ডু—কী চমৎকার হাসি তাঁর। আগেরবার চা খাইয়েছিলেন। দুটো বই ঢুকেছিল বুকলিস্টে। এখানে অনেক বছর

ধরে প্রবোধ কর্মকারের ভূপরিচয় পড়ানো হয়। এবার সেটা বদলে যাবে বলেছিলেন ম্যাডাম। সে বই-এর কোনো রিভিশন হয়নি নাকি। ভুলগুলো ভুলই থাকছে।

যিনি বসে আছেন তিনি শীর্ণকায়, চোখে সরু ফ্রেমের চশমা, কপালের কাছে চুলে পাক, সিঁথি শূন্য। অদ্ভুত! আরতি কুণ্ডু ম্যাডামের দিকে তাকিয়ে থাকতে হত। কত বয়স, কিন্তু কিছুই ধরা যায় না। শ্যামসুন্দর চেয়ারে বসে বই বের করল, ফাইভ সিক্সের জিওগ্রাফি ম্যাডাম, ভবশংকর মাইতির বই, একবার পড়ে দেখুন, আপ টু ডেট করা আছে, সুনামি পর্যন্ত ঢুকে গেছে ম্যাডাম।

সুনামি দিয়ে কী হবে?

সিলেবাসের এক্সট্রা ম্যাডাম।

শ্যামসুন্দর নুইয়ে গেল। খুব কঠিন হবে মনে হয়। কণ্ঠস্বর কর্কশ। অবশ্য এইরকম আপাত কঠিন দিদিরা ভালও হন। শ্যামসুন্দর বলল, বাচ্চারা জানবে।

জেনে কী হবে? সিলেবাস ছাড়া কেউ পড়বেই না।

পরের বার ওটা সিলেবাসে ঢুকে যাবে ম্যাডাম।

ম্যাডাম চুপ করে থাকলেন। শ্যামসুন্দর দেখতে লাগল দেওয়ালে টাঙানো রবীন্দ্রনাথ, মহাত্মা গান্ধী, নজরুল, নেতাজি, সুকান্ত ভট্টাচার্যর ছবি। ভূগোল বই নেড়েচেড়ে দেখছেন ম্যাডাম। নিঃঝুম হয়ে বসে আছে শ্যামসুন্দর। এঁর রূপ নেই। ছিল না কোনোদিন। শ্যামসুন্দর হাত কচলায়, করতেই হবে ম্যাডাম।

ঠিক আছে বই রেখে যান।

বাংলা গ্রামার, ব্যাকরণ ও রচনা আগের বার ছিল, সেভেন-এইট, এতেও সুনামি আছে ম্যাডাম।

শীর্ণকায় হেডমিস্ট্রেস হেসে ফেললেন, ঠিক আছে।

কবে আসব ম্যাডাম, ফোনে খোঁজ নেব?

সে তো নিতে হবেই, বই তো এমনিতে হবে না।

জানি ম্যাডাম, ব্যানার্জিবাবু, পাবলিশার বলে দিয়েছে স্কুল ফান্ডে...।

দিতেই হবে, দেখছেন তো ইস্কুলের কনডিশন। ইস্কুলকে তো বাঁচাতে হবে।

শ্যামসুন্দর বাইরে বেরিয়ে এসে হাঁপাতে লাগল। আরতি কুণ্ডু হলে এই রকম কথা হত কি? কিছুই হত না। সে মুগ্ধ হয়ে ফিরে যেত। ভূগোল আর উঠতই না লিস্টে। এ একরকম ভাল। বাইরে বেরিয়ে সে দেখল দোতলার শূন্য বারান্দার রেলিং এ পরপর বসে আছে কাকেরা। ওখানে কত মুখ থাকে, ছায়া, মায়া, দয়া, বিজলি, চামেলি, স্বপ্না, রত্না, রেখা, কবিতা...., বাংলা ইস্কুলের মেয়ে।

দপ্তরি বুড়ো জিজ্ঞেস করল, কথা হল?

হল।

টাকার কথা?

দিতে হবে।

দিতে তো হবে, এবার যে বই-ই হবে তার জন্য দিতে হবে।

কেন?

পরের বছর থেকে ক্লাস ফাইভ ইংলিশ মিডিয়াম হয়ে যাবে, খরচ নেই?

তার মানে?

মানে আবার কী, প্রাইমারি তো ইংলিশ মিডিয়াম হয়ে গেছে অনেকদিন।

তারপর?

তারপর কী, এক-এক ক্লাস করে বছর বছর ইংলিশ মিডিয়াম হয়ে যাবে, আমাকেও ইংরিজি বলতে হবে, ইয়েস নো ভেরি গুড।

নিস্তব্ধ চারপাশ। বুড়ো দপ্তরি বলে যাচ্ছিল, শ্যামসুন্দর শুনছিল। ধীরে ধীরে কথাগুলো কানের ভিতর দিয়ে মরমে পৌঁছে যাচ্ছে। শ্যামসুন্দর আলতো গলায় বলল, ক্লাস ফাইভে ক'টা সেকশান?

তিনটে ছিল, গতবার দুটো হয়েছে, এবারে বোধহয় একটা হয়ে যাবে।

রোল স্ট্রেংথ? শ্যামসুন্দর জিজ্ঞেস করে।

বুঝতে পারা যাচ্ছে না, পঁয়ত্রিশটা হয়েছে, অন্য জায়গা থেকে এসেছে।

আমাদের টাকায় ইস্কুল ইংরেজি মিডিয়াম হয়ে যাবে?

যাবে, এরকম ভাঙাচোরা বিল্ডিং-য়ে তো হবে না, একেবারে অন্যরকম হয়ে যাবে।

বুড়ো দপ্তরি হাসল, ইংরেজি ইস্কুল যেমন হয়, ধর্মতলা আর চেতলায় যেমন পার্থক্য থাকে, তা আর থাকবে না, এরপর দেখবে চেতলা হাটে এসি মার্কেট...কত কী যে হবে? বলতে বলতে দীর্ঘশ্বাস ফেলল বুড়ো দপ্তরি।

কুসুমকুমারী বালিকা বিদ্যালয় থেকে ফিরে এল শ্যামসুন্দর। এরপর থেকে ওই ইস্কুলে আর যেতে পারবে না। ক্যা মাংতা? আরে উল্লু—! কোথায় গেলেন আরতি ম্যাডাম?

ব্যানার্জিবাবু গল্প জুড়েছেন বাঁধাইখানার অনিলবাবুর সঙ্গে। এখন সবে সওয়া চারটে, এ কী, এর মধ্যে ফিরে এলি শ্যাম?

শ্যামসুন্দর বসল। মুখে কষ্ট করে হাসি আনল। বলল, কুসুমকুমারী....।

ও তো জানা কথা, একদিন সব ইস্কুল ওইরকম হয়ে যাবে। ব্যানার্জিবাবু নস্যি নিলেন, বিড়বিড় করলেন, কত দেখলাম এ জীবনে, কত কী হল, তাতে পৃথিবীর কী হয়েছে?

কিছু হয়নি? আচমকা তার দু চোখ জলে ভরে গেল। ঠোঁট কাঁপছে, চোখ ঝাপসা হয়ে আসছে....ক্যা মাংতা, উল্লু ভাগো...। এর পরেও তো সে কুসুমকুমারী ইস্কুলে গেল। শ্যামসুন্দর দু হাতে মুখ ঢাকল। হাত-মুখ ভেসে যাচ্ছে নোনা জলে।

আরে তোর আবার কী হল?

আমি কী করব স্যার?

স্যার! আমি কি স্যার? হইহই করে উঠলেন ব্যানার্জিবাবু। বললেন, কী করবি মানে, যা করছিস তাই।

আমরা কি থাকব স্যার?

থাকব না কোথায় যাব? থাকব, বেঁচেও থাকব, তুই তো থাকবিই, কুসুমকুমারী ইংরেজি ইস্কুল হয়ে যাচ্ছে বলে কাঁদছিস!

শেষের কথাগুলো শুনতে পায়নি শ্যামসুন্দর। ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে আছে ব্যানার্জিবাবুর দিকে। চাপা গলায় জিজ্ঞেস করল, কী করে থাকব?

থাকতে হয় তাই থাকবি, কী হয়েছে তোর?

শূন্য দৃষ্টিতে পাখার ঘূর্ণন দেখছে শ্যামসুন্দর। ব্যানার্জিবাবুর মুখের দিকে তাকাতে পারছেনা। উনি তো জানেন না দুপুরে কী হল। ফাঁসিতে যেমন হয়। বাঁচার কোনো উপায় নেই। বই নিয়ে সে কাদের কাছে যাবে?

ব্যানার্জিবাবু পা নাচান। আস্তে আস্তে বলেন, যেমন করে ওঙ্গি, জারোয়ারা বেঁচে গেছে লিটল আন্দামানে, অমনি করে বাঁচবি, থাকবি।

সুনামি এলে?

ও তো চলছেই, মরে গেছিস নাকি, আমি মরেছি?

তার মানে?

ওরা যেভাবে বেঁচেছে, আদিম জনজাতি।

তার মানে?

মানে মানে করিসনে তো, কাল জুনপুট চলে যা।

তার মানে?

অবাক ব্যানার্জিবাবু জিজ্ঞেস করলেন, তোর কী হয়েছে বল দেখি?

মাথা নামায় শ্যামসুন্দর। শ্যামল সুন্দর। এবার চোখের সামনে জুনপুটের সমুদ্র। চোখের সামনে ঘন অরণ্য, তার ভিতরে আদিম জনগোষ্ঠী। প্রবল জলোচ্ছ্বাসও ওদের মারতে পারেনি। তারা চেনে সমুদ্র, আকাশ, মাটি—পৃথিবীকে। শ্যামসুন্দরের চোখ আবার ভেসে যাচ্ছে অশ্রুবিন্দু সমুদ্রজলে। নীলাম্বুরাশিতে। জলোচ্ছ্বাসে ভৈরব কল্লোল উত্থিত হল। সৈকতভূমি প্লাবিত হল। অনন্ত বিস্তার নীলাম্বুমণ্ডল যেন দৈত্যাকার ধারণ করল। দু'চোখ বুজে এল তার। জলে ভেসে গেল সমুদ্রপৃষ্ঠ, নগর, বন্দর। সে দাঁড়িয়ে আছে সবুজ বনভূমির আশ্রয়ে।

ক বি তা

তিনটি কবিতা

প্রসূন মজুমদার

স্বপ্ন

বাজার ভালো নয় ঘুমপরীর
আমরা পেয়ে গেছি ড্রিমমেশিন
সুইচ টিপলেই স্বপ্নদেশ
স্বপ্নে লাল, নীল, যা-ইচ্ছে।
ধন্য আমাদের সভ্যতা!
তারই তো ডাকনাম প্রযুক্তি,
রাষ্ট্র তারই হাতে, অস্ত্র তার
ঘুমের মধ্যেও নিয়ন্ত্রণ।

আমরা খুব দ্রুত এগোচ্ছি
পায়ের নীচে নেই পৃথ্বীতল
আকাশ ভেবে যাকে উড়তে চাই
সেখানে গহ্বর, লাভাস্রোত।
ক্রমশ বেড়ে যায় উষ্ণতাও
অগ্নিকুণ্ডের আমন্ত্রণ
প্রযুক্তির সেই গোগ্রাসে
স্বপ্নে ঢুকে যায় ভবিষ্যৎ।

কলের মিস্ত্রি

মাটির জলে বিষ মিশেছে তাই গঙ্গা থেকে পাইপ বেয়ে জল
পাঠিয়ে দেবে বলেছে সরকার, পাড়াতে আর বসে না তাই কল।
কলের যত মিস্ত্রি ছিল সব, তাদের চেনা গানের তালে তালে
পেরিয়ে চলে দিগন্তের সীমা, ধানক্ষেতের আড়ালে, আবডালে।
দিগন্তের ওপারে আকাশের অন্য এক নীলিম বিস্তৃত।
সেখানে মেঘ ভীষণ কালো তাই বর্ষাগুলো নিমের মতো তিতো,
নদীর জল ধারণ করে বুকে ধানের জমি, জমির ধান, সব।
প্রবৃদ্ধ সম্পাতির মতো জরা প্রমাণ করে ফসল-অসম্ভব,
সেখানে আজও নিশুত রাত্তিরে কোরাসে শোনা যাবে তাদের গান।
কল-বসানো হারানো মিস্ত্রিরা গভীর থেকে তুলে আনছে প্রাণ।

যাত্রা

যেমন যেমন চেয়েছে পাবলিকে
এই সুযোগে তেমন তেমন লিখে
ছুঁড়ে দিলাম আকাশে নেই চাঁদ
ছায়াবাজির নিয়ম মেনে সবরকমের কল্পনা, ঢপ বাদ।
আজ যা খবর কাল বাদামের ঠোঙা
চিৎকারও খুব দূরের শ্রোতার কানের কাছে
ভূতের মতো গোঙায়।
তবে যে আজ যাত্রা হবে; সকাল থেকে আকাশ তাই ভালো।
এরোপ্লেনের ডানার মতো যাত্রাপালার মঞ্চ থেকে আলো
ছড়িয়ে পড়ে দূরের গ্রামে, পাবলিকে কী চায়?
দু'মুঠো ভাত।
দু'চারখানা পেটের জন্য একটা মানুষ যাত্রা করে—
হয়তো সারারাত।

দুটি কবিতা
বিপ্লব চৌধুরী

কবি

মনে হয় এ কবিতা লিখছে এক নষ্ট দেবদূত
অশুভ সন্ধ্যার ছায়া তার ভবনে পড়েছে;
তাই এত শান্ত, ধীর, জীবন যেতেছে চলে—
রেললাইন পেরিয়ে ওপারে, মেঘের সূর্যের দেশে
সাপের স্বপ্নে ঘেরা সব রাতে, বিষের থলিতে যেন
চুমু খেতে চায় তার ভেতরে ফুটন্ত এক আগ্নেয়-র তাপ;
গলে যাবে মোমের মূর্তি, অন্য এক আকাশ তবুও পাবে
পরিক্রমা শেষ হবে প্রয়োজন মতো—
আপাতত দিগন্তে নিহত তুমি, শরীরে পিঁপড়ের সারি;
তবু মাথার ওপরে নীল প্রজাপতি ওড়ে!

বিস্মৃতি

ভেতরে যে ধ্বংসস্তূপ, তুমি তার পাশে বসে থাকো।
খেলো, ভাঙা ইটপাথরের টুকরো কিছু নিয়ে।
কবে সে অতীত ছিল
ছিল যে উৎসব কত, রঙিন পতাকা ছিল....
চন্দনের আসবাব যত্ন করে মোছা হত ভোরে।

ভেতরের ধ্বংসস্তূপ, ঝুলকালি, আধো-অন্ধকারে
সে আজ কীভাবে বলো তার তাপ তোমাকে চেনাবে!
তার চেয়ে, ফিরে যাও, ঘোড়ার গাড়িটি চেপে ....
সহিসের ঘরে।

খড়ের বিছানা তার, তবুও সে পরিশ্রমী হাতে
যখন তোমার চোখ থেকে চশমার কাচ খুলে দেবে—
ভুলে যাবে তুমি দুপুরে হঠাৎ দেখা এই ইতিহাস।
সমুদ্রতীরের গ্রামে তখন উঠবে বুঝি ঝড়....
এবং নামবেই অনিবার্য বৃষ্টিসজল,
যদিও দুপুর জুড়ে রোদের প্রতিটি কণা ছিল কী প্রখর!

দুটি কবিতা

নিখিলেশ রায়

আবরণ

তাই এই বর্ম আবরণ
এমনকি সে নিজেকে শাঁসে শাঁসে বাড়িয়ে নিয়েছে
করুণ ত্বকের কাছে দ্রাব্যতায় ঈষৎও গলেনি

চারদিকে এত ভীড়, অসত্য কথার কালি
অগোছালো পুস্তানি জুড়ে ....

এই আমি মাটিতে বসেছি
এতদূর নেমে এসে কার সাধ্য আমাকে যে ছোঁবে!

বাগিচা গাথা

তিথিহীন রাতগুলো ভারি হয়ে আসে, যাবতীয় পদছাপ শীতের সদৃশ
আদিকাণ্ডে রাম ছিল, ছিটেফোঁটা অযোধ্যাও ছিল
প্রতিটি গাঁয়েই ছিল শুশ্রূষার মত নদীজল, আজ আর
কুয়াশার মতো হাতে খুব বেশি অতীত ধরে না

ঝরেছে মুকুলগুলি, ঝরেছে কুঁড়িটি
প্রচুর বরিষে, স্রোতে যে সকল মাটি ধুয়ে যায়
আজ তাতে নিষ্করুণ কাকতাড়ুয়ার পেঁজা ক্ষেত
হাত থেকে ধনুক খুলেছে, খসে পড়ছে যৎসামান্য তীর...

দুটি কবিতা
কৌশিক চক্রবর্তী

উদাসীনের অক্ষরমালা

এই মাঠে কাল রাতে লেখা হয়েছে ইচ্ছে পড়ার লিপি—এখন তাই রোদ ও বাতাস, তীব্র জীবনকামনার মতন এই এক সুর, যে গান কোনোদিনই গুনগুন করবার নয়, মোমের রঙিন ছবির ছাপ পড়ে যাচ্ছে শরীরে শরীরে, সেখানে নুড়িপাথরের নীচে লুকোনো প্রাচীন পুঁথিটিতে রয়েছে বিস্তারিত আকাঙ্ক্ষার অনর্গল গুপ্তমন্ত্র। জড়ো করে এনেছি তাই সমস্ত দৃষ্টিপথ—যা যা দিয়ে সন্ধ্যার কালপুরুষ দেখা যায়। এই এক সৌন্দর্য, আজকাল সুন্দর নিশ্চিতভাবে দেখাই হয়না—

চিঠির অক্ষরমালা ছিঁড়ে ছিঁড়ে তাই রেখে দিচ্ছি ডায়েরির ভাঁজে, যেভাবে মানুষ প্রিয় অথচ মৃত আয়না বাঁধিয়ে রাখে বসবার ঘরে নরম সোফার পাশে; যদিও জানি এভাবে নিজের প্রতিশ্রুত ছায়াকে ঘড়ি দিয়ে আটকানো যায় না—

এই কারণেই হয়তো, ইন্দ্রজাল শব্দটির গুরুত্ব আজও প্রাসঙ্গিক....

নির্জন দ্বীপান্তর

রূপকথা ভুলে যাওয়া গল্পেরা ক্রমশ
মিথজন্মের দৈর্ঘ্যের খোলস ছাড়িয়ে
পাতাবাহারের টবের পাশে
নামিয়ে রাখতে চায় শূন্যতা নামক এক
গভীরতর ছায়া।
চারিদিকে অলীক অন্ধকার, এইভাবে
অনুসন্ধান শেষ হয় নাকি!
ঈষৎ মেঘলা আকাশ, পেণ্ডুলামের মধ্যে
টাল খাওয়া কমিক্স ও কবিতার বই
যে যাই বলুক, স্বপ্নভঙ্গের পর কখনো কি
মনে হয় অতীতের ভাষা নেই কোনো?
কীরকম ঠুনকো ও সহজলভ্য এই ঝড়ের সামনে

দরজার ঘুম গ্রন্থাগার।
কেবল নৈঃশব্দজড়িত প্রস্তরীভূত গল্পেরা
নিতান্ত অ্যান্টিক্লাইম্যাক্সে বলে চলেছে :
সাবধান, খুব জোর বৃষ্টি হতে পারে ....

দুটি কবিতা
অনামিকা বন্দ্যোপাধ্যায়

ভেদ ও অন্যান্য কবিতাগুচ্ছ

১
আমারই কেন কোনো নেই
আভরণ
চাঁদের মতো কোনো মুখশ্রী
চুরি হতে হতে সমস্ত সকাল....
সন্ধ্যা নাকি সাঁঝবেলা
একটু একটু করে ক্ষইতে থাকে সমার্থক
চোদ্দো কলার মতো ক্ষয়ে ক্ষতে
অন্ধকার
এ শব্দের নাম—শূন্যতা
একি অন্ধকার? না আঁধার
আলো কি উজ্জ্বল?

আবারও চোদ্দোদিন,
চাঁদের গায়ে চাঁদ;
রূপবতী চতুর্দশী
একি চাঁদ না চাঁদের ছায়া

যে ডুবে গেলো,
তাকে ফেরাবে কোন্ নামে?

২
গোপনে বলার কিছু নেই
কিছুছু রাখা নেই সংগোপনে

কোথাও কিছ্ছু জমিয়ে রাখা নেই
জীবন-বীমার মতন এককোণে তবু
সযত্নে তুলেছো দুই হাত।

কোথাও কিছ্ছু আবরিত নেই
ঘুমের ভেতর চম্‌কে ওঠা;—
আয়নায় স্পষ্ট হয় স্তন, মাংস, কঙ্কাল...
একার কোনো অবকাশ নেই
একার যেই, মাথার ভিতর
ভিড় করে আসে টোল-ফ্রি নম্বর

বিরহেরা মৃত হলে সচল জিভ
একটানা বলে চলে—
হ্যালো! টেলিভিশন লাইভ?

৩

তুমি ভেদ করো
খাই—
পাতা পেড়ে বসে
দুটি সুখ।

তুমি রাশ ধরো
যেন সবাই
ভ্রূণ ভেবে নিয়ে আসে—
আগুন।

তুমি ঘৃণা করো
বলে তাই
বিষ ফল ধরেছি
এই বুকে—
ওষধি বৃক্ষের মত তবে প্রেম
ভিন্ন করে এযাবৎ যত শরীর—
বেরিয়ে এসো বৎসরান্তে।

মঙ্গল-কাব্য

"যে বালক কখনও শস্যদানা দেখনি, এমনকি বীজ—তাকে।"

কর্ষণে জন্ম
আগুনে নিবৃত্তি।
বিক্রি করেছি আপন মাকে
তার বুকে শুয়ে কোন পিতৃহৃদয়ের সন্ধান
পিতা আমার আদৌ ছিল কি
কাকে তবে—
পিতৃপুরুষ—পিতৃহৃদয়?

হৃদয়বান পিতা আমার
তার বুকে উলম্ব দাঁড়িয়েছিল মা
প্রেতিনী মা আমার
পিতা আমার পাশ ফিরে শুল
মা ভূ-পতিতা

মাটি ভিজে যায় এতো রজঃ
সেই নরম মাটি ভেদ করে
আমি উদ্ভিদ হয়ে মাথা তুলেছি
দাঁড়ালেই টের পাই—
শিরদাঁড়া জুড়ে রসের উৎস্রোত
সেই রসই মাতৃদুগ্ধের মত
মুখে তোর—
আগুনে জন্ম
কর্ষণে নিবৃত্তি
প্রিয় সন্তান,
আপদে বিপদে মোর দুধেভাতে থাক্।

দুটি কবিতা
সঞ্জয় কুমার দত্ত

প্রান্তিক চাষীর গল্প

অঘ্রানের মাঠভরা ধানঢেউ থেকে ছুটে আসে হাহাকার
আমি-হাহাকার থেকে তুমি-হাহাকার
তুমি-হাহাকার থেকে তারা-হাহাকার
আমি বলে থাকি মাঠ ছুঁয়ে আগাবেলা পিছাবেলা।

আমি বলে থাকি আবাদের প্রান্ত ছুঁয়ে হাজার বছর।
রমেল বর্মন ইরি লাগাবে না এবছর, দম নেই, ঘরে পাঁচ পোষ্য, তিনবিঘা
ধানী ভিটা নেই, সারের তেলের দাম ফিবছর বাড়ে, তারপর ঝরাখরা আছে।
কোনদিকে যাবো, সব দিকেই মরণ কৃষকের। গত দশ বছরে ধানের দাম
পায়নি প্রান্তিক চাষী, আর সব দশগুণ হয়েছে বাজারে,
আবাদে কেবল ক্ষতি, জমি বেচে এবার বাঁচবে পেট.....এইসব
বলে যায় রমেন বর্মন, আমি থেমে থাকি।

আমার ভায়ের মুখ মনে পড়ে, তার ভেঙ্গে যাওয়া গাল, অসহায় চোখ
মনে পড়ে—কাককে এখন আর নিমন্ত্রণ করিনা নবান্নে,
খুব অবসন্ন লাগে সারাদিন....মহাজনের দেনা এখনো মেটেনি,
কিভাবে চলবে.....আমার ভায়ের কথা মনে পড়ে....
মনে পড়ে এই গ্রামবাংলায় কৃষকের আত্মহত্যা নিয়ে প্রতিদিন ঘরে ঘরে
মিডিয়া উত্তাল।

গরম গ্রহ

গ্যাসের বিষে তেলের বিষে বুক-বাতাস পোড়ে
খুলির থেকে পায়ের তলা তেতে উঠল গ্রহ
ধোঁয়ার গ্রহ গরম গ্রহ পাপের ইতিহাস।

আমিই সব আমার সব আমিই সর্বময়
আর যা কিছু গাছ অথবা অবোধ প্রাণীদল
আমার কাজে লাগবে শুধু আমার অন্ধলোভে
যা কিছু সবুজ জ্বালানি হবে শিল্পবিপ্লবে

নদীর বুকে গরম তেলে লাফিয়ে ওঠে মাছ
বাদামী দাড়ি ছত্রাকেরা বিকোয় চিৎকার
কফের মতো কুয়াশা ভারী ধোঁয়ানগর জাগে
বাদামী দাড়ি ছত্রাকেরা বিকোয় চিৎকার

মহানগরে আজব আমি কাউকে চিনিনা
যে ভাই ছিল পাগলখানায় একলা শুয়ে থাকে
কফের জ্বর বাতাস জুড়ে গায়ে নরক তেল
ধূসর ভিড় যতই বাড়ে ততই একা লাগে....

গ্যাসের বিষে তেলের বিষে বুক-বাতাস পোড়ে
খুলির থেকে পায়ের তলা তেতে উঠল গ্রহ
ধোঁয়ার গ্রহ গরম গ্রহ পাপের ইতিহাস।

দুটি কবিতা

অসিত দাস

আমি লোকাধিকার বলছি

আবু ঘ্রাইবের নিভৃত অন্তরালে ইরাকি যুদ্ধবন্দীদের
সদ্যনির্মিত যৌন পিরামিডের ওপর থেকে বলছি
অনিঃশেষ কার্পেট বম্বিংএ ভেঙে গুঁড়িয়ে যাওয়া
ব্যাবিলনের শূন্যোদ্যান থেকে আমি বলছি
গুয়ান্তানামো বে-র বন্দিশিবিরের সারমেয় উল্লাস ছাপিয়ে,
ব্রেডবাস্কেট পীড়নকেন্দ্রের অসামরিক নির্যাতন ছাপিয়ে
আমি পৌঁছে দিতে চাইছি আমার কণ্ঠস্বর...
অথচ তোমরা কেউই আমার কথা শুনতে পাচ্ছো না
আমার হৃদয়ের লেলিহান অগ্নিশিখা তোমাদের কারও গায়েই
দিতে পারছে না সামান্যতম মরু-আঁচ, অপারেশন ডেজার্টস্টর্মের
সময় সেই যে আমি পিষে গেলাম বালিতে
তারপর থেকে কেউই আমার গলার স্বর শুনতে পাচ্ছে না
ওদের সাঁজোয়া বুটের নীচে, ওদের ক্লাস্টার বোমার নীচে
আমার নিরাকার শরীরটা ব্যথায় কুঁকড়ে নীল হয়ে যাচ্ছে—
আমি 'লোকাধিকার' বলছি, বলার চেষ্টা করছি অন্তত
তোমরা আমার যন্ত্রণার অবসান ঘটাও।

গ্রামীণ

ইতিউতি রমণীরা নামে
স্তনভারে অবনত ঘাট
পদানত বাসনের পাশে
মাজাঘসা গোড়ালির ঠাট।
অতএব হাঁস কী-ই বা করে
ডুব দিয়ে গেঁড়ি তোলা ছাড়া
দুপুরের বেলা বড় বাঁজা
নিঃঝুম শুনসান পাড়া।

দুটি কবিতা
সেলিম মল্লিক

রহস্য

নিজেই নিজেকে চিনতে পারি না ভালো
মুখের উপর অচেনা রঙের আস্ত ছায়া
ছায়াটা কিসের তাও বোঝা যায় না
নিজের দিকে তাকিয়ে এখন আমার
খুব দুঃখ হয়
দুঃখের রঙ লেগে আরো জমাট বাঁধে ছায়ার রঙ
আরো অচেনা লাগে নিজেকে
এইভাবে এক অচিন দৃশ্যের দিকে তাকিয়ে থেকে
আমার দিন ফুরিয়ে সন্ধে আসে
সান্ধ্যআড্ডার
কথাবার্তায় অংশ নিই
কথার ডালপালার ভিতর
খুঁজে বেড়াই ছায়ার উৎস
দিনের পর দিন জীবন
এক আধিভৌতিক বাড়ি

স্মৃতি

চোখের মণি খুঁজতে খুঁজতে
অনেকদিন আগের পুরোনো এক রাত্রির কাছে
সেই ছড়াটা শুনতে চাইলাম—
চাঁদ উঠেছে ফুল ফুটেছে
কিন্তু রাত্রি কোনোমতেই আমাকে চিনতে পারল না
এতদিনে আমাকে ভুলে গেছে আমার ছেলেবেলার অন্ধকার
এখন কী হবে উপায়
এখান থেকে কীভাবে ফিরে যাব
গাছের ডাল ভেঙে
পথ ঠাহর করে একটু একটু হাঁটছি

মনে হলো ভাঙা ডালে একটা ফুল
ফুলকে বললাম, চাঁদ এখন কেমন দেখতে হয়েছে?
সে গন্ধ ভাসিয়ে শোনাতে লাগলো
বসন্তের মাতাল হাওয়ায় জ্যোৎস্নার—
বনে আসা লোকজনদের গল্প
নিশিতে পাওয়া অচেনা মানুষদের কথা শুনতে শুনতে
আমি তার হাত ধরে ফিরতে চাইছি নিজের কাছে

দুটি কবিতা
মানসকুমার চিনি

সুরবাঁশি

কৃষ্ণচূড়া—রাধাচূড়ার পাশে তোমার
ঘুমন্ত গ্রাম জেগে উঠছে, চোখে চোখ
রেখে বলি কে আছে তোমার?

যত কাছে আসো, ভাঙো জলস্নান
অন্তরে পাক খাওয়া ভুল বোঝাবুঝি
দুঃখগান স্বপ্ন মুছে ওঠো

আমি সেই সুর বাঁশি যে প্রতিটি
রাধার ঘুমে শোক হয়ে জেগে থাকি।

গর্ভ

রাতজাগা লেখাগুলো তোমার দিকে তাকিয়ে আছে
দূরে কোথাও নিস্তব্ধ আলো
পথ জুড়ে লুকিয়ে রেখেছে বিস্ময়
গোধূলিতে চেনা যায় সম্পর্কের রঙ!
সে সময় কবিতা যেন
গর্ভজাত ভাঙা স্মৃতি, সভ্যতা
কাগজে ঝলসানো একটা জীবন।

দুটি কবিতা
তুষার ভট্টাচার্য

আঙুল তুলে

এখন যেভাবে কথা বলা দরকার
কেউ দুচোখ রাঙিয়ে, গলা বাজিয়ে কথা বললে
তাকে চীৎকার করে প্রতি উত্তর দেওয়া।
এখন যুগ পাল্টে গেছে, হাওয়া ভিন্নমুখী,
এতকাল যারা লোক ক্ষ্যাপানো কথা বলেছে মাঠে ময়দানে
স্তাবক করতালিগুলি যাদের দুইপায়ে পেন্নাম ঠুকেছে
তাদেরও বুঝিয়ে দেওয়া দরকার—
এখন আমাদেরই আঙুল তুলে কথা বলার দিন।

কাঁটাগাছ

হীরক খচিত সিংহাসনে বসে থাকা কতটা নিরাপদ?
এখন পায়ের তলায় বেড়ে উঠছে কয়েকটা কাঁটাগাছ!

ক বি তা ব লি

সম্ভাবনার ঢেউ

আনন্দ ঘোষ হাজরা

সম্ভাবনার ঢেউ ছড়িয়ে জানালে তুমি সারাবিশ্বে ছড়িয়ে গিয়েছ
গায়ে হিমস্পর্শ পাই তরঙ্গের, স্নায়ুতন্ত্রী কাঁপে
তাহলে এখানে নেই, কোথা আছো, কোন সমুদ্রের পরপারে?
অথবা গ্রহান্তরে, নক্ষত্রমণ্ডল জুড়ে, কোনো এক রহস্যবিন্দুতে!

বন্ধ করো চোখ, তুমি তাকিয়ে দেখো না
আমি কি দর্শনযোগ্য? আমি শুধু নৃত্যের ভঙ্গিমা;
উর্মিমালা, ধাবমান প্রবাহচঞ্চল অস্থিরতা
ছুঁয়ে যাই শ্যামলিমা, গ্রহদল, নীলাকাশ, সিন্ধু কলরোল
ছুঁয়ে যাই সময়কম্পন, ছুঁই দহনবেলার হাহাকার
তোমার শরীর ঘূর্ণি, সত্তার ক্রন্দন—
ব্যাপ্তি প্রসারতা ছুঁই, অমোঘরোদন;
যে তাকায় কৌতূহলে অথবা স্পর্ধায়
আমি তার কাছে স্থির চলচ্ছক্তিহীন, যেন জড়।

সম্ভাবনার ঢেউ ছড়িয়ে জানালে তুমি আলো হয়ে
নেচে চলে গেছ....
এইবার বন্ধ করি চোখ।

যেটা অবধারিত ছিল

যশোধরা রায়চৌধুরী

জাল আর ফাঁদের ভিতর দিয়ে পিছলে সরে যায়
জটিল, অদ্ভুত একটা পথ
আমাদের ব্যর্থ মনোরথ।

কোথাও পরিষ্কার করে
ঠিকানাও লেখা নেই, মানচিত্র স্পষ্ট নয় খুব
দিন রাত্রি ছেনাল, অসৎ
আমাদের ব্যর্থ মনোরথ।

কোনখানে পাওয়া যাবে মাথার ছাউনি ও মহব্বৎ
কোন দিকে পাওয়া যাবে নির্জনের শান্ত তরিবত
কে আমাকে মায়া দেবে, সুনিবিড় মহৎ বৃহৎ
ইত্যাকার ত-ভাগান্ত, থ-ভাগান্ত যাবতীয় শব্দের সঙ্গত

আমাদের ব্যর্থ মনোরথ
    আমাদের ব্যর্থ মনোরথ
        আমাদের ব্যর্থ মনোরথ
            আমাদের ব্যর্থ মনোরথ।

দহন

সুবীর ঘোষ

এই তো দহন, গৃহী,
মধ্যবিত্তের সংসারে
বুকশেলফের পেছনে লুকোনো বিনা রোগের ওষুধ।

সারাদিন রোদ ছিল আজ;
শতাব্দী-প্রাচীন কাক
খাদ্যের অপচয় গ্রাফে আঁকবে বলে
এসে বসেছে অ্যানটেনার ওপর।

একবুক গলাজ্বালা নিয়ে ঘরে পড়ে আছি
কর্মক্ষেত্রে সহকর্মী সন্দেহের দাঁড়ি মেরে
নিপুণ খবরকাগজওয়ালার মতো
তুলে ধরে নিষিদ্ধ করাঙ্গুলি।

এই তো দহন, গৃহী,
সোফায় মাথা রাখতে না রাখতেই
হৃদরোগের মত ছেঁকে ধরে মশা।

এখানেই শেষ নয়

অরিন্দম মণ্ডল

এখানেই শেষ নয়—
আরো কত কিছু আছে—কত কিছু হবে!
শুনে রাখো, পৃথিবীর অযুত গর্ভ;
আর, তুমি কি ভেবেছো,
পৃথিবীর গর্ভপাত হবে?

ঝুম্‌ঝুম্‌ ঝুম্‌ঝুম্‌ ঝুম্‌ঝুম্‌
ঝুম।—
মাটিতে কান পেতেছ কখনো
গভীর নিশীথে?

আত্মহনন

শিবাংশু মুখোপাধ্যায়

এক অসংবদ্ধ আঁধারে
জান কবুল করল সে
দেখতেও চাইল না আগুনেরও কত সহস্র লালচে রঙ
কত গাঢ়, কত শৌখিন সেই আগুন

আর আর কেউ গোঁফ ছাঁটলো না
সিটি দিল না দু আঙুল জিভে
লালার গরমে পুড়ে গেল হাত—ধোঁয়ায় জ্বলতে থাকা চোখ
অসংখ্য হৃদপিণ্ডের শব্দে বধির হল মেঘ

জান কবুল করল সে
জান কবুল করল

এভাবে কতবার

প্রফুল্ল পাল

এবার সমস্ত খবরকাগজ থেকে নিয়ে আসবো বানানো শিল্পকথা
কোনো এক নির্জনতায় নিয়ে যাবো তোমার চোখের ভাষা
যেখানে থাকবে আস্ত একটা নদী, নরমত্বকচর্চার গোধূলি,
সুন্দর বলতে ফেলে দেওয়া চিঠির বিবর্ণতায় খুঁজে নেব
যতসব টুকরো অভিপ্রায় আর শিরায় শিরায় জ্বলে ওঠা,
এভাবে কতবার আর তোমার কাছে আসবে যুদ্ধবিধ্বস্ত দিনগুলি
অলংকার শিল্পের গলা জড়িয়ে যে চাঁদ ক্ষয়ে যাবে অতঃপর
তার সেই চিরাচরিত কলঙ্ক থেকে উড়ে যাবে আমাদের স্কুলবাড়ির ছাদ।
ভয় পেলেও একশতাব্দী পরে আবার আমরা ক্ষমতাভাবনায় ডুবে যাব
একা থাকার চেয়ে একাকী হওয়ার মধ্যে খুঁজে নেব জলপড়ার শব্দ
সরলচাষার হাতধরে এখনও বলব তোমাদের মুক্তি নেই কোথাও
চাষার পদাবলি কার্বনধোঁয়ায় মিসাইল হয়ে যাচ্ছে এই যা।
মাটির গন্ধে যারা ঘুমুতে গেছে কলঙ্কিত চাঁদের আলোয়
তাদের হাত ধরে বলব অনেক খবরকাগজে তোমাদের কথা নেই।

অন্ধকার গেঁথে গেঁথে আমিই সেদিন...

হরিসাধন চন্দ্র

বলেছি অনেকদিন ওকে
'এইসব কুচো প্যারাফিন
কোথাও জমিয়ে রাখ্,
মোমবাতি বানান দেখিস্।'

মোমবাতি আশা দিয়ে ভরা
গোলাপি গ্যাসবেলুন নিয়ে
কত যে লোডশেডিং পুরেছে পকেটে
হই হই করে!

কিন্তু একদিন
গ্যাস কমে বেলুন চুপ্‌সে গেলে,
হঠাৎ খেয়াল হলে
যদি বলে ওঠে,
'অন্ধকারে পকেট বোঝাই হয়ে গেল,
আর কবে মোমবাতি...'
সেদিন প্লাস্টার খসা বুকে
আমিই হয়তো
পেঁপেডাল আর
কুচো কুচো প্যারাফিন হাতে নিয়ে
কাকুতি-মিনতি করে যাব
'আমাকেই একখানা মোমবাতি তুই...
এতদিন চারদিকে অন্ধকার গেঁথে....'

রাজনৈতিক উপাখ্যান

এ তো বড় রঙ্গ, জাদু

তপন বন্দ্যোপাধ্যায়

অশ্লেষা না মঘা ঠিক কোন কুক্ষণে লাইনের বাসে না উঠে একটা ট্রাকের সামনে উঠে বসেছিল তা অনেক ভেবেও কূল করতে পারেনি বিপ্লব। ট্রাকে উঠলে বিনি পয়সায় গন্তব্যে পৌঁছোনো যাবে এমন একটা লোলুপ মনোভাব থেকে তার দুর্ভাগ্যের শুরু। ট্রাকের ড্রাইভার তার চেনা হওয়ায় এক হাতে স্টিয়ারিং অন্য হাত গাড়ির বাইরে বাড়িয়ে 'যাবেন নাকি বিপ্লবদা?' শুনে লোভ চাপতে পারেনি আর। সামনে এক খালাসি বসে খৈনি ডলছিল, তাকে উঠতে দেখে তাড়াতাড়ি খৈনির দলা গলায় চালান করে দিয়ে সরে বসে তাকে জানলার ধারটাই অফার করে। তখন হাওয়ায় খৈনির গন্ধ ছাপিয়ে হাওয়ার একটা মিষ্টি গন্ধ, যা বিপ্লবকে মাতিয়ে দিয়েছিল কিছুক্ষণের জন্য। লেভেল ক্রসিংটা পেরিয়ে আরও মিনিট পাঁচেক ট্রাকজার্নি করলে পৌঁছে যেত জেলাশহরের প্রান্তিক এলাকায় তাদের বাড়ির গলির সামনে, ঠিক তখন থেকেই বিপত্তির শুরু।

লেভেল ক্রসিঙের মুখে তাদের ট্রাক পৌঁছোনোর ঠিক তিরিশ সেকেন্ড আগে হুড়পাড় করে নেমে এল লেভেল ক্রসিঙের ঝাঁপ। পরে বিপ্লবের মনে হয়েছিল ওটা লেভেল ক্রসিঙের ঝাঁপ নয়, গিলোটিন।

বোধহয় পাঁচটা চল্লিশের ডাউন আসছে এরকম ভাবতে ভাবতে ট্রাকের দরজা খুলে মাটিতে লাফ দিয়ে নামে সে, লেভেল ক্রসিঙের ঝাঁপে বুক ঠেকিয়ে মাথাটা ঝুঁকিয়ে দেখছিল লাল রক্তচক্ষুটা নিভে গিয়ে সবুজ জোনাকিটা জ্বলতে কত দেরি, অর্থাৎ কিনা স্টেশন থেকে ট্রেনটা ছাড়তে কত দেরি। কিন্তু লালচেটো লালই থাকে, সবুজ হওয়ার বিন্দুমাত্র গরজ নেই, ঠিক সে সময় পিছন থেকে একটা গর্জন ভেসে এল বিপ্লবের কানে, শালা বোকা—, গাড়িটা সরা!

বিপ্লব যে-ট্রাকে চড়ে এতটা পথ এসেছে সেই গাড়ির চালক পচন গামছাটা বার করে তার ঘাড়-গলা মুছছিল, হঠাৎ এক-আঁজলা খিস্তি শুনে জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে দেখল পিছন দিকে। তার ট্রাকটা লেভেল ক্রসিঙের একেবারে সামনে দাঁড়িয়ে, তার ঠিক পর-পরই আরও তিন-চারটে ট্রাক তার পিছনে সার দিয়ে দাঁড়ানো, কেউ কেউ

ইঞ্জিন থামিয়ে অপেক্ষা করছে লাল আলো সবুজবর্ণ ধারণ করার জন্য, আবার কারও ইঞ্জিন গর্জন করেই চলেছে এভাবে লেভেল ক্রসিঙের ঝাঁপ ফেলে অপেক্ষা করানোর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতেই বোধহয়। খিস্তিটা কার উদ্দেশে ছোঁড়া হচ্ছে তা পচন বুঝতে না পেরে ঘাড়সুদ্ধ গলাটা আবার ট্রাকের স্টিয়ারিঙের সামনে নিয়ে গিয়ে পুনর্ব্যবহার করতে শুরু করে নোংরা গামছাটার।

বিপ্লব অবশ্য বুঝতে পেরেছিল খিস্তিটা কার উদ্দেশে ধাবিত। একটা সাদা অ্যামবাসাডার, তার মাথায় একটা লাল আলো দপদপ করছে, তারই সামনের সিট থেকে কেউ একজন মাথা গলিয়ে ছুঁড়েছে খিস্তিটা। ট্রাকের ড্রাইভার বা খালাসিদের সারাক্ষণ খিস্তি করা বা শোনা ডালভাত খাওয়ার মতো সরলসোজা ব্যাপার। আসলে খিস্তি হল তাদের কাছে বাক্যের মধ্যে অব্যয়, উপসর্গ বা প্রত্যয় ব্যবহার করার মতো কয়েকটি শব্দ, যা বারবার ব্যবহার করলে তাদের বাক্যগঠনে একটা অন্য ঝংকারের সৃষ্টি হয়। গাড়ি চালানোর সময় বিপরীত দিক দিয়ে ছুটে আসা গাড়ির বেচাল ড্রাইভারদের উদ্দেশে খিস্তি পরিবেশন তাদের অন্যতম প্যাশন। কিংবা তাদের চালানোয় বেচাল দেখলে বিপরীত দিকের বা তাদের ওভারটেক করতে থাকা ড্রাইভারদের মুখ থেকেও এরকম অব্যয় বা ক্রিয়ার বিশেষণ ধাবিত হয় তাতেও তারা অভ্যস্ত।

বিপ্লব সেদিক থেকে মুখ ফিরিয়ে আবার তাকাচ্ছিল রেললাইনের ওদিকে রক্তচক্ষুটির দিকে। এখনও ডাউন ট্রেন এসে পৌঁছোয়নি স্টেশনে, কখন আসবে তারও নিশ্চয়তা নেই, অথচ এত আগে থেকে লেভেল ক্রসিঙের ঝাঁপ ফেলে দেওয়ায় গাড়িগুলোর কী ভোগান্তি। লেভেল ক্রসিঙের গেটম্যান তার চাকরি সুরক্ষিত করতে নির্দিষ্ট সময়ের বহু আগে গেট ফেলে দিয়ে নিযুক্ত হয়েছে তার অন্যান্য কাজে। তাতে সাধারণ পথচারী দিব্যি ঝাঁপের বাধার নীচে দিয়ে হামাগুড়ি প্র্যাকটিস করতে করতে গলে পার হয়ে যাচ্ছে ওপারে। সাইকেল আর বাইকগুলোও একহাতে তাদের বহনের ঝুঁটি চেপে ধরে, অন্যহাতে অ্যাটলাসের মতো ঝাঁপটি স্যাটাস্যাট তুলে পার হচ্ছে রেললাইন। কে আর নিষেধাজ্ঞা মানছে! শুধু বড় গাড়িগুলোরই যা মরণ!

একটু পরেই অ্যামবাসাডারের ভিতর থেকে আরও একগুচ্ছ খিস্তি বান্ডিল হয়ে ঝরে পড়ল ট্রাকগুলোর উদ্দেশে। দু-রকম স্বরে দু-ধরনের খিস্তি। কিন্তু সেই দ্বৈত আক্রমণ খিস্তিতেই সীমাবদ্ধ থাকল না আর, বিপ্লব হঠাৎ তার চোখ ব্রহ্মতালুতে তুলে দেখল দু-জন পুলিশের উর্দি-পরা লোক হাতে লাঠি নিয়ে বেরিয়ে এল গাড়িটার ভিতর থেকে। চোখমুখ তৈমুর লঙের কায়দায় স্ফুলিঙ্গ ছড়াচ্ছে প্রতি মুহূর্তে। বিপ্লব শঙ্কিত হয়ে লক্ষ্য করে তাদের লক্ষ্য পচনের ট্রাকই।

পচন এতক্ষণে শঙ্কিত হয়, বলে, কী বইলছেন কী আপনেরা? আপনেদের গাড়ি কি গেটের উপর দেউড়ে পার হইয়ে যাবে? পাখা লাগাইছেন নাকি গাড়িতে?

বিপ্লব চোখ গোল-গোল করে বলল, কী রগড় রে, পচন! পুলিশবাবুরো রঙ্গ দেখাইবে নাকি?

পাশ থেকে এরকম ফোড়ন কাটা শুনে আরও চুরচুরিয়ে উঠল উর্দি-পরা, কী বললি শালা, রঙ্গ করছি? দাঁড়া তবে তোর মজা দেখাচ্ছি।

তখন সন্ধে হয়ে এসেছে, গোধূলি আলোরও শেষ পর্ব, তাতে রেললাইনের ওপাশে রক্তচক্ষু আরও ভীষণদর্শন। লাঠিয়াল দুই বীরপুরুষের চোখও জ্বলছে জোড়া লাল আলো হয়ে। তাদের মুখ থেকে খিস্তির স্রোতও আড়ে ও বহরে এমনই ক্রমবর্ধমান যে তারা অবয়ব ধারণ করতে পারলে নিশ্চিত ধরাশায়ী হত পচন ও তার ট্রাক। দুই লাঠিয়ালের একজন পচনের জানলার কাছে গিয়ে তীব্রস্বরে চেঁচিয়ে বলল, শালা, বোকা—তোকে কখন থেকে ট্রাকটা সরাতে বলছি, কানে যাচ্ছে না, শালা, হারামজাদা, ট্রাকটা এমন পোঁদ বেঁকিয়ে রেখেছিস যে আমার সাহেব গাড়ির মধ্যে স্ট্যান্ডেড হয়ে গেল। সরা তোর ট্রাক। আমরা আগে পার হয়ে যাই—

বিপ্লব মুখ খিঁচিয়ে বলল, বাবুরো কি মুখ দে কথা বলছেন, না পোঙা দে কথা বলছেন? এমন খিস্তি করছেন কেন?

দুই উর্দি তখন আরও ভয়ংকর হয়ে উঠে বলল, শালারা রাস্তা জুড়ে ট্রাক রাখবে, আবার বড় বড় কথা! সরা শালা ট্রাক—

পচন বিষয়টা বোঝেনি এতক্ষণ, ঘাড় ফিরিয়ে দেখল তার ট্রাকটা এমন তেরচা ভঙ্গিতে দাঁড় করানো যাতে পিছনের কোনও গাড়ি তাকে অতিক্রম করতে না পারে। এরকমই রাখে তারা লেভেল ক্রসিঙে ঝাঁপ ফেলা থাকলে। পিছনের গাড়ি এমনিতে তাকে ওভারটেক করতে পারবে না, কিন্তু যেই লেভেল ক্রসিঙের ঝাঁপ উঠবে, অমনি তার পিছনের সবাই একযোগে হুড়মুড়িয়ে পার হতে চাইবে রেললাইন, একই সঙ্গে ওদিকের গাড়িও পার হতে চাইবে এদিকে। ট্রেন চলে যাওয়ার পরের মুহূর্তটিই খুব গুরুত্বপূর্ণ গাড়ির ড্রাইভারদের কাছে, তাই পচনের এ হেন ট্রাক রাখার কায়দা।

কিন্তু তার কায়দা যে অ্যামবাসাডারের মালিকের এতটা গাত্রদাহের কারণ হবে তা পচন বোঝেনি, বোঝেও না ট্রাক ড্রাইভাররা কেন না হাইওয়েতে ট্রাক ড্রাইভারদের প্রতাপের কাছে অ্যামবাসাডার বা ছোট গাড়ির ড্রাইভাররা প্রায় কেঁচো। শহরে ঢোকার মুখেই বা তার ব্যতিক্রম হবে কেন!

আসলে পচন গভীর মনোযোগে লক্ষ্য করছিল দূরে রেললাইনের লালচক্ষু কতক্ষণে তাদের ধমক দেওয়া বন্ধ করবে, কিন্তু যা লক্ষ্য করেনি তা হল অ্যামবাসাডারের উপরে দপদপ করে জ্বলছে একটি লাল আলোর বাতি। এই লালটাই তো আরও মারাত্মক।

লালবাতির চক্ষু সত্ত্বেও বিপ্লবের খুব খারাপ লাগছিল দুই লাঠিয়ালের খিস্তির বহর দেখে। লাঠিয়ালরা নিশ্চয় ভাল লাঠি চালাতে জানে, কিন্তু তারা যে খিস্তির ক্লাসেও পাঠ নিয়েছে তা এত গভীরভাবে জানেনি কখনও। বিপ্লব নিজে থেকেই প্রতিবাদ করে বলল, আপনারা এভাবে কথা বলছেন কেন? লেভেল ক্রসিং বন্ধ বলেই ট্রাকটা থেমেছে, আপনার গাড়ি তো আর ঝাঁপ তুলে চলে যেতে পারবে না। ট্রেন চলে গেলেই ট্রাক চলতে শুরু করবে।

—শালা, তুই দালালি করার কে? ঝাঁপ তুলে যেতে পারব কি না তা আমরা বুঝব। ট্রেন আসতে এখনও অনেক দেরি। গাড়িতে বড় সাহেব স্বয়ং বসে। ব্যাটা গেটম্যানকে বড় সাহেব হুকুম দিলে ঝাঁপ তোলার আর পথ পাবে না।

বলেই তাদের মোটামতো লাঠিয়ালটা লাঠি উঁচিয়ে পচনকে বলল, শালা, ট্রাক সরাবি কি না বল? বড় সাহেবের সময়ের কত দাম জানিস?

পচন পিছন ফিরে দেখছিল ট্রাকটা সরানো যাবে কি না। কিন্তু এর মধ্যে বহু গাড়ি, ট্রাক আর লাইনের বাস সারিবদ্ধভাবে দাঁড় করানোয় ট্রাকটা পিছোনোর কোনও উপায় নেই। সে ততক্ষণে বুঝেছে অ্যামবাসাডার গাড়িতে যিনি বসে আছেন তিনি পুলিশের কোনও কর্তাব্যক্তি হবেন। তাঁর চ্যালাচামুণ্ডারা চাইছে ট্রেন আসতে যখন দেরি আছে, তাদের কর্তাব্যক্তি লেভেল ক্রসিঙের ঝাঁপ তুলে ট্রেন আসার আগেই রেললাইন পার হয়ে যেতে। ব্যাপারটা ঘোরতর আইনবিরুদ্ধ, তা সত্ত্বেও পুলিশের কর্তাব্যক্তি চাইছেন বেআইনি করেই সময় সাশ্রয় করবেন এখন।

পচন এদিক-ওদিক তাকিয়েও যখন নিশ্চিত হল তার পক্ষে কোনও ক্রমেই ট্রাক সরানো সম্ভব নয়, আর চ্যালাচামুণ্ডারা তাকে ক্রমাগত উপহার দিয়ে চলেছে ট্রে-ভর্তি খিস্তি, তখন সে বাধ্য হয়ে বলে ওঠে, খিস্তি করছেন কেন ভদ্দরলোকের ছেলেরা? এই তো ট্রেন অসে পড়ল বলে। তারপরই সরিয়ে নোব গাড়ি।

—তবে শালা, বোকা—, বলে দুই লাঠিয়াল তাদের লাঠি উঁচিয়ে সপাটে ঘা মারল ট্রাকের সামনের কাচে। ঝকঝকে কাচ ভেঙে পড়ে ঝনঝন শব্দে। রাস্তায় কাচের গুঁড়ো ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকে খইয়ের মতো। পরক্ষণে আবার লাঠির ঘা। আবার কয়েক মুঠো খই। পচন চেঁচিয়ে ওঠে, কী করছেন আপনেরা? এটা কি মগের মুলুক?

—শালা, কার মুলুক তা এইবারে বোঝ। পরক্ষণে লাঠির ডগা সপাটে নেমে আসে পচনের মাথা লক্ষ্য করে। একজনের টার্গেট মিস করল তো অন্যজন ভালই লাগিয়েছে পচনের মাথায়। পচন আর্তনাদ করতে বিপ্লব আর নিজেকে স্থির রাখতে পারে না। 'কী করছেন কী আপনারা?' বলে লাফিয়ে এগিয়ে গিয়ে ওদের দুজনের লাঠি ধরে টানাটানি করতে থাকে। তার ফল যা হওয়ার তাই হয়। অতঃপর লাঠির টার্গেট দিকপরিবর্তন করে মরসুমি ঝড়ের মতো নেমে আসে বিপ্লবের মাথা লক্ষ্য করে। বিপ্লব বুঝতে পারে তার গায়ে-মাথায় দুই লাঠিয়ালের ঝড়বৃষ্টি। তার মাথায় ঠং ঠং করে লাঠির শব্দ হচ্ছে এ তার নিজের কানে শোনা। তার জ্ঞান লুপ্ত হতে খুবি বেশি দেরি হবে না সেরকমই মনে হচ্ছিল তার। অন্য গাড়ি থেকে ততক্ষণে আরও ড্রাইভার-খালাসিরা নেমে এসে মুখ গোল করে দেখছে ব্যাপারটা। কিন্তু পুলিশ দেখে কেউ টু-শব্দটি করছে না, তারই মধ্যে রেললাইন দাপিয়ে ট্রেনটার যাওয়া ও পরক্ষণে একরাশ ছোট গাড়ি, বাস, রিকশা ও ট্রাকের ইঞ্জিনের সম্মিলিত শব্দ, ও সেই শব্দ ছাপিয়ে লাঠির আওয়াজ সব শুনতে পাচ্ছিল—সব মিলিয়ে কিছুক্ষণের মধ্যে তার শরীরে প্রবল যন্ত্রণা।

মাটিতে লুটিয়ে পড়া তার শরীরটার দিকে তাকিয়ে তখন এক লাঠিয়াল বলছে, শালা মরে গেল না কি রে!

অন্য লাঠিয়াল বলছে, না না মরবে কি! ওই তো হাত-পা নাড়াচ্ছে। চল, বড় সাহেবের কাছে নিয়ে যাই।

বিপ্লব তার প্রায়-সংজ্ঞাহীন মগজ দিয়ে অনুভব করছিল দুই লাঠিয়াল তার শরীরটা চ্যাংদোলা করে নিয়ে চলল কোথাও। তার চোখ তখন ঝাপসা, মাথায় ঘোর, শরীরে যন্ত্রণা। তার শরীরে গণপিটুনির মতো নেমে আসছিল লাঠি, কিল, ঘুসি। কিন্তু তার অপমান বোধহয় লাঠি-কিল-ঘুসির চেয়ে ঢের যন্ত্রণার। সেই লাঞ্ছনার মধ্যে সে দেখে দুই লাঠিয়াল তাকে নিয়ে হাজির করেছে মারুতি জিপসির মধ্যে বসে-থাকা একজন কড়কড়ে ভাঁজভাঙা সাদা পোশাকের লোকের কাছে। তিনি বিপ্লবের প্রহারলাঞ্ছিত শরীরটা দেখে উল্লসিত হয়ে বললেন, শালাদের খুব বাড় বেড়েছে। বলে তিনিও বিপ্লবের শরীরে তাঁর বুটসুদ্ধ লাথি ও কয়েকটা ঘুসি প্রয়োগ করে গম্ভীরমুখে বললেন, ব্যাটাকে থানায় ঢুকিয়ে দিবি চল।

পরক্ষণেই বিপ্লবের জায়গা হল মারুতি। জিপসির পিছনের ফাঁকা পরিসরটিতে। সঙ্গে মালপত্র বা ছাগল বা ভেড়া থাকলে যেমন হত।

কিছুক্ষণ চলার পর মারুতিটা একটা থানা কম্পাউন্ডের মুখে দাঁড়িয়ে পড়ে, বিপ্লবের শরীরটা পিছন থেকে নামানো হয়, দুই লাঠিয়াল তাকে চ্যাংদোলা করে নিয়ে যায় কম্পাউন্ডের ভিতরে, সেখানে বিপ্লবের প্রায়-নিস্পন্দ শরীরটা নামিয়ে দিয়ে এক লাঠিয়াল বলল, মেজবাবু, কেসটা দেখবেন। বড় সাহেব পাঠিয়েছেন। ট্রাকের লোক। রাস্তায় বড় সাহেবের গাড়ি আটকে রেখে মাস্তানি দেখাচ্ছিল। এম ভি অ্যাক্টে একটা কেসে ঝুলিয়ে দিতে বলেছেন বড় সাহেব।

প্রবল গর্জন শুনিয়ে মারুতিটাকে থানা কম্পাউন্ড থেকে বেরিয়ে যেতে দেখল বিপ্লবের যন্ত্রণাক্রান্ত শরীর। থানার মেঝের ধুলোয় মাখামাখি হতে থাকে সে। মেজবাবু নামের উর্দিপরা লোকটি থানার অন্য কারও উদ্দেশে চেঁচিয়ে বললেন, অ্যাই কান্ত, এটাকে কাস্টডিতে ঢুকিয়ে দে। বড়বাবু থানায় এলে ব্যবস্থা নেওয়া যাবে।

বিপ্লব আরও কিছুক্ষণ পরে অনুভব করতে পারে আরও তীব্র হচ্ছে তার শরীরের যন্ত্রণা। একবার খিঁচুনিও ধরে গেল হাতে-পায়ে, তারপর হঠাৎ তার চোখে ঘনিয়ে এল অন্ধকার। তার খিঁচুনির রকম বোধহয় নজরে পড়ল থানার বাবুদের। একজন লোক চেঁচিয়ে বলল, মেজোবাবু, লোকটার ধরন ভাল ঠেকছে না। যা পিটুনি খেয়েছে, টেঁসে যেতে পারে। তখন কিন্তু আপনার-আমার ঘাড়েই দোষ পড়বে। বড় সাহেবের সিকিউরিটি কিন্তু পার পেয়ে যাবে সহজেই।

মেজোবাবু তার কথা উড়িয়ে দিয়ে বললেন, ট্রাকের ড্রাইভার তো। তোরা বলছিলি না লোকটা বলছিল রঙ্গ দেখানোর কথা। এখন নিজেই রঙ্গ দেখাচ্ছে। আসলে ঘাগু মাল। অত সহজে টেঁসবে না। ওরা খুব হার্ডি হয়। তুই চট করে একটা জিডি এন্ট্রি করে রাখ কেসটা।

—না মেজবাবু, কেসটা ভাল ঠেকেছে না। আপনি একবার চেয়ার থেকে উঠে এসে দেখে যান।

বিপ্লব তার চেতনা হারিয়ে ফেলছিল প্রায়। তার মধ্যেই অনুভব করল কেউ বা কারা তাকে একটা গাড়িতে তুলে পাঠিয়ে দিল হাসপাতালে। কেন না কিছুক্ষণ পরেই সে দেখতে পেল একজন স্টেথো-গলায় লোককে, যাকে ডাক্তার ছাড়া আর কিছু ভাবতে পারল না। তিনি তাকে পরীক্ষা করছিলেন, কিছুক্ষণ পরে বিড়বিড় করে কিছু বললেনও কাউকে। বিপ্লব তার হাতের তালুর উল্টোপিঠে সিরিঞ্জ ঢোকানোর ব্যথা পায়, বুঝতে পারে তাকে স্যালাইন দেওয়া হচ্ছে। একজন নার্স স্যালাইনের নলে পটাপট দু-তিনটে ইঞ্জেকশন পুশ করতে বিপ্লব পুরোপুরি চোখ মেলে তাকাতে পারে। অতঃপর তার বুকে ও কানের পিছনদিকে যন্ত্রণা হচ্ছে বলায় ডাক্তার চাইছিলেন তার শরীরের কয়েকটা এক্স-রে হোক। কিন্তু পুলিশের লোক চাইছিল তাকে থানায় নিয়ে যেতে।

এর আগে কখনও মার খায়নি বিপ্লব। তার বাবা বা মা কখনও একটা চড় পর্যন্ত মারেনি তাকে। সারা শরীরে যন্ত্রণা নিয়ে সে বুঝতে পারছিল গণপিটুনিতে কীভাবে মৃত্যু হয় সমাজবিরোধী বা দুর্বৃত্তদের। কয়েক ঘন্টার মধ্যে তাকে সুস্থ হয়ে উঠতে দেখে থানা পুলিশরা কেন কে জানে তাকে থানায় নিয়ে যেতে ঝুলোঝুলি শুরু করল খুবই! বিপ্লব থানায় যেতে চাইছিল না, কেন না সে জানে থানায় যাওয়া মানে পুলিশের খপ্পরে পড়া। কিন্তু বড় সাহেবের কথা বলতে হাসপাতালের ডাক্তারবাবুরা এক্স-রে-র মায়া শিকেয় তুলে অমনি তাকে ছুটি দিয়ে দিলেন তড়িঘড়ি। থানার গাড়িতে ওঠার আগে তার হাতে ধরিয়ে দিলেন একটা প্রেসক্রিপশন।

ততক্ষণে তার পাড়া থেকে কয়েকজন ছুটে এসেছে এভাবে নিগৃহীত হওয়ার সংবাদ শুনে। বিপ্লব অস্থির হয়ে উঠছিল এ কথা শুনে যে, তার বৌ নাকি পা ছড়িয়ে ডাক ছেড়ে কাঁদছে। পাড়ার গণেশদা তাকে আশ্বস্ত করে ছুটে এসেছেন থানায়। গণেশদা এসব ব্যাপারে খুবই পারদর্শী। থানা-হাসপাতাল কেসে তদ্বির করে দু-চারজনকে বার করে নিয়ে এসেছে এর আগে। থানার বড়বাবুর সঙ্গে তার জানাজানি থাকায় গণেশদার এলেম অবিসংবাদিত। কিন্তু এবার সেই গণেশদার জারিজুরিও খাটল না, থানার বড় থেকে মেজ-সেজ সবাই ঘাড় শক্ত করে জানালেন, এটা বড় সাহেবের কেস, ছাড়লে চাকরি চলে যাবে।

গণেশদা মারফত বিপ্লবও জেনে গেল তার বিরুদ্ধে মামলা রুজু করেছে থানার পুলিশ। তাতে লেখা আছে, র‍্যাশ ড্রাইভিঙের জন্য তাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। সে কারণে পরদিন সকালে তাকে কোর্টে হাজির করা হল পুলিশের দেড়টনী কালো ভ্যানে। সেখানে পুলিশের আবেদনে সরকারি উকিল বিপ্লবের জামিন নাকচের জন্য অতিচেষ্টা সত্ত্বেও তার জামিন মঞ্জুর হল অলৌকিকভাবে।

বিপ্লব ও তার পাড়ার লোকজন জানতে পেরে গেল তার বিরুদ্ধে পুলিশ যে-ধারায় মামলা সাজিয়েছে তা গণ্য হতে পারে বছরের সেরা জোক হিসেবে। গণেশদা

বললেন, তুই যে কথায় কথায় বলিস না রঙ্গ দেখানোর কথা, এখন দ্যাখ পুলিশ সত্যিই রঙ্গ দেখাচ্ছে। কী যে ঝুড়ি ঝুড়ি মিথ্যে কথা বলতে পারে পুলিশ! সেটা জজসাহেবের কানে বুঝিয়ে দিতেই অমনি জামিন।

আদালত থেকে বেরিয়ে হাঁপ ছাড়ে বিপ্লব। একদিনের জন্য হলেও হাজতবাস যে কী নির্মম অভিজ্ঞতা, তা হাড়ে হাড়ে জানার পর বাড়ি যেতে পেরে বাঁচে। পুলিশের খপ্পর থেকে আপাতত নিস্তার। কিন্তু পুরোপুরি রক্ষে পেল তা নয়। পুলিশি হেপাজত থেকে বেরিয়ে আসতেই তাকে বাগিয়ে ধরল এক মোটাসোটা উকিল। জামিনের আবেদন গ্রাহ্য হতে তার হাতে ধরিয়ে দিল একটা মোটা অঙ্কের বিল। বলল, এ সব কেসে জামিন পাওয়া কি যে-সে কথা, নির্ঘাত তিন মাস জেলবাস ভাগ্যে ছিল, বাঁচিয়ে দিলাম আপাতত।

উকিলের সঙ্গে কথা বলে জানা গেল মামলাটা পুলিশের স্বয়ং বড় সাহেব পাঠিয়েছেন, এতে জামিন পাওয়া অসাধ্য। সেই অসাধ্য সাধন করতে পেরেছেন তিনি জেলা কোর্টের নাম্বার ওয়ান অ্যাডভোকেট ষড়ভুজ জানা বলেই। খুবই জটিল মামলা। তবে তিনি থাকলে বিপ্লব মণ্ডলের কোনও চিন্তা নেই। ভাল করে লড়তে পারলে এ মামলা কোনও মতেই টিকবে না।

ভাল করে লড়া মানে মোটা টাকা ফিজ হিসেবে উকিলবাবুর পকেটে ভরা। বিপ্লব বুঝল বাঘের পাল্লায় পড়লে আঠারো ঘা, পুলিশের পাল্লায় পড়লে ছত্রিশ ঘা, উকিলের পাল্লায় পড়া মানে বাহাত্তর ঘা। জজেও মানে সে কথা। উকিলবাবু সিরিয়াস-সিরিয়াস মুখ করে জানালেন, এ সব মামলায় পাঁচদিন হাজিরা দিলে হয়ত একদিন বিচারক সময় পান মামলাটা শুনতে। তাও একপক্ষ আসে তো অন্যপক্ষ গরহাজির। তার সাদাসাপ্টা মানে মামলা চলবে আরও বহুকাল। হয়ত দু-চার বছর। বিপ্লবকে মাঝেমধ্যে উকিলবাবুর সঙ্গে যোগাযোগ রাখতে হবে পকেটভর্তি ফিজসহ। মাঝেমধ্যে বদলাতে হবে জুতোর শুকতালা।

এ পর্যন্ত ঠিকই ছিল, কিন্তু বাদ সাধল রোগাপ্যাংলা চেহারার এক রিপোর্টার। সে আদালত প্রাঙ্গণে ঘুরে বেড়ায় খবরের সন্ধানে। রোজই একটা-দুটো ধারালো এবং মারালো খবর নিয়ে কাগজের অফিস গরম না করতে পারলে তার চাকরির নিরাপত্তা বিঘ্নিত হতে পারে। আজ তিন নম্বর কোর্টের মামলাটা উঠতে তার বাঁকানো নাকটা আরও সেঁধিয়ে দিল লম্বা করে, দাদা, কী নিয়ে মামলায় ফাঁসলেন তা একটু বলবেন দয়া করে!

বিপ্লব তখন মানসম্মান নিয়ে ঘরে ফিরতে পারলে বাঁচে। খবরের কাগজের লোক শুনে তাকে এড়িয়ে যেতেই চাইল, কিন্তু লোকটা নাছোড়বান্দা হতে বলল, আরে ভাই, এ তো বড় রঙ্গ, দাদা, এ তো বড় রঙ্গ। ঝুড়ি ঝুড়ি মিথ্যে পাবেন, আসুন আমার সঙ্গে।

সাংবাদিকের কলম উদ্যত হয়ে ওঠে, কীরকম?

—আর দাদা, যা পুলিশি রঙ্গ চলছে দেশে!

রঙ্গ শুনে তার কলম আরও ধারালো এবং মারালো হয়ে ওঠে। পুলিশের খবর কাগজে খায় ভাল।

—তা কীরকম রঙ্গ?

পুলিশের অত্যাচার শুনে সাংবাদিকটির নাক তিনগুণ বর্ধিত হয়ে ছুঁতে চাইল বিপ্লবের ভোঁতা নাকটি। অতঃপর কিছুটা গণেশদা, বেশিটাই বিপ্লব একটু একটু করে বিশদ করল গত সন্ধে থেকে তার উপর বর্ষিত অত্যাচারের কাহিনি। সাংবাদিক ছেলেটি তাতে খুবই খুশি, বিপ্লবের উপর অত্যাচারের কাহিনি যত নির্মম ভোকাবুলারিতে বর্ণিত হচ্ছে, ততই তার কলম শাণিত হয়ে উপভোগ করছে—যেন নির্মমতার ডিগ্রির সঙ্গে তার চাকরির নিরাপত্তাও অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত।

মামলাটা আদালতে চলতে দিয়ে বিপ্লব ঘরে ফিরে আসে। পাড়ায় তাকে নিয়ে তখন জোর হুজ্জুতি। গণেশদা নামের মানুষটা ছাড়নেওয়ালা নন, তিনি বিপ্লবকে বললেন, বিপ্লব, এর একটা হেস্তনেস্ত করে ছাড়ব।

বিপ্লব তখনও পুলিশি অত্যাচারের ঘোর থেকে মুক্ত হতে পারেনি। অন্তত চার-পাঁচজন বড় মেজ ছোট সাহেব তাকে ইচ্ছেমতো মেরেছে। যেন তারা জন্মেছে মারার জন্য, আর বিপ্লবরা জন্মেছে মার খাওয়ার জন্য। বিপ্লবের মাথায়-পাঁজরে-হাতে-পায়ে নানা জায়গায় এখনও ব্যান্ডেজের বীভৎস উপস্থিতি। কীভাবে হেস্তনেস্ত করা যায় তা তার মাথায় আসছিল না।

কিন্তু মাথায় এসে গেল পরদিন সকালে খবরের কাগজ হাতে পেয়ে। সেখানে তার উপর অত্যাচারের বিবরণ ছাপা হয়েছে তিন কলম জুড়ে। তাও পাঁচের পাতায়। তার হেডিং: 'এ তো বড় রঙ্গ জাদু'।

রোমহর্ষক ও আতঙ্কবর্ধক খবর হলে কোনও খবর এরকম প্রাধান্য পায় সংবাদপত্রে। পুলিশের একটি গাড়ি লেভেল ক্রসিঙের ঝাঁপ টপকে যেতে চেয়েছিল। কিন্তু জনৈক ট্রাক ড্রাইভারের বেয়াদপির কারণে যেতে না পারায় পুলিশ জনৈক বিপ্লব মণ্ডলের নামে একটি মামলা রুজু করে তাকে হাজতে ভরে দিয়েছিল। অনুরোধ করা সত্ত্বেও তাকে জামিন দেয়নি থানার পুলিশ। এক রাত পরেই অবশ্য কোর্টে গিয়ে সে জামিনে ছাড়া পায়। কিন্তু মজার ঘটনা এই যে, বিপ্লবের নামে যে-ধারায় মামলা রুজু করা হয়েছে সেই ধারা তার ক্ষেত্রে আদৌ প্রযোজ্য নয়। বলা যায় রামের ভূত চাপানো হয়েছে হরির কাঁধে। পুলিশের অত্যাচার যে কোন পর্যায়ে পৌঁছেছে তা এই একটি মামলা থেকেই উপলব্ধি করা যায়।

বিবরণের দ্বিতীয় অংশে আরও রোমহর্ষক কাহিনি বিবৃত করে রিপোর্টারটি জানিয়েছেন, পুরো ঘটনাটিই পুলিশের সাজানো। তাদের কোনও উচ্চপদস্থ অফিসারের যাওয়ার পথে বাধা সৃষ্টি হওয়ায় তিনি নিজে ও তাঁর বাহিনীর দুজন উর্দিপরা লোক একজন নিরীহ মানুষের উপর যথেচ্ছ অত্যাচারই শুধু করেনি, তার নামে একটি মিথ্যে মামলা সাজিয়েছে তাকে চরম ঝামেলায় ফেলতে।

একটি বহুলাখি কাগজে সংবাদটি প্রকাশিত হতে বেশ শোরগোল বেধে গেল প্রশাসন ও প্রশাসনবিরোধী মহলে। গণেশদা সাতসকালে জাতীয় পতাকার মতো একটি কাগজ উচ্চে তুলে বিপ্লবদের বাড়িতে এলেন প্রায় প্যারেড করার ভঙ্গিতে। বেশ উত্তেজিত মুখভঙ্গি তাঁর। বিপ্লব তখন একটা মোড়ায় বসে পিসার হেলানো টাওয়ারের মতো গা এলিয়ে দিয়েছে তাদের ছ্যাতাপড়া দেওয়ালে। মুখটা অনেকটা জেল-খাটা আসামির মতো, চোর-চোর ভঙ্গি। তার সামনে খবরের কাগজটা ছুঁড়ে দিয়ে গণেশদা বললেন, দ্যাখ, পড়ে দ্যাখ, কী লিখেছে তোর সম্পর্কে!

বিপ্লব কেন যেন গণেশদাকে দেখলে একটু বল পায় মনে। মানুষটা ভারি সাচ্চা। অন্তত সাড়ে তেইশ ক্যারেট। কোথাও কোনও অবিচার দেখেলে তার নিরসনে তৎপর হয়, নিরীহ লোকরা আতান্তরে পড়লে ঝাঁপিয়ে পড়ে তাদের বাঁচানোর চেষ্টা করে, কেউ হাসপাতালে ভর্তি হলে বগলে সতরঞ্চি নিয়ে গিয়ে হাসপাতাল-কম্পাউন্ডে রাত জাগে, কেউ মারা গেলে কোমরে গামছা বেঁধে শ্মশানে ছোটে, আবার তার শ্রাদ্ধে পেট পুরে খেয়ে ঢেকুর তুলে বাড়ি ফেরে। এক কথায় খুবই এলেমদার মানুষ গণেশদা। এক লাখ মানুষের মধ্যে খুঁজে পেতে দু-চারটে পাওয়া যায় এরকম মানুষ। তার ছুঁড়ে-দেওয়া কাগজটা আদ্যোপান্ত পড়ে সেও উত্তেজিত বোধ করে বেশ। এ ক'দিন পুলিশের হাতে হেনস্থা হওয়ায় তার মনোবলে বেশ চিড় ধরে গিয়েছিল। ভেবেছিল, সে আর মুখ দেখাতে পারবে না কারও কাছে। প্রথমে লেভেল ক্রসিঙের কাছে খাকি উর্দিদের কাছে রুলের বাড়ি, সেই সঙ্গে সাদা পোশাকের বুটের লাথি খেয়ে, পরে থানার হাজতঘরে রাতবাস করার ফুরসতে আর এক দফা চড়-ঘুসি খেয়ে বিপ্লবের মনে হয়েছিল, তাকে আর বেঁচে ঘরে ফিরতে হবে না।

তারপরও যে সে বেঁচেবর্তে আছে এটাই তার কাছে অবিশ্বাস্য। এখন পাড়ায় পাড়ায় তাকে নিয়ে কানাকানি, ফিসফিসানি। এখন তার সারা শরীরে পুলিশের আঠারো ঘা। তার আপাদমস্তক আঠারো রকম ব্যান্ডেজ।

কিন্তু এখন খবরের কাগজে তার সম্পর্কে লেখা বেরিয়েছে দেখে তার ব্যান্ডেজচুম্বিত শরীর নড়েচড়ে বসে। তার বিস্ময় ধাঁ ধাঁ করে বেড় ওঠা মাল্টিস্টোরিডগুলির মতো আকাশচুম্বী হয়। বিশেষ করে তার নাম অন্তত চারবার ছাপা দেখে তার মগজ কিছুক্ষণের জন্য ডেফ অ্যান্ড ডাম্ব। তার চোখদুটো নৈনিতাল আলু হয়ে গেঁথে গেছে কালো কালো হরফগুলির মধ্যে।

—তুই দেখে নিস বিপ্লব, আমি এর হেস্তনেস্ত করে ছাড়ব।

কী হেস্তনেস্ত তা বিপ্লবের মগজে কুলোয় না। পুলিশ অফিসার ও তার সঙ্গীরা তাকে বেদম পিটিয়েছে, তার বিরুদ্ধে একটা মামলা দায়ের করেছে। এর বিরুদ্ধে কিছু করা যায় কি না তা বিপ্লব জানে না। পুলিশের বিরুদ্ধে কিছু করা যায় এই বোধটাই তার নেই। বরং পুলিশের বিরুদ্ধে লড়তে গিয়ে তার বরাতে আরও ঝামেলা হতে পারে। কিন্তু গণেশদার খপ্পর থেকে নিস্তার পাওয়া বেশ শক্ত। তিনি তাকে বেশ উত্তেজিত করে তুললেন কিছুক্ষণ সওয়াল করে। বললেন, তুই মামলা কর।

—মামলা! বিপ্লব তার ঠাকুর্দার কাছে শুনেছিল, যে-কোনও মানুষের উচিত যতক্ষণ পারা যায় ঘরে যেন মামলা না ঢোকে। মামলা হচ্ছে পরকীয়া প্রেমের মতো। একবার লাগলে আর ছাড়ানো যায় না। মামলা লড়তে গিয়ে কত মানুষ সর্বস্বান্ত হয়েছে তার বিবরণ শোনাতেন বিশদ করে। মামলার নাম শুনে ভয় পেয়ে গেল বিপ্লব। তাও আবার পুলিশের বিরুদ্ধে!

গণেশদা বিষয়টা খোলসা করেন, এ মামলা সে মামলা নয়। মানবাধিকার কমিশনে একটা দরখাস্ত কর। একবার পুলিশকে কীরকম টাইট দিয়েছিলাম মানবাধিকার কমিশনে মামলা করে তা তো জানিসনে! পুলিশ তো গায়ে উর্দি চাপালে সাপের দশ পা দেখে।

বিপ্লব ব্যাপারটা ঠিক ভেবে উঠতে পারে না। তবে গণেশদার বুদ্ধির উপর ভয়ানক আস্থা। গণেশদা লোকটার কী কারণে যেন বরাবর পুলিশের উপর রাগ। বলে, পুলিশ অকারণে আসামি পিটিয়ে আনন্দ পায়। তাদের মাঝেমধ্যে টাইট না দিলে ব্যাপারটা ঠিক ব্যালান্স হয় না। বললেন, তুই একটা জম্পেশ করে দরখাস্ত ঝেড়ে দে, বিপ্লব! পুলিশের সঙ্গে পাঞ্জা লড়ে হারাতে মজা বেশি। কড়া মাঞ্জা দিয়ে লিখতে হবে দরখাস্তটা, যাতে পুলিশের ইয়ে ফেটে যায়।

ইয়ে শব্দটিতে যা বোঝার বুঝে গেল বিপ্লব। তার ইচ্ছে ছিল না পুলিশের সঙ্গে পাঞ্জা লড়তে। তার মনে কেউ কেউ ভয়ও পাম্প করতে লাগল, বিপ্লব, পুলিশ বড় ভয়ংকর জীব। তাদের সঙ্গে লাগতে গেলে তোকে একটা ডাকাতি কিংবা মার্ডার কেসে ফাঁসিয়ে দেবে, তারপর তোকেই প্রমাণ করতে হবে তুই ডাকাতি করিসনি, বা মার্ডার করিসনি। দেখবি একজন সাক্ষীও নেই তোর হয়ে দাঁড়াবে কোর্টে। মাঝখান থেকে তোকে জেলের ঘানি টানতে হবে খামোখা। তারপর যদি তুই মামলা লড়ে খালাস পাসও, দেখবি তার আগে আন্ডার ট্রায়াল প্রিজনার হিসেবে দশ বছর জেল খাটা হয়ে গেছে।

কিন্তু গণেশদা সে-সব শুনে এক ধমক দিয়ে বললেন, তোর অত ভয় কীসের রে? বাবারও বাবা থাকে তা জানিস?

অগত্যা এক বুক তরাস নিয়ে গণেশদার চাপাচাপিতে দরখাস্ত লিখে পাঠিয়ে দেওয়া হল সম্মাননীয় শ্রীল শ্রীযুক্ত চেয়ারম্যানের উদ্দেশে। পাঠিয়ে নিস্তার পেতে চাইল গণেশদার কাছ থেকে। গণেশদা লোকটা ছাড়নেঅলা পার্টি নয়। জোঁকের মতো কামড়ে থাকতে ভালবাসে। দরখাস্তটা রেজিস্ট্রি ডাকে পাঠিয়ে বললেন, দ্যাখ এবার কীরকম রঙ্গ বাধে।

বিপ্লব বিষয়টা ভাবার চেষ্টা করে। কী থেকে কী হয় কে জানে। সেই ভয়তরাসের মধ্যেই অফিসে যায়। তার সহকর্মীরা তার পিঠে-মাথায়-হাতে পুলিশের লাঠির বর্ণনা দেখে বলে, তুই বলে বেঁচে ফিরেছিস। আমরা হলে এতদিনে শ্মশানের কাজ সেরে ফিরত বাড়ির লোক।

বিপ্লবের গায়ের ঘা যতই শুকোতে শুরু করে তার মগজ থেকে ততই মিলোতে থাকে পুলিশ এপিসোডটি। ঘায়ের দাগগুলো অবশ্য একেবারে মিলোয় না। এক-একটা ক্ষতের দাগ পুলিশের এক-একটা ক্রুর চোখের মতো তাকে ধমকাতে থাকে সারাক্ষণ। বিপ্লব ভয়ে তার ক্ষতগুলোর দিকে পারতপক্ষে তাকাতে চায় না। তাকালে শিরশির করে ওঠে তার শরীরটা। মাসখানেক এমন অজস্র ধমক খাওয়ার পর হঠাৎ একদিন সরকারি অফিসের ছাপ মারা একটা নোটিশ তার নামে আসতে আরও ভয় ধরে গেল বিপ্লবের। খামটা খুলে চিঠির বয়ান বার দুই পড়ার পর ভয়ে-আতঙ্কে জর্জর, জ্বরজ্বর। মনবাধিকার কমিশন অফিসের নোটিশ। তার আবেদনের প্রত্যুত্তরে কমিশন জানিয়েছেন, বিষয়টি তাঁরা দেখছেন।

কোথায় ছিলেন গণেশদা, নোটিশের খবর পেয়ে হন্তদন্ত পায়ে এসে খামটা চাইলেন, কই দেখি, কী লিখেছে?

বিষয়টি খতিয়ে দেখে লাফাতে শুরু করলেন গণেশদা। দেখেছিস, একজন আই জি-কে তদন্ত করে রিপোর্ট দিতে বলেছে মানবাধিকার কমিশন। এবার কী হুড়কো খায় পুলিশ বাবাজিরা দেখে নিস। বেধে গেছে রঙ্গ!

বিপ্লব ঠিক বুঝে উঠতে পারে না, উপরঅলার তদন্তের ফলে যে-সব পুলিশ তাকে পিটিয়েছিল তাদের কোনও শাস্তি হবে কি না। তাদের পাড়ার অবনীদা বললেন, আই জি মানে তো আর এক পুলিশ অফিসার। একজন পুলিশ অফিসার কি আর এক পুলিশ অফিসারের বিরুদ্ধে শাস্তির আদেশ দেবে!

বিপ্লবের সেরকমই মনে হচ্ছিল। অবনীদা আরও ভয় দেখিয়ে বললেন, শাস্তি তো দেবেই না, উল্টে তোকে কী করে টাইট দেওয়া যায় তার ষড় করবে।

২

মানবাধিকার কমিশনের চিঠি পেয়ে একটু নড়েচড়ে বসলেন পুলিশের ইনস্পেক্টর জেনারেল অরুময় সেনগুপ্ত। কয়েকদিন আগে খবরের কাগজের লোকেরা ঘটনাটা নিয়ে বেশ হইচই-হট্টগোল বাধিয়েছিল তা মনে আছে। সে-সময় ডেলি সিট্রেপ থেকে জানতে পেরেছিলেন ট্রাকের এক খালাসি বিনা লাইসেন্সে ট্রাক চালাচ্ছিল, তার বিরুদ্ধে একটি মামলা দায়ের করা নিয়ে মহা হুজ্জুতি হয়েছিল থানায়। তারপর আরও পাঁচটা মামলার মতো এটাও তাঁর মগজ থেকে 'আউট' হয়ে গিয়েছিল যথারীতি। তারপর আজ মানবাধিকার কমিশনের—

চিঠিটা পেয়ে যেমন করে থাকেন, সেটির একটি কপি জেলার পুলিশ সুপারের কাছে পাঠিয়ে নির্দেশ দিলেন, বিষয়টি যেন যথাযথভাবে তদন্ত করে তাঁকে একটি রিপোর্ট পাঠানো হয়।

আই জি-র নির্দেশ। জেলার এস পি সেই চিঠির একটি কপি তাঁর অধস্তন অফিসার ডি এস পি-কে পাঠিয়ে বললেন বিষয়টি তদন্ত করে যথাযথ রিপোর্ট দিতে।

ডি এস পি আবার থানার ও সি-কে চিঠির কপি পাঠিয়ে বললেন রিপোর্ট পাঠানোর কথা। ও সি আবার চিঠিটি দিলেন তাঁর অধস্তন এক সাব-ইনস্পেক্টরকে। ভাগ্যিস কনস্টেবলদের তদন্ত করে রিপোর্ট পাঠানোর কথা লেখা নেই, তাই থানার এস আই কেই তদন্ত করে রিপোর্টটা দিতে হল বড় দারোগার কাছে। কয়েকদিনের মধ্যে থানার দারোগার তদন্তের রিপোর্ট ডি এস পি হয়ে এস পি-র মাধ্যমে এসে পৌঁছল আই জি সাহেবের দফতরে।

চিঠিটি পড়ে দেখলেন, একেবারে রুটিন রিপোর্ট। পুলিশ এ ধরনের রিপোর্ট রোজই ডজন ডজন দিয়ে থাকে। সেরকমই একটি রিপোর্ট পাঠানো হয়েছে পুলিশের বড় কর্তার কাছে:

এক ট্রাক ড্রাইভার বিপ্লব মণ্ডল দিল্লি হাইওয়ে দিয়ে ট্রাক চালাচ্ছিল খুব বেপরোয়াভাবে। এতই র‍্যাশ চালাচ্ছিল যে, উল্টোদিক থেকে ধেয়ে আসা কয়েকটি গাড়ির সঙ্গে অ্যাক্সিডেন্ট করতে করতে কোনওক্রমে সামলায়। পিছনে একটি পুলিশের গাড়ি তাকে থামতে নির্দেশ দিলেও সে কেয়ার করে না, আরও স্পিড বাড়িয়ে চালাতে থাকে হাইওয়ে দিয়ে। তারপর সামনে লেভেল ক্রসিং পড়তে থামিয়ে দিতে বাধ্য হয়। গাড়িটিকে আটক করতে গেলে ড্রাইভার কেবিন থেকে নেমে ছুটতে থাকে পুলিশের গাড়ি দেখে। পুলিশ তাড়া করলে সে গাড়ি থামিয়ে লাফ দেয় মাটিতে। রাস্তা থেকে নেমে নয়ানজুলির দিকে যেতে চেষ্টা করে, তাতে খানায় পা আটকে উল্টে পড়ে জখম হয় ভয়ংকরভাবে। পুলিশ তাকে হাসপাতালে দিয়ে সুস্থ করে, তারপর এই মামলা রুজু করেছে। বেপরোয়াভাবে গাড়ি চালানোর অভিযোগে মোটর ভেহিকলস অ্যাক্ট অনুযায়ী ড্রাইভার বিপ্লব মণ্ডলের শাস্তি প্রাপ্য। গাড়ির নম্বরও একটা দিয়েছে পুলিশ, ডবলিউ বি কিউ ১২৩৪।

রিপোর্টটি পড়ে ভুরুতে কিছু ভাঁজ জমে আই জি সাহেবের। অভিযোগকারীর চিঠিতে যে কাহিনি লেখা আছে তার সঙ্গে পুলিশের রিপোর্ট প্রায় আর্কটিকা-আন্টার্কটিকার পার্থক্য। পুলিশের রিপোর্ট বানানোর ধুরন্ধর কৌশলগুলি তাঁর ভালরকম জানা। এ ক্ষেত্রে রিপোর্টটা কতটা বানানো কতটা সত্যি তা খতিয়ে দেখতে হলে তাঁকেই নামতে হবে ফিল্ডে। সেরকমই ভেবে তিনি নোটিশ দিয়ে শুরু করলেন তদন্তের কাজ। অভিযোকারী বিপ্লব মণ্ডলকে ডেকে পাঠিয়ে যে রিপোর্ট পেলেন তা তার অভিযোগপত্রে লেখা কাহিনির অনুরূপ। মারুতি জিপসির ড্রাইভার ও সিকিউরিটি গার্ড তাকে মারধর করার পর টানতে টানতে নিয়ে গিয়েছিল জিপসিটার কাছে। সেখানে একজন বছর পঁয়ত্রিশ-ছত্রিশের সাদা পোশাকের অফিসার বিপ্লবের পেটে-বুকে ঘুসি ও বুটসুদ্ধ লাথি মেরেছিলেন, যার ফলে তার কয়েকটি রিব ভেঙে গিয়েছিল। বার কয়েক একই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে জানতে চাইলেন অফিসারটির বর্ণনা। এস পি-র রিপোর্টের কোথাও এই অফিসারের কথা লেখা নেই।

আই জি অরুময় সেনগুপ্তর মনে একটা খটকা ছিলই, সেটি দূর করতে বারবার

জেরা করলেন মারুতি জিপসি-র ড্রাইভারটিকে। বিপ্লব মণ্ডল তার জবানিতে বলেছে, তাকে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল একজন অফিসারগোছের যুবকের কাছে যিনি তাকে মারধর করেছিলেন নির্মমভাবে। সেই অফিসারের কথা পুলিশ রিপোর্টের কোথাও লেখা নেই। বিপ্লব মণ্ডল বলেছে সবাই বড় সাহেব বলে উল্লেখ করছিল তাকে। কে সেই বড় সাহেব তা নিয়ে কারও কোনও স্টেটমেন্ট নেই কেন! মারুতি জিপসির ড্রাইভার জিভ কেটে কান মুলে বারবার বলল, কেউ ছিল না, স্যার।

বিষয়টি তিনি এস পি জয়ন্ত রায়গুণাকরকে জিজ্ঞাসা করতে তিনিও বিষয়টা এড়িয়ে গেলেন। বললেন, স্যার, যে-ঘটনাটা ঘটে গেছে তার তো আর চারা নেই। দুজন কনস্টেবল মিলে একটু একসেস করে ফেলেছে, এখন বিষয়টা কী করে ম্যানেজ করা যায়—

আই জি সাহেব ঠোঁট উল্টে বললেন, ম্যানেজ করা যাবে না। কমিশনের চেয়ারম্যান ভারি ঠ্যাটা লোক। রিপোর্ট ঠিকঠিক না গেলে আমাকেই হয়ত ঝামেলায় ফেলে দেবে। দেখি তোমার যে ডি এস পি তদন্তের চার্জে ছিল তার বক্তব্য কী!

ডি এস পি রণজয় মল্লিক এর আগেই একটি রিপোর্ট পাঠিয়েছিলেন কমিশনের কাছে। সেই রিপোর্টটির উপরই জোর দিয়ে এস পি বললেন, স্যার, এখন আমাদের রায়গুণাকরের ওই বয়ানটিতেই স্টিক করে থাকতে হবে। এখন অন্য কিছু বলতে গেলেই কমিশনের সন্দেহ হবে।

—হবে কী বলছ, হয়েছে। কাগজে একরকম রিপোর্ট বেরিয়েছে, অভিযোগকারীর বক্তব্যের ধরনও তাই, এখন পুলিশ রিপোর্ট তার থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন হলে কমিশনের সন্দেহ তো হবেই। পুলিশ রিপোর্টে মারধরের কথা লেখাই নেই। তুমি দ্যাখো, তোমার কোন অফিসার সেদিন লেভেল ক্রসিঙে গেট পড়ে থাকা সত্ত্বেও পেরিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছিল।

—দেখছি, স্যার। তবে, স্যার, খালাসিটার র‍্যাশ ড্রাইভিং-এর ঘটনাটাই কমিশনকে খাওয়াতে হবে।

আই জি সাহেব এবার এস পি-কে একটা ধমক দিয়ে বললেন, বোকার মতো কথা বোলো না, মল্লিক। নীচের অফিসারকে গার্ড দিতে গেলে শেষে উপরতলার অফিসাররাই ফেঁসে যায়। তুমি কি দেখেছ পুলিশ যে-মামলাটা রুজু করেছে তা কার বিরুদ্ধে, কোন ট্রাকের বিরুদ্ধে?

পুলিশ সুপার একটু বিব্রত হলেন, না মানে, স্যার—

জি ডি খুলে দ্যাখো, যে-লোকটার বিরুদ্ধে মামলা করা হয়েছে সে একটি বেসরকারি অফিসের পিয়নের পোস্টে কাজ করে। লোকটা ট্রাক চালাতেই জানে না। র‍্যাশ ড্রাইভিং করা দূরের কথা।

—স্যার—

—তোমার থানার পুলিশ যে-ট্রাকটার বিরুদ্ধে মামলা সাজিয়েছে সেই ট্রাকটা আজ ন' বছর ধরে আউট অফ রোড। সেটি একটি অয়েল ট্যাঙ্কার।

এস পি-র মুখ শুকিয়ে কিসমিস, স্যার—

—জেনারেল ডায়েরিতে লেখা আছে খালাসিটা র‍্যাশ ড্রাইভিং করে যাচ্ছিল ঝড়ের মতো। তাতে যে-কোনও মুহূর্তে দুর্ঘটনা ঘটতে পারত বলেই পুলিশের জিপটা তাকে বারবার হুকুম করছিল ট্রাকটা থামাতে, পিছনে পুলিশের গাড়ি দেখে খালাসিটি আরও জোরে চালিয়ে পালাতে চাইছিল তখন। পুলিশের গাড়িটা তাকে চেজ করে, কিন্তু একবারও সামনের কোনও থানাকে অয়্যারলেসে জানায়নি গাড়িটাকে থামানোর জন্য। এটা একটা ইমপর্ট্যান্ট তথ্য। পুলিশ কোনও গাড়িকে তাড়া করলে এটাই তো নিয়ম যে, সামনের সব থানাকে অ্যালার্ট করে দেওয়া। কমিশন তো এটাই জিজ্ঞাসা করবে ইনভেস্টিগেটিং অফিসারকে, অয়্যারলেসে অ্যালার্ট করা হয়েছিল কি না!

—স্যার—

—বারবার স্যার স্যার করলে কিছু সুরাহা হবে না। আগে দ্যাখো প্রকৃত তথ্য কী! নইলে কমিশনের কাছে দাঁড়ানোই যাবে না। এত ভুল মামলা সাজালে কমিশন ধরে ফেলবেই। তুমি দ্যাখো নিশ্চয় তোমার ওই মুখে জরুলঅলা ডি এস পি-টা বিশ্রীভাবে মেরেছে কমপ্লেন্যান্টকে। ওর ট্যুর ডায়েরিতে ২৭শে এপ্রিল কী লেখা আছে দ্যাখো। আমি সামনের সপ্তাহে সমস্ত রেজিস্টার, ট্যুর ডায়েরি খতিয়ে দেখব।

রোদশুকনো মুখে এস পি তাঁর উপরঅলাকে স্যালুট দিয়ে চলে গেলেন, তাঁর ভাবভঙ্গি দেখে কীরকম যেন অদ্ভুত লাগছিল আই জি সাহেবের।

৩

জেলার এস পি জয়ন্ত রায়গুণাকর পারলে সেই রাতই যেতেন, না পেরে পরদিন সকালেই ছুটে গেলেন মুক্তেশ্বর থানায়। থানার ও সি বিনয় চট্টরাজ মাঝবয়সী, ভুড়িটা বাগিয়েছেন বেশ কষ্ট করে, ফলে একটু ছোটাছুটি করতে তাঁর বেশ পরিশ্রম। পুলিশ সুপারের গাড়ি থানায় ঢুকতে দেখলে সব দারোগারই বুকে পিন গেঁথে যায়। তাড়াতাড়ি বেল্ট সামলে বাইরে এসে লম্বা স্যালুট দিয়ে বললেন, স্যার—

পুলিশ সুপার গম্ভীর মুখে ও সি-র চেয়ারে নিজের শরীরটা ঝপ করে ফেলে দিয়ে বললেন, কই দেখি, আপনার জি ডি রেজিস্টারটা—

বড়বাবু এতক্ষণ প্রমাদ গুনছিলেন। কেন না তার আগেই মানবাধিকার কমিশন থেকে দু'জন অফিসার এসে দেখে গেছেন রেজিস্টারটা। বলে গেছেন, রেজিস্টারের গত সাতদিনের সমস্ত এন্ট্রি যেন আজকের মধ্যেই ফটোকপি করে কমিশনের অফিসে পাঠানো হয়। সে কথা এস পি-কে বলতেই তিনি আঁতকে উঠে বললেন, ফটোকপি পাঠানো হয়ে গেছে নাকি?

—ন্যা স্যার। আজকেই পাঠাব। মুক্তেশ্বর বাজারে দুটো জেরক্সের দোকান, দুটোতেই কাল দু'বার লোক পাঠিয়েছিলাম জেরক্স করতে, দু'বারই আমার হোমগার্ড ফিরে এসে বলল, কারেন্ট নেই। আজ আবার পাঠিয়ে দিচ্ছি—

পুলিশ সুপার হাঁপ ছেড়ে বললেন, কই দেখি আপনার জি ডি রেজিস্টারটা। কী লিখেছেন সেখানে?

একজন আর্দালি দ্রুত ছেঁড়াখোঁড়া রেজিস্টারটা এনে টেবিলে ফেলতেই পুলিশ সুপার হুমড়ি খেয়ে পড়লেন তার পৃষ্ঠায়। কিছুক্ষণ নিরিখ করে মুখ খিঁচিয়ে বললেন, কার হাতের লেখা এটা?

বড় দারোগা এতক্ষণে বুঝে গেছেন পুলিশ সুপার কেন সাতসকালে ছুটে এসেছেন থানায়। রেজিস্টারের উপর তিনিও হুমড়ি খেয়ে দেখলেন লেখাটা। তারপর বললেন, স্যার, মেজবাবু।

—আপনার মেজবাবু এত ক্যালাস কেন? কথা শুনে তো মনে হয় ওয়াটারলুর যুদ্ধ জয় করে আসতে পারত। এদিকে কাজের বেলায় লবডঙ্কা।

—কেন স্যার? ও সি-র মুখও ব্যাজার।

—যে লোকটার নামে মামলা করা হয়েছে সেই লোকটা ট্রাকের খালাসি কি না তার খোঁজ নেননি?

—স্যার?

পুলিশ সুপার গলা চড়িয়ে বললেন, ডাকুন আপনার মেজবাবুকে। যার নামে মামলা করেছেন খালাসি সাজিয়ে, সেই লোকটা আসলে একটা অফিসের পিয়ন। জীবনে ট্রাকের দূরের কথা, একটা মোটরবাইকের স্টিয়ারিং পর্যন্ত ছোঁয়নি।

বড়বাবু ঢোক গিলে বললেন, লোকটা কি জেরার মুখে এই সব কথা বলেছে, স্যার? ওরকম সবাই বলে থাকে। অফিসের পিয়ন হলেও বেআইনিভাবে তার ট্রাক চালাতে তো আপত্তি নেই।

দূর মশাই, সে লোকটা অফিস থেকে বেরিয়ে রোজ বাসে ওঠে। সেদিন চেনা ট্রাক পেতে তাতেই উঠে পড়েছিল। তার নামে একটা কেস দিয়েছেন, এখন তার ঠেলা সামলাবে কে?' তার উপর যে-ট্রাকটা সে চালাচ্ছিল বলে দেখানো হয়েছে সেটা আসলে একটা অয়েল ট্যাঙ্কার। কয়েক বছর ধরে 'অন রোড' নেই। যা ফাঁসান ফাঁসিয়েছেন আপনারা—

বড়বাবু রেজিস্টারের উপর আর একবার হুমড়ি খেয়ে সঙ্গে সঙ্গে বেল বাজিয়ে ডাকলেন আর্দালিকে, যাও তো মৃগেন, এক্ষুনি মেজবাবুকে একবার ডেকে আনো। বলো বড়সাহেব ডাকছেন।

মেজবাবু লক্ষ্মণ বরাট ভারি এলেমদার লোক, পুলিশ সুপারকে একটা লম্বা স্যালুট দিয়ে শশব্যস্ত হয়ে বললেন, সে কি বড়বাবু, এখনও বড়সাহেবের জন্য কফির অর্ডার দেননি? সাহেব কতদূর থেকে কত কষ্ট করে এসেছেন! অ্যাই ফটকে, শিগগির ছোট, বেশ কড়া করে কফি আর এক প্লেট কাজু নিয়ে আয়।

এস পি তাকে থামিয়ে দিয়ে বললেন, থামুন তো বরাটবাবু। এখন কফি খাওয়ার সময় নেই। আপনি যা করেছেন তার হ্যাপা সামলাতেই আপনার আমার সবারই অবস্থা খারাপ। দেখুন কী করেছেন জি ডি-র খাতায়?

মেজবাবু একেবারেই ভ্রূক্ষেপ না করে বললেন, স্যার, এ নিয়ে আপনি একেবারেই চিন্তা করবেন না। লোকটা যদি বলে থাকে ট্রাক চালাতে জানে না, তা হলে ডাহা মিথ্যে বলেছে। তার লাইসেন্স না থাকতে পারে। কিন্তু ট্রাক চালাতে জানে এ কথা প্রমাণ করা মোটেই অসম্ভব নয়। আমাদের উকিল বলবে, সে ফুরসত পেলেই তার বন্ধুর ট্রাক চালায়। এখন ভালমানুষ সাজছে। আসলে তাকেই তো প্রমাণ করতে হবে সে ট্রাক চালাতে জানে না। আমাদের অনেক হোমগার্ড মারুতি, অ্যামবাসাডার চালাতে শিখে গেছে। একজন তো দিব্যি ট্রাক চালায়। কারও লাইসেন্স নেই। আর অয়েল ট্যাঙ্কারের কথা বললেন স্যার? আসলে এই ট্যাঙ্কারটা সিজ করে থানায় ফেলে রেখেছিলাম অনেককাল। এই তো ক'দিন আগে মামলায় জিতে ট্যাঙ্কারটা নিয়ে গেছে কোম্পানির লোক। সেই নম্বরটা খাতা উল্টে দেখে লিখে দিলাম জি ডি-তে। কোনও অসুবিধে নেই। আমরা বলব গাড়িটার রিনুয়াল হয়নি, তবু গাড়িটা চালানো হচ্ছে রাস্তায়।

এস পি লাল চোখ করে মেজবাবুর বক্তিমে শুনে বিষয়টা হৃদয়ঙ্গম করার চেষ্টা করছিলেন। পুলিশ এরকম হয়কে নয়, নয়কে হয় করতে অভ্যস্ত। কিন্তু এ যাত্রা মেজবাবুর নয় যে হয় হবে না, তা তিনি জলবৎ বুঝে গেলেন। হুঙ্কার দিয়ে বললেন, এতদিন কোর্টের হাকিমদের যেভাবে টুপি পরিয়ে এসেছেন তা মানবাধিকার কমিশনকে পরানো যাবে না। আপনি এখনই জি ডি এন্ট্রি বদলান। দেখুন ডটপেনের কালি কোনও রবার ঘষে তোলা যায় কি না। কেসটা ভাল করে সাজান। নইলে সবাইকে ধরে টানাটানি করবে কমিশন। কুইক। এখনই আমার সামনে বদলে ফেলুন। সেই আস্ত ট্রাকের নম্বরটা কী হল? যেটার সঙ্গে ঝগড়া হয়েছিল!

—স্যার, সেদিন তালেগোলে সেই ট্রাকটার নম্বর নেওয়া হয়নি। বিপ্লব মণ্ডলকে মারধর করার মধ্যেই লেভেল ক্রসিঙের গেট খুলে যায়। তার ড্রাইভার হুজ্জুতি দেখে তাড়াতাড়ি ট্রাক চালিয়ে পালিয়ে যায় তখনকার মতো। মারুতি জিপসির সিকিউরিটি-ড্রাইভার কেউই ট্রাকের নম্বর নোট করেনি। তারা যে-লোকটাকে মারছিল তার বডিটা টেনে এনে ফেলে দিয়ে যায় থানার সামনে। তারপর তাড়াহুড়োয় জি ডি এন্ট্রি করি আমরা। যে-ট্রাকটার নম্বর হাতের কাছে পেয়েছি তাই নোট করেছি জি ডি-তে। তাতে একটু ভুল হয়ে গেছে স্যার।

—একটু ভুল মানে! এস পি খিঁচিয়ে উঠলেন আবার, আপনি এখনই এন্ট্রি ঠিক করুন। কুইক। তারপর তার ফটোকপি পাঠিয়ে দিন কমিশনের অফিসে। আর—

পুলিশ সুপারের পরবর্তী হুকুম শোনার জন্য দুই অফিসার উৎকীর্ণ হলেন, স্যার—

—আমি যে সেদিন মুক্তেশ্বরে এসেছিলাম তার কোনও প্রমাণ রাখতে চাই না। দেখি আপনাদের ইনস্পেকশন বইটা। যে-পৃষ্ঠায় আমি ইনস্পেকশন করে রিপোর্ট লিখেছিলাম, সেই পৃষ্ঠাটা ছিঁড়ে হাপিস করে দিন।

বড়বাবু, মেজবাবু দুজনেই আমসি মুখে তাকালেন, স্যার, তাতে রেজিস্টারের পৃষ্ঠাসংখ্যা মিলবে না।

—মিলবে না মানে কী? মেলাতেই হবে। মাস্ট।

মেজবাবু দ্রুত ইনস্পেকশন রেজিস্টারটা নিয়ে এলেন, এই দেখুন স্যার, বাইশ-তেইশ পৃষ্ঠায় আপনার নিজের হাতে রিপোর্ট লেখা।

—এখনই পৃষ্ঠা দুটো ছিঁড়ে ফেলে পৃষ্ঠার নম্বর বদলে ফেলুন।

—স্যার—

—কোনও স্যার নেই এর মধ্যে। ওইদিন যে আমি ঘটনাস্থলে উপস্থিত ছিলাম তার কোথাও যেন প্রমাণ না থাকে। দিই ইজ মাই অর্ডার।

৪

আরও কয়েকদিন পরে আই জি অরুময় সেনগুপ্তর রিপোর্ট পৌঁছোল মানবাধিকার কমিশনের দফতরে। তিনপৃষ্ঠার বিবরণে যে কথাগুলো লেখা আতে তার মোদ্দা ভার্সন এরকম :

জুনের বাইশ তারিখে মুক্তেশ্বর লেভেল ক্রসিঙের গেট পড়ে যাওয়ায় একটি ট্রাক কিছুটা বেয়াড়াভাবে দাঁড়ায় গেটের সামনে। তার পিছনে এসে দাঁড়ায় আরও দুটি ট্রাক। তারও পিছনে একটি মারুতি জিপসি পৌঁছে বেয়াড়াভাবে দাঁড়ানো ট্রাকটির উদ্দেশে ঘনঘন হর্ন দিতে থাকে যাতে লেভেল ক্রসিঙের মুখটা ছেড়ে দেয়। তখনও ট্রেন আসতে দেরি থাকার কারণে মারুতি জিপসি চাইছিল গেট খুলে লেভেল ক্রসিং পেরিয়ে যেতে। কিন্তু বেয়াড়াভাবে দাঁড়ানো ট্রাকটা জায়গা না দেওয়ায় মারুতি জিপসি থেকে দু'জন পুলিশের উর্দিপরা লোক নেমে এসে ট্রাক ড্রাইভারের উদ্দেশে যথেচ্ছ গালাগাল করতে থাকে। তাতে অভিযোগকারী বিপ্লব মণ্ডল, যিনি মুক্তেশ্বর থেকে তার অফিস ছুটির পর বাসে না উঠে ড্রাইভার চেনা থাকায় ট্রাকটিতে উঠেছিলেন জেলাশহরে তাঁর বাড়ি যাওয়ার উদ্দেশে, তিনি দুই পুলিশকর্মীর দুর্ব্যবহারের প্রতিবাদ করেন। তাতে দুই পুলিশকর্মী আরও উত্তেজিত হয়ে বিপ্লব মণ্ডলকে মারধর করে ও তাঁকে টানতে টানতে নিয়ে যায় মারুতি জিপসিতে বসা তাদের বড় সাহেবের কাছে। সেই বড় সাহেব তাঁর কর্মীদের মুখে বিপ্লব মণ্ডলের 'দুঃসাহসিকতা'র বিবরণ শুনে উত্তেজিত হয়ে তাঁকে আরও মারধর করেন, তাতে বিপ্লব মণ্ডলের পাঁজরের কয়েকটি রিব ও কানের পাশের হাড় ভেঙে যায়।

তারপর বিপ্লব মণ্ডলকে মারুতি জিপসির পিছনের দিকে তুলে নিয়ে তারা জেলাশহরে যায়। সেখানে থানার ইনস্পেক্টরের কাছে তাকে জিম্মা দিয়ে বড় সাহেব তাঁর রেসিডেন্সে নিদ্রা দিতে যান। বিপ্লব মণ্ডলের আঘাত এতটাই গুরুতর ছিল যে, তিনি ঘনঘন জ্ঞান হারাতে থাকেন। তাঁর আত্মীয়স্বজনরা তাঁকে হাসপাতালে দেওয়ার জন্য অনুরোধ জানালে থানার পুলিশ জানায়, কেসটা বড় সাহেব থানায় দিয়ে গেছেন, অভিযোগকারীকে হাসপাতালে দেওয়ার প্রশ্ন নেই, জামিন দেওয়ারও কোনও সুযোগ নেই। কিন্তু অভিযোগকারীর শরীরের অস্থিরতা ক্রমশ বেড়ে যাওয়ায় পুলিশ

বাধ্য হয় তাঁকে হাসপাতালে নিয়ে যেতে। সেখানে তাঁর কিছু প্রাথমিক চিকিৎসা হয়। হাসপাতালের ডাক্তার অ্যাডভাইস করেন, তাঁর এখনই কয়েকটা এক্স-রে করা দরকার। পুলিশ তাতে কর্ণপাত না করে তাঁকে পুনর্বার ফিরিয়ে নিয়ে আসে থানা হাজতে। গুরুতর আহত অবস্থায় বিপ্লব মণ্ডল সারা রাত থানা হাজতে বাস করেন। পরদিন কোর্টে হাজির করলে সেখানে তাঁর জামিন হয়। তাঁর আত্মীয়স্বজনরা তাঁকে কোর্ট থেকে ছাড়িয়ে নিয়ে গিয়ে হাসপাতালে গেলে তখনই এক্স-রে করা সম্ভব হয় তাঁর শরীরে। এক্স-রে-তে ধরা পড়ে তাঁর রিব ভেঙে যাওয়ার কথা, কানের পর্দা ফেটে যাওয়ার কথা।

অতঃপর শরীরে ব্যান্ডেজ নিয়ে তিনি বাড়ি ফিরে আসেন। পুলিশের বিরুদ্ধে লড়াই করে লাভ হবে না বুঝতে পেরে অভিযোগকারী মানবাধিকার কমিশনে দরখাস্ত করার কথা ভাবেন। বিষয়টি নিয়ে তদন্তে নেমে আমি জানতে পারি, জি ডি-তে পুলিশের গল্পটি একেবারেই বানানো। বিপ্লব মণ্ডল যে ট্রাক চালাতে জানেন না, একটি সদাগরি অফিসে সামান্য মাইনের চাকরি করেন, সেদিন অফিস ছুটির পর বাড়ি ফেরার বাস না পেয়ে তিনি উঠে পড়েছিলেন একটি চেনা ড্রাইভারের ট্রাকে, এই কাহিনিটা পুলিশ জানত না। অভিযোগকারীকে ফাঁসাতে ঘটনাটা নিজের মতো করে সাজিয়েছিল পুলিশ। বিপ্লব মণ্ডল আসলে সেদিন প্রতিবাদ করেছিলেন সেই মারুতি জিপসির দুই উর্দিপরা কর্মীর দুর্ব্যবহারের। ট্রাক ড্রাইভারের উপর অজস্র গালিগালাজ ও ট্রাকটি ভাঙচুর করার প্রতিবাদ মোটেই ভাল চোখে দেখেনি পুলিশ কর্মীরা। তাদের উর্দি পরার অহংকার তাদের প্ররোচিত করেছিল প্রতিবাদকারীর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে যথেচ্ছ মারধর করতে। শুধু তাই নয়, তাদের বড় সাহেবের কাছে তাঁকে নিয়ে গিয়ে তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ করলে সেই বড় সাহেব আরও নির্মমভাবে প্রহার করেন। এ ঘটনা আরও ন্যক্কারজনক।

পুলিশ অভিযোগকারীর প্রতিবাদের প্রতিশোধ নিতে তাঁকে থানায় নিয়ে গিয়ে তাঁর বিরুদ্ধে রুজু করে এই মামলা। কিন্তু থানার পুলিশ অফিসারদের মেধা এতটাই যে, তারা এক পিয়নশ্রেণির কর্মীকে ট্রাকের চালক বলে মামলা সাজায়, যে-ট্রাকটির বিরুদ্ধে তাদের মনে ক্রোধ জন্মেছিল সেটিকে মামলায় আবদ্ধ না করে অন্য একটি অয়েল ট্যাঙ্কারের কথা লেখে জি ডি-তে। হয়ত ক্ষতিগ্রস্ত ট্রাকটিকে তারা মামলা থেকে আড়ালে রেখে দিতে চেয়েছিল, অথবা যে-অয়েল ট্যাঙ্কারটি বহুদিন 'অন রোড' নেই, তার বিরুদ্ধে মামলা দাঁড় করানো অপেক্ষাকৃত সহজ হবে, কিংবা অন্য কোনও কারণে। আমাদের দেশে আদালত চলে কাগজপত্রের উপর, কখনও সরেজমিনে তদন্ত হয় বটে, কিন্তু সেই তদন্ত করে পুলিশ অফিসারেরাই। তাতে হয়কে নয় নয়কে হয় করার স্বাধীনতা থাকে পুলিশের।

কিন্তু সরেজমিনে তদন্ত করতে গিয়ে বিপ্লব মণ্ডলের ট্রাক চালানোর অনভিজ্ঞতা, সেই সঙ্গে একটা বাতিল ট্রাককে সচল দেখানোর বিষয়টিই আমার নজরে পড়ে। এই

দুটি খুঁতের কথা পুলিশ অফিসারদের নজরে আনতেই টনক নড়ে তাদের। সেই খুঁত ঢাকতে গিয়ে থানার সমস্ত রেজিস্টারের বয়ান মেরামত করে তারা নতুনভাবে সাজাতে চায় মামলাটা। একের পর এক রেজিস্টারে ট্যাম্পারিং করে প্রক্রিয়াটি নতুনভাবে শুরু করতে। ওভাররাইটিং করতে হয় জি ডি এন্ট্রিতে। ছিঁড়ে ফেলতে হয় ইনস্পেকশন বইয়ের পৃষ্ঠা। আর এত সব করার সময় তাদের মগজে এটুকু ঢুকল না যে সামান্য চেষ্টাতেই ধরা পড়ে যাবে তাদের জারিজুরি।

বিষয়টি তদন্ত করে আমি এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছি যে, এক বড় সাহেব ও দুই পুলিশ কর্মী যথেচ্ছ প্রহার করে গুরুতর আহত করে বিপ্লব মণ্ডলকে। তাঁর বিরুদ্ধে মিথ্যে মামলা সাজায়, তাঁকে থানা থেকে জামিন দেওয়া হয় না। হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার পর চিকিৎসারত ডাক্তার তাঁকে এক্স-রে করার অ্যাডভাইস দিলেও থানার অফিসাররা সেই উপদেশ অমান্য করে, তাঁকে সারা রাত বিনা চিকিৎসায় ফেলে রাখে। তারপর তাদের সাজানো মামলাটি উপরঅলার চোখে ধরা পড়ায় তারা সমস্ত কাগজপত্র ও রেজিস্টার ট্যাম্পার করে।

অতএব—

ঘটনাটি বিশ্লেষণ করে আমার সিদ্ধান্ত, এ ক্ষেত্রে মোট চারটি অপরাধ সংঘটিত করেছে জেলার পুলিশ সুপার ও তাঁর অধস্তন কর্মচারীরা। সেগুলি হল :

১. যিনি কখনও ট্রাক চালাননি সেই বিপ্লব মণ্ডলের বিরুদ্ধে একটি বাতিল অয়েল ট্যাঙ্কার নিয়ে র‍্যাশ ড্রাইভিঙের অভিযোগ।

২. বিপ্লব মণ্ডলকে শারীরিক নির্যাতন করা ও তাঁকে চিকিৎসার সুযোগ থেকে বঞ্চিত করে জামিন না দিয়ে থানার লক-আপে সারা রাত রাখা।

৩. মিথ্যে রিপোর্ট দিয়ে থানার অফিসারদের কোর্ট ও মানবাধিকার কমিশনকে বিভ্রান্ত করা।

৪. থানার ও জেলা সুপারের অফিসের বিভিন্ন রেজিস্টার ও অন্যান্য কাগজপত্র ট্যাম্পার করা।

মানবাধিকার কমিশন যথোচিত ব্যবস্থা নিতে পারেন জেলা সুপার ও অন্যদের বিরুদ্ধে।

পরদিন সকালে বহুলাখি সংবাদপত্রে আইন আদালত বিভাগে মামলাটির রিপোর্টের সঙ্গে এরকম একটি ছড়াও প্রকাশিত হল :

এ তো বড় রঙ্গ, জাদু, এ তো বড় রঙ্গ
চার মিথ্যে সাজাতে পারো যাব তোমার সঙ্গ।

'হাসি'র খসড়া

মোহিত রায়

মেজদার অফিস থেকেই তিমিরের মাথায় আইডিয়াটা ঢুকে ছিল। অনেকদিন ব্যাপারটা সুপ্ত থাকলেও লুপ্ত হয়নি, সাঁতার শেখার মতন আর কী, সে কি ভোলা যায়? ডুবে ডুবে জল খেয়ে বেঁচে থাকা অনেকদিন। তখন বেকার জীবনের প্রথম ভাগ। চাকরির জন্য শুনেছে ঘোরাঘুরি করতে হয়, তাই অফিসপাড়ায় কাজে-অকাজে ঘোরাঘুরি লেগেই থাকত, যদি কোথাও কিছু একটা লেগে যায়। সেই ফাঁকে যখন-তখন মেজদার অফিসে মাঝেসাঝে ঢুকে একটু জিরিয়ে নেওয়া। ডালহৌসি পাড়ায় সরকারি অফিস অনেকটা স্বাস্থ্যনিবাসের মতনই। চারপাশের হনহন-করা জীবনযুদ্ধের সিন থেকে এক পা এগিয়ে নোংরা সংগ্রামী পোস্টারশোভিত দরজাটা ঠেলে ঢুকে পড়লেই হল—আঃ যেন সিনেমা হল, উত্তম-সুচিত্রার মিস্টি ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইট জগৎ। বিরাট হলঘরে ছড়ানো টেবিলে টেবিলে আনন্দধারা বহিছে ভুবনে। কোনো টেনশন নেই, কোনো বসের হুংকার নেই, জীবন এখানে লীলাময়। মেজদার ফাঁকা টেবিল-চেয়ার দখল নিয়ে বসে যেত তিমির। একটু জিরিয়ে তবে আবার বাইরের জীবনযুদ্ধে নামা।

বিশ্ব সর্বত্র ইথারময়, এই বৈজ্ঞানিক তত্ত্বটি একশো বছর রাজত্ব করে বিদায় নেয়। কিন্তু প্রকৃতি যেহেতু শূন্যস্থান পছন্দ করে না, সে স্থানটি দখল করে নেয় শ্রেণীসংগ্রাম। ইলেকট্রন-প্রোটন থেকে রাইটার্স বিল্ডিং—তখন থেকেই শ্রেণীসংগ্রাম সর্বত্রগামী, এমনকি তার তরঙ্গে দোদুল্যমান মেজদার অফিসও। এই তরঙ্গের বিশ্বায়ন যতই সংকুচিত হচ্ছে ততই এখানে তার তরঙ্গ উদ্বেলিত হয়ে উঠছে। তিমির দত্তের মেজদা সুকান্ত দত্ত তাই এই নিস্তরঙ্গ অফিসে শ্রেণীসংগ্রাম নিয়ে ব্যস্ত থাকেন। ফলে কমরেড সুকান্ত দত্তের টেবিল-চেয়ার বেশিরভাব সময়ে ফাঁকাই থাকে। তিমির তাতে বসে পড়ে। অনেকটা সাবজুনিয়র রবিঠাকুর যেমন জানালায় বসে বাড়ির পুকুরঘাটে হরেকরকম স্নানের দৃশ্য দেখত, তেমনই তিমির দেখতে থাকে জগৎ-পারাবারের পারে আরেক কার্টুনের পৃথিবী। ঘরে অনেকগুলো টেবিল কিন্তু কখনোই সবকটায় লোক থাকে না। সক্কালবেলায় একেবারে ফাঁকা ময়দান, দু-একজন অন্য কাজের ফিকিরে সকালে চলে আসেন। তারপর গুটিগুটি করে টেবিল ভরতে থাকে, একেবারে দুপুর

নাগাদ লিঙ্গ সাম্য রক্ষা করতে দু-একজন দিদিমণিও চলে আসেন। যখন মনে হতে থাকে এই আর কিছু পরে নিশ্চয়ই সব ভরে যাবে, তখনই একটা একটা করে সকালে-ভরা টেবিল খালি হতে থাকে। অনেকটা সেই তৈলাক্ত বাঁশে বাঁদর ওঠার অংক, কখনোই বাঁদর বাঁশের মাথায় চড়ে উঠতে পারে না। সরকারি অফিসের টেবিলেরা কখনো পূর্ণ হয় না।

কমরেড সুকান্ত দত্তের উল্টোদিকের টেবিলে বসেন জগন্নাথবাবু। লম্বা চুল, গলায় রুদ্রাক্ষের মালা। বড় টেবিলের পাশে একটা ছোট টেবিল লাগিয়ে তার উপর মা-কালীকে স্থাপন করেছেন। রক্তজবায় শোভিত মায়ের ফোটো। সকাল এগারোটা-বারোটা নাগাদ এসে মা-মা হুংকার ছেড়ে প্রথম পুজো হয়। সরকারি অফিস, বিভিন্ন কাজে অনেক লোকই আসে, গাঁয়ের লোকও কম নয়। তারা তখন জোড় হাতে টেবিলের পাশে দাঁড়িয়ে পড়ে। পুজো শেষ হলে তবে কাজ শুরু। কাজের জন্য চেয়ার এগিয়ে যে দুজন টেবিলের ওপারে বসেন, তাঁরা কাজের আগে হাত দেখাতেই ব্যস্ত হয়ে পড়েন। হাত দেখা মানে লোক জমে যায়। অন্য টেবিলের লোকজনও চলে আসে। থাকলে চেয়ার টেনে তিমিরও জমে যায়। কমরেড সুকান্ত দত্তের ছোটভাই, সবাই বেশ নরম হয়ে কথা বলে। মেজদার টেবিলের অন্যপাশে বসেন গণেশ পুততুণ্ড। উনি নির্ঝর মিত্র নামে কবিতা লেখেন। তিনটের পর উনি আর থাকতে পারেন না, কফি হাউসে তখন ওনার আরেক অফিস থাকে। উঠে যাবার আগে তিমিরকে বলেন—ভাই, তোমার দাদাকে এই কবিতার বইটা দিয়ে দিও। ওনার সঙ্গে আমার অনেকদিন দেখা হচ্ছে না। কবিতার বই, নাম কবিতার যুদ্ধ। এই ল্যাকপ্যাকে ন্যাকান্যাকা লোকটা নাকি যুদ্ধ করবে, তাও কবিতা দিয়ে। হাঃ, হাঃ। এসব মজার জন্যই তো মেজদার অফিসে আসা। একটু বিশ্রামের সঙ্গে কিছু বিনোদন। হঠাৎ ফোন বেজে ওঠে। নোংরা তেল চিটচিটে একটা টুলে ফোন রাখা। ফোনটাও সমান তেল চিটচিটে, কেবল হাতলটা ধরতে হয় বলে ওটাই একটু উজ্জ্বল। ফোন বেজেই চলে, কেউ ধরে না। তিমির উসখুস করে, আরেক পাশ থেকে সমীরবাবু বলেন—ওটা অজিতবাবুর ডিউটি। উনি এখন নেই তো।

—আজ আসবেন না?

—না এসে পড়বেন। ওনার বাঁশদ্রোণী বাজারে দোকান আছে তো। টিফিনের আগে এসে উঠতে পারেন না।

—উনি না এলে তাহলে ফোন ধরা যাবে না?

—না ভাই, অফিসের অনেক নিয়ম মেনে চলতে হয় তো। সুকান্তদাই নিয়ম ঠিক করে দিলেন, এ ঘরের প্রতিনিধি অজিতবাবু। উনিই ফোন ধরবেন।

ফোন বেজে চলে। তাতে কোথাও কোনও ছন্দপতন হয় না। মনে হয় এটা এ অফিসের আবহসংগীত। তার সাথে তাল মিলিয়ে টেবিলে টেবিলে গুলতানি। বারবার একই কাগজ পড়া হতে থাকে। এবার তিমির উঠে পড়ে। চারটের সময় বরুণের

অফিসে যাবার কথা, ওদের নাকি টেম্পোরারি লোক মাঝেমাঝে নেওয়া হয়। এতক্ষণে মনটা ওর বেশ ভালো হয়ে গেছে। সন্ধের ঠেকে জগন্নাথবাবু আর নির্ঝর মিত্ররাই আড্ডা জমিয়ে দেবে।

কাল অনেক রাত জেগে খসড়াটা লেখার সময় এসব কথা ভেসে আসছিল তিমিরের মাথায়। সাধারণত বেশি রাত পর্যন্ত জাগার বুদ্ধিজীবী অভ্যাস তার নেই। বাড়িতে ঢোকে রাত করে পাড়ায় আড্ডা মেরে। আগে ঢুকে কোনও কাজ তো নেই। খেয়ে ঘুমোলেই বরং একটা দিন নিশ্চিন্তে গেল। সেই ডালহৌসি পাড়ায় ঘোরা দিয়ে শুরু, তারপর দশ বছরও কবে চুপিচুপি পেরিয়ে গেল, পাশের বাড়ির পারমিতা দু-বাচ্চার মা হয়ে গেল, কিছু ঠিক লাগল না। অনেক কিছু করেছে সে, অফিসে স্টেশনারি অর্ডার সাপ্লাই, ভ্যাকুয়াম ক্লিনারের সেলস মার্কেটিং সার্ভে, নাগপুর থেকে মাছের চালান। মানে একটা গ্র্যাজুয়েট ছেলে যা যা করতে পারে আরকি। এক বহুমুখী কর্মজীবন। একবার তার মনে হয়েছিল যে মুখ্যমন্ত্রী না পাল্টানো পর্যন্ত তার আর কিছু লাগবে না। সেই যে কবে থেকে একই মুখ্যমন্ত্রী চলছে। শেষমেশ তাও হল, নতুন মুখ্যমন্ত্রীও হল, তবু তার কিছু হল না। মাঝেমাঝে কিছু আশা জাগে, আবার হোঁচট খেতে হয়, শুধু চোয়াল শক্ত হতে থাকে। একদিন বোঝে যে চোয়াল শক্ত করে শুধু চোয়ালে ব্যথাই হল। তখন সে পাড়ার লাফিং ক্লাবে যাওয়া শুরু করে। চোয়াল খুলে, সারা মুখগহ্বর উন্মুক্ত করে হাসো। হাঃ, হাঃ। হাসতে থাকো। যত খুশি হাসো। এসবই তার কাল রাতে শেষ করা খসড়ার মধ্যে ঢুকে আছে। মাঝে বেশ কিছু দিন যাওয়া হয়নি, সকালে মাদার ডেয়ারির দুধ নেবার আগে একটু ঢুকে পড়ল লাফিং ক্লাবে।

হুঃ হাঃ। হুঃ হাঃ। হাঃ হাঃ হাঃ। কোমর থেকে হাত তুলে আকাশের দিকে হাত ছুঁড়ছে, আবার হাত কোমরে। আকশে ছুঁড়ে দিচ্ছে শব্দতরঙ্গ। হাসতে হুঃ হাঃ। হুঃ হাঃ। হাঃ হাঃ হাঃ। অনেকদিন পরে এসে তিমির মেপে নিচ্ছে লোকজন। ডানদিকে ঝুঁকে হাসতে হাঃ হাঃ বিলিয়ে দিচ্ছেন নিত্যবাবু। দু ছেলেই বেকার। রাস্তার ওপর একতলা বাড়ি কিন্তু পর্দা টানানোর পয়সা নেই। তিনি হাসছেন। হাসছেন মিসেস ধাড়া। ছেলেরা বৌ নিয়ে দেশে-বিদেশে, উনি বাড়িতে বাড়িতে এখন হোম সার্ভিস খাবার বিক্রি করেন। তিমির এদের সবাইকে চেনে, তার মতো এদের সবারই হাসি দরকার। এখানেই তার নতুন জন্ম। তার নতুন প্রজেক্টে এরাও থাকবে। খসড়াটা ফাইনাল করার আগে একটা গ্রুপ মিটিং বা ব্রেনস্টর্মিং গোছের মিটিং করার কথাও ভাবছে তিমির। কিংবা লাফিং ক্লাবের মেম্বারদের নিয়ে একটা ওয়ান ডে ওয়ার্কশপ। এসব নতুন ম্যানেজমেন্ট টেকনিক। শেষ পর্যন্ত তো তাকে ইস্যুটা সেল করতে হবে, মার্কেটে নামতে হবে।

বড় রাস্তার ওপরে তিমিরদের ছোট বাড়ি। এখন বিশ্বায়নের প্রতিযোগিতায় যেন আরো কুঁকড়ে গেছে। চারপাশের ছোট ছোট বাড়ি উদারীকরণে বড়বড় ফ্ল্যাট হয়ে গেল। পাশের বাড়ির নাম ছিল 'দিনের শেষে'। রাবীন্দ্রিক হরফে শ্বেতপাথরে লেখা।

তার নীচে ১৯৫৬। ধূসর হয়ে এসেছিল ফলক, শ্বেতপাথরে দারিদ্র্য ও দূষণের ছাপ। এখন তা চকচকে চারতলা ফ্ল্যাট বাড়ি, প্রোমোটার নাম পাল্টে দেয়াল জুড়ে লিখেছে— গোল্ডেন টাওয়ার। ও পাশের বাড়ির প্রোমোটার একটু ভক্ত মানুষ, তার ফ্ল্যাটবাড়ির নাম লোকনাথ ২। তার প্রথম তৈরি ফ্ল্যাটবাড়ির নামও লোকনাথ, তাই এটা দু'নম্বরি। দুটোর মাঝে চেপ্টে যাওয়া তিমিরদের বাড়িরও একটা নাম ছিল, সে ফলক অনেকদিন আগেই খসে গেছে। এর দেড়তলার দশ বাই বারোর ঘরটি তিমিরের আস্তানা। এক তলার আড়াই ঘরের সাজানো সংসারের বর্তমান কর্তা মেজদা সুকান্ত দত্ত। মা নেই, একতলাকে দুই সন্তানের বাসযোগ্য করে রেখেছেন সুকান্ত ও তস্য গৃহিণী, বাবাও একপাশে আছেন। সুকান্ত দত্তের কথাতেই দু'পাশের ফ্ল্যাটবাড়ির প্রোমোটারেরা জয়েন্ট ভেঞ্চারে উল্টোদিকের ফুটপাথে শহিদ বেদি (ঝান্ডা লাগানোর গর্তসহ) ও বিপ্লবী দৈনিক পত্রিকা লাগানোর ইট-সিমেন্টের পাকা বোর্ড বানিয়ে দিয়েছে।

দত্তবাড়ির আসল কর্তা গৌরহরি দত্ত ছিলেন উষা কোম্পানির টেকনিশিয়ান। দক্ষিণ কলকাতায় বিশাল চত্বর নিয়ে ফ্যান, সেলাই মেশিন বানানোর মস্ত কারখানা। তখন এ দিকটার পরিচিতিই ছিল কলকারখানার নামে। বাসের কন্ডাক্টররা চেঁচাত উষা স্টপ, বেঙ্গল ল্যাম্প স্টপ, ন্যাশানাল ইনস্ট্রুমেন্টস স্টপ, সুলেখা, স্টপ, কৃষ্ণা গ্লাস স্টপ, অন্নপূর্ণা গ্লাস স্টপ। সব কারখানার নামে বাস স্টপ। চল্লিশ-পঞ্চাশ বছর পর এই সব বাস স্টপই আছে, কন্ডাক্টররা একই চেঁচিয়ে যাচ্ছেন, কিন্তু এই কারখানাগুলো আর নেই। জলজ্যান্ত কারখানাগুলোকে নির্ভেজাল বাস স্টপে রূপান্তরিত করবার এই সুররিয়ালিস্ট শিল্পের প্রথম সারির শিল্পী ছিলেন গৌরহরিবাবুরা। ওঁদের আন্দোলনে উষা কোম্পানি ফ্যান, সেলাই মেশিনের থেকে বিপ্লবী সংগ্রামে বেশি খ্যাতি পেল। তখন তার যৌবনেরও উষা, গৌরহরিবাবু ছেলেদের নাম রাখলেন বিপ্লব, সুকান্ত, মেয়ে প্রগতি। শেষমেশ সংগ্রামের দ্বান্দ্বিক নিয়মে কোম্পানি লকআউট অনেকদিন। তখন হল তিমির। পুরো নাম অবশ্য তিমিরবরণ। একদিন লকআউটও ওঠে, গৌরবাবুও প্রোমোশন পেয়ে ইঞ্জিনিয়ার হন, কিন্তু শেষমেশ কোম্পানিই উঠে যায়।

দত্ত পরিবারের অর্থনৈতিক নক্ষত্র মণ্ডলের সাম্প্রতিক অবস্থাটা এরকম। মধ্যগগনে সূর্যসম মেজদা সুকান্ত দত্ত। সরকারি চাকরি আর কমরেডশিপের ঔজ্জ্বল্যে দত্ত পরিবারের আকাশ আলোকিত করে আছেন। বড়দা বিপ্লব দত্ত প্লুটোর মতন দূর গ্রহ, সিউড়িতে কী এক ওষুধ কোম্পানির সেলস রিপ্রেসেন্টেটিভ। বাবা গৌরহরির রক্তপতাকা ফিকে হয়ে আসতে সে পতাকা রক্তিম রাখার দায়িত্ব তুলে নিয়েছিল জ্যেষ্ঠপুত্র বিপ্লব। বাবার গণ্ডি পেরিয়ে বীরভূমের মাটিতে কিছুদিন লাল পতাকা উড়িয়ে তারপর আলিপুর সেন্ট্রাল জেল। এখন সেই বীরভূমেই ওষুধ বেচে বিপ্লব দত্ত। মেজপুত্র দ্বান্দ্বিক নিয়মটি বুঝে ফেলে সরকারি বামপন্থায়ই লেগে পড়ে। বৃদ্ধ গৌরবাবু নিভে যাওয়া নক্ষত্র, ব্ল্যাকহোল হয়ে বসে আছেন। বাড়িতে অস্তিত্ব বোঝা যয় না তবে বেশিক্ষণ কাছে থাকলে টেনে নেন পঞ্চাশ-ষাট দশকের সুপ্ত মাধ্যাকর্ষণে। তখন শুরু হয় বিপ্লব

শ্রেণীসংগ্রামের পোস্টমর্টেম। দিদি প্রগতি, দূর গগনের তারা, কোনো ঝকঝকে সাঁঝে শ্বশুরবাড়ি থেকে বাপের বাড়িতে উদয় হয়।

সৌরমণ্ডলে পজিশন পাল্টাতে পাল্টাতে বেকার তিমির এখন নিজের একটা কক্ষপথ চায়। এর-ওর উপগ্রহ হয়ে ঘুরছে অনেক বছর। প্রথমে ছিল মেজদার উপগ্রহ। চাকরির দরখাস্ত আর এর-ওর সাথে দেখা করার পর্ব চলতে চলতে বছরের পর বছর গড়িয়ে গেল, তখন মেজদা বলল—বিজনেস কর। চীনকে দেখছিস না, এখন কেমন বিজনেস করছে। আমাদের মুখ্যমন্ত্রীর ছেলেও বিজনেস করছে। আর শোন, ওই চোয়াল শক্ত করা ভাবটা ছাড়। বিজনেসে সব সময় একটা হাসিখুশি মুখ রাখতে হয়। বাবার আমলের বিদ্রোহী টেকনিক চলবে না। উন্নততর স্ট্র্যাটেজি নিতে হবে।

নতুন ব্যবসায় শুনেছে ট্রেড লাইসেন্স লাগে। কিছু আয়ের আগেই একটা খরচ। সজলকে সঙ্গে নিয়ে তিমির বেরুলো কর্পোরেশনের বোরো অফিসে ট্রেড লাইসেন্স করাতে। অফিসের সিঁড়িতেই কর্পোরেশনের টেডমার্ক। প্রতিটি পদক্ষপেই নোংরা, দেয়ালে পানের পিকের কোলাজ। তিমির ভাবে, এর পরও কর্পোরেশনের কাছে পরিষ্কার শহর আশা করাটা অন্যায়। দোতলায় উঠে দু-একজনকে জিজ্ঞাসা করে পাওয়া গেল ঘর। ঢুকেই সামনের টেবিলে দুজন। একটু সংকোচ নিয়ে ট্রেড লাইসেন্স ফর্ম চাওয়ামাত্র দুজনই ব্যস্ত হয়ে উঠলেন। একেই বলে ওয়ার্ক কালচার। একজন বললেন—একটু নীচে আসুন, ফর্ম নীচে রাখা আছে। আরেকজন আরো বিনয়ী। বলল—বসুন, আমিই এনে দিচ্ছি। তারপর বড়বাবুর কাছে নিয়ে যাব। হয়ে যাবে সব। একেবারে পেছনের বড় টেবিলে বড়বাবু বসেন, এখনো আসেননি। এবার তিমির বোঝে এরা কেউই কর্পোরেশনের লোক নয়, দালাল। বাঃ, শুরুতেই বেশ একটা জামাই ঠকানো মজা। এরপর পেছনের দুটো টেবিলে একজন মহিলা, একজন বয়স্ক পুরুষ। টেবিলের সামনে দাঁড়ানো মাত্র মহিলা একটা ফিল্ম ম্যাগাজিন পড়া থেকে চোখ না তুলে বললেন—আজ তো হবে না।

কি হবে না? তিমির তখনো কিছুই বলেনি, মজা দেখতে বলেই বসল—আজকে তো আসতে বলেছিলেন।

তাহলে কালকেই আসুন ভাই। আজ খুব ব্যস্ত আছি—মুখ তখনো ম্যাগাজিনে ঢাকা।

তিমির এবার পাশের টেবিলে। স্যার, ট্রেড লাইসেন্স ফর্ম।

বয়স্ক ভদ্রলোক একবার চোখ তুলে অনেকক্ষণ ধীরসুস্থে দেখেন—ব্যবসা করবেন?

এই ভাবছি, লাইসেন্স তো নিয়ে রাখি।

খুব ভাল, ব্যবসাই তো লক্ষ্মী।

সজল এতক্ষণে মজা পাচ্ছে। শুরু করে—কী ব্যবসা ভাল হচ্ছে স্যার আজকাল? কিসের ট্রেড লাইসেন্স বেশি ছাড়ছেন আপনারা?

সে সবরকম। লটারি আর জ্যোতিষের চেম্বার বেশ ভাল যাচ্ছে। কোথায় খুলবে

ভাই তোমাদের অফিস?—এই বলে একটা কার্ড ধরান ভদ্রলোক, গোল্ড মেডালিস্ট জ্যোতিষাচার্য—এদিকে জায়গা থাকলে আমাকেও একটু বলো ভাই। একটা চেম্বার খোলার বড় ইচ্ছে।

স্যর, বড়বাবুকে আজ পাওয়া যাবে না?

আগে তো লাইসেন্সের ফর্ম ফিলাপ করো, জমা দাও, তারপর ইন্সপেক্সন, তারপর বড়বাবু যা চাইবার চেয়ে নেবেন। তবে ফর্ম তো আজ নেই, স্টকেই নেই।

তাহলে দিন দুয়েক পরে আসি?

এসো ভাই, আমরা তো সেজন্যই বসে আছি। তা ব্যবসা শুরু করতে যাচ্ছ, হাতটা দেখালে না? চারটের পর আমি এই টেবিলেই দেখি।

ও, পরদিন নিশ্চয় দেখাব।

আজকের মতো কাজ শেষ। তিমির, সজল বেরিয়ে আসে।

বেরিয়ে এসে যেন ভালই লাগে। সত্যি একদিনেই যদি কাজটা হয়ে যেত, লাইসেন্স বেরিয়ে যেত, তবে কাল থেকেই দৌড় শুরু। অর্ডার জোগাড়ের জন্য কাল থেকেই ঝাঁপাও। অথচ কোথায় অর্ডার! সুতরাং ধীরে বন্ধু ধীরে। সীমিত ক্ষমতার মধ্যে কাজে এত তাড়াহুড়ো করলে হয়, বরং দুজন লোকের সাথে আলাপ হল, ম্যাগাজিন দিদিমণি আর জ্যোতিষ দাদার। কাল সকালে লাফিং ক্লাবে হাঃ হাঃ হো হো করে হাসবার জন্য ভেসে উঠবে আরো দুটো মুখ, আরো চোয়াল হাল্কা করা হাসি হাঃ হাঃ হো হো।

তবে একদিন লাইসেন্স হল। মেজদা কিছু সরকারি অফিসের আর তাদের ইউনিয়ন নেতাদের নাম ঠিকানা দিয়ে দিলেন। এরপর করে খেতে হবে নিজেকে। চাকরির বদলে এবার স্বাধীন ব্যবসার জন্য ঘোরাঘুরি, শুধু চোয়াল শক্ত করা বারণ। সঙ্গে এখন সজল থাকে, একা মজায় সুখ নেই, সুখ তো বহুতে, ভূমায়। কোম্পানির নাম দিয়েছে তিল এন্টারপ্রাইস। তিমিরের 'তি' আর সজলের 'ল'—তিল, একদিন তিল থেকে তাল করে দেখাবে।

দশটায় অফিস খোলার সময়। সাড়ে দশটায় এক সরকারি অফিসের সামনে। মেজদার বন্ধু আছেন এখানে, ইউনিয়নে। কিন্তু এখন কেউ নেই অফিসে। এদিক-ওদিক খোঁজাখুঁজির পর একজনকে পাওয়া গেল, উনি সেই কৃষ্ণনগর থেকে আরো দূরে থাকেন তাই রোজ বাড়ি ফেরেন না। কাল বাড়ি ফেরেননি ফলে তাকে পাওয়া গেল তখন। তিমির জিগ্যেস করে—

অফিস খোলেনি এখনও?

আপনার কাকে চাই?

কেউ তো নেই, তো অফিস ক'টায় খোলে?

বড়বাবুর আসতে আসতে বারোটা হয়ে যায়। তবে এগারোটার মধ্যে অনেকেই এসে যাবে।

তো অফিস খোলে ক'টায়?

কাকে দরকার বলুন না, সে কখন আসবে বলে দিচ্ছি।

বোঝা গেল অফিস ক'টায় খোলে সেটা স্টেট সিক্রেট।। গোপন দলিল। বরং অফিস খোলা-বন্ধের দ্বান্দ্বিক অভিব্যক্তি হল—অফিসের যে কর্মীকে দরকার সে আছে কি না। সে থাকলে, যার তাকে দরকার তার জন্য অফিস খোলা নয়তো বন্ধ। প্রবলেম সলভড। কিউ ই ডি।

আচ্ছা বরুণবাবু কখন আসবেন?

কমরেড বরুণ মিত্র? উনি তো অফিসে কম আসেন। তবে পরশু পাবেন।

কেন?

পরশু বিরোধীদের বন্‌ধ আছে না, ওনাকে সকালে পাবেনই। সকাল সকাল আসবেন কিন্তু।

এভাবেই সকাল থেকে হাজার মজায় সময় কাটে তিমিরের। সকালে লাফিং ক্লাব। তারপরের মজা বাড়ির উল্টোদিকের ফুটপাথে। মেজদার উদ্যোগে বিপ্লবী দৈনিক পত্রিকার বাঁধানো বোর্ড হয়েছে। আগে পাশে একটা দেয়ালে মারা থাকত, তারপর বেশ্ন ফ্রেমট্রেম করে চাটাই আর কাঠ দিয়ে বড় বোর্ড হল। এখন একেবারে ইট-সিমেন্টে পাকা ব্যাপার। প্রায় অনেকটা মেজদার কেরিয়ারগ্রাফের মতনই এই বোর্ডের ইতিহাস। রোজ সকালে এখানে কাগজ পড়ে সারাদিনের জন্য মেজাজটা ভাল করে নেয় তিমির। সকালেই সে জেনে যায় বর্ধমান ছোট আলুতে ভারতে ফার্স্ট, বাঁকুড়া ক্ষুদ্র হস্তশিল্পে দেশে সেকেন্ড। রাজ্যে আরো নতুন বিজ্ঞানী তৈরি করতে খোলা হচ্ছে আরো মাদ্রাসা। দেশের অন্যান্য জায়গার ভয়াবহ অবস্থার খবরও পাওয়া যায়, ফলে এ রাজ্যের উন্নতির খবর আরো মন দিয়ে পড়ে। মনটা ভাল হয়ে যায়।

এরপর চায়ের দোকানে অনেকক্ষণ। বেলায় যখন বেরুতে যায় তখন দেখা হয় নির্মাল্যবাবুর সঙ্গে। রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকের বিপ্লবী কর্মী, আজ অফিস যাননি। ছুটি নিয়েছেন। আর্ন্ড লিভ জমে গেছে, এরপর জমালে আর এনক্যাশ করা যাবে না। ফলে ছুটি নিয়েছেন। কমরেড সুকান্তবাবুর ভাইকে এক কাপ চা অফার করেন। তারপর আলোচনায় বসেন—সমাজতন্ত্র যে কী বিপদেই না পড়েছে। অফিসে আর সেদিন কোথায়? তারপর সুদ কমছে। ট্যাক্সের ঝামেলা। তিমির সমাজতন্ত্র, সুদের হার এবং ট্যাক্সের দুঃখে নীরবতা পালন করে চা খায়। একটা বিস্কুটও আসে। নির্মাল্যবাবু উঠে গেলে তিমির একবার প্রাণভরে হেসে নেয়। বাবা, বড়দার পর সমাজতন্ত্রের লাল পতাকা এখন ব্যাংক কর্মী-অফিসারদের হাতে কেমন পতপত করে উড়ছে। এবার তাড়াতাড়ি উঠে পড়ে, হাউসিং বোর্ডের অর্ডারটা নাকি পাওয়া গেছে, ওটার কাগজপত্র নিয়ে আসতে হবে। নিশ্চয় সেখানেও কিছু মজা জমা আছে।

বোর্ডের অফিসে অসীম মণ্ডল ফাইলটা দেখছে। তাকে দেখেই বলল, আপনাদের অর্ডারটা বেরিয়ে গেছে, তবে কাজটা শুরু হবে পরের মাসে। নোটিশ বোর্ডে দেখে

নিন। কাগজ হাতে পেতে পরের সপ্তা। তিমির করিডোরে ঝোলানো নোটিশ বোর্ডের সামনে দাঁড়ায়। কাঁচে ঢাকা নোটিশ বোর্ড তালা মারা। ওর ভিতরটা নোটিশ লাগাতে লাগাতে বোঝাই। কেউ আর পুরোনো নোটিশ খোলে না। তারপর একদিন চাবি হারিয়ে যায়। তখন বাইরে কাঁচের ওপরেই নোটিশ লাগানো চলে। তাও ভর্তি। এখন নোটিশ বোর্ডের পাশে দেওয়ালে। অন্তত পঞ্চাশটি নোটিশ দেয়ালে ময়দানের জনসভার মতো ভিড় করে আছে। তিমির কিছু খুঁজেই পেল না। তবে অসীমবাবু যখন বলেছেন তখন কাজটা পরের মাসে হবেই। অর্ডারের বদলে আবার আশা নিয়েই ফেরে তিমির।

বড়দা মাঝেসাঝে আসে। তিমিরের দেড়তলার ঘরেই রাতে থেকে যায়। বিয়ে-থা করেনি, বাবার সাথে দু-একটা কথা হয়। পুরোনো বন্ধু দু-একজন খবর পেলে আসে, তারপর আবার সকালে বিদায়। তিমিরের খোঁজখবর নেয়। টাকাপয়সাও কিছু দেয়। এবার বড়দা যেন একটু উদ্বিগ্ন। বড়দা তিমিরকে ডাকে তিতু। তখন সত্তরের ঘনঘটায় বড়দা তিমিরকে পাল্টে করতে চেয়েছিল তিতুমির। তিতুমির তখন ছিল বিপ্লবী কৃষক সংগ্রামের প্রতীক, পরে বইপত্তর ঘেঁটে এখন বড়দা ওসব কথা আর তোলে না, তবে নামটা রয়ে গেছে।

তিতু তোর ব্যবসা কেমন চলছে। কিছু অর্ডার পেলি?

এই তো চলে যাচ্ছে। এবার ভাবছি একটু হাউসিং-এর কাজে ঢুকব।

কেন? হঠাৎ হাউসিং-এ কেন?

ওটাই তো এখন আমাদের রাজ্যে সবচেয়ে বড় শিল্প। দেখছিস না কী সব পেল্লাই বাড়ি উঠছে। বাবার কারখানার জমিতে তো এখন পঞ্চাশ তলা বাড়ি হবে। তা শুনে বাবা কেমন আরো মুষড়ে গেছে। কদিন আর কথাই বলা যাচ্ছে না।

শোন তিতু, ও তোর দ্বারা হবে না। এসব পাড়ার প্রোমোটিং-এর থেকে বড় জোচ্চুরি। তুই অন্য কিছু ধর।

কী ধরব?

একটা নতুন লাইন এসেছে। ব্যবসা—আবার একটু ইন্টেলেকচুয়াল ব্যাপারও থাকে। শহরে, গ্রামেগঞ্জে সব জায়গাতেই খাচ্ছে। আমায় ওষুধ বেচতে অনেক হাটে ঘুরতে হয় তো।

সেটা কিরে দাদা, একটু দিব্যজ্ঞান দে।

একটা এন জি ও খোল।

উঁ—

হ্যাঁ, এন জি ও। দ্যাখ গভমেন্ট আর চাকরিবাকরি দেবে না। দেখছিস না কর্পোরেশনের ময়লা সাফাই আর কর্পোরেশন করছে না, করছে এন জি ও। সরকার আর হাসপাতাল চালাবে না, চালাবে এন জি ও। ইস্কুল চালাবে এন জি ও। আর বিদেশিরাও বলছে এন জি ও-দেরই টাকা দেবে।

তাহলে একবার লড়ে যাই বড়দা।

ঠিকমতন পয়সাওলা জায়গা ধরতে হবে। আমার দু-একজন পুরোনো বন্ধু এসবে ভাল পজিশনে আছে। দু-একজন বিদেশেও আছে। চেষ্টা করলে হতে পারে।

তাহলে কি করে শুরু করব?

একটা নতুন কিছু ফোকাস ভাব। একদম নতুন। সেটাকে সমাজ উন্নয়নের পথ বলে খাওয়াতে হবে। ঠিক কি বেঠিক পরের ব্যাপার। ব্যবসা হচ্ছে ব্যবসা।

আরেকটু ছাড় বড়দা।

যেমন কেউ ধরে বসেছে বেশ্যা নিয়ে, ওটাই সব। বেশ্যাবৃত্তিই হচ্ছে দারুণ একটা সোশ্যাল সার্ভিস, মার্ক্স ওটা মিস করে গিয়েছিল। বলছে বেশ্যাদের কাজটাই আসল কাজ। বেশ্যাদের নিয়ে নাটক কর, গান কর, সাহেবরা এসে পয়সা দিয়ে যাবে। কেউ অবশ্য নিজের মেয়ে-বউকে এই সোশ্যাল সার্ভিসে নামাবে না। একেবারে ট্রু বিজনেস স্পিরিট।

ঠিক আছে তাহলে বেশ্যা নিয়েই—কিন্তু এসব নিয়ে ফান্ডা তো কিছু নেই।

না, না, তোকে বেশ্যা নিয়েই করতে কে বলছে, আর ওটাতে এখন ভিড় হয়ে গেছে। আরো কত আছে শোন না। এই যেমন এনভায়রনমেন্ট। সব বড়লোকের ছেলেমেয়ে দেখবি গাছের দুঃখে হাওয়ার দুঃখে গলে যাচ্ছে। তোকে একটা জম্পেশ বিলিতি গ্রুপ ধরে পরিবেশ নিয়ে কান্নাকাটি করতে হবে। পয়সা, বিদেশ ভ্রমণ সবই আছে। কেউ ধরেছে আদিবাসীদের। কেউ করছে মানবাধিকার। সোনায় সোহাগা সরকারি চাকরি ফেলে এখন লোকে এন জি ও করছে।

তাহলে তো লাগতেই হয় রে দাদা।

তিতু, তোকে কিন্তু পয়সা পেতে গেলে নতুন কিছু ভাবতে হবে।

নতুন কিছু?

তুই আজকাল কী নিয়ে ভাবিস? কী তোকে খুব ভাবায়?

কী ভাবায়? কিছুই ভাবায় না।

এতসব চারদিকের ঘটনা, বেকারি, হাসপাতালে মৃত্যু, জনযুদ্ধ, গুজরাত, বিশ্বায়ন।

দূর, আমার সব কিছুতেই আজকাল মজা লাগে। বুঝলি সব কিছুতেই মজা আছে। তা দেখে হেসে যা। দেখবি চোয়াল শক্ত নেই, মনটা ভাল। ও জীবন ঠিক কেটে যায়। আমায় দেখছিস না। জীবনটাই একটা লাফিং ক্লাব।

বড়দা বিপ্লব দত্ত কিছুক্ষণ চুপ।

তারপর বলে উঠে—ঠিক—আইডিয়া। তিতু এটা একটা নতুন আইডিয়া। এটাই তোর ভেঞ্চার ক্যাপিটাল।

কী?

ভেঞ্চার ক্যাপিটাল। এই জন্য তোকে খুঁজবে ফান্ড দেবার লোকেরা। শোন, এই আইডিয়াটা লিখে ফেল। বেশ গুছিয়ে। তোর এন জি ও হাসির মধ্যে দিয়েই সামাজিক মুক্তির কথা বলবে। মনে রাখবি এটা শুধু লাফিং ক্লাব নয়, তোকে এটাকে অনেক

বড় পৃথিবীতে নিয়ে যেতে হবে। তুই একটা খসড়া লেখ। চারদিকের টেনশনের পৃথিবীর ভেতরে এক সাবঅলটার্ন হাসির পৃথিবী। তোর এন জি ও সেই পৃথিবীকে সামনে নিয়ে আসবে।

তা হলে লিখব বলছিস?

একটু সিস্টেমেটিক ভাবে লিখবি—প্রথমে অবজেকটিভ, তারপর মিশন স্টেটমেন্ট, তারপর কী করা হবে ইত্যাদি। এই হাসির মধ্যে ঢুকিয়ে দিবি সমাজ, গুজরাত, গ্লোবাল ওয়ার্মিং, হিন্দুত্ব, মার্কিনি আগ্রাসন, আদিবাসী, জেন্ডার আর অবশ্যই এইডস।

বলছিস দাঁড়াবে?

ব্যবসায় রিস্ক তো থাকেই। তোর তো এখানে টাকাপয়সা লাগছে না, তোর ক্যাপিটাল তোর আইডিয়া। আমি পরের সপ্তাহেই আসব। তবে একটা বড় কাজ বাকি থাকছে, এন জি ও-র নামটা দারুণ দিতে হবে। ওটাও একটা নতুন আইডিয়া হতে হবে। তারপর কিছু কানেকশন, কিছু ইন্টারনেট—সব মিলে দেখা যাক কী হয়। আমার পুরানো দু-একজন বন্ধুও তো এখন এ লাইনে ভালই কামাচ্ছে।

কাল অনেক রাত পর্যন্ত তিমির এন জি ও-র খসড়াটা লিখে শেষ করেছে। দাদার আজ রাতে আসার কথা। অনেক দিন পর তাই সকালে লাফিং ক্লাবে এসে ভাবনাগুলো ঝালিয়ে নিচ্ছে। এন জি ও করতে অন্তত সাতজন মেম্বর চাই। লাফিং ক্লাবের কয়েকজনকে নিলে ভাল ক্রেডেনশিয়াল হবে। নামটাই শুধু বাকি রয়ে গেছে।

রাতে বড়দা এল।

দাদা শুধু নামটাই বাকি। এটুকু তুই করে দে।

দিচ্ছি। হাসি মজা নিয়ে ব্যাপার, নাম থাকুক হাসি।

হাসি?

হাসি—মানে হোলিস্টিক অ্যাসোসিয়েশন ফর সোশ্যাল ইমপ্রুভমেন্ট। HASI.

হ্যাঁ, আরেকটা ক্যাচি শ্লোগান রাখতে হবে—হাসির কলই মুক্তির উৎস।

দাদা, তুই নিজে একটা এরকম শুরু করছিস না কেন? তাহলে তো আরো ভাল.....

দাদার মুখে একটা ছায়া ঘনায়। ঘরে গুমোট গরম।

জামাটা খুলে বিপ্লব দত্ত জানালার সামনে দাঁড়ায়। পিঠে সেলাইয়ের লম্বা দাগ। সত্তরের চিহ্ন। জানালার দিকে মুখ রেখেই বলে—আমরা গত শতাব্দীর তিতু। এসব হাসির কথা আমাদের আসবে না।

এবারের বাছাই : *জগৎমঙ্গল কাব্য*

রাজনৈতিক সততা

চন্দন ভট্টাচার্য

এস ইউ সি আই সৎ, কেননা তারা সুযোগ পায়নি

তোমার মুখস্থ স্বামী স্নেহ পায়, ভরা পেটে
মুখসুদ্ধি চুমু, আর রাত ছায়ার জীবাশ্ম হয়ে গেলে
স্নেহ দু'মলাটের মধ্যে করে বালিশে সাজানো
ঠিক সেই মুহূর্তে চাঁদ মুখ বাড়িয়েছিলো জানলা খুলে
পানের পিক ফেলে ফেলে ভূত করে দিয়েছিলো ঘরের দেয়াল
....
.............কাঁধে কাঁধ নিষ্কলঙ্ক ঠেকে যাচ্ছে,
দুচোখে গোধরা...শেয়ারের অটো এর বেশি
দাঙ্গাবাজ হতে শেখেনি।

এস ইউ সি আই আজ এখনও সৎ পার্টি

জগৎমঙ্গল কাব্য : সপ্তর্ষি প্রকাশন।

দপ্তরে নানান বই আসে, তারই একটি জগৎমঙ্গলকাব্য।
সেই বইয়ের একটি কবিতার অংশ এখানে তুলে দেয়া হলো।

শেষপাতার ছড়া

শিবাজী বন্দ্যোপাধ্যায়

ভাষাভাসানের ছড়া

আনতাবড়ি আলটপকা
আধখেঁচড়া আড়পাগলা যা তা—
স্ফোটের চোটে ধ্বনির জোটে
হঠাৎ ছোটে কথার মধু বাতা।

আড়ংবাড়ং খাত সে কথার
তিড়িংবিড়িং নাট—
মাতম মাতম নাচন-ঘূর্ণি
পৌঁছে গেলং তিনপূর্ণির ঘাট।

ধাক্কা-রোলের গোলে কাঁপে তিরপুনিরের ঘাট—
তিরপুনিরের ঘাট না ওটা, চিৎপুরেরেই মাঠ!
সে মাঠ জুড়ে আটপহরই চিক্ চিক্ চিক্—
রাতদুপুরেও ঝাঁঝছে বালি ঠিক—
হলকা রোদের কলকা কাটে চিত্তপুরের ভিতর-বাটে,
চিত্তপুরের আগুন-লাটে মুখ যে সদাই রক্তে ফাটে!

বাদ্যি বেজে ফিরছিল সে নদীর বাঁকে-টোলে—
(স্বপ্ন-আলোয়, দোহার বোলায় সপ্তডিঙায় মাল্লামাঝির গান!
দিগ্‌নগরের চিকন চুলের মেয়ের দলে হুলুই-জোকার তোলে!!)—
এমন সময় চলকে বেজায় থমকে যে যায় চটুলধ্বনির বান
চিৎপুরেতে ভুল-বেপথে ফুরোয়-মেলায় কথার কথায় টান।

সত্যি তবু—নিশির ডাকে স্ফোটের চোটে ধ্বনির জোটে
বদ্ধ ঘরে হঠাৎ ক'রে ভাষবাতাসি মধুর বাতা ওঠে....

ক্রোড়পত্র

পাঁচ ঘর এক উঠোন : পাঁচ নবীনের গল্প

ভূমিকা : অনিরুদ্ধ লাহিড়ী

পাঁচ ঘর এক উঠোন

'অনুষ্টুপ'-এর দপ্তরে ছাপাবার জন্য পাঠানো ছোট গল্প জমা পড়ছে বছরের পর বছর। যা লক্ষণীয়, এসব গল্পকাহিনীর লেখক-লেখিকাদের অধিকাংশই কিন্তু মফস্বলের বাসিন্দা; এবং এঁদের কেউ মনে হয় না নিজ নিজ চেনাজানা চৌহদ্দির বাইরের বৃহত্তর পাঠকবর্গের কাছে তেমন কিছু পরিচিত। পরিচিতি ঘটাবার উদ্দেশ্যে ঘটকালি করতে আমাদের বিন্দুমাত্র আপত্তি নেই, তা থাকবার কথাও নয়—বরং বলা যায়, সে ব্যাপারে আমরা খুবই আগ্রহী। তবে তা সত্ত্বেও বড় মাপের মুশকিল একটা থেকে যাচ্ছে : দুঃখের সঙ্গে বলতে বাধ্য হচ্ছি, কাঁচা অপটু হাতের দাগ এসব রচনায় সুস্পষ্ট। বেছে ছাপাবার জন্য কোনো উদ্যোগ যে এতদিন নেওয়া হয়নি, তা এই কারণে।

আন্তরিক একটি দায় আমাদের তাও রয়েই গেল পাঠকপাঠিকার কাছে, এবং সেই সুবাদে ঠিক ততটাই আবার হবু গল্পকারদের কাছে। উৎকর্ণ হয়ে দৈনন্দিনের ছোটবড় হারজিত আর পাশফেলের কথাগুলো যে এঁরা শুনবেন, এঁরা বলতে পাঠকবর্গ, সম্ভব হলে নিয়মিত তা জোগাবেন কারা? আজ যাঁরা হবু লেখক তাঁরাই নিশ্চয়। এক্ষেত্রে সাংস্কৃতিক অবস্থানগত একটি বাড়তি সুযোগ মনে হয় এঁদের করায়ত্ত। অনেকটাই এঁরা লিখছেন মফস্বল থেকে। তাই এঁদের অভিজ্ঞতার ভর ও উদ্দেশ্যগুলি কলকাতা-কেন্দ্রিক মনস্কতার বদ্ধতাকে ভেঙে না হলেও অনেকাংশে ডিঙিয়ে, আশা করা যাক, আমাদের পৌঁছে দিতে সক্ষম হবে ব্যাপকতর নানা সামাজিক বিস্তার ও বৈচিত্র্যে। সাংস্কৃতিক এই খেইগুলি যদি এঁরা ধরিয়ে দিতে পারেন, সেটা হবে আমাদের নিট লাভ। কথাটা আরো বেশি করে সত্যি, যদি দেখা যায় সামাজিক অভিজ্ঞতার নির্বাচনে মনস্কতার সঙ্গে যৌথভাবে সক্রিয় নিবিড় ব্যাপৃতির সাক্ষ্য এসব রচনায় পর্যাপ্তভাবে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে, তাই এসব লেখাপত্র হয়ে উঠছে সাংস্কৃতিক তাৎপর্যে গরিষ্ঠ।

সেটা যে ঘটছে তা কিন্তু নয়—অন্তত এখনো পর্যন্ত নয়। এই জায়গাটিতে এসে গুরুত্ব অর্জন করছে গুণগত মানের বিবেচনাটি। অভিজ্ঞতার মেধাবী নির্বাচন এবং রচনায় তার নিবিষ্ট প্রতি-নির্মাণে এঁদের তাই মনোযোগী ও সযত্ন হতে হবে—আপ্রাণ। মনে রাখতে হবে, শেষ পর্যন্ত কিন্তু এই সব প্রশ্ন উঠবেই : লেখা দাঁড়াল কেমন? আদৌ দাঁড়িয়েছে কি? তাই রফা কোনোমতেই করা চলবে না। আরেকটি কথা : আপ্রাণ চেষ্টা করা হয়েছিল কিনা এই প্রশ্নটি যতক্ষণ ওঠে, নিজেদের দায়বদ্ধতার

কাছে, এবং তা যতদূর; লেখকবিবেকের পরিশ্রমী থাকবার মেয়াদও ততক্ষণ এবং তা ততদূর, একই সঙ্গে তার সাফল্যও। আপ্তবাক্যের মতো শোনাচ্ছে। শোনাক, কথাগুলো সত্যি।

যে চারটি গল্প বাছা হল, অভিপ্রেত উৎকর্ষের মাত্রা যে তারা ছুঁতে পেরেছে তা কিন্তু নয়। নিহিত সম্ভাবনাগুলিকে উসকে দেবার আগ্রহ থেকেই মূলত এই নির্বাচন। একে যুক্তি দিচ্ছে এরকম একটি তাগিদ বা আকাঙ্ক্ষা যে এঁরা আরো লিখবেন—তবে সেসব লেখাকে হতে হবে আরো অনেক বেশি সজাগ ও নিষ্ঠাবান। তা ক্রমেই বেশি করে।

যে সাংস্কৃতিক প্রক্রিয়ার কাছে 'অনুষ্টুপ' চুক্তিবদ্ধ, পরবর্তী প্রজন্মের নিরীক্ষাশীল লেখক-লেখিকারাই তো কেবল তাকে চরিতার্থতা দিতে পারেন। তাঁরা তা মাথায় রাখছেন তো? প্রস্তুতি নিচ্ছেন?

অরণ্যকাণ্ড

রানা সরকার

গোদাবরীর তীর। বিটনুন মাখা ঝুরোঝুরো আলুভাজার মতো হাওয়া দিচ্ছে। থেকে থেকে মন উদাস হয়ে যাচ্ছে। সকালবেলা। নদীর পাশেই বাগানবাড়িতে ব্যস্ততা ঢুকে পড়েছে। হনুমানের উঠোন ঝাঁট দেওয়া হয়ে গেছে। জামাকাপড় কাচতে বসেছেন। লক্ষ্মণের প্যান্টের পকেটে গাঁজার পুরিয়া দেখে সন্তর্পণে পাশে রেখে দিলেন। গতবার অসাবধানতার জন্য ভিজে গিয়েছিল বলে লক্ষ্মণের সে কি কথা। গুরুজন বলে কোনো মান্যি নেই। কানে কয়েক বোতল গঙ্গাজল ঢাললে তবে নিশ্চিন্তি। রবিবারের কাগজে কত বিজ্ঞাপন থাকে, নির্ঝঞ্ঝাট পরিবার বা কোনো বৃদ্ধার দেখাশুনো। মাইনেও ভাল। কবেই কাজ ছেড়ে চলে যেতেন। নেহাত সীতা আছেন। গজগজ করতে করতে কাপড় ধুতে লাগলেন। সীতা রান্নাঘরে ব্রেকফাস্ট তৈরি করছিলেন। পান্তা। লক্ষ্মণের ফেভারিট। ডাইনিং টেবিলে টুংটাং শব্দ শুনেই বললেন, "বেশি মাখন খেও না, কোলেস্টেরল বেড়ে যাবে। হঠাৎ যদি কিছু হয়, এই বিদেশ বিভুঁই-য়ে কাকে ডাকব।" রাম ইতস্তত গলায় বললেন, "না, না। ঐ একটু আরকি......" বলে এদিক-ওদিক তাকিয়ে আরও খানিকটা মাখন মাখিয়ে নিলেন। ওদিকে লক্ষ্মণ কাজের তদারকি করছেন। বানরেরা সব অস্ত্রে তেল মাখাচ্ছে, মুছেটুছে সাফসুতরো করে রাখছে। যুদ্ধের সময় আটকে গিয়ে যা বেইজ্জত হতে হয়েছে তা আর বলবার নয়। তাছাড়া মার্কেট ইকনমিতে অস্ত্রের দাম বেড়ে গেছে, পরিষ্কার না করলে জং ধরতে পারে। রাম লক্ষ্মণ আর সীতা সমেত অযোধ্যা ছেড়ে এখানে আসবার কারণ হলেন স্বয়ং কৌশল্যা! এমনভাবে রামকে আগলে আগলে রাখতেন যেন কচি খোকা। সীতা কোনো আবদার মেটাতে বললেই রাম মাকে দেখিয়ে দিতেন। বেড়ানো, সিনেমা দেখা তো দূরস্থান; ফুচকা খাওয়াতে বললেও সেই মা। নিরিবিলিতে কথা বলবার জো পর্যন্ত নেই। কাঁহাতক সহ্য হয় এসব। তাইতো ঝগড়াঝাঁটি করে আলাদা থাকবার বন্দোবস্ত করতে হল। ওদিকে লক্ষ্মণও আসতে চাইছিল। উর্মিলার সঙ্গে ঠিকমতো বনিবনা হচ্ছিল না। উর্মিলা সাফ বলে দিয়েছেন যে গাঁজাখোর স্বামীর সঙ্গে থাকবেন না, বাপেরবাড়ি গিয়ে খোরপোশের মামলা করবেন। লক্ষ্মণ এখন অন্য মেয়ের খোঁজে আছেন। নতুন জায়গায় গেলে যদি কাউকে পাওয়া যায়। তাই আসবার জন্য দাদার হাতে-পায়ে

ধরাধরি। ব্যাপারটা সীতার অসহ্য লাগছিল। রামই চোখ টিপে ফিসফিস করে বললেন, "আরে নিয়ে চলো। বাইরের কাজও তো অনেক থাকে, ওকে দিয়ে করাব, আজকাল মুফতে এমন বিশ্বাসী লোক পাবে কোথায়?" সীতা আর রাজি না হয়ে পারলেন না। প্রথমে ভাবলেন চিত্রকূটে থাকবেন। পাহাড়ি জায়গা, জল-হাওয়াও ভাল। কিন্তু তারও কি নিশ্চিন্তি আছে। ভরত প্রায়ই আসেন। ব্যাপারটা তার ঠিক বোধগম্য হয়নি। রাম কি গদি ছেড়ে দিলেন? নাকি অন্যত্র রাজধানী স্থাপন করবেন? রামের বিরুদ্ধে বিদ্রোহও করা যায় না, প্রজাদের মধ্যে এমন একটা গুডি গুডি ইমেজ যে সেটা ভাঙা খুব সহজ নয়। এমন ভালমানুষের মতো থাকেন যে বোঝবার উপায় নেই তিনি কী চিজ! কিন্তু চিত্রকূটে ভরতের এই আসা সীতাকে বেশ ভাবিয়ে তুলল। বাড়ির লোকজন দেখে যদি আবার মায়ের কথা মনে পড়ে যায়; তাহলে তো ক্যাচাল। অনেক সাধ্যসাধনা করে রামকে নিয়ে বেরিয়ে এসেছেন, ফিরে গেলে মান থাকবে! তাই চিত্রকূট থেকে আরও দক্ষিণে গিয়ে উপস্থিত হলেন অত্রিদার কো-অপারেটিভে। ভাবলেন এখানেই বাড়ি বানিয়ে থাকবেন। বেশ কাটছিল কিন্তু অত্রিদার স্ত্রী অনসূয়া বৌদি রামকে এমন আদরযত্ন করতে শুরু করলেন যে সীতা প্রমাদ গুনলেন। একেই বনচারিণী লোকজনের খুব একটা দেখা মেলে না; একই ব্যাটাছেলে দেখে দেখে চোখ হেজে গেছে। নতুন কোনো পেশিবহুল যুবক দেখলে আর থাকতে পারেন না। যত দিন যেতে লাগল আদিখ্যেতার বহরও বাড়তে লাগল। আর রামটাও তেমন, বৌদি বলতে একেবারে অজ্ঞান। সীতা কানাঘুষো শুনতে পান রাম আর অনসূয়া বৌদির সম্পর্কের কথা, দুর্ভাবনা বেড়েই চলে। ওদিকে ভিত কাটা পর্যন্ত হয়ে গেছে। কিন্তু সীতার এখানে থাকবার বিন্দুমাত্র ইচ্ছে নেই। যে জন্য শ্বশুরবাড়ি ছাড়া, সেই স্বামীকেই তো কাছে পাচ্ছেন না। মনে মনে ফন্দি আঁটছেন কী করে অন্য কোথাও চলে যাওয়া যায়, রামকেই বা কী বলা যায়। যোগাযোগটা অদ্ভুতভাবে ঘটল। একদিন বিকেলে রাম, লক্ষ্মণ এবং সীতা বেড়াতে বেরিয়েছেন। হাইরোড। রাস্তার আলোগুলো কারা খুলে নিয়ে গেছে। সন্ধে হতেই অন্ধকার, শুধু চাঁদের আবছা একটা আলো। হঠাৎ একদল ছোকরা তাঁদের ঘিরে ফেলল। কার কাছে সাহায্য চাইবেন ভেবে পাচ্ছেন না। ট্রাকগুলো পাশ দিয়ে হুসহাস চলে যাচ্ছে। ওদের কাছে সাহায্য চাওয়া মানে আবার কারো খপ্পরে গিয়ে পড়া। ওদিকে দুটো ছেলে রাম আর লক্ষ্মণকে জাপটে ধরল। দলের পান্ডা এগোল সীতার দিকে। কাপড় ধরে টান মারতেই রাম এক ঝটকায় ছেলেটিকে মাটিতে ফেলে ছুটে গিয়ে পান্ডাটিকে দিলে এক ধাক্কা। আচমকা ধাক্কায় গ্যাংলিডার মাটিতে পড়ে গেল। প্রথমে বেশ খানিকটা ধস্তাধস্তি হল, শেষে না পেরে রাম ছুঁড়ে মারলেন মালের বোতল, প্যান্টের পকেটে ছিল। মারতেই আশ্চর্য। পান্ডার মুখটা আস্তে আস্তে পাল্টে গেল! সবাই হাঁ, মারপিট থামিয়ে দিয়ে কাণ্ডটা কী হল বোঝবার চেষ্টা করছে। পান্ডাটিই নিস্তব্ধতা ভাঙল, "আমি এক গন্ধর্ব, কুবের কায়দা করে ফোটোশপে আমার ওপর অন্য একটা ফেস বসিয়ে দিয়েছিল, আপনার সঙ্গে ধস্তাধস্তি করবার সময় মুছে

গেছে। কুবের ব্যাটা ব্রেনটাও ওয়াশ করেছিল, বোতলটা ব্রহ্মতালুতে লাগতেই এক ঝটকায় সব পুরোনো কথা মনে পড়ে গেছে।" গন্ধর্ব তার কৃতকর্মের জন্য ক্ষমাটমা চাইল। তারপর সাঙ্গোপাঙ্গ সমেত অন্ধকারে মিলিয়ে গেল। সমস্ত ব্যাপারটায় তিনজন এত হতচকিত হয়ে গেলেন যে কো-অপারিটিভে আসার রাস্তাটা পর্যন্ত গুলিয়ে ফেললেন। খানিকক্ষণ উদভ্রান্তের মতো এদিক-ওদিক হাঁটার পর হঠাৎ দূরে আলোর একটা ক্ষীণ রেখা দেখা গেল। আলো লক্ষ্য করে অনেকটা আসার পর তাঁরা দেখলেন একটা মোটেল। বাইরে থেকে হাঁক মারতেই একজন বয়স্ক লোক বেরিয়ে এল। শরভঙ্গ। মোটেলের মালিক। রামকে দেখে চিনতে পারলেন। রাম ইশারায় চুপ করতে বললেন। ব্যাপারটা সীতার নজর এড়াল না। লক্ষ্মণ পরিচয় দিতেই শরভঙ্গ অভ্যর্থনা করে ভিতরে নিয়ে গেল। রাতে খাওয়াদাওয়ার পর যখন রাম-সীতা বিশ্রাম নিচ্ছেন, তখন সীতাই প্রসঙ্গটা তুললেন। রাম দেখলেন লুকিয়ে লাভ নেই। পান চিবোতে চিবোতে বললেন, "শরভঙ্গের সঙ্গে আলাপ অনেকদিনের। তখন আমাদের বিয়ে হয়নি। শরভঙ্গ অস্ত্রের চোরাচালান করে। বিশ্বস্ত লোক। বাজারের থেকে একটু কম দামে কালাশনিকভ, গ্রেনেড, শেল, মর্টার-টর্টার পাওয়া যায়। ইন্দ্রের সঙ্গে আমাদের মিসাইলের চুক্তিটা ওর মারফতই হচ্ছে। যা সব চারপাশে চলছে, মিসাইল ছাড়া কি প্রতিরক্ষা চলে? বাবার তো প্রথমে আপত্তি ছিল, পরে লঙ্কা থেকে তাড়কা এসে যখন আক্রমণ করল তখন তিনি মিসাইলের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করলেন। তার মধ্যে দিলাম পরমাণু বোমা ফাটিয়ে; ওদিকে শুধু বোমা থাকলে চলবে না, দূর লক্ষ্যে ফেলার যন্ত্র চাই। এতে লঙ্কাকে চাপে রাখা যাবে। বাবা আর ঝামেলা করলেন না। বোমার ব্লু-প্রিন্টটাও শরভঙ্গেরই আনা, মালমশলাও। তামাম দুনিয়া জুড়ে ওর নেটওয়ার্ক, এখানে ক'দিন গা ঢাকা দিয়ে আছে।" সীতা একটা হাই তুললেন। রাম বলে চললেন, "ব্লু-প্রিন্টের জন্যই তো বনে আসা, তবে এভাবে যে দেখা হবে ভাবিনি।" রাম সিগারেট ধরালেন। সীতা মনে মনে ভাবতে লাগলেন, "আমার বাড়ি থেকে বেরিয়ে আসা নিয়ে তাই টুঁ শব্দটিও পর্যন্ত করেনি, আমি ভাবি বুঝি আমার কথা ভেবে..." সীতা গুম হয়ে বসে রইলেন। হঠাৎ দরজায় শব্দ।

"কে?" রাম জিজ্ঞাসা করলেন।

"আমি শরভঙ্গ। কথা আছে, বাইরে আসুন।"

রাম বাইরে এলেন। দেখেন শরভঙ্গের হাতে সি ডি। "কী এটা?"

"মিসাইলের ব্লু-প্রিন্ট।" ফিসফিস করে বললেন, "আর এটা রাখুন" বলে রামকে একটা চাবি ধরিয়ে দিলেন।

"চাবি?"

"ওহো, আমার নতুন কোম্পানির কথা তো বলাই হয়নি। আমরা টার্ন-কি প্রজেক্ট করি। আপনার বাবা গুজরাটে একটা অ্যাটমিক রিঅ্যাকটার তৈরি করতে বলেছিলেন...."

"এবার মনে পড়েছে। তা বেশ তাড়াতাড়িই তো শেষ করলেন....."

গদগদ হয়ে শরভঙ্গ জবাব দিল, "এ আর এমন কী...."

"পেমেন্ট পেয়েছেন তো?"

"ওসব ব্যাপারে আপনার বাবা একদম পাকা, সুইস ব্যাঙ্কে জমা করে দিয়েছেন।" এদিক-ওদিক তাকিয়ে বললেন, "ঘরে আসুন, কেউ শুনে ফেলতে পারে।" শরভঙ্গ রামকে নিয়ে তার ঘরে চলে গেল।

এদিকে লক্ষ্মণ সীতার ঘরে ঢুকলেন। সীতা চুল আঁচড়াচ্ছিলেন। দাদা কোথায় জিজ্ঞাসা করাতে সীতা টুল টেনে বসে লক্ষ্মণকে সব বললেন। লক্ষ্মণ বললেন, "যাক আমি ভাবি...."

"আমিও তো। তোমার দাদার ঘটে যে বুদ্ধি আছে এখন তা জানলাম। দেখ, আবার আদিখ্যেতা করে ভরতকে সব যেন বলে না দেয়। যা পেটপাতলা লোক...জানো, আমাদের ফুলসজ্জার রাতের কথা শাশুড়িমাকে....কী লজ্জার কথা বলতো!"

"ধুস, ভাবলাম এখানে নতুন কোনো মেয়ের দেখা পাব.....কোথায় কী...."

"এই লক্ষ্মণ এসো তো, গয়নাগুলো গুনে দেখি বেড়ে গেল কিনা?" সীতা বিছানার উপর গয়নার বাক্স খুলে বসলেন।

"তেমার এই এক নেশা বৌদি....এত বোরিং...." অনিচ্ছা সত্ত্বেও লক্ষ্মণ হাত লাগালেন।

ওদিকে অন্য ঘরে শরভঙ্গের সঙ্গে রামের কথা হচ্ছে। শরভঙ্গ বলছে, "নতুন রি-অ্যাকটারটা অগস্ত্যকে দিয়েই উদ্বোধন করান,.....পয়সাওলা লোক। দেশময় গর্ভপাতের ক্লিনিক। শুধু যাচ্ছের্ন আর তিনবার বলছেন গর্ভপাত, গর্ভপাত, গর্ভপাত। ব্যস খাল্-লাস। রিস্কলেস। রোগী সঙ্গে সঙ্গে ক্লিনিক থেকে বেরিয়ে আসছে। দেখে এতটুকু বোঝবার জো নেই। ওনাকে হাতে রাখলে আপনার ফাইন্যান্সটাও স্ট্রং হবে।"

রাম শরভঙ্গকে চুমু খেলেন, "সাধে কি তোমায় এত ভালবাসি।"

"ও হ্যাঁ, বলতেই ভুলে গেছি, গোদাবরীর ধারে অগস্ত্যের একটা বাগানবাড়ি আছে। ফাঁকা। আপনারা ওখানে গিয়ে থাকতে পারেন।" রাম মৃদু আপত্তি জানালেন।

"অগস্ত্য অবশ্য মাঝে মধ্যে আসেন, ফুর্তিটুর্তি করে চলে যান। সারাক্ষণ কাজ ভাল লাগে?...আর এইরকম বাড়ি তাঁর দেশ জুড়ে আছে। আমি একটা মেইল করে দেব এখন।"

রাম ঘরে ফিরে এলেন। সীতা অঘোরে ঘুমোচ্ছেন। পাশে খোলা গয়নার বাক্স। লক্ষ্মণ বাইরে বসে গাঁজা খাচ্ছেন। চাঁদ ক্লান্ত হয়ে মাঝ আকাশে বিশ্রাম নিচ্ছে। ইঁদুর খেয়ে অ্যাসিড হওয়ায় একটা প্যাঁচা বেখাপ্পাভাবে ঢেকুর তুলছে। রাম ল্যাপটপটা চালু করে ব্লু-প্রিন্টটা পাঠালেন, গুপ্তচরদের ই-মেলগুলো চেক করে নিলেন। না, তেমন কিছু নেই। জনমত এখনও তাঁর দিকেই। মায়ের একটা মেসেজ এসেছে। লিখেছেন ভাল করে খেতে, শরীরের যত্ন নিতে। দেখতে দেখতে ঘুম আসছিল। কোকেনের একটা শট নিয়ে শুয়ে পড়লেন। পুরোনো অভ্যাস।

২

ঘুম ভেঙে রাম দেখেন সকাল হয়ে গেছে। কে যেন বেড-টি দিয়ে গেছে। সকালে কচি করে একটা কোকেনের ডোজ নিতে হয়, খোয়ারি ভাঙা। খবরের কাজগটা টেনে নিলেন। দেখলেন মিসাইলের খবরটা বেরিয়েছে। ঝট করে স্নান সেরে বাইরে এলেন। সীতা আর লক্ষ্মণ ডিম-পরোটা খাচ্ছেন। রামও বসে পড়লেন। সীতাকে গোদাবরীর ব্যাপারটা বলায় খুশিতে তিনি তিনখানা পরোটা এক্সট্রা খেয়ে নিলেন। পরে অ্যান্টাসিডের জন্য ঘরে দৌড়োলেন। খাওয়া শেষ করে সবাই সিয়েলো করে অত্রিদার কো-অপারেটিভে এলেন। অত্রিদারা অবশ্য কোনো দুশ্চিন্তা করেননি। লক্ষ্মণ টাইমে এস.এম.এস. করে দিয়েছিলেন। দুপুরে খাওয়াদাওয়া করলেন। তারপর বিকেলে মালপত্র নিয়ে গোদাবরীর দিকে রওনা দিলেন। পথে বৃদ্ধ জটায়ুর সঙ্গে দেখা। দুপুরে তিনি সব সময় পাখির ছদ্মবেশে থাকেন। বললেন, "আমি গরুড়ের ভাই, তোমাদের বাবার বন্ধু। তোমরা নির্বিঘ্নে পঞ্চবটীতে বাস কর, তোমাদের থেকে তোলা নেব না।" রামকে আলাদা ডেকে বললেন, "রাতে যদি লাগে বোলো......ব্যবস্থা আছে....সব দেশেরই পাবে....হেঁ *হেঁ হেঁ*"

রাম জটায়ুর বোমাইল নম্বরটা নিলেন।

ক'টা দিন ভালই কাটল। হঠাৎ ল্যাপটপে একটা মেইল, লঙ্কা থেকে দুজন গুপ্তচর এসেছে। খর ও দূষণ। যখন-তখন রেইড করছে। শরভঙ্গ ধরা পড়েছে। জটায়ু কোনোরকমে পালিয়ে গেলেও ডেরা থেকে সত্তরটা মেয়ে ধরা পড়েছে। রাম প্রমাদ গুনলেন। তার এত দিনের ড্রাগের কারবার কিনা শেষে খুচরো অফিসারের জন্য নষ্ট হয়ে যাবে!

লঙ্কার অবশ্য এই রেইডের কারণ আছে। জটায়ু প্রায়ই লঙ্কা থেকে মেয়ে ধরে আনত। আর শরভঙ্গ সন্ত্রাসবাদীদের ওয়েপন সাপ্লাই দিত। ওরা একবার ক্যু করে বসেছিল, আগে থেকে খবর পাওয়ায় তা ভেস্তে যায়। কিন্তু এতে প্রেসিডেন্ট রাবণ খুব চটেছিলেন। তাই পাঠিয়েছেন তদন্ত করতে। ওরা রামকে খুঁজতে অযোধ্যাতেও গেছিল, কিন্তু সেখানে পায়নি...কিন্তু এখন যদি শরভঙ্গকে চাপ দিয়ে....ভাবতেই রামের মেরুদণ্ড দিয়ে ঠান্ডা স্রোত বয়ে গেল। একটা ভদকার বোতল খুলে সুইমিং পুলের ধারে বসলেন। দুটো মেয়ে-বানর গাছে বসে হাওয়াকেলি করছে। রাম হালকা ঝারি করছিলেন আর নিট বোতল থেকে মারছিলেন। হঠাৎ একটা আইডিয়া এল। জটায়ুর সঙ্গে যোগাযোগ করলেন, এখন আন্ডারগ্রাউন্ড ঠেকায় লুকিয়ে আছে। কথা হল, জটায়ু দুজন বানরবোমা পাঠাবেন। আর তারা গিয়ে খর-দূষণকে একবার জড়িয়ে ধরতে পারলেই কেল্লা ফতে। সেই মতো কাজ হল। টিভিতে হেডলাইন, "বানরবোমায় লঙ্কার দুজন অজ্ঞাতপরিচয় ব্যক্তির মৃত্যু।"

যেদিন খবর এল সেদিনই পার্টি। রাতভর খানাপিনা, গানবাজানা, স্ট্রিপটিজ নাচের জন্য আমেরিকা থেকে কয়েকজন নর্তকী আনা হয়েছিল। বাঁধভাঙা ফুর্তির জোয়ারে ভেসে গিয়েছিল সবাই। অনেকদিন পর রাম কোকেন ছাড়াই ঘুমোতে পারলেন।

ওদিকে লঙ্কার সরকার এই খবরে ভীষণ উদ্বিগ্ন হয়ে উঠল। মেয়ে পাচার, মাদক ব্যবসা, অস্ত্রের চোরাচালান সবই আবার আগের মতো চলতে থাকল। তবে এটা বোঝা গেল যে একজন দেশীয় এজেন্ট ছাড়া এইভাবে দিনের পর দিন এইসব কাজকারবার চালানো সম্ভব নয়। ক্যাবিনেট মিটিং ডেকে গুপ্তচর নিয়োগ করা হল। বেশ কয়েক মাস পরে গুপ্তচর খবর দিল একজন এজেন্ট এখানে কাজ করছে বটে কিন্তু তার নাম বলা যাবে না, বললে অনর্থ হয়ে যাবে। প্রেসিডেন্ট রাবণ অভয় দিলেন। বললেন, "নাম কোনোভাবে জানাজানি হবে না।" তাতেও গুপ্তচর টলল না। বলল, "এর আগে ওসব স্তোকবাক্যে অনেককে ভুলিয়েছেন, আমি ওসবে ভুলছি না। কে জানে কখন আবার আমে-দুধে মিশে যাবে, আর আমি আঁটি গড়াগড়ি খাব।...পিতৃদত্ত প্রাণটা এভাবে হারাতে চাই না।" হঠাৎ কুম্ভকর্ণ বিশ্রীভাবে চেঁচিয়ে তার ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন, "কে? কে আছে সর্ষের মধ্যে ভূত হয়ে...পেলেই তাকে" বলে মস্ত একটা হাই তুলে আবার ঘরে ঢুকে ঘুমিয়ে পড়লেন। থাইরয়েড, উপরন্তু নার্ভের রোগী। ডাক্তার তাকে ঘুমের ওষুধ দিয়েছেন। প্রায় সারাক্ষণই ঘুমোন। বেগতিক দেখে রাবণ গুপ্তচরকে রাতে একাকী দেখা করতে বললেন। গুপ্তচর এলে রাবণ তাকে আশ্বস্ত করে বললেন, "তোমার কোনো চিন্তা নেই, তোমাকে বাঙ্কারে পাঠিয়ে দেব। সেখানে আমার আত্মীয়েরা আছেন। তুমি তোমার পরিবার সমেত ওখানেই থাকবে....এখন বল কে সেই কালপ্রিট?"

"শ্রীমান বিভীষণ মহারাজ"

রাবণ দারুণ চমকে উঠলেন, 'বিভীষণ! এত সাত্ত্বিক লোক, সারাক্ষণ পুজো-আর্চা নিয়ে থাকে। সবসময় নীতিকথা আওড়ায়, চলাফেরায় কী অসম্ভব একটা মার্জিত ভাব। শেষে সে কিনা....?' রাবণ অবিশ্বাসের দৃষ্টিতে গুপ্তচরের দিকে তাকালেন। গুপ্তচর তখন তাকে সমস্ত ছবি, ভিডিয়ো ফিল্ম দেখাল; রেকর্ড করা কথা শোনাল।

পরদিন বিভীষণকে ডেকে রাবণ বিরাট ধাতালেন। বললেন, "নেহাত নিজের ভাই, অন্য কেউ হলে মৃত্যুদণ্ড দিতাম। দেশদ্রোহিতার শাস্তি। কিন্তু তোকে আমি নির্বাসন দিলাম। আজ রাতের মধ্যেই তোকে লঙ্কা ছেড়ে অন্যত্র যেতে হবে।" সবাই জানল বিভীষণ সন্ন্যাস নিয়ে কোথায় যেন চলে গেছেন।

দিন যায়। রাবণের মনে কোনো শান্তি নেই। খাওয়াদাওয়াও কমে গেছে। এইভাবে রাজ্য চালানো যে কী টেনশনের কাজ তা হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছেন। ডাক্তার বলেছেন প্রমোদের ব্যবস্থা করতে। উদ্বিগ্ন হয়ে মন্দোদরী ইন্দ্রজিৎকে খবর আনতে পাঠালেন। সব শুনে ইন্দ্রজিৎ বললেন, "ঐ রকম এক-আধটা ডাল ছেঁটে লাভ নেই, মূল গাছটাকেই উপড়ে ফেলতে হবে।" আবার মিটিং বসল। মারীচের নেতৃত্বে কমিটি গঠন করা হল। মাস দুই পর রিপোর্ট জমা পড়ল। কঠোর নিরাপত্তা সত্ত্বেও দু-একটা লাইন ফাঁস হয়ে গেল। তার মধ্যে একটি হল রামের কোকেন ও মেয়েছেলের প্রতি আসক্তি এবং সীতার সোনাপ্রীতি। সেইমতো ঠিক হল প্রথমে সেক্সি শূর্পণখা রামকে শরীরের লোভ দেখিয়ে প্রতিরক্ষা সরঞ্জামের কারখানা আর পরমাণু চুল্লিগুলোর ঠিকানা জেনে নেবেন।

তারপর সেলফ্ গাইডেড ব্যালাস্টিক মিসাইল দিয়ে সেগুলোকে ধ্বংস করে ফেলা হবে। শুরু হল "অপারেশন শঠেশাঠ্যং"।

৩

শরতের সকাল। হাওয়ায় শিউলি ফুলের গন্ধ নেই। একটা ফরাসি কোম্পানিকে বরাত দেওয়া হয়েছে। শিউলি ফুল থেকে পারফিউম তৈরি করবে। ওদের লোকাল এজেন্টরা সব ফুল নিয়ে গেছে। তবে সাদা মেঘগুলো আছে। হয়ত বুড়ো হয়ে গেছে বলে ওদেরকে কেউ খুব একটা পাত্তা দিচ্ছে না। গাছে গাছে পাখিরা আর ফুলে ফুলে মৌমাছিরা পরনিন্দা-পরচর্চা করছে। সীতার শ্যাম্পু শেষ। ড্রায়ার দিয়ে চুল শুকোচ্ছেন। রাম আর লক্ষ্মণ সকাল থেকে ব্যস্ত। শিকারে যাবেন। লক্ষ্মণ শেষবারের মতন দেখে নিচ্ছেন স্যান্ডউইচ, বিয়ারের ক্যান সব ঠিকঠাক নেওয়া হয়েছে কি না। রাম বন্দুক নিয়ে পড়েছেন। সীতা যাবেন না, রক্ত দেখলে তার গা গোলায়। সঙ্গে লোকলস্কর, জিপ, লরি কী নেই। রাম-লক্ষ্মণ অবশ্য আমেরিকান মোটরস-এর জিপে যাবেন। কিছুদূর যাওয়ার পর ভাল জায়গা দেখে তাঁবু ফেলা হল। ক্যাটারিং-এর লোকজন রান্নার তোড়জোড় শুরু করে দিল। চিকেন পকোড়া চাট। রাম-লক্ষ্মণ চেয়ারে বসে বিয়ারের বোতল খুললেন। দু-এক চুমুক দেওয়ার পর লক্ষ্মণ দূরবিনটা নিয়ে চারপাশ দেখতে লাগলেন। দেখলেন কাছেই একটা সরোবরে কী যেন নড়ছে। একটু নজর করে দেখলেন এক ফাটাফাটি সুন্দরী বিকিনি পরে সাঁতার কাটছে। লক্ষ্মণ ভাবলেন, একি স্বপ্ন? না মায়া? ভাবতে ভাবতে রামের দিকে তাকিয়ে দেখেন রামও নিজের দূরবিনটা সেদিকেই তাক করেছেন। তারও হালত খারাপ। বেগতিক দেখে লক্ষ্মণ বললেন, "দাদা, তুই বোস। আমি চারপাশটা একটু দেখে আসি।" রাম বুঝলেন। বললেন, "যা তবে খুব একটা দেরি করিস না। দু'পাত্তর খেয়ে আমিও যাব।" লক্ষ্মণের তখন অপেক্ষা করার জো নেই। মাথা নেড়ে দ্রুত পায়ে এগোতে লাগলেন। রামও ছক কষছেন। কী করে ঐ মালকে হাত করা যায়। থাকতে না পেরে তিনিও উঠে পড়লেন। কিছুক্ষণ যাওয়ার পর মাথায় ঠোক্কর, দেখেন লক্ষ্মণ। ওদিকে দু'জন পুরুষকে তার দিকে আসতে দেখে যুবতীটি সরোবর থেকে উঠে দাঁড়াল। ভিজে গায়ে বুকের ভাঁজে জলের ফোঁটাগুলো হীরের মতো ঝকমক করছে। যৌবন ছোট্ট কস্টিউম থেকে পাকা বেদানার মতন ফেটে বেরোচ্ছে। রাম-লক্ষ্মণের চোখ সরছিল না। ব্যাপারটা বুঝে সুন্দরী হেসে গায়ে তোয়ালে জড়িয়ে সামনে দাঁড়ানো ক্যারাভানে ঢুকে গেল। রাম-লক্ষ্মণ মুখ চাওয়া-চাওয়ি করলেন। কিছুক্ষণ পর সুন্দরীটি দরজা খুলে বেরোল। সুন্দরীটি আর কেউই নন, প্রেসিডেন্ট রাবণের বোন, শূর্পণখা। কালো রঙের শিফন জর্জেট শাড়ি। সিগ্ধ। ম্যাচিং ব্লাউজ। ক্লিভেজ স্পষ্ট। হাল্কা মেকআপ করেছেন। লক্ষ্মণের মনে হয় যেন একটা সাপ। রামই তড়িঘড়ি আলাপ করলেন। শূর্প এমন একটা ভান করলেন যেন চেনেনেই না। প্রতিনমস্কার করে বললেন, "আমি শূর্প, প্যারিসে থাকি। এখানে ছুটিতে এসেছি।" কথা বলতে বলতে তাঁবুর দিকে এগোলেন। শূর্পর মন

লক্ষ্মণকে দেখেই চেগে উঠল। লক্ষ্মণের নাম তিনি এজেন্টদের কাছ থেকে শুনেছেন, ছবিও দেখেছেন, কিন্তু তিনি যে এরকম হ্যান্ডসাম তা আজ প্রথম টের পেলেন। সদ্য বিধবা হয়েছেন। মনে হল লক্ষ্মণকে পেলে আবার জীবন কানায় কানায় ভরে উঠবে। কিন্তু রামের এই গায়ে-পড়া স্বভাবটা তাঁর পছন্দ হচ্ছিল না। তাঁবুতে পৌঁছনোর পর রাম শূর্পকে বিয়ার অফার করলেন। বিয়ারে চুমুক দিতে দিতে শূর্প উদাস ভঙ্গিতে চারপাশটা দেখে নিলেন। রসিক হাওয়ার ঝাপটায় মাঝে মাঝে শূর্পর বিষণ্ণ নাভিটা দেখা যাচ্ছিল। নাভিটা দেখে লক্ষ্মণের মাথা ঝিমঝিম করছিল। তাঁর মনে হল কিছু একটা বলা দরকার। জিজ্ঞাসা করলেন, "আপনি কী করেন?" মিষ্টি হেসে শূর্প জানালেন, "আমাদের প্যারিসে ড্রেস ডিজাইনের ব্যবসা আছে।" লক্ষ্মণ বলতে যাচ্ছিলেন যে তার জন্য কোনো ড্রেস করা....সামলে নিলেন। কটা দিন যাক। দুজনেই শিকার ভুলে শূর্পকে তেলাতে লাগলেন। হাওয়া ক্রমশ গরম হয়ে উঠল। শূর্পণখা বুঝলেন রাম কাত। কিন্তু তিনিও লক্ষ্মণের প্রতি একটা টান অনুভব করছেন। শূর্পণখাকে নিয়ে দুই ভাই-এর মধ্যে বাওয়াল হওয়ার উপক্রম। এ ওকে শাসাচ্ছে। হঠৎ রাম বিয়ারের ক্যানে ঘুষি মারলেন। বললেন, লক্ষ্মণ যদি এখান থেকে চলে না যায় তবে এটা ওর পেটে ভরে দেবেন। লক্ষ্মণও কম যান না, তিনি পকেট থেকে বার করলেন ঝা চকচকে কানপুরিয়া। দুজন দুজনকে ডুয়েলে আহ্বান জানালেন। শূর্পণখা দেখলেন এ তো আচ্ছা গেরো। রাম যদি মরে যায় তাহলে কোথা থেকে খবর পাবেন, আবার লক্ষ্মণকেও বা তিনি কীভাবে মরতে দেন। তিনি যে তাঁর প্রেমে দিওয়ানা। লক্ষ্মণের হাত চেপে ধরে শূর্প বললেন, "আপনি এরকম করতে পারেন না। কিছুতেই না....উনি যখন বলছেন তখন ঘুরেই আসুন না।" লক্ষ্মণ হাত ছাড়াবার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। শূর্পণখাও কম যান না, কিছুতেই লক্ষ্মণের হাত ছাড়ছেন না। এবার লক্ষ্মণের পুরো রাগ শূর্পণখার ওপর পড়ল। প্রথমে তিনি শূর্পকে খিস্তি দিলেন, তারপর এক ঝটকায় মাটিতে ফেলে দিয়ে চালিয়ে দিলেন কানপুরিয়া। সমস্ত ব্যাপারটা এত আচমকা ঘটে গেল যে রামও কিছু করতে পারলেন না। দেখলেন লক্ষ্মণ চালালেন আর শূর্পণখার নাক কেটে গেল। রক্তে চারদিক ভেসে যাচ্ছিল। লক্ষ্মণ তাঁর ভুল বুঝতে পারলেন, কানপুরিয়া পড়ে গেল। সবাই মিলে ধরাধরি করে শূর্পণখাকে তাঁবুর ভিতরে নিয়ে গেলেন। রাম সুষেনকে কল দিলেন। সীতার মন ভাল নেই। কোথায় নতুন জায়গা, একটু আনন্দ-ফূর্তি করবেন, তা না, কোথাকার এক মাগির প্রেমে কী কাণ্ডটাই না বাধাল দু'ভাই-য়ে। ছি! ছি! আর রামের ভাবসাবও আজকাল যেন কেমন। কতদিন তাঁরা সেক্স করেননি। রাতের দিকে মাঝে মধ্যেই বিছানায় থাকেন না। একদিন পিছু নিয়ে দেখলেন রাম শূর্পণখার ঘরে গিয়ে ঢুকল, মাগো!...এই কথা যদি শ্বশুরবাড়ির লোক শোনে, বিশেষ করে শাশুড়ি, রক্ষে থাকবে? মুখ দেখাতে পারবেন সেখানে? মিথিলায় যেদিন প্রথম দেখা হয়েছিল সেদিন অন্যরকম ছিলেন। মনে আছে রাম পিয়ারে কাঁদার ধুতি আর গুচ্চির উত্তরীয় পরেছিলেন, চোখে গভীর চাহনি। খালি মিটিমিটি হাসছিলেন। আর প্রথম রাত? কত শপথ; কত কসম! আর আজ? সীতা

একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেললেন। নতুন যে কী একটা ব্যবসা ধরল, চোখদুটো সারাক্ষণই ঢুলুঢুলু, কী যে খান কে জানে! তবে কি রান্নাঘরের তেলকালি মেখে আর ফাইফরমাশ খেটেই এই যৌবন চলে যাবে? যৌবন তো দু'দিনের, সেটাই যদি ঠিক মতন উপভোগ করা না যায় তবে কীসের এই জীবন? এই পরাধীনতাই বা কেন? উড়ে গেলেই তো হয়। কিন্তু যাবেন কোথায়, ওদের নজর সব দিকে। না, সংসারের ঘানি টানাই তাঁর কপালে লেখা আছে। এইরকম সাতপাঁচ ভাবছেন, হঠাৎ দাসী এসে বলল, "খাবার তৈরি করতে হবে, লঙ্কান ফুড।" এই এক নতুন ফ্যাচাং হয়েছে। শূর্পণখার জন্য ডেলি নিত্যনতুন রান্না করা। আজ মেক্সিকান, তো কাল কন্টিনেন্টাল, পরশু থাই। আর পারি না বাপু। মাঝে মধ্যে মনে হয় সুইসাইড করি। তারও কি উপায় আছে, পোড়া যৌবনটা যে মানা করে। রাগে গজগজ করতে করতে সীতা রান্নাঘরের দিকে এগোলেন।

৪

শূর্পণখার অবস্থার উন্নতি হয়েছে। তিনি এখন হেঁটেচলে বেড়াচ্ছেন। লক্ষ্মণের সঙ্গে ভাব জমেছে। যে কাজে এসেছিলেন তা প্রায় সফল। বেশ কিছু জায়গার ঠিকানা পাওয়া গেছে রামের কাছ থেকে। একটা ম্যাপ বানিয়ে নিয়েছেন। তবে দুঃখ একটাই, নাক নিয়ে। সুষেন বলেছেন চিন্তার কিচ্ছু নেই, প্লাস্টিক সার্জারিতে ঠিক হয়ে যাবে। লক্ষ্মণকে সঙ্গে নিয়ে গেলে ভাল হত, কিন্তু দাদা মেনে নেবেন না। অনেকদিন ঘরছাড়া, তাই সেরে উঠেই প্রাইভেট জেটে সোজা লঙ্কা।

রাবণ অনেকদিন শূর্পণখার খবর না পেয়ে বেশ চিন্তায় ছিলেন। প্রেসারটাও বেড়েছিল। মন্দোদরী এসে সান্ত্বনা দিতেন। বলতেন, "ননদকে তো আমি চিনি, কোথাও ফেঁসেছে। তবে দেখো জাল কেটে ঠিক বেরিয়ে আসবে।" শূর্পণখা আসবার পর সোজা চলে গেলেন রাবণের ঘরে। নাকে কাটা দাগ দেখে রাবণ কারণ জিজ্ঞাসা করলেন। সব খুলে বললেন শূর্পণখা। রাবণ তো রেগে আগুন। আইসব্যাগ দিয়ে মাথা ঠান্ডা করবার পর শূর্পণখার আনা ডকুমেন্টগুলো দেখলেন। ভিতরে প্রতিশোধের ইচ্ছা ধিকিধিকি জ্বলছে। প্রথমে খর-দূষন বানরবোমায় মারা গেল, তারপর শূর্পণখার নাক কাটা! উফ্, এ যে সারা লঙ্কার নাক কাটা গেল। শেষে ঝোড়ো মিটিং ডেকে সিদ্ধান্ত নিলেন অযোধ্যার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করবেন। সেই মতো সীমান্তে সৈন্য মোতায়েন হল। আধুনিক যোগাযোগ ব্যবস্থার কল্যাণে সারা পৃথিবী মুহূর্তে জেনে গেল। বিভিন্ন দেশ থেকে নানা প্রেসার আসতে লাগল। আমেরিকাসহ জি-সেভেনভুক্ত দেশগুলি বলল টোটাল ভর্তুকি তুলে নেবে। বিভিন্ন প্রজেক্টে টাকা দেওয়া বন্ধ হয়ে যাবে জানাল বিশ্বব্যাঙ্ক। কিষ্কিন্ধ্যা বলল লঙ্কা থেকে কলা ইমপোর্ট বন্ধ করে দেবে। নেতারা শান্তির জন্য বৈঠক শুরু করে দিলেন। জাতিসংঘের সেক্রেটারি এসে রাবণকে বোঝালেন, এতে লঙ্কা তথা দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার অর্থনৈতিক উন্নতি ব্যাহত হবে। অবশেষে প্রচণ্ড আন্তর্জাতিক চাপের মুখে পড়ে যুদ্ধ থেকে বিরত থাকলেন রাবণ। কিন্তু মনের ভিতর খচখচানিটা গেল না। ক'দিন পর অকম্পন এসে রাবণকে একটা প্ল্যান দিল। সীতার

সোনায় উইকনেসের কথা সবাই জানে। ঠিক হল মারীচ প্রথমে লরিভর্তি সোনার বিস্কুট নিয়ে পঞ্চবটীতে যাবে। এজেন্ট মারফত কথাটা রামের কানে তুলে দেখা হবে। রাম সেটা সীতাকে বলবে। সীতা সেই বিস্কুটগুলো আনার জন্য বায়না ধরবে। সোনার খোঁজে রাম-লক্ষ্মণ মারীচের পেছনে ধাওয়া করবে। আর এই মওকায় রাবণ গিয়ে সীতার শ্লীলতাহানি করবেন। কেউ টের পাবে না। পরে ছবিসহ ঘটনাটা ভারতের কোনো একটা বড়সড় নিউজ এজেন্সিতে ধরিয়ে দিলেই হল। রামের নাককাটা যাবে। প্রজাদের কাছে সীতাকে নিয়ে যেতে পারবে না, আবার ফেলে দিতেও পারবে না। কারণ ফেললেই বধূ নির্যাতনের কেসে ফেঁসে যাবে। সেইমতো সব ঠিক হয়ে গেল। যথাসময়ে রাবণ, মারীচ, অকম্পন, বজ্রদংষ্ট্র ছদ্মবেশে পঞ্চবটীতে পৌঁছলেন।

রবিবার। ছুটির দিন। সারা সপ্তাহের খাটাখাটির পর বিশ্রাম। কিন্তু অগস্ত্যের বাগানবাড়িতে সকাল থেকেই ঝগড়াঝাঁটি। রাম সকালেই দু'পাত্তর চড়িয়েছেন, মেজাজটা খিঁচড়ে আছে। সীতা রাত থেকে একটা সাতনরি হারের জন্য আবদার করেছেন। গতকাল পার্টিতে ওই হার গলায় রুমাকে দেখেছেন, একটা বানরী যা পরতে পারে, তিনি পারেন না! রাম অনেক করে বোঝানোর চেষ্টা করেছিলেন। বলেছিলেন যে আজকাল কত কী উঠেছে, ডায়মন্ড, প্ল্যাটিনাম....কিন্তু সীতার সেই এক কথা....সাতনরি তার চাই-ই চাই।

হঠাৎ এক খোচড় এসে খবর দিল সোনার বিস্কুটভর্তি লরি এখান দিয়ে যাবে। স্মাগলারের সোনা, একবার হাতে লেগে গেলেই...। কথাটা সীতার কানে গেল। বললেন, "না দিলে বিষ খাব।" রাম ভাবলেন সোনার জন্য চোরের ওপর বাটপাড়িটা মন্দ হয় না। এই মওকায় যদি গোল্ড ডিপোজিটটাও বেড়ে যায় ক্ষতি নেই। সিদ্ধান্ত হল, রাম-লক্ষ্মণ কিছু বিশ্বস্ত বানর নিয়ে লরির পেছনে ধাওয়া করবেন। সীতাকে বারণ করে দেওয়া হল তিনি যেন বাইরে না বেরোন। দুপুরের দিকে লরির খবর এল। কথামতো সবাই বেরিয়ে পড়ল। লরিটা শ্যাওলা রঙের। নম্বরটা লক্ষ্মণ দূরবিন দিয়ে দেখে নিলেন। ওদিকে লরিতে মারীচের বুক দুরুদুরু করছে। গাড়িটা নিয়ে অনেক দূরে যেতে হবে যাতে অগস্ত্যের বাগানবাড়িতে আসতে ঘন্টা আড়াই সময় লাগে। রাবণের অর্ডার। রিয়্যার ভিউ মিররে দেখলেন রাম-লক্ষ্মণ লরি থামাতে ইশারা করছেন। মারীচ অ্যাক্সিলেটরে চাপ দিল। অনেকক্ষণ ধরে গাড়ির ছোঁয়াছুঁয়ি চলল। মারীচ খানিকটা এগিয়ে গিয়েছিল। পরে জিপ লরিকে প্রায় ধরে ফেলল। কয়েক রাউন্ড গুলিও চলল। টাল সামলাতে না পেরে মারীচ একটা গাছে ধাক্কা মারল। স্পট ডেড। বানরেরা মারীচের বডিটা লরি থেকে বের করল। রাম-লক্ষ্মণ দেখছেন ক'পেটি গোল্ড এল। একজন বানর এসে খবর দিল, লরিড্রাইভারের পকেট থেকে আপত্তিকর সব কাগজপত্র পাওয়া গেছে। মনে হচ্ছে লঙ্কার লোক, নম্বরটাও ফলস্।

শুনে তো রাম-লক্ষ্মণের চোখ কপালে। এটা লঙ্কার কোনো ষড়যন্ত্র নয়তো? মোবাইলে সীতাকে ডায়াল করলেন, রিং হয়ে গেল। সন্ধে হয়ে আসছে, অনেকটা দূরেও এসে পড়েছেন। রাম-লক্ষ্মণের দুশ্চিন্তা বাড়তে লাগল। ওদিকে গোদাবরীর

তীরে তখন অন্য এক চিত্রনাট্য চলছে। রাবণ সন্ন্যাসী সেজে অগস্ত্যের বাগানবাড়িতে এসে বেল বাজালেন। হাতে কমণ্ডুলু। আসবার আগে কায়দা করে টেলিফোনের তারটা কেটে দিয়েছেন। অকম্পন ঝোপের ভিতর হ্যান্ডিক্যাম নিয়ে তাক করে। শ্লীলতাহানিটা ফুল রেকর্ড করে নেবেন। বেল বাজাতেই বাড়ির ভিতর থেকে প্রশ্ন, "কে?"

"আমি সন্ন্যাসী। পুণ্যফল বেচতে এসেছি। খুব সস্তা, একটা নিলে অন্যটা ফ্রি।" রাবণ গম্ভীর গলায় বললেন। দাসী দরজা খুলে দিল। সন্ন্যাসীর ড্রেসে থাকায় কোনো সন্দেহ হল না। "ভিতরে আসুন। দাদাবাবুরা তো নেই, বৌদিকে খবর দিচ্ছি।" রাবণ ড্রয়িংরুমে বসলেন। একটু পরে নূপুরের শব্দে ঘুরলেন। দেখলেন নীলবসনা এক সুন্দরী। হাসিমুখে সে বলল, "আমি সীতা।" সীতাকে দেখে রাবণের হৃদয়ে টাইটানিকের মিউজিক বাজতে শুরু করল। তন্ত্রীতে তন্ত্রীতে ঝংকার উঠতে লাগল। মনে হল এই পড়ন্ত বয়সেও বসন্ত সারা শরীরে ঢুকে গেছে, ভায়াগ্রার আর দরকার নেই। আগের প্ল্যান ক্যান্সেল করে ফেললেন। সীতাকে তার চাই বিছানায় ডেলি। তবেই শালা রাম উচিত শিক্ষা পাবে। উত্তেজনায় রাবণ দাঁড়িয়ে উঠলেন। সীতা অপলক চোখে সন্ন্যাসীর দিকে তাকিয়ে। কি রঙ, কি গড়ন! যেন কন্দর্প স্বয়ং সামনে দাঁড়িয়ে। চোখের তারা কপার সালফেটের মতো। সীতার মনে হল ওই চোখেই তার সব—জীবন, যৌবন, ধন, মান। দাসীর গলাখ্যাকারি, "সরবত"। সীতা অপ্রস্তুত হয়ে গ্লাসটা সন্ন্যাসীকে দিলেন, "আপনি উপবেশন করুন মহোত্তম।" রাবণ সরবত খেতে খেতে কী বলবেন মনে মনে আউড়ে নিলেন। সরবত শেষ করে বললেন, "তুমি নানান ভোগান্তির মধ্যে আছ, তোমার চোখের কোণে কালি, ...মনেও" সীতা মাথা নেড়ে সায় দিলেন।

"আমি দৈব নির্দেশে এসেছি...তোমাকে এই যন্ত্রণা থেকে মুক্তি দেব বলে।"

সীতা কেঁদে ফেললেন, "খুবই অশান্তিতে আছি মহারাজ। দিনরাত হেঁসেল, তার ওপর লাথি-ঝাঁটা। অন্য কোনও পুরুষের সঙ্গে কথা বললেও সন্দেহ। তারপর পরস্ত্রী নিয়ে ফষ্টিনষ্টি তো আছেই, মাঝে মধ্যে মনে হয় সংসারের মুখে ঝামা ঘষে কোথাও চলে যাই..."

"যাবেই তো, এটা তো নারী স্বাধীনতার যুগ।" দু'হাত প্রসারিত করে রাবণ বললেন, "তাইতো এসেছি তোমায় নিয়ে যেতে.."

"কোথায়? কে আপনি", সীতার গলায় একটু সংশয়।

"আমি প্রেসিডেন্ট রাবণ। কথা দিচ্ছি, পাট না হোক, অন্তত প্লাস্টিকরানি করে রাখব।" সীতা নতুন দৃষ্টিতে সন্ন্যাসীর দিকে তাকালেন। রাবণ আবার বললেন, "ইওরোপ, আমেরিকার দিকে তাকাও। ওখানে সামান্য কথা কাটাকাটিতে ডিভোর্স হয়ে যায়....আর তোমার ব্যাপারটা তো সাংঘাতিক।....অশোকবনে শুধু তোমারই জন্য অট্টালিকা বানিয়েছি। সারারাত দুজনে মিলে মস্তি করে চাঁদ দেখব আর গল্প করব। আমার দেশে দারুণ সব বিচ আছে, সেখানে ঘুরে বেড়াব। ক্রিকেট দেখব। আর ফি বছর ইওরোপ ট্যুর তো আছেই...চাইলে মহাকাশেও নিয়ে যেতে পারি..."

সীতার লোভ হচ্ছিল, তবুও বললেন, "চারিদিকে ঢি ঢি পড়ে যাবে....কলঙ্কিনী বলবে সবাই।"

"কিসের কলঙ্ক? তুমি নিজের ইচ্ছেয় যাচ্ছ। আর যারা কলঙ্কিনী বলবে তারা এসেছে তোমার দুর্দিনে?....ওরা ওরকমই, দু'দিন তোমার কথা বলবে, আবার নতুন কোনও স্ক্যান্ডাল পেলে বেমালুম ভুলে যাবে। ....লিজ টেলরকে চেনো?" সীতা মাথা নাড়লেন, "না।"

"কতবার বিয়ে করেছেন জান? ছ'বার। তার মধ্যে একজনকে দুবার। আর এসব কথা আজকাল কেউ ভাবে নাকি? তুমি লঙ্কার কোষাগারের কথা ভাব। সোনাদানা, মণিমুক্তো কী নেই। রতনহার, চন্দ্রহার, সাতনরি—কী চাই বল না...."

"সাতনরি....সত্যি?" সীতা রাজি হয়ে গেলেন।

"এই মন্ত্রপূত চকোলেটটা খাও, এতে মেন্টাল স্ট্রেন্থ বাড়বে।"

ওদিকে অকম্পনকে মশা কামড়াচ্ছে। ভাবছেন রাবণ করছে কী। হঠাৎ হেলিকপ্টারের শব্দে ওপরের দিকে তাকালেন, এ তো তাদেরই। এয়ার পুষ্পক। হেলিকপ্টারটা অগস্ত্যের বাগানবাড়ির সামনে ল্যান্ড করল। রাবণ অকম্পনকে ডেকে বুঝিয়ে দিলেন কী করতে হবে। হঠাৎ কোথা থেকে জটায়ু এসে হাজির। বললেন, 'তোলা না দিয়ে এখান থেকে মেয়েছেলে নিয়ে যাওয়া চলবে না।' রাবণ দরাদরি চালাচ্ছিলেন, কিন্তু জটায়ু কিছুতেই মানছে না। শেষে রাবণ কমণ্ডলু দিয়ে মারলেন এক ঘা। ইন্টারনাল হেমারেজ। স্পটডেড। সীতা হনুমানকে সঙ্গে যেতে বলেছিলেন কিন্তু হনুমান রাজি হলেন না। তিনি কালাপানি পেরোবেন না, জাত যাবে। সীতা তখন হনুমানকে তার বাপেরবাড়ি চলে যেতে বললেন। রাবণ সীতাকে নিয়ে হেলিকপ্টারে উঠলেন। হেলিকপ্টার উড়ে চলল। সীতা তার ইমিটেশনের গয়নাগুলো ওপর থেকে ফেলতে লাগলেন।

ওদিকে রাম-লক্ষ্মণ যখন ফিরলেন তখন রাত হয়ে গেছে। তাঁদের দেখেই দাসদাসীরা কান্নায় ভেঙে পড়ল। সব শুনে রাম হা সীতা, হা সীতা করতে লাগলেন। লক্ষ্মণ রাগে খান কতক পোর্সিলিনের ফুলদানি ভাঙলেন, দেওয়ালে এমন ঘুষি মারলেন যে প্লাস্টার করতে হল। রাম বোতল নিয়ে বসলেন, পুরোনো দিনের কথা মনে হল। একবার সীতাকে নিয়ে রাস্তায় বেরিয়েছিলেন। রাস্তার সমস্ত লোকের সেদিন দৃষ্টি ছিল সীতার দিকে। গর্বে তার মেনা কয়েক ইঞ্চি ফুলে গেছিল....কী দারুণ ইলিস পাতুরি, মোচার ঘন্টা শিককাবাব করত....না, এর একটা বিহিত করতেই হবে। ভাবতে ভাবতে রাম ঘুমিয়ে পড়লেন।

দিন তিনেক কেটে গেছে। কৈকেয়ী রামকে দুঃখ ভুলে যেতে বলেছেন। বলেছেন 'ও আপদ গিয়ে ভালই হয়েছে।' তিনি আবার রামের বিয়ে দিতে চান। হঠাৎ রামের মোবাইল বাজল। সীতার মেসেজ। লিখেছেন, "লাস ভেগাসের দ্য লিটল হোয়ায়েট চ্যাপেলে যাচ্ছি। ডিভোর্স পেপার ক্যুরিয়ারে পাঠিয়ে দেবো।" রাম একদৃষ্টে এল.সি.ডি. স্ক্রিনের দিকে তাকিয়ে থাকলেন। মোবাইলের আলোটা আস্তে আস্তে নিভে গেল।

উড়ান কুইরী

ধীরেন্দ্রনাথ কর

পথনির্দেশিকা এইরকম—গৌরীপুর ছোট্ট হল্ট স্টেশন, এখানে ট্রেন মাত্র এক মিনিট থামে। ট্রেন থেকে নেমেই লাইনের ওপারে দেখতে পাওয়া যাবে একটা ভাঙাচোরা রিক্সা, তবে রিক্সাটা চালু। রিক্সার হ্যান্ডেল ধরে সওয়ারির আশায় দাঁড়িয়ে ততোধিক ভাঙাচোরা চেহারার উড়ান কুইরী, স্টেশন এলাকার একমাত্র রিক্সাওয়ালা। উড়ানের চেহারা ভাঙাচোরা হলেও রোদে-পড়া তামাটে নির্মেদ অবয়ব-সর্বাঙ্গে একটা সর্বক্ষণের কাঠিন্যের আবরণ—খানিকটা গ্রিক ভাস্কর্যের বিমূর্ত আদল। স্টেশন থেকে বেরিয়েই সোনাডির রাস্তা—মাত্র আড়াই কিমি। উড়ান কুড়ি-পঁচিশ মিনিটে সোনাডি পৌঁছে দেয়। ভালুকগড্যার মাঠ পেরিয়ে তবে সোনাডি। মাঠের মাঝ দিয়ে লাল মোরামের রাস্তা—সধবার মাথায় সিন্দুরে সিঁথির মতো। এ-পথে আগে একটা লজঝড় বাস চলত—এখন চলে না। তাই গাঁয়ের মানুষ হেঁটে, সাইকেলে ও গরুর গাড়িতে যাতায়াত করে।

ব্যাগ ও বেডিং নিয়ে আমি রিক্সায় চেপে বসি। উড়ান বলে—বাবু, ইসকুলে যাবেন ত?

—ঠিক ধরেছ, আমি সোনাডির স্কুলে যাব। আমি যে স্কুলে যাব তুমি জানলে কী করে?—আমি এমন কোনো দিগ্‌গজ ব্যক্তি নই যে পাড়াগাঁয়ের এক অখ্যাত রিক্সাওয়ালা আমার শুভাগমনের খবর অগ্রিম পেয়ে থাকবে।

—আজ সকালেই বড় পণ্ডিত বল্যেক, উড়ানরে, এ্যাকজন নূতুন মাস্টারমশায় অ্যাসবেক, লিয়ে আসবি। দ্যাখ্‌ছি আপনি নূতুন মানুষ, মাস্টার ব্যলে মালুম হৈছে। তা, ভাড়ার কথাটা শুধালেন নাই যে?

—যা নিয়ে থাক তা-ই নেবে।

—এক কুড়ি লিই, তবে আপনি গাঁয়ের ইস্‌কুলের মাস্টার ত, পনের টানা লিব।

—তাই নিও।

এক নগণ্য পাড়াগাঁয়ের প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মাস্টারমশায়কে একজন নিরক্ষর শ্রমজীবী মানুষ একসঙ্গে সম্মান ও কনসেশ্‌ন দিচ্ছে ভেবে অবাক হতে হয়। তাছাড়া

মাস্টার হিসাবে নিজের যে একটা ওজন আছে, তা এই মুহূর্তে উপলব্ধি করে আমি খুশিই হলাম।

উড়ান রিক্সার সিটে চেপে পড়ে। মুখে একটা বিশেষ ভঙ্গি করে প্যাডেলে পা লাগিয়ে সজোরে চাপ দেয়। ধনুকে টংকার দিতে গেলে ধনুকের যা চেহারা হয়, এই মুহূর্তে উড়ানের ভঙ্গিমাও সেইরকম। রিক্সার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ থেকে শি-ই--ই আওয়াজ বেরোয়—প্রায় একটা আর্তনাদ—সওয়ারি টানতে প্রবল অনিচ্ছা। তবু চাকা সশব্দে ঘোরে। পাতলা মোরাম বিছানো রাস্তা; এখানে-ওখানে খানা-খন্দের ছড়াছড়ি। রাস্তার দু'পাশে বাইদ জমি। ধানকাটার মরশুম। দু'পাশের জমিতে মুনিষজন ধান বাঁধছে, ভরি করছে। কামিনরা খাটো শাড়ি পরে কাস্তে হাতে কচ্ কচ্ বাদ্যান ধান কাটছে, গলায় টুসুর গান—

"আয় লো টুসু কাটবি ধান
ব্যাতন দুব খিলি পান,
সোনার বরণ ধান প্যাকেছে মাঠে।
কাট্‌বি লাড়া দুই কাহন
ছুটি পাবি স্যাই তখন
নদীর পারে সূর্য যাবে পাটে।"

রাস্তায় দু'একটা ধানবোঝাই গাড়ি চলেছে। গাড়ির চাকায় একটানা ক্যাচর ক্যাচর আওয়াজ—টুসু গানের ব্যাকগ্রাউন্ড মিউজিক।

প্রায় দেড় কিমি যাওয়ার পর ভালুকগড়্যার মাঠ। আরও খানিকটা গিয়ে উড়ান রিক্সা থামিয়ে নেমে পড়ে, পকেট থেকে বিড়ি-দেশলাই বের করে আগুন ধরায়, কয়েকটান দিয়ে বলে—"রাইট টাইমে পৌঁছাই দিব বাবু, তবে রাস্তাটা খুব খারাব আছে, খাল-খুশ্যালে ভত্যি। অই পঞ্চায়েত থ্যাকে কখন-সখন গুচ্ছেক কল্ল্যাচ ছড়াই দ্যায়। মিয়ামানুষ পঞ্চায়েতে প্রধান হৈছে, সইটা কোনমতে খগবগ কত্যে শিকেছে, কলমের ত্যামন জোর নাই। এ্যাদিকে উপরে ত্যামন পট্টিপাট্টি নাই"—বলে উড়ান আবার রিক্সায় চেপে পড়ে। 'কড়াচ' করে একটা তীক্ষ্ণ শব্দ বেরোয়। আমি চমকে উঠি, এই বুঝি নাটবল্টু খসে পড়ল! উড়ান নির্বিকার। আমার সন্ত্রস্তভাব দেখে সে অভয় দেয়—"কনো চিন্তা ক্যরবেন নাই বাবু; ব্যলেছি ত রাইট টাইমে পৌঁছাই দুব। রিক্সাটা চলার আগে অইরকম আওয়াজ ক্যরে জানান দ্যায়—আমি উড়ছি হে উড়ান!" আমি গুছিয়ে বসে বলি—"রাস্তাটার কাজ হবে বলে মনে হচ্ছে। এই তো রাস্তার দু'পাশে পাথর স্ট্যাক্ করা হয়েছে।"

হো হো করে হেসে উঠে উড়ান—"অইত ঝুলাই রাখ্যেছে। গোটা বছর অই পাথরের গাদা পড়ে; পথের পাথরচাপা কপাল। লোকে-লাকে শুনছি গরমেন্টের পয়সা নাই। পঞ্চায়েত পাবেক কুথায়? বল্লাম ত, অই মিয়ামানুষ ভোটে প্রধান হৈছে, ভাল করে সই কত্যে পারে না, হাত কাঁপে, উপরে স্যারকম পট্টিপাট্টি নাই। কাজ হবেক কী করে?

—গাঁয়ের মানুষ অতি সোজাসাপটা, সাত-পাঁচ বুঝে না, তাই না?

—স্যাদিন আর নাই বাবু। যখনি ভোট আসে, খ্যাম্‌টালাচ শুরু হ্যয়ে যায়। তা'পর মাঝেমদ্যি লাগপাছাড়ি, লাচন-কোঁদন লেগেই থাকে। ভোটবাবুরা অ্যাসে তুষের আগুন জ্ব্যালে দিয়ে গ্যাছে। ধিকিধিকি জ্বলছেই।

সামনে ডাউন রাস্তা, রিক্সার চাকা ঘুরছে দ্রুততর—সেই তীক্ষ্ণ সানুনাসিক শব্দটা ধারাবাহিকভাবে বেরুচ্ছে সেই অনুপাতে। মাঠ পেরিয়ে কয়েকটা বড় বড় আম গাছ। এদের আড়ালে সোনাডি। আস্তে আস্তে চোখের সামনে গ্রামের ছবি ভেসে উঠে—গ্রামের প্রান্তে দু'চারটে ভাঙা কুঁড়েঘর—উড়ান হাত বাড়িয়ে দেখায়—"অ্যাই দ্যাখেন বাবু, ক'দিন আগে দলমার হাতিগুলো অ্যাসেছিল, ভ্যাঙে দিয়ে গ্যাছে। হাতি অ্যাল পালকে পাল, খামার-খুশ্যাল আলথাল।"—শেষটা সুর করে গেয়ে উঠে উড়ান।

—হাতিগুলো তো প্রতি বছরই আসে দলমা থেকে, খবরের কাগজে পড়েছি। ওরা তো মাঠের ফসল খেতে আসে, নানা জায়গায় উৎপাত করে বেড়ায়। হাতিদের বেয়াদপিতে আমি বিরক্ত। হাতিরা বনে থাকলেই মঙ্গল।

—ক্যানে উৎপাত করবেক নাই বাবু? মানুষ হাতির ড্যারাতে ঢুকে লন্ডভন্ড ক্যরছে; হাতিরা ছ্যাড়ে কসুর করবেক? বনবাদাড় ক্যাটে মানুষ বসত ক্যরছে; হাতিরা খাবেক কী? থাকবেক কুথায়?—হাতিদের পক্ষে জোরালো সওয়াল করে উড়ান। তার বক্তব্য বেশ সারালো ও ধারালো। বন্য হাতিদের সম্পর্কে আমার অজ্ঞতা অসামান্য, প্রায় পর্বতপ্রমাণ; নিজেকে হস্তিমূর্খ না ভাবার কোনো অবকাশ নাই। তাই লজ্জিত হয়ে আমি এবার উড়ানের সঙ্গে একমত হই।

—তোমার কথাই ঠিক উড়ান। হাতিরাও তেমনি লঙ্কাকান্ড ঘটাচ্ছে। ওদের রাগ কম নয়, বুদ্ধিও কম নয়।

রিক্সা গ্রামে ঢুকে পড়েছে। কেউ খোঁটায় গরু বাঁধছে, কেউ খড় কাটছে, ছাগল তাড়াচ্ছে কেউ। মেয়েরা কলসি কাঁখে হাতে বালতি ঝুলিয়ে টাইম কলে জল নিতে চলেছে। আর সব মেয়েরা কলতলায় তুলেছে তুমুল হৈচৈ। সামনের হরিমেলায় বুড়ো মুরুব্বি দু'একজন বসে হুঁকোমুখে, পাশে ছোট রেডিওতে বাজছে কীর্তন। ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা বই-খাতা বগলে চেপে চলেছে স্কুলে। আর একটু এগিয়ে উড়ান বলে—অ্যাসে গ্যাছি বাবু, এ্যাই ত ইসকুল, এ্যাইখানে নামুন।—উড়ান রিক্সা থামায়। ব্যাগ ও বেডিং সে টালি-ছাওয়া প্রাথমিক বিদ্যালয়ের বারান্দায় নামিয়ে রাখে। উড়ান ভাড়া বুঝে নিয়ে বলে—আপনি টুকচে বসুন, এ্যাখনি বড় পণ্ডিতমশায় অ্যাসে যাবেক। যখনি ইস্টিশনে যাবেন ট্রেন ধত্যে, আমাকে ব্যলবেন, আমি গাড়ি লিয়ে হাজির হব। অই যে অশদ্‌তলায় আমার ঘর—বলে অনতিদূরে প্রায় পত্রশূন্য একটা অশ্বত্থগাছের দিকে হাত বাড়িয়ে দেখায়। রিক্সায় চেপে পড়ে উড়ান, মুখে গানের কলি—

ওলো বিনোদিনী রাই
চখে তোর ঘুম নাই

এ্যাত র‍্যাতে তোর ঘরের হুড়কা খুলা ক্যানে?...

সোনাডি প্রাথমিক বিদ্যালয়। সর্বসাকুল্যে জনা তিরিশেক ছাত্রছাত্রী। প্রতিদিন উপস্থিত হয় মেরে-কেটে জন পনের। যবে আরও কম হাজিরা হয়, সেদিন পণ্ডিতমশায়দের কাজ, বাড়ি বাড়ি যেয়ে ছেলেমেয়েদের সন্ধান করা। দেখা যায় কেউ গেছে কাড়া চরাতে, কেউ গেছে খেতের কাজে, পুকুরে মাছের প্যেতানি লেগেছে, সেখানে অনেকেই গেছে ঝুড়ি নিয়ে মাছ ধরতে। বিদ্যার্জনে ছেলেমেয়েদের এই নিদারুণ অনীহা অভিভাবকদের বিন্দুমাত্র বিচলিত করত বলে মনে হয় না। দ্বিতীয় শিক্ষক কানাইবাবু মারা গেছেন মাস ছয়েক আগে। হেড পণ্ডিত হরিহরবাবু এই ক'মাস একাই সামলাচ্ছিলেন। আমি জয়েন করতেই তিনি হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন। আপাতত স্কুলের পাশেই রেশন ডিলার বঙ্কু পালের দোকানের লাগোয়া একটা ঘরে আশ্রয় নিলাম। পরে তেমন একটা বাড়ি পাওয়া গেলে সপরিবারে সেখানে গিয়ে উঠব—মনের এই বাসনা। এখন একা, তাই স্বপাক রান্না। রান্না করা আর ছেলে পড়ানো ছাড়া অন্য কোনো উল্লেখযোগ্য কাজ নেই। মাঝেমধ্যে বাসী খবরের কাগজ পেলে পড়ি আর রেডিও শুনি। গ্রামে অবস্থাপন্ন দু'একজনের বাড়িতে টিভি এসেছে, ছাদে অ্যান্টেনা দেখেই বুঝা যায়।

খুব ভোরে আমার ঘুম ভাঙে। উড়ান ঘন্টি বাজিয়ে স্টেশনে যায়। কোনো কোনো দিন সকালেও ঘন্টির শব্দ পাই। কখনও সওয়ারি নিয়ে যায়, কখনও খালি যায়। ঘন্টি বাজিয়ে উড়ান হাঁক দেয়—মাস্টারবাবু, ইস্টিশনে যাচ্ছি, যাবেন ত?

—না হে, আজ যাব না, শনিবার স্কুল ছুটির পর এসো, বাড়ি যাব, আড়াইটার ট্রেন ধরব।

—ঠিক আছে, অই দিন অই সময়ে আসব—বলে গান ধরে উড়ান—

"অসময়ে মন্ত্র হেল্যা
ক্যামনে লাঙল বাই?
ধানধুল হ্যল না
পাটরাকুড়া খাই।"

উড়ান ঘন্টি বাজিয়ে গান গেয়ে চলে যায়।

শনিবার হাফস্কুল। ছুটি হয়ে গেছে দুপুরে। আমি ভাবছি, উড়ান আসবে তো? সকালে ওর সঙ্গে দেখা হয়নি। রাস্তার এদিক-ওদিক তাকাচ্ছি। অবশেষে রিক্সা-সহ উড়ানের দেখা পাওয়া গেল। উড়ান এসে হাজির।

—মাস্টারবাবু, আমি রাইটটাইমে অ্যাসে গ্যাছি, চ্যাপে পড়ুন।—আমি তাড়াহুড়া করি। আমার ব্যস্ততা দেখে উড়ান বলে—এ্যাই ট্রেনটা পত্যেক দিন লেটে আসে। হপড়-ধপড় ক্যারে য্যাতে হবেক নাই। হাওয়া খ্যাতে খ্যাতে চলুন।

আমি খানিকটা বিচিলত হই—না, না, একটু আগে পৌঁছানোই ভাল। স্টেশনে পৌঁছে যাই, তারপর ট্রেন একটু লেটে আসুক না, তবে বেশি লেটে এলে অসুবিধা হবে।

উড়ান একটা বিড়ি ধরিয়ে দু'একটান দিয়ে আগুন নিভিয়ে আধপোড়া বিড়িটা বাঁ কানে গুঁজে রেখে হেসে বলে—খ্যাপেছেন বাবু? ট্রেনটা এ্যামনিতেই আধ ঘন্টা লেট থাকে। আজ হ্যল শোনিবার, একঘণ্টা লেট থাকবেকই।

আমি আঁতকে উঠি—তাই নাকি? তবে তো বাড়ি পৌঁছুতে সন্ধে পার হয়ে যাবে। ওদিকে আবার দু কিমি হাঁটতে হবে। শীতের বেলা—এক্সপ্রেস ট্রেনের মতো এই এল, এই গেল।

চোখ কপালে তুলে উড়ান—তাই নাকি? ভারি মুশকিলে পড়তে হবেক ত? ল্যান, রিক্সায় উঠে আচ্ছা ক্যরে বসুন। আগে পৌঁছাই তা'পর দ্যাখা যাবেক—বলে সুর করে গান ধরে উড়ান—

চিরুনি দ্যালো এলোচুলে
বাঁধলো খোঁপা পলাশফুলে।

উড়ানের গলায় গান লেগেই থাকে। চেহারায় রুক্ষশুষ্ক একটা মানুষ, তার গলাটা বাজখাঁই হওয়াটাই ছিল স্বাভাবিক, কিন্তু সময়ে-অসময়ে তার গলায় খেলে অযাচিত সুরলহরী; এই বৈপরিত্য আমাকে বিস্মিত করে। উড়ানের গানে কান পেতে আমি বলি—"তোমার গানের গলা তো বেশ! এটা কি ঝুমুর গান?" গান থামিয়ে উড়ান বলে—"ঠিক ধ্যরেছেন বাবু? এ্যাকসময় টুসু ও ঝুমুর দলে গাইতাম, বিয়া করার পর থ্যাকে ছ্যাড়ে দিইছি। মন গ্যালে টুকটাক গ্যায়ে থাকি"—বলে উড়ান আবার গান ধরে। রিক্সা চালানোর সঙ্গে সঙ্গে চাকা থেকে নানারকম আওয়াজ বেরোয়—সব আওয়াজ মিলে একটা অর্কেস্ট্রা—উড়ানের গানের সঙ্গে ঐ অর্কেস্ট্রাই বাজে, সুরে-বেসুরে, তালে-বেতালে যেভাবেই হোক।

গ্রামের প্রান্তে ভাঙা কুঁড়েঘর ক'টা দেখা গেল। সেদিকে চেয়ে উড়ান বলে—"মাস্টারবাবু, হাতিগুলোন দলমায় ফিরে যায় নাই। এ্যাই যে ডংরিটা, উটার উধারের বনটায় লুকাই আছে। ধামসা মাদল ঢাক পিটাই, ফটকা ফুটাই কিচ্ছু হচ্ছে নাই। উয়ারা গেরাহ্যি কল্যে ত? হুলা পাটি অ্যালে গ্যাছে। এ্যদিকে আবার বিপদ!"

—বিপদ আবার কিসের? সময় হলেই হাতিগুলো আপনা-আপনি ওদের ডেরায় চলে যাবে। একবার চলে গেলে এ সিজনে আর আসবে বলে মনে হয় না।

—উয়াদের বিশ্বাস কত্যে ভরসা পাচ্ছি না। এ্যাকবার মনে লাগে বিপদটা মানুষই ঘটাইছে, উয়াদের দুখ মানুষ বুঝে নাই—উড়ানের গলায় দুঃখের সুর।

—বুঝলে মানুষেরও মঙ্গল হত হাতিরও হত। তা আমি-তুমি কী করব?

—যদি হাতিগুলোন সাঁঝের পর অ্যাসে তবে ত গ্যাছি। —উড়ান চিন্তিত হয়ে পড়ে।

—কেন, সন্ধের পর হাতিরা এলে তোমার কী বিপদ হবে?

—হবেক বৈকি বাবু। আমি আপনাকে ব্যলতে লজ্জা পাচ্ছি, তবে সত্যিটা লুকাব নাই। সারাদিন খ্যাটেখুটে সাঁঝের বেলায় টুক্‌চে ইয়া খাই, এ্যাকটু খাই, ন্যাশা ন্যাশা

লাগে। ভ্যাবেছি, স্যাই সময় যদি হাতিগুলোন খেদ্যাড়ে অ্যাসে, দৌড় মারত্যে লারব। ন্যাশার ঘোরে উল্টাই যাব।

—মদ খাও কেন? তোমার সংসার আছে, ছেল্যাপুল্যা আছে।

—আমার সংসারও নাই, ছেল্যাপুল্যাও নাই। বিয়া হইছিল, বউটা বছর দু'ঘর ক্যরে কুথায় পালাই গ্যাল। ভালই হৈছে, ছেল্যাপুল্যা হয় নাই। বউটা বাঁজা ছিল যে্য। ভ্যাবেছি আর কোনোদিন বিয়াটিয়া ক্যরব নাই।

উড়ানের জীবনবৃত্তান্ত শুনতে শুনতে স্টেশনে পৌঁছে গেলাম। প্ল্যাটফর্মে উঠে দেখি, সিগন্যাল ডাউন হয়নি। ট্রেন আসতে এক ঘন্টা দেরি। উড়ানের কথাই সত্যি হল। উড়ান যথাস্থানে রিক্সা রেখে চায়ের দোকানের বেঞ্চিতে বসে পড়েছে চা খাবে। তারপর ট্রেন না আসা পর্যন্ত বসে থাকবে সওয়ারির আশায়। আমি বসে থাকি ট্রেনের আশায়।

সোমবারের সকালে উড়ান স্টেশনে ঠিক হাজির থাকবে বলেছে। কিন্তু সেদিন ট্রেন থেকে নেমে উড়ানকে কোথাও দেখতে পেলাম না। অগত্যা হেঁটে যাওয়াই মনস্থ করলাম, পৌঁছেই স্কুলে যেতে হবে; স্নানটা সারলেও রান্না সারা হবে না। হাঁটতে শুরু করলাম। সঙ্গে একটা ছোট ব্যাগ, অন্য তেমন কিছু ওজনদার জিনিস নেই। দায়ে পড়ে মর্নিং ওয়াকটাও হয়ে যাচ্ছে। প্রায় এক কিমি হাঁটার পর দেখি দূরে উড়ান আসছে, খুব দ্রুত রিক্সা চালিয়ে। কাছাকাছি এসে বলে—উঠে পড়ুন বাবু, সকালেই ইস্টিশানে যাব ক্যরে বেরাইছি, দ্যাখি, পাড়ার উদিকে চ্যাঁচামেচি, হৈচৈ, হাই-হাই। ভলা মাঝির বউটা, নাম শুষ্‌নি, দশ মাসের পোয়াতি। উঁচু দাওয়া থ্যাকে প্যড়ে গ্যাছে—চ্যাঠা নাই। ধরাধরি ক্যরে রিক্সায় চাপাই লিয়ে সরবেড়্যার হাসপাতালে ভর্ত্তি ক্যরে অ্যালম। ভলা খ্যাটে-খাওয়া মানুষ, লুকাইচরাই এ্যাক-আধটুকু হ্যেড়ার কাজ করে। গরিব মানুষ। পয়সা দিতে চাইলেক লিলাম নাই। বল্ল্যাম, বউটাকে আগে বাঁচাই তুল, তা'পর দ্যাখা যাবেক।

ততক্ষণে আমি রক্সিায় চেপে বসেছি। উড়ান যথাসাধ্য প্যাডেল ঘুরায়। রাস্তা খারাপ, উড়ান সতর্ক।

—বউটা কেমন আছে উড়ান? পেটের বাচ্চার কোনো ক্ষতি হবে না তো?—"মনে লাগে, ত্যামন কিছু ক্ষতিটতি হবেক নাই। ডাকতারবাবু ত স্যারকমই বল্লেক।" একটু থেমে উড়ান বলে—"আপনাকে অনেকটা হাঁটতে হ্যল বাবু।"

—তা হোক গে, ভোলার বউটাকে হাসপাতলে নিয়ে গিয়ে ভর্তি করে খুব বড় কাজ করেছ। ভাগ্যিস ঠিক সময়ে গাঁয়ে ছিলে। স্টেশনে থাকলে বউটার কী গতি হত বল দেখি?—কী হতে পারত তা ভেবে আমি উদ্বিগ্ন হই।

—সবি ভগমানের হাত বাবু। ভগমান যাকে রাখব্যেক তাকে কেউ মারত্যে লারবেক। গরিবের ভগমান ছাড়া আর কে রইছে বলুন ত?—বলে কপালে হাত ঠেকায় উড়ান।

রিক্সা চলেছে, সেই পরিচিত আওয়াজ অবশ্য এখন কানসহা। উড়ান বাঁই বাঁই প্যাডেল ঘুরায়। সে বুঝেছে মাস্টারবাবু যেয়ে স্নান সারবেন, রান্না করবেন, খাবেন, তারপর স্কুলে যাবেন। দেরিতে পৌঁছালে ভাত না খেয়েই থাকতে হবে; তাই তার মুখেচোখে উদ্বেগের ছায়া। দেহের সব শক্তিটুকু পায়ের মারফত সঞ্চার রিক্সার চাকার ঘূর্ণনে। গতিবেগ দ্বিগুণ করার চেষ্টার প্রতিফলন শরীরের অঙ্গপ্রত্যঙ্গে। যাই হোক, যথা সময়ে পৌঁছে গেলাম। রিক্সা থেকে নেমে উড়ানকে পনের টাকা দিতে যাই, উড়ান দশ টাকা নিয়ে বলে—"বাবু, আপনি অদ্ধেকটা পথ হ্যাঁটে অ্যাসেছেন, পনের টাকা ক্যান লিব?"

আমি সস্নেহে উড়ানের দিকে তাকিয়ে বলি—"উড়ান তুমি সাতসকালে যে কাজটা করেছ, তার দাম কে দেয় বল তো?"

—রাইট টাইমে য্যায়ে আপনাকে লিয়ে আসা তো আমার কত্যব্য।

—সে তো বুঝলাম, কিন্তু ওদিকে খুব সকালে ঐ গর্ভিণী মেয়েটাকে হাসপাতালে পৌঁছে দিয়ে যে কর্তব্য করেছ তার কি কোনো দাম দেওয়া যায়?

—কত্যব্যের আবার দাম কী? ইয়ার দাম ভগমান দিবেক, ভগমানের দিয়া ফুরায় না। বাবু, আমি দামের প্রত্যাশী লই। আপ্নি ভালব্যাসে এ্যাই য্যে বল্যেন অ্যাইটে গ্যাদে পাওয়া।

নিরক্ষর গেঁয়ো উড়ান আমার চোখে এক বিস্ময়। ওর রুক্ষ কঠিন চেহারা দেখলে মনে হয় এখনি কিছু প্রশ্ন করলে রেগে উঠবে, কিন্তু তা না, উড়ানকে কোনো দিন কোনো অবস্থায় রাগতে দেখিনি। চড়া কথা ওর মুখে কোনো দিন শুনিনি, শুনি ওর গান।

প্রতি শনিবার স্কুল ছুটি হলে উড়ান আমাকে স্টেশনে পৌঁছে দেয়, আবার সোমবার সকালে ঠিক সময়ে স্টেশন থেকে আমাকে নিয়ে সোনাডি আসে। এক শনিবার স্টেশনে পৌঁছে উড়ান বলে—বাবু, আজ গাটা ক্যামন ম্যাজম্যাজ কচ্ছে। বোদয় জ্বর আইছে। ভ্যাবেছিলাম, শুদু রিক্সাটা লিয়ে ফিরে যাব, কিন্তু স্যাটা হচ্ছেক কই? ভানু ঘোষের জামাই-বিটি এ্যাই ট্রেনটায় অ্যাসছে। উয়াদের লিয়ে য্যাতে হবেক।

—তোমার জ্বর? তা আগে বলোনি কেন? আমি তো আজকের দিনটা হেঁটেই আসতে পারতাম। সোমবার যদি শরীর অসুস্থ থাকে, এসে কাজ নেই, আমি হেঁটেই সোনাডি যাব।

—না, বাবু, এ্যাকটু ঠাণ্ডা ল্যাগে জ্বরটা আইছে—জ্বরটা থাকবেক নাই। সোমবার সকালে পৌঁছাই দুব। কালই জ্বর পালাই যাবেক। জ্বরবাওয়াজি বুঝে, উড়ানের কত কাজ রইছে।

প্রতি শনিবার ও সোমবার যাওয়া-আসার পথে গ্রামের নানা খবর উড়ান আমাকে শোনায়—বনমালী পালের স্ট্রোকের খবর, তাকে নিয়ে গিয়ে হাসপাতালে ভর্তি করে দিয়েছে উড়ান, গোবিন্দ দাসের মেয়েকে শ্বশুরবাড়ি পৌঁছে দিয়েছে সে, পালদের

হারু-ধরু দু'ভাইয়ের বউদের মধ্যে মারামারি, দু'জা দু'পার্টির হয়ে পঞ্চায়েত ভোটে দাঁড়িয়েছে—ঝগড়াটা ঐ সূত্রে, রাধিবোষ্টমীর নাতি হয়েছে, ইত্যাদি ইত্যাদি।

অবশেষে একদিন গ্রীষ্মের ছুটি এসে গেল। স্কুল প্রায় এক মাস ছুটি। ছুটির দিনে উড়ান যথাসময়ে আমাকে ট্রেন ধরিয়ে দেয়। ট্রেনে চাপার আগে সে হঠাৎ আমাকে প্রণাম করে পায়ের ধুলো নেয়। আমি বিব্রত বোধ করি। উড়ান আমাকে কী ভেবেছে কে জানে? আমি তো পাড়াগাঁয়ের এক প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাপোষা নিরীহ মাস্টারমশায়। দেবত্বও নেই, কোনো অসামান্যতাও নেই, তবে নড়বড়ে ব্রাহ্মণত্বটুকু আছে। পল্লিবাংলার অপাপবিদ্ধ শিশুদের পাঠদান ছাড়া অদ্যাবধি অন্য কোনো মহৎ মানবিক কর্ম সম্পাদন করার কৃতিত্ব অর্জন করতে এই শর্মা পুরোপুরি ব্যর্থ। তাই ভাবি, আমি উড়ানের প্রণাম গ্রহণ করার উপযুক্ত পাত্র কিনা? আপত্তি করতে গেলে উড়ান বলে—বাম্ভনের ছেল্যা, পন্নাম কল্যে পাপের ক্ষয় হয় বাবু।

একদিন গ্রীষ্মের ছুটি শেষ হয়ে গেল। স্কুল খোলার দিন সোনাডি চলেছি। ট্রেন থেকে নেমেই দেখি উড়ান রিক্সা নিয়ে দাঁড়িয়ে, এদিকে চেয়ে। আমাকে দেখে তার চোখে-মুখে খুশি খুশি ভাব। উড়ান ব্যাগ ও ব্যাগেজ রিক্সায় চাপায়। আমি জিজ্ঞাসা করি—উড়ান ভাল আছ তো?

—এ্যাকরকম ভালই আছি, খারাব কনো হয় নাই। এখন একটু জিরাই লিন, হড়বড় কত্যে হবেক নাই। চা এ্যাক কাপ খ্যায়ে লিন আগে। রাস্তাটা সারাই হৈছে। ভোট আসছে যে। পঞ্চায়েত পাথর আর কল্ল্যাচ ফ্যালে ধুরমুশ ক্যরেছে। আগের মতো খাল-খুশ্যাল নাই। বার কতক প্যাডেল ঘুরাই দিলেই সোনাডি।

আমি দূরে রাস্তার দিকে চেয়ে দেখি, তাই তো, রাস্তাটা বেশ তকতকে দেখাচ্ছে। দু'পাশে আর্থ-ওয়ার্ক হওয়ায় রাস্তাটা চওড়া হয়েছে। আমি দোকানে চা-বিস্কুটের অর্ডার দিই, উড়ানকে চা-পাউরুটি দিতে বলি। চা খাওয়ার পর রিক্সায় চেপে পড়ি। রিক্সায় চাপার প্রাক-মুহূর্তে উড়ানের সেই অতি পরিচিত বঙ্কিম ভঙ্গিমাটা দেখা গেল না। অল্প আয়াসে রিক্সা দৌড়াচ্ছে। উড়ানের গলায় খুশির সুর—

ঝিঙ্গা ফুলের হলুদ রঙ
চ্যখে ল্যাগেছে,
বঁধূর আমার মনে পাকা
পিরিত জ্যাগেছে।

আমার অনুপস্থিতিকালে নিশ্চয় গ্রামে অনেক কিছু ঘটে গেছে, জানতে আমার খুব উৎসাহ। তাই আমি জিজ্ঞাসা করি— গাঁয়ের খবর কী উড়ান?

—কালা-ধলা দু'পরকার খবরই আছে বাবু। আপনি চ্যলে গ্যালেন য্যাদিন, তার পরের দিন সাঁঝবেলায় এ্যাকটা দলছুট দাঁতাল হাতি ভলা মাঝিকে আছড়ে ম্যারে ফ্যালেছে।

—অ্যাঁ! সেই ভোলা মাঝি? যার বউকে তুমি হাসপাতালে ভর্তি করে দিয়েছিলে?

—হ্‌ আজ্ঞ্যা, স্যাই ভলা মাঝি। মুনষালি কাজ কত্য আর লুকাই-চরাই চোলাই মদ বিক্কি কত্য, গরিব খ্যাটে-খাওয়া মানুষ। মদের বাস প্যায়ে হাতিটা সাঁঝবেলায় অ্যাসে হাজির। ভলার ভাঁটি-টাটি ভ্যাঙ্গে দিইছে হাতিটা। ভলা পাথর ছুঁড়লেক, অম্‌নি হাতিটা র‍্যাগে-ম্যাগে উয়াকে আছড়ে ম্যারে ফ্যালেছে।

—সব হাতিই তো শীত কমলে দলমায় পালায়। তা হাতিটা এল কী করে?

—না, সব হাতি যায় নাই, এ্যকটা এ্যাদিকে কনো বনে ছিল।

—তা ভোলার বউ-এর কী হল?

—উয়ার বউ শুষনির এ্যাকটা বিটি হৈছে।

—ওরা এখন কীভাবে আছে? ওদের চলছে কীভাবে?

—বাবু, আমি শুষনিকে বিয়া ক্যরেছি।

আমি রীতিমতো চমকে উঠি, বিস্মিত হয়ে বলি—তুমি বিয়ে করেছ? ভোলার বিধবা বউকে? তাজ্জব ব্যাপার!

—হ্‌ আজ্ঞ্যা, তাজ্জবই বটেক। দ্যাখলাম পিথিবীতে শুষনির কেউ কুথাও নাই, উয়ার শরীরের অবস্থাও ত্যামন ভাল নয়। খ্যাটে খাবার সুয়াং নাই। বিটিটার জন্য দুদ্‌ পাবেক ক্যামন ক্যরে? এ্যামনি দ্যাখাশুনা কল্যে গাঁয়ের মানুষ পাঁচকথা বলবেক, তাই শুষনিকে বিয়া ক্যরে ফ্যাল্ল্যাম। তার পর স্যাদিন থ্যাকে তাড়ির সঙ্গে আড়ি, এ্যাকেবরে ছাড়াছাড়ি।

—খুব, খুব ভাল করেছ, এর চেয়ে ভাল খবর আর হয় না। আচ্ছা, তুমি কি শুষনিকে ভালবাসতে?

—কী য্যে বলেন বাবু? আমাদের মতো মানুষের আর ভালবাসা! ভালবাসা আস্‌মানের চাঁদ, চাইলেই কি পাওয়া যায়? ভালবাসা লয় ওন্য কিছু। আমি ত এ্যাকটা মানুষ বটি, আমার এ্যাকটা কতব্য আছে না?

আমি উড়ানের দিকে হাঁ করে চেয়ে থাকি। উড়ান একটা মানুষই বটে, তবে সাধারণ মানুষের চেয়ে অনেক লম্বা, অনেক উঁচু—

আকাশস্পর্শী সৌধের মতো।

রিমিক্স

শেখর বন্দ্যোপাধ্যায়

দেশবন্ধু রোড ধরে মার্কিন ট্যাঙ্কের লাইন। ভজাদার পানের দোকানের সামনে মার্কিন সৈন্যবাহিনী। এক সোলজার শনিমন্দিরের ওপরের লাল ত্রিকোণ ফ্ল্যাগটা নামিয়ে সেখানে মার্কিন ফ্ল্যাগ উড়িয়ে দিতেই মন্দিরের ঠিকে পুরোহিত রামবিরিজ গম্ভীর মুখে শান্তির জল ছিটাতে ছিটাতে বলল, 'ওং শান্তি। ভেরি ভেরি শান্তি।'

চারদিক কেমন যেন রঙিন হয়ে আছে। ইস্টম্যানকালার। শনিমন্দিরের ওপর দিয়ে একটা দু'মুখো হেলিকপ্টার ঘুরছে, কিন্তু কোনো শব্দ নেই। শুধু রামবিরিজের শান্তির জল ছিটানোর আওয়াজ।

পটাইয়ের দোকানে কুকিস দিয়ে চা খাচ্ছি। বিড়ি ধরিয়ে মন দিয়ে সিনটা দেখলাম। কেয়া সিন হ্যায়। ফাটাফাটি। বিড়িটা শেষ করার আগেই সব ভোঁ-ভা। কেউ কোথাও নেই। অজয়দার দর্জির দোকান থেকে সেলাই মেশিনের আওয়াজ। ওপারে মুদি দোকানের ভজাদা রাস্তার দিকে তাকিয়ে বসে আছে তীর্থের কাকের মতো। দোকানের সামনে রোদ বাঁচানোর কালো কাপড় হাওয়ায় উড়ছে। কাপড়ের ওপর লেখা মমতা স্টোর্স।

মমতা ভজাদার বউয়ের নাম। লাভ ম্যারেজ। নাইন্টিন সেভেনটি নাইন। আলোছায়া টকিজে তখন 'মুকদ্দর কী সিকন্দর'। মমতাদি, ভজাদা টাউন থেকে উধাও হয়ে মাথা তুলল ভুটানের ফুন্টশোলিং-এ। কয়েকদিন জোর হাল্লা টাউনে। তার আগেই অবশ্য লাভার লেন, মানে পার্কের গলিতে লেখা থাকত 'ভজা+মমতা'। পাশে তীর বেঁধা হার্ট। আমরা জুনিয়ররা কসম খেয়েছিলাম বিয়ে করলে অ্যায়সাহি, হল না।

ভজাদা রেডিওয় ইয়াদো কী বারাত-এর গান শুনছে। রামবিরিজ পদ্মাসনে ঝিমাচ্ছে।

এই মরা টাউনে সব কিছুই খুব সাধারণ। সিনেমা হল, স্কুল-কলেজ, দোকান, মাধ্যমিকের রেজাল্ট, নেতা, মাস্তানি। এমনকি মেয়েরাও। নতুন কিছু হয় না। ভাল কিছু, বড় কিছু, ঝাক্কাস কিছু। শিলিগুড়ির মতো।

শিলিগুড়িতে সব সময় কিছু না কিছু ঘটছে। ঘ্যামা ফাংশন, খুন-খারাবি, মধুচক্র, গণবিবাহ, হংকং মার্কেট, মেলা, কারেন্ট বই, স্মাগলিং, ফেস্টিভ্যাল, ধামাকা, হোল

নাইট ডান্ডিয়া ড্যান্স, অল স্টার নাইট, নাকাবন্দি। ঠিক বম্বের মতো। স্বপনো কা শহর। আমার খুব বম্বে যাওয়ার শখ ছিল। কেবল আসার পর আর তত ইচ্ছা করে না। আব দুনিয়া মেরি জেব মে। ফি শনিবার রামবিরিজ খুব ভড়ং করে। সন্ধ্যার ঝোঁকে লোক হবে মন্দিরে। চারদিকে চড়া রোদ। রাস্তায় লোক কম। টাউনের লোক রোদ না মরলে বেরোয় না। আবার রাত বেশি হলে সব শুনশান। তখন টিভি-র সামনে টাউন।

তখন শুধু দেশবন্ধু রোডের ওপর কটা পানের দোকান, মেডিসিন শপ, ভাতের হোটেল, চা কাম চোলাইয়ের ঠেক খোলা থাকে। তখন বল্টু টাল্লা দিয়ে এসে গায়ে পড়ে গল্প করে। আগেকার কথা।

বল্টুর এখন মার্কেট ডাউন। হলে বই লাগানোর আগেই কেবলে চলে আসছে। হলের অবস্থা টাইট। টাউনটা পাল্টাচ্ছে। আহিস্তা, আহিস্তা। ডেলি নতুন নতুন লোক ঢুকছে। আসাম পার্টি, বাংলাদেশি, ডুয়ার্সের লোক। সারাদিন মাইক ফুঁকে সিনেমার পাবলিসিটি করে বল্টু। বল্টুর গলা পুরো আমিন সায়ানি। 'ভাইয়ো ঔর বহেনো! আজসে শ্রীরূপা সিনেমা মে শান সে চল রাহা হ্যায় হাম কিসিসে কম নেহি। হাম দিল দে চুকে সনম। হাম আপকে হ্যায় কৌন।' তখন বল্টু হিরো। আমরা একসময় ভাবতাম বল্টু বহুত দূর যাবে। বিনাকা গীতমালায় ভেসে আসবে বল্টুর আওয়াজ। 'সাথিয়ো, আব হাম আপকো এক বহুত দর্দভরা গীত শুনায়েঙ্গে'। পুরো ইন্ডিয়ার সঙ্গে আমরাও শুনব বল্টুর গলা। আমরা, মানে মধু, ভোম্বল আর আমি—কালু।

রাতে মাল খেয়ে ফেরার পথে বল্টু বাওয়াল করে। তখন তার গলা খসখসে, খোয়া-ওঠা দেশবন্ধু রোডের মতো। আমরা জানি বল্টুর লিভার শেষ। বল্টু আর বেশিদিন লাস্ট করবে না।

গরমের ভাপে রাস্তা থেকে গনগনে তাত উঠছে। একদম মরুভূমির মতো। তাহলে কি মরুভূমির কথা ভাবতেই মার্কিনদের দেখলাম? সি এন এন চ্যানেল?

বহুত সব উল্টোপাল্টা ব্যাপার হচ্ছে কিছু দিন হল। ঠিকঠাক ভাবলে কেবল আসার পর থেকে। কিছু ভাবলেই সব চোখের সামনে সাফ সাফ দেখিয়ে দিচ্ছে। কে দেখাচ্ছে?

গেল শনিবার রেল গুমটির কাছে পম্পা বৌদির বাড়িতে লাইন ঠিক করতে গিয়ে বৌদির কোমরের খাঁজ আর পাতকুয়োর মতো গভীর নাই দেখে যেই না জিনাতের কথা মাথায় এল, তখনই সত্যম শিবম সুন্দরম-এর পুরো সিন ঝটসে হাজির। সেই কোমর, খাঁজ, ভেজা পাতলা সাদা শাড়ি, নাই, থাই। এ কিরে ভাই! ঝটসে বডি গরম। পরশু কোন একটা চ্যানেলে ফিরসে দেখাচ্ছিল বইটা। শালা মাথার কানেকশনও বোধহয় লুজ হয়ে যাচ্ছে। অ্যান্টেনার লাইফ ফিনিশ! সকাল থেকে বহুত খাটনি গেছে। মোড়ের পটাইয়ের দোকানে স্পেশাল ডিম বিস্কুট দিয়ে চা খেয়ে মৌজ করে একটা বাঁটুল বিড়ি ধরাতে না ধরাতেই ফটাকসে মার্কিন সোলজার চলে এল মোড়ে।

মাথার আর দোষ কী? ফি শনি-রবি এরিয়ার লাইন দেখভাল করতে হয়, কাস্টোমারের সঙ্গে খেজুড় ফাউ। যা কম্পিটিশনের মার্কেট, তাতে মফস্বল টাউনে বসে কেবেলের ব্যবসা দিগদারি। বড় টাউনে তো কথায় কথায় রেট বাড়াচ্ছে। প্রতিদিন আসমান থেকে নয়া নয়া চ্যানেল ঝাড়ছে। পাবলিক খুশ।

আমার স্কুটারটার ওপর লাইন সারাইয়ের ব্যাগটায় ঠেকনা দিয়ে মৌজসে চা খাচ্ছে হাবু। আমার অ্যাসিস্টেন্ট। মুখ শুকিয়ে গেছে। লাইনে নতুন, তবে টনকো। ঠিকঠাক শিখিয়ে নিলে কালেদিনে কম পয়সায় বড় অ্যাসেট হবে। তখন আর আমাকে স্কুটার নিয়ে চর্কি মারতে হবে না।

স্কুটারটা কিনেছি বিনয়ের কাছ থেকে। বাজাজ, এইট্টি ফোর। এখনও যা সার্ভিস ঘরের বৌ-ও দেয় না। বিনয় নতুন হিরো হন্ডা নামালো শ্বশুরের পয়সায়।

—কালুদা মিউজিক ভিডিওটা বেশি চালান। ওই যে কাঁটা লগা! সলমনের কারেন্ট বইটা কবে দেখাবেন? পটাই গ্লাস ধুতে ধুতে খেজুর করে।

হবে, হবে!

এখন কারেন্ট বই দেখালেই হল-মালিকরা অবজেকশন দিচ্ছে।

শালার পাবলিক। যত দিন যাচ্ছে, তত ডিম্যান্ড বাড়ছে। 'কালু, সেবাইতপাড়ার কেবলে একমত দিচ্ছে, মোক্তার পাড়া হররাত ব্লু দেখাচ্ছে, ক্রিকেট চ্যানেলটা ভাল আসছে না, পয়সা দিসনি বলে তিনটে চ্যানেল লক করে দিয়েছে।' যত্ত সব! এদিকে মাস গেলে দেড়শো বার করতে বাই জন্মে যায়।

পাবলিক থ্রি এক্স চায়। হর শুক্রবার রাশিয়ান চ্যানেলে ব্লু হওয়ায় পাবলিক এতদিন ভাল রেভেনিউ দিত। থানা থেকে মাল্লুর জন্য টেপাটেপি করার পর থেকে চ্যারেট। হাঁস পাড়বে ডিম, আর মামলেট খাবে দারোগাবাবু! পয়সা ছাড়া তামাশা হয়? ঝামেলা হলে কে সাম্টাবে?

পটাইকে আরো দুটো ডিম বিস্কুট দিতে বলে ধোঁয়ার রিং ছেড়ে সেই রিঙের মধ্যে দিয়ে দেখলাম রামবিরিজ পদ্মাসন করে ঝিমাচ্ছে। মার্কিনিরা উধাও।

দেশবন্ধু রোড দিয়ে একটা মালবোঝাই ঠেলা পাড়ায় ঢুকছে। নতুন কানেকশন। কোন বাড়িতে এল পাত্তা লাগাতে হচ্ছে! রাস্তা দিয়ে পর পর কয়েকটা ভাল স্যাম্পেল গেল।

পটাইয়ের এখন চায়ের বাজার ডাউন, একটু পরেই মাল গুটিয়ে খেতে যাবে। হাবুকে বিস্কুট দিতে দিতে গলা খেলিয়ে বলল, কালুদা এবার বিয়াটা করে ফ্যালান।

ঝাড়ি করতে দেখেছে? কী করব! চোখ চলে যায়।

আমি কিছু না বলে আঙুল মটকাই, না হলে জুৎসই কথা মুখে আসতে চাই না। পটাপট কয়েকটা আঙুল ফুটিয়ে নিয়ে বললাম, নিজের গাঁড়ে ধোঁয়া দে!

বলেই গাড়ি স্টার্ট। পিছনে হাবু ব্যাগ নিয়ে রেডি। অপারেশন শেষ হতে এখনও দেরি। যদি একটা মাল্লু শ্বশুর থাকত!

৩

চোখ কুঁচকে স্কুটার চালাই। শনি-রবিবার মেরামতির নাম দিয়েছি অপারেশন লাইন। গোয়ালপাড়া হয়ে শাঁখারিপাড়া, শাঁখারিপাড়া থেকে কুমোরপাড়া, কুমোড়পাড়ায় চুক্কি খেয়ে নয়াবাজার। পিছনে কেতরে বসে থাকে হাবু। রোদে মাথা ঝিমঝিম করে। শালা, হেলমেটও আগুন। খালপাড়ায় লাইনের খবর করতে করতে দেখি চারদিকে খেজুর গাছ, গরম বালিতে উটের দল। ধু ধু চারদিক। মাঝে মাঝে মার্কিন ট্যাঙ্ক আর কাঁটাতারের বেড়া। মাথার ওপরে সার্চলাইটের মতো সূর্য লাইভ।

২.

কালুর বয়ঃবৃদ্ধির ইতিহাস বলিউডের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। জঞ্জির কালু পালের ছেলেবেলা, আনন্দ—হাফপ্যান্ট, শোলে, নাইটফল, দিওয়ার থেকে ডন, গোঁফের রেখা, জোর সিটির আওয়াজ ইত্যাদি। এক ভিডিও ক্যাসেটের খাপে অন্য ফিল্মের ভিডিওর মতো কালুর বয়ঃবৃদ্ধিও এলোমেলো, ক্যায়োটিক। সে নিজেই যেন একটা বিশাল ভিডিও/সিডি লাইব্রেরি, যেখানে কমপ্যাক্ট ডিস্কে রিচ, পার্মানেন্ট ফরম্যাটের পরে কালুর বিবর্ণ স্মৃতির অবশেষ—দ্রুত মুছে যেতে থাকা কোনও ফাঙ্গাস পড়া ভিডিও ক্যাসেট, যা ঝাপসা, অস্পষ্ট। কালুর কিছু অভিজ্ঞতা ও স্মৃতি প্রত্যক্ষ ও বাস্তব, কিন্তু অনেক দৃশ্য ও শ্রাব্য অপ্রত্যক্ষ হলেও অবাস্তব নাও হতে পারে।

দৃশ্য ও শ্রাব্য। ছবি ও আওয়াজ সমৃদ্ধ সিন্থেটিক কিন্তু প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার সঙ্গে মিলে কালু পালের মাথায় জমে থাকে তার বাস্তব ও প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার গাদ।

কালু, যার যৌবন এখন চলে যেতে যেতে চোখ ঘুরিয়ে দেখে নিতে চাইছে সুখ-সময়ের রেখা, জিনাত, পারভিন, কাজল, কিরণদের; যার কানে আমিন সায়ানি, গলায় এখনো রফি কী কিশোর, চুলে অভিতাভ। দিওয়ার সেই কালু পালের বিবর্ণ অভিজ্ঞতার সঙ্গে কেবল লাইনে প্যারালাল চলে বর্তমান, বাস্তব, যেন হিন্দি ফিল্মের পুরনো গানের রিমিক্স।

তাই কেবেল কালু নিজের বিয়ের পাত্রী দেখতে গিয়ে বরাদ্দ মিষ্টি ও চা খাওয়ার পরে খুবই ক্যাজুয়ালি পাত্রীর পায়ের গোছ ও দাবনার আদল দেখতে দেখতে, শরীরের প্রতিবর্ত ক্রিয়াকে অমান্য করতে না পেরে, নজর কোমরের কাছে উঠিয়ে এনে স্পষ্ট উচ্চারণে 'হায়, কেয়া বদন!' বলে শিস দিয়ে উঠেছিল। ফলে সেবাইত পাড়ায় মার খায়।

আসলে তার চোখের সামনে তখন ভাসছিল রেখার ষোলভা শাওন। শালা ষোলো—ষোলোতেই খোলো। সেই ডবনাটির সামনে বসে থাকার অলীক সুখ-সময়ে বেডটাইম কি পসন্দ রেখা চোখের সামনে যেন অলীক রমণ মুদ্রায় কোমর ঝাঁকাচ্ছিল। কালুর শিস না মেরে কোনও উপায় ছিল না।

অজস্রবার দেখা কোনও ফিল্মের মুচমুচে ডায়লগ তার মুখে চলে এসেছিল, যেমন করে খুসবুদার খাবার দেখলে মুখ ভরে যায় লালায়। সেই অলীক দৃশ্যে

ভাসমান ভরাট পা, জাং, বুক এবং সিনের ভেতরকার সেনসুয়ালিটি তাকে খুব ক্যাজুয়ালিই কথাগুলো বলায়। তারপর বছর ঘুরে গেলেও ঘটনাটা মফস্বল টাউনে খুব খোরাক দিয়েছিল। তাই এখনও বিয়ের কথা উঠলে কেবেল কালু স্পষ্টতই বিরক্ত হয়।

তবে ফাঁক পেলেই কেবেল কালু ঘরের বৌয়ের মতো বিশ্বস্ত এইট্টি ফোর বাজাজ দাবড়ে টিকিয়াঝাড়, ময়নাবাড়ি, ধূপপাড়ার গ্রামে চলে যায় তার একটা কারণ হতে পারে যে সে হয়ত বিশ্বাস করে যে কোনও এক গাঁওকি গোরি তার জন্য শোলের টাঙ্গাওয়ালি হেমার মতো অপেক্ষা করে আছে। যেমন ফিল্মে থাকে। কালু মনে মনে জানে দুনিয়ার সব চিজ এখনও ময়লা হয়নি।

দৃশ্য ও শ্রাব্যের সঞ্চিত স্মৃতি তাকে যেসব প্রাথমিক অভ্যস্ততা দেয় তা প্রত্যক্ষ হলেও সিন্থেটিক। কিন্তু কেবেল কালু এখন বোঝে তার পক্ষে বুঝে লঠা ক্রমশ কঠিন হয়ে দাঁড়াচ্ছে যে কোনটা তার পরোক্ষ স্মৃতি আর কোনটা প্রত্যক্ষ।

যেমন মুৎসুদ্দি পাড়ার শেষটায়, যেখানে মণ্টু সাহার পাশের পানাপুকুর অবধি গিয়ে টাউন শেষ, চাষের জমি শুরু। কেবল এরিয়ার সেই সীমান্তে দাঁড়িয়ে কালু পাল দেখতে পাচ্ছিল সমুদ্রের ধারে ঘোর গরমে গা ভিজাচ্ছে জিনাত। কুরবানির জিনাত...সেভেনটি টুতে দল বেঁধে পানাপুকুরে ঝাঁপ খেলা। অনবরত প্রত্যক্ষ আর পরোক্ষ স্মৃতি আসা-যাওয়া করছিল পিংপং বলের মতো।

ব্যাকগ্রাউন্ডে অমিতকুমারের আওয়ারা গলায় লায়লা হো লায়লা লায়লা। এরকমই একঝাঁক সুরের বর্ষা নিখুঁত বুননের দোরঙা উলের মতো মাথার ভেতরে মিলেমিশে যাচ্ছিল। কালু সে-সব পাত্তা না দিয়ে সাহা বাড়ির সীমান্তে বুস্টারটা হাবুকে দিয়ে চেক করিয়ে নিতে নিতে সরাসরি ক্ষেতের দিকে তাকিয়েছিল। মাথার সার্কিটে আজকাল বড্ড ডিসটাপ দিচ্ছে।

টাউনের কেবল সীমান্ত থেকে পচা নাড়ুর এরিয়া। টাউনের গায়ে ঠেসে থাকা শোভাগ্রাম গঞ্জের দিকটায় নতুন লাইন। লাস্টবার মণ্টু সাহার বাড়ি ছাড়িয়ে এলাকার ল্যাম্পপোস্টে নাড়ু কেবল ফেলার পর কালু খুব হাল্লা করে। কালু অ্যাসোসিয়েশনে কমপ্লেন করার পর অ্যাসোসিয়েশন অনেক চুদুরমুদুর করে পরে পচা নাড়ুকে এরিয়া ছাড়ার হুকুম দেয়।

তারপর থেকে মুৎসুদ্দি পাড়ার পানাপুকুরটাই লাইন অব কন্ট্রোল।

এক সময় এই পানাপুকুরে নাড়ুদের সঙ্গে কম সাঁতার কেটেছে কালু? নতুন বর্ষার জল ঘাঁটতে ঘাঁটতে নাড়ুর দু'হাত, পায়ের খাঁজে পাঁচড়ার রস গড়াতো। তখন থেকেই তার নাম পচা নাড়ু। এখনকার কটা লোক এসব জানে?

এখন কালুর সেই ন্যাংটা পোঁদের দোস্ত বর্ডারে কালুকে লেঙ্গি দেওয়ার জন্য ননস্টপ কাস্টোমারদের কান ভাঙায়। আং সাং চ্যানেল দেয়। নাড়ুর এলাকায় উনিশ নম্বর খাচ্ছে তো, কালই কালুকে ডিশে উনিশ লাগাতে হবে না হলে কাস্টোমারের রোয়াব।

পচা নাড়ু পার্টির ছেলে। দোস্ত দোস্ত না রাহা, প্যার প্যার না রাহা। কালু গুনগুন করতে করতে হাবুকে দিয়ে বুস্টার আর লাইন চেক করায়।

কালু হাড়ে হাড়ে জানে সীমান্ত এলাকায় কাস্টোমাররা নাড়ুর লাইন নিয়ে ফেললেই মুশকিল। তখন নাড়ু বাঁই বাঁই করে লাইট পোস্টে ঝুলতে ঝুলতে কম্যান্ডোদের মতো পৌঁছে যাবে টাউনের সেন্টারে। তখন কালুকে এলাকা ছাড়তে হবে। তবে যতদিন জান আছে, কালু এলাকা ছাড়বে না। ছেঁড়া পরোটার মতো, নাকি ইন্ডিয়ার অর্ধেক ম্যাপের মতো টাউনটার মাঝখানটা আর পশ্চিম দিকে ছড়ানো তার টেরিটরি। মা কসম ও টেরিটরি ছাড়বে না কালু।

তবে লাস্টবারের কেবল অপারেটর মহাসম্মেলনে কালুর বারফট্টাই ধুয়ে সাফ। ইউনিয়ানের নেতা সুভাষ বোস পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করে জলদগম্ভীর ভাবে গলা কাঁপিয়ে সম্মিলিত প্রতিনিধিদের ভয় দেখায়, বড় কোম্পানি নাকি মফস্বলে ঢুকবে, কাস্টোমারকে ধরে রাখা যাবে না। তখন দেওয়াল ভেঙে নতুন লাইন নিতে ছুটবে পাবলিক। তাই সব কেবল কোম্পানি মিলে মহাজোট গড়ে একটাই নেটওয়ার্ক করতে হবে।

কালুর মাথায় তখন প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ স্মৃতির পিংপং খেলা শুরু হয়েছে। তখন কালু দেখছে একটা বড় ডিশ। ডিশের রঙ ডিমের খোলার মতো। সেই খোলায় টুপটাপ ঝরে পড়ছে সাউন্ড আর পিকচার। বৃষ্টির মতো। ব্যক্তিগত। টুপটাপ, টাপটুপ। প্রতিটা ফোঁটার মধ্যে হাসি, কথা, গল্প, গান, ড্যান্স।

কালু পাল লাইনের সব থেকে পুরানো প্লেয়ার। বড় মুখ করে, অমিতাভের মতো একটা কাঁধ ঝুঁকিয়ে, চুলে হালকা হাত চালিয়ে লিডার সুভাষ বলেছিল, ওসব করে কিছু হবে না। টাইমে সার্ভিস না দিলে ভোগে চণ্ডী। নাহলে কোনও মাল্টিন্যাশনালের বাপও কিছু করতে পারবে না। জো ডর গ্যয়া, সমঝলো উয়ো মর গ্যয়া! এই মরা টাউনে কোনও মাল্টিন্যাশনাল এমনি ভিড়বে না, বস।

তাতে সুভাষ বহুত খাড় খেয়ে ওপেন সেশনেই তাকে খিস্তি দেয়। তারপর থেকে কালুর লাইনে ধস।

ষোলটা কাস্টোমার খসিয়ে দিয়েছে পচা নাড়ু। এদিকে কুমোরপাড়া, রেলবাজার, থানা মোড়, হসপিটাল বাবলুর টেরিটরি। বাবলু নিজের টেরিটরি ছাড়িয়ে এখন কালুর এলাকায় ঢুকছে।

অন্যদিকে মুচিপাড়া, স্টেশন, মন্দিরপাড়া, বাঁশহাটির দিক থেকে হামলা চালাচ্ছে বাংলা। উত্তর দিকটায় অবশ্য ল্যাং-নিতাইয়ের সঙ্গে কালুর আন্ডারস্ট্যান্ডিং আছে। নিতাই আবার অন্য ইউনিয়ান আলাগমা কালার। নিতাইয়ের নতুন পার্টি। তাই এখনও কালুর কাস্টোমার খসায়নি। কিন্তু বাকি তিন দিক থেকে চেপে ধরে পচা হারু, বাবলু, বাংলা।

কালু নিশ্চিত, এসবই সুভাষ বোসের খেলা। এদিকে ত্রিশূলের দুই শূল বিনয়

আর রতন—কালুর পার্টনাররা থোক পেলেই বসে যাওয়ার জন্য রেডি। সুভাষ টাউনের হার্টটা চাইছে। তাহলেই ছক্কা ক্ষীর। সেই ক্ষীর কন্ট্রোল করবে বাঞ্চোত সুভাষ বোস। যে-কোনও বড়, সংগঠিত জিনিস কন্ট্রোল করা সহজ।

কালু হয়তো মুখ না খুললেই ভালো ছিল। কিন্তু সময়ে অসময়ে কথা আর ছবি এমন চক্কর খায় কালুর মাথার, যে সে কিছু বলার আগেই যা বলার নয় মুখ তা বলে ফেলে।

কালু ঠিক করে রেখেছে তেমন হলে ল্যাং নিতাইয়ের নতুন ইউনিয়ানে জয়েন দেবে। ল্যাংদের পার্টির এখনও রেট কম।

সীমান্ত এলাকার বুস্টারটা চেক করানোর পরে খানিক টহলদারি করতে করতেই খিদেয় পেট ডাকতে শুরু করে কেবেল কালুর। স্কুটার স্টার্ট দেয় কালু, মাথায় হেলমেট। পিছনে যন্ত্রপাতি নিয়ে ঠেসে বসে হাবু। প্রতিদিনের রাত্রিকালীন কেবল যুদ্ধের জন্য কেবেল কালু আরেক সীমান্তের দিকে রওনা দেয়।

৩.

গোয়ালপাড়া মোড়ের ডানদিকের চার নম্বর বাড়িটা হারু ঘোষের। হারু আমার সঙ্গে পড়ত। বল্টু আর হারু আমার খুব বন্ধু ছিল। একসঙ্গে কন্ট্রোলের চাল তোলার লাইন দিয়েছি। সিনেমার টিকিট ব্ল্যাক, কোলবলের ব্যবসা। কত কী! তখন দিনকাল অন্যরকম ছিল।

এক হোলিতে হারু স্ট্যাব হয়। হারুর হাতে ছিল ভদ্রপুর থেকে কেনা নতুন টেপ। জাপানি মাল। দমদার। মরা হারুর লাশের পাশে পড়ে থাকা টেপটা থেকে গান হচ্ছিল 'বাহারো ফুল বরষাও, মেরে মেহবুব আয়া হ্যায়।'

হারু রফির ফ্যান ছিল। আমি কিশোরের। হারুর ছোট বোনটা এখন সকালের বাসে শিলিগুড়ির লাইনে যায়। মধু বলছিল। হারু মরে গেলেও হারুদের বাড়িটাকে আমার হারু ঘোষের বাড়ি বলেই মনে হয়। অবশ্য এখন আর সে বাড়ি নেই। নতুন চকচকে ফ্ল্যাট উঠেছে। খোপে খোপে নয়া চিড়িয়া। আমার কাস্টোমার। ডলি বৌদি তিনতলায় ডানদিক। বৌদির কোমরের তিলটা মথার খুন তুলে দেয়। মেজাজ ডাউন থাকলে ডলি বৌদির বাড়িতে লাইন সারাতে যাই।

হারুর বাড়ির পরে ধরণী মাস্টারের বাড়ি। মাস্টারের একতলায় নতুন কাস্টোমার ঢুকেছে। নতুন ভাড়াটে।

বাইরে থেকে কলিংয়ের শব্দে বারান্দা থেকে ধরণী মাস্টারের বউ উঁকি দিল। রবিবারের বাজার, মাংসের গন্ধ ছাড়ছে, মাস্টারের বাড়ি থেকে। মাস্টারের ছেলে বাপি জেলা পরিষদের ঠিকাদার। সলিড কামাই। ধরণী মাস্টারের বউ আমাকে দেখেই পানের পিক ফেলার মতো করে বলল, কালু, লাইনটা ঠিক কর! এক আকাশের নীচে দেখতেই পাচ্ছি না। পেমেন্টের বেলা দেরি করিস না...

ধরণী বুড়ো আমার মাস্টার। ধরণী কোচিংয়ের টাইমে নোট লিখতে বসিয়ে বাজারে যেত। সেই ধরণীর ঘরনী এখন টাটকা চ্যানেল চায়! 'মাসিমা। আর কটা দিন। লাইন পাল্টাচ্ছি তো। তারপর একদম ফাস ক্লাস। ডিজিটাল। ড্রেসিং আয়নার মতো ছবি। কাঁচ, কাঁচ, পুরো কাঁচ।' মাসিমা উত্তর দেয় না। আমি দাঁত কেলিয়ে বলি, 'পাড়ায় নতুন লোক এল দেখলাম তাই একটু খোঁজ করতে এলাম। কোত্থেকে এল?'

মাসিমার মুখ হাঁড়ি। লোকাল মাসিমা খোপে ঢুকে যায়।

লোকাল হলে বহুত লাফরা। 'না, ভাই, তার তো নিয়ে এসেছি। নতুন তার লাগবে না। ডিপোজিট করা ছিল। ফেরতই দিল না! আবার কেন দেব?' শুরু ইস্তক সওয়াল। না হলে মোড়ের মাথার পোলে আমার মেইন কেবল। বুস্টার। সেখান থেকে লাইন ধরালে চোখ বন্ধ করে তিনশো ঢুকে যাবে। আংসাং টপাতে পারলে আরো দুই। ডিপোজিট পাঁচশো। হাজার টাকা তো এখন পাবলিকের হাতের ময়লা।

গোড়ায় ব্যবসা ছিল তিন পার্টনারের, তখন ডিপোজিটের টাকায় কারবার চলত। পরে বিনয় প্রোমোটারিতে ঢুকে গেল। রতন ঠিকাদারি। জেলা পরিষদ, পি. ডব্লু. ডি, ইরিগেশন। আমিই টিকে আছি। তেফলার দুটো দাঁত ভাঙা। হারামিগুলো এখন নোট গোনে। স্লিপিং পার্টনার। শালা বালের পার্টনার।

ক্যাপিটাল না থাকলে গায়ে খাটতে খাটতে চ্যারেট। বাঞ্চোতরা এখন বউয়ের কোলে শুয়ে দুদু খায়! আমার বিয়ে হবে? কবে? টাউনে কেউ আমার জন্য অপেক্ষা করে নেই।

অলরেডি টাক পড়তে শুরু করেছে। অমিতাভ-কাট আর চলে না। তবুও টাকটা ঢাকা থাকে। চোখের কোন কুঁচকে যাচ্ছে, কষের দাঁত নড়ছে। সকালে অম্বল হয়ে মুখ টক মেরে থাকে। রাতে ঘুমের আগে হাত-পা ছাড়াই, সামনে বেন্ড হতে পারি না— কোমরে লাগে। শরীরটা ঠিক রাখতে হবে। কি করে রাখব, ঘুমই আসে না।

মেয়ে দেখলেই চোখ চলে যায়। রাতে ছবি আসে লাইন দিয়ে। পারভিন, জিনাত, রেখা। রেখাকে ভাবলেই হিট। হিটে হিটাক্কার।

টিপছি সাড়া নেই। বেল বাজছে। কেয়া হ্যায় ভাই, কুছ তো বোলো!

খোলে না বাঁড়া, কালা নাকি?

ধরণী মাস্টার আর হারুর বাড়ির মাঝখানে এক চিলতে রাস্তা। সাইড কাটি। এই প্যাসেজে সাইকেল রাখতাম কোচিংয়ের সময়। মাস্টার বাজার থেকে ফিরতে দেরি করলে বিড়ির ধোঁয়া উড়ত। এই ফাঁকটার নাম ছিল কোচিং ফাঁক। কোচিং ফাঁকে ঢুকি। থানকুনি, ঘাস, ক্লাসিকের প্যাকেট, ফ্ল্যাটবাড়ির কন্ডোম, লটারির ছেঁড়া টিকিট। ডানদিকে বড় ঘর। হারু, আমি, বল্টু, ভোম্বল, সুজিত, মধু, উৎপল। উৎপল এখন ক্যালকাটায় ডাক্তার। সুজিত শিলিগুড়িতে ল'ইয়ার, এখন খবরে কাগজে নাম থাকে। বউটা সলিড। এই ল্যাদরা টাউনে যারা পড়ে আছি তারা কেউ ভাল নেই।

মধুর পানের দোকান। বউটা বাঁজা। ভোম্বল বাড়িতেই থাকে, দাদার ঘাড়ে। বেকার।

গলিতে ঢুকতে ঢুকতে ভাবি, হারু ভোগে। বল্টু মাতাল। আমি কেবেল কালু। তবু টিকে আছি।

প্রি-ইউ ছেড়ে কোলবল, তারপরে চোট খেয়ে অনন্ত সাহার সাউন্ড সাপ্লাইয়ে ঠিকে। আহুজা সেট, চোঙ, মাউথপিস, স্ট্যান্ড। কর্ডলেস মাইক তো পরে। বানারহাট, ময়নাগুড়ি, ফালাকাটা। বিচিত্রানুষ্ঠান, কিশোর নাইট, আশা নাইট। পিয়া তু আব তো আজা। কিশোর, আশা, রফি, মুকেশ, রুনা লায়লা। অরিজিনাল না, কণ্ঠী। 'হ্যালো, হ্যালো, হ্যাল্লো-ও। মাইক টেস্টিং, ওয়ান টু থ্রি ফোর।'

মাইক ঘষতে ঘষতে ভিডিও হল। ফাটা জগার। শাঁখারিপাড়ার ভাড়া ঘর। টু ডেজ-থ্রি গার্লস, লাভ নাইট, পারসোনাল সেক্রেটারি, উমঙ্গ ভরি রাত নাশিলি জওয়ানি।

তারপর কেবল। বিনয়, কালু, রতন। ত্রিশূল কেবল। ফিল্মের নামে নাম। অমিতাভ, রাখি, শশি, হেমা।

কাল রাত্তিরে বল্টু শনি মন্দিরের সামনে ধরেছিল। নেশার ঝোঁকে অনেকক্ষণ কাঁদল। রাতে মন্দিরের মোড়ে একবার না বসলে এখনো ব্যয়ন মেলে না। আগে ফুলকাট আড্ডা হত। এখন সন্ধ্যা থেকে জুনিয়াররা বসে। রাতে ওরা উঠলে কোনওদিন মধু আসে, কোনওদিন ভোম্বল। বল্টু ডেলি বাড়ি ফেরার পথে একবার ঠেক খায়। শনি ঠাকুরকে জোর প্রণাম করে। বিড়বিড় করে 'মা, মা' বলে। শনি কি মা? শালা! তোর বাপের মা।

কাল ফোঁপাতে ফোঁপাতে বল্টু বলল, 'তুই তো জানিস, আই কংগ্রেস, মাই কংগ্রেস, মাই ফরটিন ফাদার কংগ্রেস, কংগ্রেস ফ্যামিলি! তবু শালা একটা চাকরি হল না?'

নেশার ঝোঁকে কত পিছিয়ে গেছে বল্টু। এখন আলাগ জমানা। আমিন সায়ানি নেই। বিনাকা গীতামালা, রেডিও শেষ। এখন কেবল। কেবল আর সিপিএম।

ভোম্বল রাতের ঠেকে মাঝে মাঝে আসে। বছরভর ভোম্বল মাফলার পরে থাকে। বাতিক। চাকরি না পাওয়ার বাতিক। কথায় কথায় ঠান্ডা লাগে ভোম্বলের। ওর এখন একটা ফুটো চাই। হয় চাকরি না হয় মেয়েছেলে। বল্টুর কান্না শুনে ভোম্বল খুব সিরিয়াস মুখ করে বল্টুকে বোঝাচ্ছিল, এ জন্মে চাকরি না হলেও সামনের বার হবেই। প্যানেলের প্রথম দিকে নাম থাকবে, সামনের জন্মে মিলিয়ে নিস। গরিবের কথা মামা, বাসি হলেই ট্রু।

ভোম্বলের মাথাটা গেছে।

কোনও সাইডেই নেই। স্বপ্ন কা সওদাগর। পয়সা ফেঁকো, তামাশা দেখো।

লাইন লাগাও, লাইন লাগাও। ঘরে ঘরে কেবলেরই লাইন লাগাও।

সুর লাগাই, 'আগুন জ্বালো, আগুন জ্বালো'। ফুলটুসি গাইতো। হারুর মেজো বোন। খুব সুইট ছিল। একদম খাপে খাপে। এখন কোথায় থাকে কে জানে।

ফুলটুসিকে কিস খেয়েছি। লাইফের ফাস্ট কিস। প্রি ইউ। ফুলটুসির নাইন।

তারপর আর কাউকে কিস খাওয়া হয়নি। এখন কাউকে বিছানায় পেলে সির্ফ চটকেই মেরে দেব। হাত নিশপিশ করে। ধুন হলে আজকাল নাইটফল হবেই।

জীবনে আর আছে কী? ফি শনিবার দারু, রাতে ভাত খাওয়ার পর ফিন্টার, ঘুমের আগে হাতমারা আর কেবলে ভেসে আসা সিন। ব্যস! মা এখনো বকবক করে—কালু, ঘরে একটা বউ আন! মরার আগে দেখে যাই। আমার যা অলুক্ষণে কপাল। বলে আর প্যানপ্যান করে কাঁদে।

আমার মা আর বেশিদিন নেই। তারপর আমার আর কোনও হ্যাপাও নেই।

ধীরে ধীরে গলি দিয়ে এগোই। একটার পর একটা জানালা হাট করে খোলা। কেউ নেই। কিছু নেই। শেষ বড় ঘরটার দিকে এগোয়। মাস্টারের শনিপুজোর মন্দির। জঞ্জাল আর জঙ্গলে ঢেকে আছে গলিটা। কোচিং ফাঁকের জঙ্গল ঠেলে এগোই জানালা দেখতে দেখতে। মনে সুনহেরি ইয়াদেঁ ভিড় করে।

বড় ঘরের জানালায় উঁকি দিতেই হাঁ!

কোথ থেকে কিশোর-কলি এসে ভাসিয়ে দিল ব্যাকগ্রাউন্ড। বডির ভেতর থেকে উঠে আসছে গান। জ্বর আসছে। হাতের লোম খাড়া। হিন্দি ফিল্মের টগবগে ইমোশন গলার কাছে আটকে যায় চোকড্ ড্রেনের মতো।

রূপ তেরা-আ মস্তানা, প্যার মেরা-আ দিওয়ানা ভুল কভি হামসে না হো যায়! ট্যাট ট্যারা!

ঠোঁটে শিস্ পঁচ্চিশ-তিশ সাল পহলে য্যায়সা। চুলে ঘন অমিতাভ, বেলবটস্। হাতে স্টিলের বালা। হামারা পাশ গাড়ি হ্যায়, বাংলা হ্যায়, মোটোর কার হ্যায়। তুমহারা পাশ কেয়া হ্যায়?...যিনসে পঁচ্চিশ বরষতক আপনা মাকো যোড়ে যোড়ে মরতে হুয়ে দেখা...মাই নেম ইজ অ্যান্টনি গনজালভেজ...

সময় দুমড়ে-মুচড়ে যায়, চাকার নীচে পড়া কৌটোর মতো। আমিও দুমড়ে-মুচড়ে ছোট হয়ে যেতে থাকি। চারদিকে পাগলের সাউন্ড..গব্বর সিং আপনি আদমি সে বাহো কি হাতিয়ার ফেক দে...। দু'হাতে গরাদ চেপে দেখতে থাকি সেভেনটি সেভেনের প্রি ইউ ব্যাচ। পিন্টু, ভোম্বল, সুজিত, মধু, উৎপল। আমি সুরজিৎ পাল—কালু। কোচিং ফাঁকের গলি থেকে ভিতরে ঢোকার জন্য গরাদ ধরে ঝাঁকাই, যেন লোহার গরাদের বাইরে অন্য কোনও দুনিয়া আমার জন্য সত্যিই ওয়েট করে আছে।

৪.

কালু পাল গোয়ালপাড়ার বাড়ির ফাঁকের মধ্যে গণধোলাই খায় ও মারা যায়। যদিও তার বিস্তারিত কোনও খবর পরদিনের কাগজে এমনকি লোকাল পেপারেও বেরোয়নি। অবশ্য পাবলিকের তেমন কোনও হাউসও ছিল না। ভিতরের পাতায় বোল্ডে ও লম্বা এক কলমে 'গণপ্রহারে কেবলওয়ালার মৃত্যু' শিরোনামে খবরটার ভিতরে বর্ণনা ছিল কিভাবে এলাকার বিশিষ্ট শিক্ষক (প্রাক্তন) ধরণীধর মজুমদারের বাড়ির নতুন ভাড়াটে যুবতীর আর্ত চিৎকারে এলাকার মানুষ নিমেষে মাঝ দুপুরে

জড়ো হয়। বিশিষ্ট জননেতা শ্রী সুভাষ বোস অনেক চেষ্টা করেও ক্রুদ্ধ জনতাকে ঠেকাতে ব্যর্থ হন।

জনৈক কালু পাল, এলাকার কেবল অপারেটর, কিভাবে লাইন লাগানোর অজুহাতে ঘরে ঢুকে সেই যুবতীর শ্লীলতাহানির চেষ্টা করে। যুবতীর বয়ানে সে বিবরণ থাকলেও সেই রিপোর্টে চিচিং ফাঁক গলি, ধরণী মাস্টারের পড়ানোর বড় ঘর বা তার গরাদওয়ালা জানালা, আদৌ কেবলওয়ালা ঘরে ঢুকেছিল কিনা অথবা সেই ভরা দুপুরে কীভাবে এতগুলো ষণ্ডা লোক গোয়ালপাড়ায় গলিতে এক চিৎকারে জড়ো হয়ে গেল—তার কোনও বিবরণ কাগজে ছিল না।

ঠিক কী কী ঘটেছিল তা নিয়ে এলাকার মানুষের সন্দেহ থাকলেও প্রত্যক্ষদর্শী অনেকের মুখে সে রাতে শনি মন্দিরের মোড়ে শোনা যায়, মার খাওয়ার সময়ও কালু প্রতিরোধের কোনও চেষ্টা করেনি, বরং তার মুখে হাসির ছাপ ছিল স্পষ্ট। মার খেতে খেতেও সে অনবরত চিরুনীর মতো হাত চালিয়ে অমিতাভ-চুল সেট করছিল। তার মুখে লেগে ছিল এক অজানা অভিমান। মধু পরে বলেছিল, পুরো শোলের অমিতাভ।

ঘটনার বিবরণে উল্লেখ ছিল না কিশোরকুমারের সেই গানের, মৃত কালু পালের কোচিং ব্যাচের, সেই দুপুরে মাস্টারের ভাড়াটের ঘরে অন্য কেউ ছিল কিনা।

সে রাতে লোকাল কেবলে কালু পালের ডেথ নিউজটা 'নগর সংবাদ' অনুষ্ঠানে প্রচারিত হয়, তা স্বাভাবিকভাবেই ছিল নৈর্ব্যক্তিক। ভিস্যুয়ালে যুবতীর ওড়না ঢাকা মুখের ক্লোজ আপ, মৃত কালু পালের রক্তাক্ত দেহের ক্লোজ শট, ঘাসের চাপড়া ওঠার মতো ফাঁকা হয়ে আসা অমিতাভ-চুল—এ সব কিছুই বর্ণময় কোলাজের মতো ছড়িয়ে ছিল পর্দা জুড়ে। কালু পাল যে রিচ ফরম্যাটের ইস্টম্যান কালারে সারা জীবন ডুবে ছিল, মৃত্যুর পরও সেই দৃশ্য ও শ্রাব্যের সেট দুনিয়া তাকে ছাড়েনি। যদিও পাবলিক ভুলে গেছিল। কারণ চ্যানেলে থাকবে লাশ থাকবে না, তাই কখনও হয়?

খবরের পর কারেন্ট হিন্দি বইয়ের নীচ দিয়ে স্ক্রোল মেসেজে ভুল বানানে বার বার চলে যাচ্ছিল—কালু পাল, তোমাকে আমরা ভুলছি না, ভুলব না—কেবিল অপারেটরস অ্যাসোসিয়েশন।

বিশ্বস্ত সূত্রে জানা যায়, কেবল কালু যেদিন মারা যায় সেই দিন ধরণী মাস্টারের যুবতী ভাড়াটের রাত হয়েছিল শুতে। অনেক রাত পর্যন্ত টিভিতে গান চলছিল ধরণী মাস্টারের একতলায়।

ফুলটুসি খাটে আধশোয়া হয়ে টিভি দেখছিল। সুভাষ বোস আর কালুর জিগরি দোস্ত স্বর্গত হারু ঘোষের মেজো বোন ফুলটুসি। যে একসময় কালুর খাপে খাপ ছিল।

কালু জানতো না টাউনটা ধীরে ধীরে হলেও বড় হচ্ছে। একদম ঝাক্কাস।

সুভাষ লোকাল হাতের মোবাইলে খুচরো ফোন সামলাতে সামলাতে চ্যানেল সার্ফ করছিল। টিভির কেবল চ্যানেলের কোনও একটায় গান হচ্ছিল 'রূপ তেরা মস্তানা, প্যার মেরা ...।' কিশোরের রিমিক্স।

আর একটি মেষশাবক

সাগরিকা রায়

চোর-পুলিশ খেলতে খেলতে হঠাৎ-ই নিজের সযত্নে রক্ষিত কাগজের টুকরোটা বাকি চারজনকে দেখিয়ে দিল মধু। বাকিরা ওর এই কাণ্ডে একেবারে অবাক। "মধু ডাকাত! মধু ডাকাত! আগেই বলে দিলি? ঝুমন পুলিশ হয়েছে, সে-ই তোকে ধরত! কাগজ দেখালি কেন?" জোর চিৎকার হল। মধু শুনতে পায়নি। কাল বিকেলে বৃন্দার বাবা ওকে কাছে ডেকে এক টাকার একটা কয়েন দিয়েছিল। বৃন্দাকেও দিয়েছিল। কাঠিবরফ খাওয়ার জন্য। সেই পয়সাটার কথা আজ মনে পড়ল। মনে পড়ল বৃন্দার বাবা ওকে মাসখানেক আগে একটা শার্ট দিয়েছিল। নীল ছাপা শার্ট। কমলা স্টোর্স থেকে কিনেছিল। কিন্তু, তখন বৃন্দাকে কিচ্ছু দেয়নি। বৃন্দা শার্টের কথাটা জানে?

এখন কয়েকদিন যাবৎ মেঘ আর রোদ ওদের মতো চোর-পুলিশ খেলছে। বর্ষা শেষ। অথচ, শরৎ এখনও সেভাবে দাবি দেখাতে পারছে না। মাঝে মাঝে ঝুপ্ ঝুপ্। চারপাশ ঝাপসা! গুমোট!

আজ শেষরাত থেকে বৃষ্টি পড়ছিল। গভীর ঘুমের মধ্যে বৃষ্টির শব্দ ও মেঠো গন্ধ নাকে আসছিল মধুর। সেই সোঁদা গন্ধ শুঁকতে শুঁকতে বাতাসে ভর করে উঠে দাঁড়াল মধু। মাঠময় বৃষ্টির জল। পায়ের পাতা ডুবে যায়। ঘোরলাগা আলো মাখামাখি হয়ে আছে চারপাশে। সবুজ মাঠ বুকপেতে বসে আছে মধুর জন্য। আর আছে মতি ওঝা। ডুগডুগি বাজছে তার হাতে। শুকনো নারকুলে মুখ। পাতলা ঠোঁট পানের রসে জবজবে। কোটরগত চোখে ডুগডুগি বাজায়——'ডে-ডে-ডে...ডুগ্...ডুগ...!' ডুগডুগির তালে তালে দুলে চলে মধু। এই সুর আর তাল সবকিছু ভুলিয়ে দেয়। আকাশ, মাটি, মানুষজন, ঘরবাড়ি....সব ছাপিয়ে মধু অন্য জগতের অধিবাসী। তখন ওর আঙুলের ডগায় ভুবন নাচে 'যোভি চাউ/ও ম্যায় পা-উ.../ জিন্দেগিমে জিত যাউ...।' সূর্য কাঁপে তখন ওকে দেখে। মতি ওঝা এই সময়ই তীক্ষ্ণ গলায় হেঁকে ওঠে— 'মো...ও...ওধ্...উ-উ ...উ! বাতা-দে, মেরে হাথোমে ক্যায়া হ্যায়! বাতা-দে....!'

মধু দু'হাতে মাটিতে ভর দেয়। তারপর অদ্ভুত কায়দায় শরীরটা উল্টে ফেলে। আবার মাটিতে পা রেখে দাঁড়ায়। এভাবেই ছ'বার কি সাতবার ফটাফট্ উল্টে যায় ও।

প্রক্রিয়া বজায় রাখতে রাখতে ও চিৎকার করতে থাকে "হাথমে হ্যায় এক রূপিয়া....এক রূপিয়া, ...বাঁয়ে হাথমে একঠো কেলা, হরবখত অকেলা...আ...আ।" মতি ওঝা হাতের মুঠো খোলে। বিস্মিত দর্শক দেখে মতি ওঝার থেকে অনেকটা দূরে দাঁড়ানো মধু চোখ বুজে চেঁচিয়ে চলেছে। মতি ওঝার খোলা মুঠিতে এক টাকার একটি কয়েন, একটি হলদে পাকা কলা।

উল্টে যেতে যেতে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে পড়েছে মধু। এবার শূন্যে দড়ির ওপর দিয়ে হেঁটে যাবে ও। দু'হাতে ধরে আছে লম্বা বাঁশ। আড়াআড়ি ভাবে। দ্রুত গতিতে ডুগডুগি বাজে। সুর তুলে মন্ত্র পড়ে মতি ওঝা—'গড় করি মা/ গড় করি মা/ বাতাসে শক্তি দে। হাতে পায়ে বল দে/ কান্ধাপর সওয়ারি দে/ সওয়ারিকো দিল দে....এ...এ...এ!' শেষের 'এ' শব্দ উচ্চারণের সময় গলায় জোরসে ঝাঁকি দেয় ওঝা। তারপরই স্যাক্ করে থেমে যায় শব্দ। তারপরই সব নিশ্চুপ। মধু নেমে আসতে থাকে আকাশ থেকে। তেলহীন শুকনো চুল। বাতাসে পত্‌পত্‌। নীল ছাপা শার্টে অদ্ভুত কমলালেবু আলো ছুঁড়েছে আকাশ। ছোট ছোট দাঁতগুলোয় অবাধ্য হাসি। গত হপ্তায় সামনের দাঁত পড়েছে একটা। মতি ওঝা মন্ত্র পড়ে দেবে বলেছে। মন্ত্র পড়লেই রাতারাতি দাঁত গজাবে। জানে মধু।

একফালি ন্যাকড়ায় ওর চোখ বেঁধে দেয় ওঝা।

'তেরা উমর বাতা!'

'আঠ!'

'তেরা পা-ও কে নীচে ক্যয়া হ্যায়?'

'মিট্টি!'

'মিট্টি-কে নীচে?'

'আগ!'

'আগ-কে নীচে?'

'পানি!'

'পানি-কে নীচে?'

'পাথর।'

'পাথর-কে নীচে?'

ম-ধ-উ!

অন্দরের আবছায়ায় নড়েচড়ে মধুর মা। মাঠের সোঁদা গন্ধ ঘুরেফিরে আসে। বৃষ্টি এখনও ধরেনি। গুটিয়ে শুয়ে থাকা মধু মায়ের ডাক শুনতে পাচ্ছিল। উঠতে পারছিল না। যেন, মাটির সঙ্গে গেঁথে আছে। উঠতে পারবে না। কোনওদিন না।

মধুর মা বেরিয়ে যাচ্ছিল। মাস্টারমশাইয়ের বাড়ি রান্না করতে যাচ্ছে। কখনও মধু মায়ের সঙ্গে যায়। আজ যাবে না।

'ওঝা এসেছিল। বিকেলে খেলা দেখাতে যাবি। ঘোগোমালি স্কুলের মাঠে।' মায়ের

কথা ঘরের মধ্যে ঘোরে। চোখ বুজে ঘাড় কাত করে শুয়ে মায়ের চলে যাওয়াটা দেখে মধু। মতি ওঝাকে দেখে। মাঠ দেখে। মাঠের সোঁদা গন্ধ দেখে। দর্শকদের দেখে। সব। সব দেখতে পায়। কাল যখন জুবিলি ক্লাবের মাঠে খেলা দেখাচ্ছিল, যখন মতি ওঝা ওর দু'চোখ কাপড়ে বেঁধে নানান প্রশ্ন করছিল, রুমাল-বাঁধা চোখে ওঝার প্রশ্নের জবাব দিচ্ছিল মধু।

'ক্যায়া হ্যায় হাথ-মে?'

'ছোটা সা পাত্থর।'

'মাথে পর?'

'এক আপ্পেল!' মা কথা বলছে! হেসে গাড়িয়ে পড়ল মা। 'আপ্পেল' না বলে 'সেও' বলার কথা ভুলে গেল মধু।

'বাক্‌সা-মে?'

'দো চাম্‌চ।' লোকটা মদ খাচ্ছে!

'বাবুকো পকিট্-মে ক্যয়া হ্যায়?'

'দশ রূপিয়া। একঠো কাগজ। এক অঙ্গুঠি!' এটা কোন লোকটা? পরশু যেটা এসেছিল? নাকি নতুন কেউ? পানের দোকানি? ড্রাইভার? চেককাটা লুঙি। আতরের গন্ধমাখা তুলো কানে গোঁজা। মধু ঘরে ঢুকে গন্ধ পাবে। কে এসেছিল? কারা এসেছিল?

এ...এ...এ....মতি ওঝা সুর তুলে ছড়া কাটে—

'আ যা! আ যা! আ যা!

ইহাপ্পর!'

তেরে কিতনে হাথ!

'দো।'

কিতনে আঁখে!

'দো।'

কিতনে দিল!

'এক!'

ডুগডুগির তালে তালে ডিগবাজি খেতে থাকে মধু। ঘাসের গন্ধ-ভরা মাটির ওপর উল্টে যেতে থাকে। মাটি ভেদ করে আগুন, পাথর, জল....উঠে আসতে পারে না। যখন পারে, তখন সব পুড়িয়ে দেয়। ভাসিয়ে দেয়। হয়ত।

২

বৃষ্টি পড়ছিল। বারান্দায় দাঁড়িয়ে আকাশ দেখল অহনা। আজ আর রোদ উঠবে না। শ্যামল কি আসতে পারবে? জ্বর-গায়ে না আসাই ভাল। তবু, না এলে ভাল লাগবে না।

গেট খুলে চম্পা ঢুকছে। অহনাকে দেখে হাসল। ওর টেনে-আঁচড়ানো চুলে প্রজাপতি মার্কা ক্লিপ। বছর পাঁচেক হল চম্পাকে দেখছে অহনা। মনে হয়, একটুও বয়স বাড়েনি। একই রকম। চম্পা কি কোনও রূপটান ব্যবহার করে? মনোযোগ দিয়ে চম্পাকে দেখতে দেখতে প্রশ্ন করে অহনা—'মধু এল না?'

'নাঃ! বিকেলে খেলা আছে যে!'

মধু মাদারির খেলা দেখায়। হাটে, মাঠে, বাসস্ট্যান্ডে, মেলায়। আলাপ জমাতে চেয়েছিল অহনা। ছেলেটা কম কথা বলে। ভেব্‌লু টাইপ।

চম্পা চলে যাচ্ছিল, অহনা ডাকল—'মধু যে চোখ বুজে সব দেখতে পায়, সেটা কী ব্যাপার বলত?'

'ধূর! ওসব ওঝার কারসাজি! শেখানো থাকে। যদি আগে "বাবু-কো পকেট-মে" বলে, তবে "দশ রূপিয়া" আছে বুঝিয়ে দেয়! যদি, 'ইয়ে বাবুকো পকেটমে" বলে, তখন খুচরো পয়সা আছে! এইরকম! ওগুলো আগেই শিখিয়ে রাখে!' কোমর দুলিয়ে চলে যেতে যেতে ফিরে তাকাল চম্পা। যেন জানত অহনা ওর পেছনটান দেখবে, দেখতে থাকবে।

'বাইরে থেক না দিদি! ক'দিন বাদেই 'মা' হচ্ছ। ঠান্ডা বাতাস দিচ্ছে! এসময় জ্বর-জারি হলে....'

যে পারছে সেই খবরদারি করছে। তলপেটে হাত রেখে হাসে অহনা।

কুণ্ডুবাবু এসেছেন। শ্রীশ মাস্টার চম্পার সংলাপের শেষটুকু শুনে আনমনা। কুণ্ডুবাবু পিটিশান লেখাতে এসেছেন। ওঁকে জবরদস্তি বসালেন—'শুনুন। বিজ্ঞানের কথা শুনুন। বিজ্ঞান কোথায় গিয়ে পৌঁছেছে জানেন? অবাক মশাই! অবাক হবেন! পৃথিবীতে আর পুরুষজাতির দরকার নেই। সন্তানের জন্ম দিতে মা একাই যথেষ্ট। হাসছেন?' কুণ্ডুবাবুর বিস্ময়কে তারিয়ে তারিয়ে উপভোগ করছিলেন শ্রীশ। কোষ-সংগ্রহ ও দ্রুত কোষ-বিভাজন পদ্ধতি নিয়ে মাস্টারের বয়ান ঘরের বাতাসে ঘুরে বেড়ায়। বারান্দায় দাঁড়িয়ে অহনা শোনে। শীত করছিল। ওর জীবনে কি শ্যামলের কোনও প্রয়োজন নেই? ও একাই পারবে সন্তানের জন্ম দিতে? শ্যামলের কোনও ভূমিকা নেই? তাহলে শ্যামলরা কোথায় যাবে?

লোহার গেট টেনে খোলার চেষ্টা করছিল মধু। পুলিনকে ডাকল অহনা। শ্রীশ মাস্টারের ফাই-ফরমাশ খাটে পুলিন। ঠান্ডায় গুটিসুটি পুলিন উঠে এল।

'তুই? একা এলি?' চোখ কুঁচকে মধুকে দেখছিল পুলিন।

'নাঃ! দিয়ে গেল।' সুট্‌ করে ঢুকে পড়তে চেষ্টা করল মধু।

'কে দিয়ে গেল? তোর বাপ? বাবরি চুল?'

'নাঃ! ওটা আমার বাবা না।' মধু পুলিনের হাত ছাড়াতে চেষ্টা করে। পুলিন ছাড়ে না —'তবে? তোর মাকে গতকাল যে এ বাড়ি থেকে ডেকে নিয়ে গেল....সেই ড্রাইভারটা? সে...তোর বাবা?'

'না, না!' মধু জোরে ঘাড় ঝাঁকায় —'আমার বাবা না!'

'আঃ! ওকে ঢুকতে দাও!' বিরক্ত হচ্ছিল অহনা। এ-ই এক ঝামেলা পুলিনকে নিয়ে। মধুকে পেলেই হল! বারবার একই প্রশ্ন...!

ছাড়া পেয়ে লাফাতে লাফাতে বাড়ির ভেতরে চলে গেল মধু। এখন ও মায়ের কাছে বসে থাকবে। অহনার ইচ্ছে করে মধুকে অবজার্ভ করতে। ওর কি সত্যিই কোনও একস্ট্রা পাওয়ার আছে? চোখ বেঁধে রাখলেও কি ও সব দেখতে পায়? নাকি সবই আগে থেকে শেখানো? চম্পা কি বিজনেস সিক্রেট বলবে? তবে কি চালাকি করে মতি ওঝা? সবার সামনে কী করে চালাকি করে?

'ভেড়া দিয়ে আমাদের চারণক্ষেত্র রুদ্ধ হল বলছেন?' কুণ্ডুবাবুর রসিকতায় হাসেন শ্রীশ। দেখতে না পেলেও হাসির রঙটা ধরতে পেরে লজ্জা পেল অহনা।

'ঠিক। তৃণভূমি আর আমাদের দখলে রইল না। এতকাল আমরাই মেষ-টেষ পালন করেছি। চিরকাল ওরাই তো আমাদের দিয়ে এসেছে। শীতে পশম। ক্ষিধেয় মাংস। এবার পুরো দায়িত্বটাই নিজের ঘাড়ে তুলে নিল।'

'ওটাকে বলছেন....।'

শুনে গর্ব হচ্ছে। কান্নাও পাচ্ছে। কষ্ট হচ্ছিল। শ্যামলের জন্য। জ্বরগায়ে না এলেই ভাল। দিনটা ভাল নয়।

রান্না সেরে ফিরে যাচ্ছিল চম্পা। মধুর হাতে ফেলে দেওয়া কাশির ওষুধের খালি শিশি। যে কোনও সেনটেন্সে সুর লেপে দেওয়াটা ওর স্বভাব। 'লজেন্স দেবে-এ! মা লজেন্স দে...এ....বে...এ!' মা-র পিছনে লাফাতে লাফাতে চলেছে মধু। মেন রোড থেকে ঢালু পথ নেমে গেছে মজদুর মাঠের দিকে। সুরজ-এর দোকানটা পড়ে রাস্তায়। মধুকে দেখলেই গাল টিপবে সুরজ। দেখেশুনে মুচকি হাসবে চম্পা। মধু সুরজের অদ্ভুতভাবে তাকিয়ে দেখাটা দেখে। ঠিক এভাবে তাকায় বৃন্দার বাপ। ট্রাক ড্রাইভারটা। ফলওলা সমসের.......

৩

সাইবার কাফে থেকে বেরিয়ে এদিক-ওদিক তাকাল শ্যামল। শেয়ার বাজার দ্রুত উঠছে। শেষ পর্যন্ত কী দাঁড়াবে কে জানে। অহনা অপেক্ষা করছে হয়ত। রাস্তা পেরিয়ে স্টেশনারি দোকানে ঢুকল। সিগারেট নিতে নিতে আয়নায় নিজের চেহারাটা দেখল। জ্বর হয়েছে। শুকনো চোখে-মুখে এক ধরনের বিস্বাদ লেপ্টে রয়েছে।

'শ্যামল যে!' গমক তুলে কথা বলাটা সুরঞ্জনের অভ্যেস। গভীর প্রশান্তি চোখেমুখে। একটা অদ্ভুত কথা মনে হল শ্যামলের। সুরঞ্জনের কি কখনও জ্বর হয় না?

আকাশ মেঘলা থেকে ঘন বাদ্‌লার চেহারা নিচ্ছিল। বাপের বাড়িতে বসে শ্যামলের জন্য অপেক্ষা করছে অহনা। বরটি একটি হতশ্রী দোকানের সামনে আনতাবাড় গল্পে জুড়েছে। শুধু শুধু সময় নষ্ট!

'জ্বর? ওটা ভাইরাল। ওষুধ নেই।' কণ্ঠস্বর কখনও মধ্য সপ্তকে, কখনও উচ্চ সপ্তকে ওঠানামা করছে সুরঞ্জনের। অলস চোখে অন্যদিকে তাকিয়ে থাকে শ্যামল।

'বিশ্বাস করবে? রেক্সিনের ব্যাগের মধ্যে ছোট্ট ক্যামেরা। সফিসটিকেটেড ডিজিটাল ক্যামেরা! মেমরি কার্ড স্ক্যান করে কী দেখা গেল জান?'

'ভারতের অনেক ইমপর্টান্ট আর স্ট্র্যাটেজিক জায়গার ছবি!' হাই তুলল শ্যামল।

ভীষণ দমে গেল সুরঞ্জন। কী বলতে যাচ্ছে, মোবাইল বেজে উঠতে ও সেল-সংলাপে মগ্ন হয়ে পড়ল। সেই ফাঁকে পালাল শ্যামল।

'হে...হে...ডে...ডে...' ডুগডুগি বাজছিল কোথাও। একটা ভীড় জমে উঠেছে গোল চেহারার। মাদারির খেল চলছে। শুকনো চেহারার লোকটি বিদঘুটে সুরে চেঁচাচ্ছে। সুর তুলে যেন মন্ত্র আওড়াচ্ছে। বাচ্চা খেলুড়ে ফটাফট উল্টে যাচ্ছে। একটু দাঁড়াল শ্যামল। আকৃতি বা প্রকৃতি কোনওদিকেই ইমপ্রেসিভ নয়, তবু বাচ্চা ছেলেটির চোখ বাঁধা অবস্থায় প্রশ্নের জবাব দেওয়ার ভঙ্গিটি আকৃষ্ট করল।

'তেরে পা-ও কে নীচে কেয়া হ্যায়?'

'মিট্টি।'

'মিট্টি-কে নীচে?'

'পাথর।'

'হে হে....বাবুকো পকিট্‌ মে?'

'বহোত রূপিয়া!'

'বাবুকো দিল মে?'

'বুখার। বহোত!'

শ্যামল হাসল। দিল মে বুখার? তাহলে শ্যামলকে দেখলে কী বলবে ছেলেটি? ভীড় ঠেলে বাইরে বেরিয়ে আসতে আসতে অন্যমনস্ক হয়ে পড়ল ও। দিল মে বুখার? সব্বার দিলমে এখন বুখার! বাবা-কাকারা কি এভাবে ভুগতো? শ্যামলরা কোন্‌ জগৎ সৃষ্টি করল? বাচ্চা ছেলেটি কি শেখানো কথা আওড়ে চলেছে? কে ওর টিচার? শুকনো চেহারার লোকটি?

স্নান সেরে শুয়েছিল অহনা। খুশি হল শ্যামলকে দেখে।

'এলে কেন? জ্বর...'

'ভাবলাম, তুমি চিন্তা করবে.....'

খেতে বসে খবরটা ভালরকম বুঝতে চায়—'ক্লোনিং ব্যাপারটা একটু বুঝিয়ে দিও না!'

মাথা নাড়ে শ্যামল।

'আর বাবাকে দরকার নেই? মা একাই পারবে জন্ম দিতে...?'

অহনার দিকে তাকায় না শ্যামল। একটু একটু করে উষ্মা জমা হচ্ছিল। কী বলতে চায় অহনা?

'কিছু না! আমি শুধু ব্যাপারটা....তুমি রেগে যাচ্ছ!' অহনা অবাক হয়।

রেগে যাচ্ছে! বুঝতে পারছিল শ্যামল। তবু কন্ট্রোল করতে পারছিল না। কোথায় কে যেন খোঁচা দিচ্ছিল।

'ওই একটা...ভেড়ার বাচ্চা....! পরে বলব! খেতে দেবে?'

নিশ্চুপ অহনা শ্যামলকে দেখে। 'ভেড়ার বাচ্চা' নয়, শ্যামল আসলে 'শূয়োরের বাচ্চা'ই বলতে চেয়েছিল, অহনা ভাবে। শ্যামলের পায়ের নীচের মাটি কেড়ে নেওয়া হচ্ছে কি? মাটির নীচে পাথর, জল আর আগুন রয়েছে। সেসবে পা রাখবে কি শ্যামল? এখন? এই মুহূর্তে?

খেতে খেতে শ্যামল অনুভব করে, দিল-এ সত্যি সত্যি নানান বুখার।

৪

বিকেলে সবুজ সংঘের মাঠে খেলা দেখাতে গেছিল মধু। ফিরল জ্বর নিয়ে। কাল খেলা দেখাতে পারবে না। চাদরমুড়ি দিয়ে শুয়ে ছিল মধু। শুয়ে শুয়ে বৃন্দার বাবার গান শুনছিল। বৃন্দাকে নিয়ে এসময়ে গান গায় বাবাটা। গান শুনতে শুনতে ঘুমিয়ে পড়ছিল। ঘুমিয়ে পড়তে পড়তে ও বুঝতে পারছিল বাবাটা ওর মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছে—'মেরা রাজা বেটা রে...।' বাবার হাত দুটো কত্ত শক্ত! কত্ত জোর। বৃন্দার বাবা, ড্রাইভারটা, চেক লুঙি, সুরজ দোকানি....কেউ পারবে না ওর বাবার সঙ্গে। বৃন্দার বাবার মতো মধুকে ওপরে ছুঁড়ে দিয়ে ফের লুফে নেবে বাবা। ঘুমের মধ্যেও চেতনা কাজ করে। বাবার মুখটা দেখতে ইচ্ছে করছিল মধুর। দেখতে পেলেই পুলিনকে ডাকবে—

'দ্যাখো! এইটা আমার বাবা!' কিন্তু এই প্রথম কিছু দেখতে পাচ্ছিল না। মতি ওঝা যদি কখনও এই প্রশ্নটা করে জবাব দেবে কী করে মধু? বাবাকে যে চেনে না ও! পুলিন শক্ত করে চেপে রেখেছে ওর মুখ 'বাতা দে/ বাতা দে....তোর মাকে ক্লিপ দিয়েছে সে-ই তোর বাবা তো?'

'না।'

'চেক লুঙি?'

'না!'

'মতি ওঝা?'

ওঃ! ঘুম ভেঙে গেছে! শুয়ে থাকে মধু। কাল মতি ওঝা আসবে। জ্বর না থাকলে একঘন্টার জন্য খেলা দেখাতে নিয়ে যাবে। মজদুর মাঠে বিরাট মেলা বসেছে। ওখানেই যাবে ওরা।

৫

লম্বা বাঁশের আগায় ছোট্ট তক্তা সেঁটে রাখা। তার ওপরে দাঁড়িয়ে মধু। মতি ওঝার মাথায় খাড়া বাঁশ। বাঁশের ওপর মধু। তার ওপরে আকাশ। আর নীল প্রজাপতি। দু'হাত তুলে বাতাস কাটে মধু। ভীড়ের মাঝে দাঁড়িয়েছিল পুলিন। গভীর অনুসন্ধিৎসা নিয়ে মতি ওঝাকে দেখছিল পুলিন। জন্মরহস্য কেন গুপ্ত রয়েছে মধুর? কী লাভ এতে?

হে...হে...হে...ডে...ডে...ডুগ ডুগ....ডুগপুৎ! ডুগডুগির তালে ফটাফট উল্টে যাচ্ছিল মধু। পুলিন চিৎকার করে 'এটাই তো? জানি, জানি! মতি ওঝা তো?'

শূন্যে ঘুরপাক খায় মধু। লাট্টুর মতো ঘুরে চলে। চারপাশের মানুষজন, রাস্তাঘাট, শব্দাশব্দি, সব হারিয়ে যায় এক বৃত্তাঘাতে। তারই মাঝে একা মধু নিজস্ব দুনিয়া রচনা করতে থাকে 'না, না! এটাও আমার বাবা না।'

'কোথায়? তোর বাপ কোথায়?' মতি ওঝা চেঁচাচ্ছিল! চেরাগলায়/'নে-ই! নে...ই! ওখানে আমার বাবা নেই!'

ওখানে বাবা নেই! এই ঘূর্ণ্যমান জগতে সম্ভবত মায়ের প্রয়োজনও অনুভব করে না মধু। নিজেকেই সৃষ্টি করে চলে ও নাকি জন্মদাতার অন্বেষণ করে চলে এই ঘূর্ণ্যমান জগতে! নতুন গ্রহে কেবল নারী নয়, একজন পুরুষকেও প্রয়োজন মধুর!

আলো-আঁধারের গল্প

অরুণ কাঞ্জিলাল

রামপুরহাট লোকাল যখন সাঁইথিয়া স্টেশনে থামল, পশ্চিমের আকাশে তখনও অন্ধকারের গাঢ় প্রলেপ। রাত শেষ হয়নি। স্টেশনের বাতিগুলো কুয়াশায় ভিজে ভিজে। জন দশ-বারো লোক নামিয়ে দিয়ে ট্রেনটা চলে গেল। বাতাসে কালো ধোঁয়ার পোড়া গন্ধের সঙ্গে কিছুটা কয়লার কুচি উড়ে এল। স্টেশনের প্রধান শেড্‌টির তলায় কতকগুলি পরিবার চাদর মুড়ি দিয়ে একে অপরের গা ঘেঁষে অঘোরে ঘুমোচ্ছে। অন্ধকার এখনও স্টেশনের ঘরবাড়ি, প্ল্যাটফর্ম, গাছপালার মাথায় জড়িয়ে আছে। শেষ রাতের ঠান্ডা বাতাস বইছে। ইঞ্জিন হল্টের ছাইগাদায় সদ্য ঘুমভাঙা চোখে কয়েকটা কাক কলরব জুড়েছে। আর কোথাও বিশেষ কোনো সাড়াশব্দ নেই। ট্রেন থেকে যারা নেমেছিল, তারা কেউ লাইন পার হয়ে এদিক-ওদিক চলে গেল, কেউ প্লাটফর্মের গেট দিয়ে বাসরাস্তায় নামল।

ট্রেন থেকে নেমেছে একটি যুবক। নাম মৃগাঙ্ক। সুঠাম অঙ্গ। রঙ ফরসা, মুখখানি সুন্দর। গড়পড়তা মধ্যবিত্ত বাঙালি ছেলেদের থেকে বাড়ন্ত শরীর। হঠাৎ দেখলে বয়স তিরিশ-এর মতো মনে হয়, কিন্তু মুখের কমনীয়তা প্রমাণ করে একুশ-বাইশের বেশি হবে না। এই শেষ রাতে প্ল্যাটফর্মে কুলিকামিন বলতে কেউ নেই। কুলি দূরে থাক রাতের ডিউটিতে রেলের কোনো লোক আছে কিনা সন্দেহ। মাথায় মাফলার জড়িয়ে, র‍্যাপারে গা-হাত-পা মুড়ে একজন খালাসি গোছের লোক কিছুক্ষণ আগেও স্টেশনের তদারকিতে ছিল। সেই ঘন্টা বাজিয়েছে। সবুজ ফ্ল্যাগ দেখিয়েছে। গেটের কাছে দাঁড়িয়ে টিকিট সংগ্রহ করে আবার স্টেশনের কোনো এক অদৃশ্য গুমটি ঘরে ঘুমোতে গিয়েছে। এখন প্ল্যাটফর্মে লোক বলতে মৃগাঙ্ক আর একজন দেহাতি চা-ওয়ালা।

মৃগাঙ্ক যদি খুব সাধারণ ছেলে হত তাহলে এই পরিবেশে ট্রেন থেকে নেমে পড়ে যথেষ্ট নিরাপত্তাহীনতায় ভুগতো। কিন্তু তার ধাত অন্য রকমের। নির্জন রাতে, জল-ঝড়ে অথবা চরম শীতে অজানা-অচেনা পরিবেশে সে অনেক রাত কাটিয়েছে। তার শরীর ও মন এখন সব রকম পরিস্থিতির জন্যই তৈরি।

দেশে এখন জরুরি অবস্থা চলছে। বাঙালির জীবনে এ এক যুগান্তকারী সময়। শহর ও গ্রামের দেয়াল-লিখনগুলো উদ্ধতভাবে প্রচার করছে—এই দশক মুক্তির দশক। চারিদিকে দারিদ্র্য, বেকারি, হতাশা—আর এই নিরবচ্ছিন্ন আঁধারে এক দল প্রাণোচ্ছল তরুণ যারা স্বপ্ন দেখে—একদিন সূর্যের ভোর। এরা চরমপন্থী। মুক্তির লড়াইয়ে এরা ঘটিয়েছে বেআইনি আগ্নেয়াস্ত্রের আবির্ভাব, পিক্‌রিক অ্যাসিডের বোমা। ঠিক যেন বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের অনুষঙ্গ। এইসব তরুণদের মধ্যে যেমন রয়েছে প্রচণ্ড দ্রোহ অপর দিকে মানুষী দুর্বলতা। মৃগাঙ্ক এই দলের। দেশের আইনি ব্যবস্থায় সে একজন চিহ্নিত অপরাধী। পুলিশ তার গোপন আস্তানায় হানা দিয়ে আগ্নেয়াস্ত্র সমেত দু'জন সঙ্গীকে গ্রেপ্তার করেছে। হন্যে হয়ে খুঁজছে তারা মৃগাঙ্গকে। সে এখন গা ঢাকা দিয়ে বেড়াচ্ছে।

দেশের আইনি প্রশাসনের মতো বাড়িতেও সে ব্রাত্য। মৃগাঙ্কর বাবা সমাজে একজন গণ্যমান্য ব্যক্তি। ছেলের সশস্ত্র পন্থায় তার যথেষ্ট ক্ষোভ। পুলিশের চোখে ধুলো দিয়ে তবু কখনও-সখনও মৃগাঙ্ক বাড়িতে আসে, পিছনের দরজাটি দিয়ে। মা তাকে বসিয়ে খাইয়ে দেয়, কিছু টাকা হাতে গুঁজে দেয় নিজের সঞ্চয় থেকে। তারপর অনেকটা উৎকণ্ঠা নিয়ে পিছনের দরজাটি দিয়েই বার করে দেয়। এভাবেই চলছিল। একদিকে পুলিশ, অপরদিকে বাবা। কিন্তু একদিন প্রচণ্ড গোল বাধল। বাড়িতে ঢুকেই বাবার মুখোমুখি হয়ে গেল মৃগাঙ্ক। ববার এই রুদ্ররূপ জীবনে কখনও দেখেনি সে। একটানা বচসা চলল। মায়ের মধ্যস্থতাতেও সমস্যা মিটল না। পথে নামল সে।

পথে সে নেমেই ছিল। এবার যেন একটু অন্য রকম। একটু দূরে। পরিচিত গণ্ডি ছাড়িয়ে খানিকটা দূরে। একটা পুরানো গানের সুর সে মনে মনে গেয়ে নিল—'পথ হারাবো বলেই এবার পথে নেমেছি।' হঠাৎ তার চোখের সামনে ভেসে উঠল এক লালমাটির দেশ। ঐ লালমাটিতেই একদিন বিরাট এক লড়াই হয়েছিল। সাঁওতাল চাষিদের সঙ্গে ইংরেজদের লড়াই—হুল বিদ্রোহ।

ঐ লালমাটির দেশ বীরভূমেই তার দিদির বিয়ে হয়েছে। বিয়ের আগে দিদির সঙ্গে তার খুব অন্তরঙ্গতা ছিল। অনেক দিন তার কোনো খোঁজখবর নেওয়া হয়নি। আবেগতাড়িত হয়ে সে ছুটল স্টেশনের দিকে। রাত দশটা নাগাদ দমদম থেকে সে রামপুরহাট লোকালটিতে উঠে বসল। কাঁধে তার ঝোলা, পকেটে মায়ের দেওয়া পঁয়ত্রিশ টাকা।

বর্ধমান পর্যন্ত দাঁড়িয়েই এসেছে মৃগাঙ্ক। আজ শুক্রবার গাড়িভর্তি তারাপীঠের যাত্রী। শনিবার তারাপীঠে বিশেষ পুজোর আয়োজন থাকে। এছাড়া শান্তিনিকেতন, ম্যাসেঞ্জার যাবার টুরিস্ট পার্টিতে গাড়ি শিয়ালদা থেকেই বোঝাই। ব্যাটারির মাইকে চলছে 'নাচ মেরে বুলবুল তো পয়সা মিলেগা।' তার সঙ্গে তাল মিলিয়ে নাচ। সব মৃগাঙ্করই বয়সী ছেলেছোকরা। মৃগাঙ্কর কেন যেন এসব ভাল লাগে না। নিজেকে এদের সঙ্গে মেলাতে পারে না। বর্ধমান আসতেই সে তাই ট্রেনের কামরা বদল করল।

এই নতুন কামরাটার মেঝেতে তিল ধারণের জায়গা নেই। ছোটখাট ব্যবসায়ীদের

মালপত্রে ঠাসা। একজন ব্যাপারী মহিলা বিপুলাকার দু'বস্তা ডাব নিয়ে দরজাটা জুড়ে বসেছে। মৃগাঙ্ক উঠতে যেতেই সে রাঢ় ভাষায় সুধালো—

—তু কুথায় যাবি রে বাবু?

মৃগাঙ্ক ওর সুরটা নকল করে বলল—সিউড়ি।

—ই গাড়িটো তো সিউড়ি যাবেক নাই।

মৃগাঙ্ক বলল—বটে।

—সাঁইথিয়া থিকে বাসে যেতে হবেক। পুথম বাস পাবে সকাল ছটায়।

মৃগাঙ্ক আবার বলল—বটে।

ব্যাপারী মহিলাটি এবার সহানুভূতির সুরে বলল—বস্তা ডিঙ্গিয়ে ভিতরে চলে যা। বাঙ্কে শুয়ে পড়। আমি নলহাটি লামব, তুমাকে ডেকে লিব।

ব্যাপারী মহিলাটিকে আর ডাকতে হয়নি, তার পরিবর্তে তাকে ডেকেছিল টিকিট কালেকটর।

—টিকিট।

উসকো-খুসকো চুল আর রাতজাগা দুটি চোখ তুলে বিস্ময়ে টিকিট চেকারের দিকে তাকিয়ে মৃগাঙ্ক বলল—টিকিট? টিকিট তো নেই।

—তবে ফাইন দিন।

মৃগাঙ্কর চোখে তখন বিস্ময়ের ঘোর কাটেনি। এর আগে কোনোদিন সে টিকিট চেকারের হাতে পড়েনি। অসম শ্রেণীর দুটো মানুষ মুখোমুখি। হঠাৎ মৃগাঙ্ক উদ্দীপ্ত হয়ে উঠল। বলল—ফাইন আমি দেব না।

টিকিট চেকার এবার ওর কানের সামনে ফিসফিসিয়ে বলল—ফাইন না দিতে চান, তার ব্যবস্থাও আছে। গেটের সামনে আসুন, দশটা টাকা দিলেই হবে।

মৃগাঙ্ক বিরক্ত হয়ে রূঢ় ভঙ্গিতে বলে বসল—আপনারা মাইনে পান না? এরকম ভিক্ষা না করলে আপনাদের চলে না? যত চোর-চোট্টার গভরমেন্ট।

কয়েক সেকেন্ড স্তব্ধতার পর টিকিট কালেকটর পকেট থেকে একটা বিলবই বার করে ভিতরে কারবন গুঁজে মৃগাঙ্ককে ফাইন করে দিল, চৌত্রিশ টাকা পঞ্চাশ পয়সা, শিয়ালদহ থেকে সাঁইথিয়া পর্যন্ত।

সাঁইথিয়া নামবার সময় সেই ব্যাপারী মহিলাটি বলে বসল—তুদের বুঝা বড় শক্ত। যিখানে দশ টাকায় কাজটা হয়ে যায়, সিখানে চৌত্রিশ টাকা! ঐ লাল কাগজটা লিয়ে তুমার কি লাভ হল? সব মাথা গরম। আমার ছেলেটাও তুর মতন।

মৃগাঙ্ক হেসে বলল—তোমার ছেলেটি কী করে?

জবাবে মহিলাটি বলে—বাবার হোটেলে খেইছে, বেড়াইছে আর টিউশানি পড়াইছে। বি.এ পাশ।

মৃগাঙ্ক হেসে বলে—বটে, মাসি!

ট্রেনের কামরা থেকে নেমে প্রথমটায় একটু চিন্তায় পড়ল মৃগাঙ্ক। কমার্স-এর

ছাত্রদের মতো একটু হিসাব করে নিল—মোট ক্যাপিটাল পঁয়ত্রিশ টাকা, টিকিট কালেকটরকে ফাইন বাবদ দেওয়া হল চৌত্রিশ টাকা আট আনা, হাতে রইল আট আনা। মাথাটা গরম না করলেই ভাল হত। তারপর ভাবল, না কাজটা ঠিকই করেছে—এরাও এক ধরনের শ্রেণীশত্রু।

মৃগাঙ্কর একটু চা খেতে ইচ্ছে করছিল, কিন্তু আট আনা অবশিষ্ট নিয়ে চায়ের ইচ্ছেটা সে দমন করল।

মৃগাঙ্কর দিকে তাকিয়ে চাওয়ালাটা বলল—চা পিজিয়েগা বাবু?

মৃগাঙ্ক বলল—না, একটু জল খেতাম।

চাওয়ালাটা বলল—প্ল্যাটফর্মের উঁধারে চলিয়ে যান। টিউবকল আছে। যত ইচ্ছে জল খেয়ে লিন।

মৃগাঙ্ক দেখল ওদিকটা বেশ অন্ধকার। তার উপর একটা ঝাঁকড়া গাছ জায়াগাটা আরও অন্ধকার করে রেখেছে। মৃগাঙ্গ বলল—ওদিকটা তো অন্ধকার।

দেহাতি চাওয়ালাটা বলল—চলিয়ে যান, বাঘ-ভালু কুছু নেহি।

মৃগাঙ্ক পায়ে পায়ে প্ল্যাটফর্মের শেষ প্রান্তে পৌঁছে গেল। পেটপুরে জল খেল তারপর চোখেমুখে জল দিয়ে পকেট হাতড়ে রুমালটা খুঁজতে লাগল। তাড়াহুড়োতে রুমালও ছেড়ে এসেছে। মৃগাঙ্ক এদিক-ওদিক তাকিয়ে দেখল কেউ কোথাও নেই। সে গায়ের জামাটা খুলে তারই একপ্রান্ত দিয়ে মুখ মুছতে লাগল। হঠাৎ অন্ধকার গাছতলা থেকে মেয়েলি হাসির শব্দ। অন্ধকার থেকে যেন প্রেতিনী হেসে উঠল। মৃগাঙ্কর বাইশ বছরের এই দুর্দান্ত ঝোড়ো হাওয়ার জীবনে এরকম ভয় সে কোনওদিন পায়নি। একটু কাছে যেতেই তার রক্ত হিম হয়ে গেল। অস্বচ্ছ পাতলা অন্ধকারে সে দেখল একটা কালো পেত্নীর অবয়ব। ঠোঁটে লাল লিপস্টিক, চোখে কাজল। জড়ির ফিতে দিয়ে বাঁধা বিনুনি দুটি কাঁধের দু'পাশে ঝুলছে। আলো-আঁধারি মায়াবী বর্ণবিভঙ্গে মনে হল দুটি সোনালি ডোরা-কাটা সাপ যেন শরীর জড়িয়ে রেখেছে। চোখে তার টলমল করছে অরণ্যচারী হরিণীর রহস্য। বস্তুত প্রথম দিকটা নার্ভাস বোধ করার পর মৃগাঙ্ক এখন কৌতুকবোধ করছিল। একটু এগিয়ে এসে জিজ্ঞাসা করল—এখানে, এত রাতে, আপনি কি করছেন?

মেয়েটা রূঢ় ভাষায় বলল—আমি? এখানে ধান্দা করি, ধান্দা।

মৃগাঙ্ক শুধায়—ধান্দা মানে?

মেয়েটা আকস্মিক মৃগাঙ্কের জামাসুদ্ধ কোমরের বেল্টটা চেপে ধরে এক ঝটকায় কাছে টেনে এনে পাশে বসিয়ে দেয়। ঘটনার আকস্মিকতায় প্রথমটায় হতবুদ্ধি হলেও নিজেকে সামলে নেয় মৃগাঙ্ক। এক ঝটকায় মেয়েটিকে সরিয়ে দিয়ে ত্বড়িৎ গতিতে পিছু হটে আসে সে। তারপর দাঁতে দাঁত চেপে বলে—বেশ্যা!

মেয়েটি খিলখিল করে হাসতে থাকে। তার হাসিতে রাতের নিস্তব্ধতা যেন খানখান হয়ে যেত লাগল। ঝাঁকড়া গাছটার মাথায় কতগুলো রাতজাগা পাখিও পাখার

ঝটপটানিতে তাদের অবস্থান জানান দেয়। মৃগাঙ্ক বিস্মিত হয়। এই পাণ্ডববর্জিত রেল স্টেশনে একা একটি মেয়ে পতিতাবৃত্তি করে। জীবনের এদিকটা তো তার দেখা হয়নি। স্বাভাবিক কৌতূহলের বশেই সে এগিয়ে গেল। বয়স তিরিশের মধ্যে হবে। আধময়লা শাড়ি, লাল ব্লাউজ। চোখেমুখে একটা ঝকঝকে হাসির ভাব।

কয়েক সেকেন্ড নীরবতার পর মৃগাঙ্ক মুখ খুলল—কাজ করে খেতে পারেন না? এই রাতে নির্জন স্টেশনে ধান্দা করেন?

মেয়েটা আবার হেসে উঠল, বলল—তুর বাড়িতে কাম দিবি মোকে। তুর ঘর সাজাব, রান্না করব। তুর বউয়ের চুল বেঁধে দিব। কিরে লিয়ে যাবি তো?

মৃগাঙ্ক গম্ভীরভাবে ঘাড় নেড়ে বলে—আমার ঘর নেই তো, বউ আসবে কোথা থেকে।

—কি বুলছিস বাবু, কেউ নেই?

—না কেউ নেই আমার। মৃগাঙ্কর গলার স্বরটা একটু ভারী শোনায়।

—ইটা তবে তো ভালই, আমার পাশে একটু বস, কোন ভয় লাই। আজ বাজার খুব খারাপ। রামপুরহাট প্যাসেঞ্জারে একটাও খদ্দের পেলাম না। একটু পর ডাউন দানাপুর আসবে। ওটা আসা পর্যন্ত থাক আমার সঙ্গে। অন্ধকারে আমার ডর লাগে।

মৃগাঙ্কর কি হল, সে পায়ে পায়ে এগিয়ে গিয়ে মেয়েটার পাশে বসল। মেয়েদের সঙ্গে এইভাবে, এই পরিবেশে ওর কথা বলার কোনো অভ্যেস নেই, কিন্তু জীবনের এক-একটা মুহূর্ত এমন হয়, যার কোনও পরম্পরা, কোনও যুক্তি খুঁজে পাওয়া যায় না।

একটু তফাত রেখেই বসেছিল সে। মেয়েটিই তফাত না মেনে সামনে এগিয়ে এল। মেয়েটির গায়ের গন্ধ নাকে এসে লাগছে। শুকনো বকুল ফুলের মতো গন্ধ। সহানুভূতির সুরে বলল সে—সত্যি বল, বাড়িতে তুর কে আছে?

মৃগাঙ্ক নিজেকে সামলে নেয়। অপরিচিত একটা মেয়েমানুষের কাছে নিজের মন খুলে ধরা নিরাপদ নয়। বিশেষ করে তার একটা রাজনৈতিক দিক আছে। তবু বীরভূমের এই লালমাটির লোকগুলোকে তার বড় ভাল লাগে, বিশ্বস্ত মনে হয়। প্রসঙ্গ না পাল্টিয়ে সে বলে—বাড়িতে সবাই আছে, আবার কেউ নেই।

তারপর সন্ধে থেকে একে একে যা ঘটনা ঘটে গেছে, সব বলে যায়। মেয়েটি মন দিয়ে সব শোনে। ভোর হয়ে এল। পাখিরাও ওড়াউড়ি শুরু করেছে। মৃগাঙ্ক উঠে দাঁড়ায়, রাত জাগার হাই তোলে, বলে—যাই।

মেয়েটি খপ করে ওর হাতটা ধরে বসিয়ে দিয়ে বলে—দিদির বাড়ি যাবি, হেঁটে-হেঁটে যাবি নাকি, পকেটে তো পয়সা লাই।

মৃগাঙ্ক বলে—এখন ভোরে ভোরে রওনা দিলে পঁয়ষট্টি কিলোমিটার রাস্তা, বিকেলের মধ্যে পৌঁছে যাব।

কথাগুলো বলার সময় তার মুখটা আশ্চর্য রকমের করুণ দেখাচ্ছিল। মেয়েটা হঠাৎ বুকের খাঁজ থেকে দশটা টাকা বার করে মৃগাঙ্কর হাতে গুঁজে দেয়। বলে—ঘরের দিদি আর রাস্তার দিদি এক লয়। তবু এই টাকাটা লিয়ে বাসে চলে যা। এতটা রাস্তা হাঁটতে লারবি।

রেলের ঘন্টা বাজল। দূর থেকে মাথায় গলায় মাফলার জড়ানো, আপাদমস্তক র‍্যাপারে ঢাকা, সবুজ ফ্ল্যাগ হাতে খালাসি গোছের লোকটাকে দেখা গেল।

মেয়েটি এবার হেসে বলল—তুমি এবার যাও ভাই, তুমি থাকলে আমার খদ্দের আসবেক লাই।

মৃগাঙ্ক অল্প হাসল। তারপর নিজের কাঁধের ঝোলাটা সামলে দ্রুত পায়ে হেঁটে লাইন পেরিয়ে স্টেশনের বাইরে এল। পিছনে ঝম্‌ঝম্‌ করে ডাউন দানাপুর স্টেশনে ঢুকে পড়ল।